এপ্রিল ২০২৪, সংখ্যা ১৩

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

To Make the World Greener

M/S MAN ENTERPRISE

We Build

We are involved in :

* **Sinking Deep Tube Well**
* **Providing Rig Machine**

We Supply:

* S. S. Strainer
* Stones
* Blind Pipe
* Water Meter
* Housing Pipe
* Gas Cylinder
* Elephant Brand Cement
* Fire Extinguisher
* Gym/ Fitness Equipment
* All Types of Kitchen hood
* Eye Protection Goggles
* Container
* Mechanical Equipment

We Construct:

* Road
* External Water Line
* Building
* Pump-House

House# 657, Road No#26, DOHS Mirpur, Dhaka-1216.
Tel # 02-8080675.
Website: www.man-enterprise.com
E-mail: msmanenterprise@gmail.com

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র
সংখ্যা ত্রয়োদশ, জানুয়ারি ২০২৪

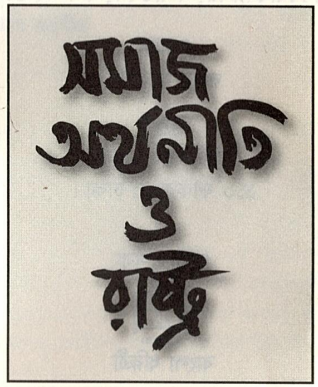

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র
সংখ্যা ত্রয়োদশ, জানুয়ারি ২০২৪
সমাজ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী

সম্পাদক
বিনায়ক সেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
দিলওয়ার হোসেন

কপিরাইট ©
সমাজ গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন, কক্ষ নং-৪০৫৭

প্রচ্ছদ
রবীন আহসান

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০ ফকিরাপুল ঢাকা।

পরিবেশক
বাংলা ধরিত্রী

মূল্য
৪০০ টাকা মাত্র
এই সংখ্যা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ
এম এম আকাশ
ফোন নম্বর: ০১৭১১৮৪৭৬৫০
দিলওয়ার হোসেন
ফোন নম্বর: ০১৮১৯১৪৪০৯৯

পরবর্তী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যোগাযোগ
এম. এম. আকাশ
মুঠোফোন: ০১৭১১-৮৪৭৬৫০; ই-মেইল: akashmokaddem@gmail.com

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র
সংখ্যা ত্রয়োদশ, জানুয়ারি ২০২৪

সূচিপত্র

তাজুল ইসলাম ১
বাংলাদেশ ও ব্রেটন উডসঃ
দারিদ্র্য বিমোচনের অর্ধ-শতক

তানভীর মোকাম্মেল ৮১
বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমা:
ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান

নজরুল ইসলাম ১১৭
আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়

পুস্তক সমালোচনা ৪৪৭

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বিশ্লেষণ
এবং বিকল্প উন্নয়ন ধারার অণ্বেষা নিয়ে পুনরুজ্জীবিত

সমাজ গবেষণা কেন্দ্র

সকল উৎসাহী গবেষককে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে

যোগাযোগ
অধ্যাপক এম এম আকাশ
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন, কক্ষ ৪০৫৭

মুখবন্ধ

সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র সমাজ গবেষণা কেন্দ্রের একটি প্রকাশনা। কেন্দ্রটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠার পরই প্রকাশ করে সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পত্রিকাটি। ডঃ আব্দুল গফুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় এটি। অনেকদিন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে এর প্রকাশন অনিয়মিত হয়ে পরে। সবশেষ দ্বাদশ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২০ সালে। তখন সেটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান।

নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে ত্রয়োদশ সংখ্যার প্রকাশনা বিলম্বিত হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ত্রয়োদশ সংখ্যাটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ডঃ বিনায়ক সেনের উপর। কিন্তু লেখা পেতে পেতে দীর্ঘ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায। অবশেষে ডঃ তাজুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল ও ডঃ নজরুল ইসলাম এর মাত্র তিনটি লেখা নিয়েই এই ত্রয়োদশ সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো।

আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের উন্নয়ন যাত্রার একটি চালচিত্র এই সংখ্যার লেখাগুলিতে ধারণ করতে। অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে যেসব অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি সাধিত হয়েছে তার একটি সঠিক পর্যালাচনা ও মূল্যায়ন করাটা আজ খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ এর উপর নির্ভর করেই আমাদের আগামী দিনের করনীয় নির্ধারন করতে হবে। সেই আহ্বান জানানোর পরে অনেক কাল অতিক্রম করে গেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানের পর্যাপ্ত লেখা আমরা পাই নি। অগত্যা তিনটি লেখা ও একটি পুস্তক সমালোচনা নিয়েই জার্নালটি প্রকাশ করতে হোল।

ড. তাজুল ইসলামের প্রথম প্রবন্ধটিতে আপনারা পাবেন বাংলাদেশের দারিদ্র্যের গতি প্রবণতার একটি অনুপুংখ পর্যালোচনা। এতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নীতিপ্রণেতাদের প্রভাব কতটুকু ছিল সেটিও তিনি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

তানভীর মোকাম্মেলের রচনায় বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরে চলচ্চিত্রে যেসব অর্জন ও ব্যর্থতা রয়েছে তার একটি চুলচেলা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বশেষ সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ডঃ নজরুল ইসলাম। সেখানে সমগ্র সামুষ্টিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গভীর বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের দশটি করণীয়ের প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে।

এই সংখ্যায় আমরা সম্প্রতি প্রথমা প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত গৌতম রায় লিখিত 'পূর্ববংগের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার কথা (১৯৪৭-৬৭) গ্রন্থটির উপর একটি

বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা প্রকাশ করেছি। সেটি লিখেছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও লেখক তানভীর মোকাম্মেল।

এই সংখ্যাটি প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আমাদেও প্রত্যাশা লেখাগুলি দীঘ হলেও আপনাদের জন্য সুখপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় হবে। আমাদের সব রকম চেষ্টা থাকবে আগামীতে যাতে বছরে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করা যায় সেই প্রয়াস নেওয়া।

বাংলাদেশ ও ব্রেটন উডসঃ দারিদ্র্য বিমোচনের অর্ধ-শতক

তাজুল ইসলাম*

১। ভূমিকা

ক) আলোচনার প্রেক্ষাপট

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি। কারণ, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের অভীষ্ট ছিল না, বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি ছিল এই সংগ্রামের অন্তর্নিহিত মূলমন্ত্র। রাজনৈতিক ভাবে করাচী-ইসলামাবাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, অর্থনৈতিক ভাবে সোনালি আঁশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় তারবেলা বাঁধ ও ইসলামাবাদের চাকচিক্য, ইত্যাদি ছাড়াও বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, ইতিহাস, দর্শন সহ সামগ্রিক বাঙালি জাতিসত্তার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পশ্চিমা আগ্রাসন শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর জনগণের মধ্যে এই মুক্তির একটা সুপ্ত বাসনার জন্ম দিয়েছিল। তাই স্বাধীনতা ও মুক্তি বাঙালির কাছে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম লীগের মত সরাসরি পশ্চিমা শাসনের সুবিধাভোগী রাজনৈতিক দল ছাড়া মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড কিংবা প্রচার প্রকাশনার মধ্যেই এই আঞ্চলিক শোষণের বিষয়টি প্রাধান্য পেত। তবে নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রকাশের পর আওয়ামী লীগের একটি দেয়াল পোষ্টারের শিরোনাম ছিল "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?"। আমার বিশ্বাস, ছয় দফাকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এই পোস্টারটির ভূমিকা ছিল অসীম। সব মিলিয়ে জন-মানসে একটা আবহের সৃষ্টি হয়, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের যত রকমের দুর্ভোগ আছে সবকিছুর জন্য "পশ্চিম

* ডঃ মোঃ তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও প্রো ভিসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য (ভূতপূর্ব) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

পাকিস্তানি শাসনই দায়ী" এরূপ বিশ্বাস এই অঞ্চলে একরকম স্বতঃসিদ্ধে পরিণত হয়। যেমন, মানুষ বিশ্বাস করত, বাংলার (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের) সাংবাৎসরিক আকাল, মরা কার্তিকের কঙ্কালসার মানুষ আর লাশের মিছিল, এ সবেরই সর্বশেষ কারণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ।

স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পঞ্চাশ বছরে দেশের সব ক্ষেত্রেই দর্শনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন সারা বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে জাগে, এই যে সব অর্জন, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে কি তা সম্ভব হত? এই প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন উত্তর দেয়া হয়তো সম্ভব নয়। কারণ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অনেক পারিপার্শিকতারই পরিবর্তন ঘটেছে; তাই আগের আন্তঃপ্রাদেশিক শোষণের ধারা অব্যাহত থাকলেও আমাদের ইতিবাচক অর্জনগুলি সম্ভব হত কিনা বলা মুশকিল। তবে যে কথাটি এখন নিশ্চিত বলা যায় তা হল এই যে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে আমরা তলিয়ে যাইনি, অনেক বোদ্ধার মতে যা অবধারিতভাবে হওয়ার কথা ছিল; যা না হওয়ায় উন্নয়ন অর্থনীতির অনেক স্বতঃসিদ্ধকেই প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে।

বর্তমান রচনাটিতে বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। জটিল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে যথা সম্ভব পরিহার করে বিগত পঞ্চাশ বছরে দারিদ্র্যের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এর অন্তঃসারটি উন্মোচন করাই এই বিশ্লেষণের প্রধান লক্ষ্য। তবে এই কাজটি করতে যেয়ে পরতে পরতে উপলব্ধিতে এসেছে যে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ সমূহ দারিদ্র্য সমস্যা সহ তাদের উন্নয়নের যে কোন প্রসঙ্গে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব সময়ই আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আদেশ, উপদেশ, দিকনির্দেশনাকে মাথা পেতে নিয়ে পথ চলতে বাধ্য হয়েছে।

এই মুরুব্বিদের মধ্যে যেমন রয়েছে বড় বড় কিছু দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী, তেমনি রয়েছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (IMF), এডিবি'র (ADB) মত বহুপাক্ষিক (multilateral) উন্নয়ন সহযোগী। কালক্রমে, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের তুলনায় বিশ্বব্যাংক এবং আই এম এফ (যারা একত্রে ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত) এমন এক অনন্য অবস্থানে উন্নীত হয় যে তাদের কথাই হয়ে পড়ে এ প্রসঙ্গে শেষ কথা।

অবশ্য সব দেশ যে ব্রেটন উডস এর খবরদারিত্বকে সমানভাবে গ্রহণ করেছে এমনটাও নয়। এর অনেকটাই নির্ভর করেছে সে দেশের অর্থনৈতিক শিরদাঁড়া কতটা শক্ত তার উপরে।

বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে "তলা বিহীন ঝুড়ি" নামে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিতি পেয়ে আসছিল, তার উপর ব্রেটন উডস এর খবরদারির মাত্রা কতটা হতে পারে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোচন সহ সবকিছুতে ব্রেটন উডস এর অবস্থান ছিল সর্বদাই সর্বোচ্চ (Jannuzi & Peach, 1990)।

একেবারে শেষ কয়েকটা লাইন থেকে পরিষ্কার হয়, দাতাদের অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকার কার্যকর রিফর্ম করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা অন্য কোথাও ব্যবহার করতে হবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক নিবন্ধের শিরোনামে ব্রেটন উডস এর উল্লেখ তাই আপাততঃ বেখাপ্পা মনে হলেও বাস্তবতার নিরিখে খুবই যৌক্তিক। এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখব, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য ব্যর্থতার ইতিহাস অনেকটাই সময়ের সাথে সাথে ব্রেটন উডস এর দারিদ্র্য-দর্শনের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস।

খ) বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা

একটা দেশের দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমরা আসলে দারিদ্র্য বলতে কোন অবস্থাটিকে বুঝাতে চাইছি। কারণ, দারিদ্র্য অভিধাটি আপেক্ষিক, যথেষ্ট প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও আরো প্রাচুর্যের অভাবে নিজকে অভাগা দরিদ্র ভাবেন এমন মানুষ একেবারে বিরল নয়। তবে আমরা যখন একটা দেশের দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলব, তার বিভিন্ন গতি প্রকৃতি অনুধাবন করতে চাইব, অথবা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করতে চাইব তখন অবশ্যই তাকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে ফেলতে হবে। একারণেই দারিদ্র্যের একটি পরিমাপ বাচক সংজ্ঞা সর্বত্র গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আমরাও এ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত দারিদ্র্য রেখা ভিত্তিক সংজ্ঞাকেই ভিত্তি ধরে আমাদের আলোচনা অগ্রসর করে নেব।

১৯৮৭ সালে UNDP, WB এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা নির্ধারণ করে যে বিশ্বের বিভিন্ন নিম্ন আয়ের দেশে একজন গড়পড়তা মানুষের ন্যূনতম অন্নবস্ত্রের

সংস্থান, এবং মাথা গোঁজার ঠাই যোগাড়ের জন্য দৈনিক এক মার্কিন ডলার সমমানের আয়ের দরকার হয়। এই পরিমাণ আয়ের চেয়ে কম যার দৈনিক আয় তিনিই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবেন। এই ধারণাটির মূলে আছে ফ্রান্সে বসবাসকারী জোসেফ রেজিন্সকি নামক একজন উদ্বাস্তু-সমাজসেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত International Movement ATD Fourth World নামক একটি মানবতাবাদী সংগঠনের রিপোর্ট। এই রিপোর্টের ভাষ্যমতে, সমাজের যে অংশটি তাদের টিকে থাকার জন্য মৌলিক দায়িত্বটুকুও পালন করতে অক্ষম তারাই হল দরিদ্র (poor), আর যাদের এই দারিদ্র্যাবস্থা এতটাই প্রকট যে দৈহিক অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন, এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থা থেকে মুক্তিরও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা, তারা হল extreme poor, বাংলায় যাকে বলা যায় হতদরিদ্র।

রেজিন্সকির সংজ্ঞারই প্রতিধ্বনি করে জাতিসংঘ দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে একজন মানুষের পছন্দ (choices) এবং সুযোগের (opportunities) ভারসাম্যের অভাব হিসাবে। এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম জীবনের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অর্থমূল্য হিসাবে দৈনিক এক মার্কিন ডলারের ধারণাটি গ্রহণ করে। তাদের মতে, ঐ সময়কার মার্কিন ডলারের মূল্যমানের হিসাবে যার দৈনিক আয় এক ডলার সমমানের চেয়ে কম, তার পক্ষে সমাজে প্রাপ্তব্য সুযোগ সমূহ ব্যবহার করে ন্যূনতম পছন্দ মাফিক একটা মানবিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিই হলেন দরিদ্র। চাহিদার এই ফর্দটি অবশ্য সর্বাঙ্গীণভাবে নিখুঁত কিংবা সামুদায়িক (inclusive) নয়, কারণ নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য, মৌলিক শিক্ষা, এ গুলিও স্বাভাবিক এবং সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য। তবে সেই সময়ে বিশ্বের ১৯০ কোটি মানবেতর জীবন যাপনকারী মানুষ (মোট সংখ্যা ৫২৮ কোটি), যারা শুধু দৈহিকভাবে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছিল, তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য একটি বিভাজন রেখার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই রেখাটিই আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখা বা International Poverty Line নামে স্বীকৃতি লাভ করে। আয়কে দারিদ্র্য পরিমাপের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করার কারণে এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত দারিদ্র্যকে আয়-দারিদ্র্য নামে অভিহিত করা হয়।

একটি দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য এই আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে কিছু সূচক গড়ে উঠে। যেমনঃ একটি দেশের যত জন আয়ের হিসাবে দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থান করে তাদের সংখ্যা হল ঐ দেশের মোট দরিদ্রসংখ্যা বা ইংরিজিতে Total Poverty Head Count। দেশের নিজস্ব হিসাব এবং নীতি

নির্ধারণের জন্য মোট দরিদ্রের সংখ্যা নির্ণয় করা হল প্রথম কাজ। তবে আন্তর্জাতিক তুলনার জন্য যে সূচকটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল Head Count Ratio বা দারিদ্র্য-অনুপাত। দেশের মোট জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাতই হল দারিদ্র্য-অনুপাত।

প্রথম থেকে দারিদ্র্যকে কেবল মাত্র আয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলেও পরবর্তীতে এই সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে আরো কিছু আয়-বহির্ভূত মাত্রাকে এর সাথে যুক্ত করা হয়। শুধু শারীরিক ভাবে টিকে থাকা নয়, একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত থাকাই হল এই ধারণামতে দারিদ্র্যাবস্থা। আয় দারিদ্র্যের পাশাপাশি এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্যকেও (Human Poverty) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহিত্যে বর্তমানে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জনে), পাঁচবছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জনে), মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জনে, বয়স্ক শিক্ষার হার (%), প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির হার (%), জন্ম হার (%), জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রভৃতি সূচকের মাধ্যমে মানবিক দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সংজ্ঞার এই সম্প্রসারণ খুবই অর্থবহ এবং যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় দেখা যায়, ভাল আয় থাকা স্বত্ত্বেও সামাজিক পর্যায়ে গণশিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতার কারণে প্রায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ আয়-দরিদ্রের মতই এই মানবিক প্রাপ্তিগুলি থেকে বঞ্চিত থাকে। একটি মোটামুটি আয়ের পরিবারও কাছাকাছি স্কুল না থাকলে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে, কমিউনিটি ক্লিনিকের অভাবে শিশু-মৃত্যু বা মাতৃ-মৃত্যুর শিকার হয়।

আয়-দারিদ্র্য এবং মানবিক-দারিদ্র্যের অনুঘটকগুলি সর্বাংশে এক না হওয়ার কারণে প্রায়শই দেখা যায় কোন একটি দেশ আয়-দারিদ্র্য প্রশমনে তেমন সাফল্য দেখাতে না পারলেও মানবিক-দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে অনেকখানি অর্জন করতে পেরেছে; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্রও দেখা যেতে পারে। তাই শুধু আয়-দারিদ্র্যের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকলে কোন দেশের দারিদ্র্যাবস্থা আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এতৎসত্ত্বেও আমাদের আলোচনার বৃহদাংশই সীমাবদ্ধ থাকবে আয়-দারিদ্র্যের মধ্যে, তবে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে মানবিক-দারিদ্র্যের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেয়া হবে। বুঝে শুনেও এই পথে হাঁটার কারণ হল, প্রথমতঃ উভয় দারিদ্র্যকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে সম্ভব হবেনা। দ্বিতীয়তঃ উপাত্তের সহজলভ্যতা এবং ধারাবাহিকতার দিক থেকে আয়-দারিদ্র্যের আলোচনা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক একটি বিকল্প। তৃতীয়তঃ, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা যেহেতু বিগত ৫০ বছরে

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের নীতি/কৌশলের ফলাফলকে ব্রেটন উডস এর সার্বিক দর্শন/কৌশলের প্রেক্ষাপটে যাচাই করতে চাইছি, তাই একটি সূচকের (যা প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে) দীর্ঘকালীন গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা।

২। দারিদ্র্যের উত্তরাধিকার

ক) প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন কাল হতেই বাংলা তার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, গ্রিক পেরিপ্লাস-গ্রন্থে, আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক) ভিনিসিয় মার্কো পোলো, চীনা পরিব্রাজক মা-হুয়ান (পঞ্চদশ শতক) প্রভৃতি সকল শ্রেনীর পর্যবেক্ষকের রচনায়ই প্রাচীন বাংলার নানান সম্পদ ও প্রাচুর্যের সুখ্যাতি করা হয়েছে।

তবে প্রাচীন বাংলার যা কিছু গৌরব গাঁথার বর্ণনা আমরা পাই তার বেশির ভাগই নগর কেন্দ্রিক। যেমন, পাল রাজধানী রামাবতী কিংবা সেন রাজধানী বিজয়পুর সম্বন্ধে কাব্যিক বর্ণনা আছে -প্রশস্থ সড়কের দুপাশে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি (পবন দূত), আর তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে হিউয়েনসাং এর লেখায় পাওয়া যায় ধনী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ বর্ণনা। এই সকল রচনার কোনটিতে কাব্যিক অতিরঞ্জন আবার কোনটিতে পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটির প্রচুর সম্ভাবনা স্বত্ত্বেও বলা চলে, সামগ্রিক অর্থনীতিতে সচ্ছলতার একটি শক্ত ভিত্তি না থাকলে এরূপ কাব্য বা পর্যবেক্ষণের পরিবেশ থাকেনা।

নীহার রঞ্জন রায়ের পর্যবেক্ষণও অনেকটা একই রকম। গুপ্ত যুগের অবসানের পর, পাল ও সেন আমলে বাংলার বহির্বাণিজ্যের ক্রমাবনতি, স্বর্ণমুদ্রার অবলুপ্তি ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে বাংলার অর্থনৈতিক স্খলনের মধ্যেও যে বিত্ত-বৈভবের পরিচয় পাওয়া যায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে নীহার রঞ্জন রায় লিখেন," ----- এই দুই আমলের সমসাময়িক সাহিত্য- রামচরিত, পবনদূত, গীতগোবিন্দের মত কাব্য----- বাঙালি কবিদের রচনা পাঠ করিলে, --------যাগযজ্ঞে পূজানুষ্ঠানে রাজারাজড়া এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ লোকদের দান ধ্যানের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়না লোকের, অন্তত সমাজের উচ্চতর আর্থিক শ্রেণিগুলির ধনসমৃদ্ধির কিছু অভাব ছিল" (নীহাররঞ্জন রায় বৈশাখ ১৪০০)।

কিন্তু বাংলার দূর অতীত কি শুধুই সুখ, সম্পদ আর প্রাচুর্যের ঠাসবুননে গড়ে উঠা এক সোনালি ইতিহাস? অবশ্যই তা নয়, কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই সমতা ভিত্তিক কৌম সমাজের অবসানের পর প্রাচুর্য এবং অভাবের সহাবস্থান মানব সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। ঐশ্বর্যের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অভাবের চরমতম রূপ -দুর্ভিক্ষের করুণ ছবিও তাই ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নেহায়েত অপ্রতুল নয়। যেমন, স্বয়ং কৌটিল্য তার 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে রাজাদের উপদেশ দিচ্ছেন, রাজা যেন দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগকে বীজ ও খাদ্য শস্য দিয়ে সাহায্য করেন, তার পরিবর্তে তাদেরকে দূর্গ, সেতু ইত্যাদি বৃহদাকার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। কৌটিল্যের পরামর্শ সর্বভারতীয় হলেও বাংলায় তার প্রতিফলন দেখতে পাই মহাস্থানের ব্রাহ্মী-লিপিতে, যেখানে মগধের রাজা তার অধীনস্থ পুন্ড্রনগরের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন মহামারীর হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার জন্য অনুরূপ ভাবে মুদ্রা ও শস্য দিয়ে সাহায্য করতে। (নীহাররঞ্জন রায়, বৈশাখ ১৪০০)

এই পরামর্শ ও তার বাস্তবায়ন যথেষ্ট আভাস দেয় যে প্রাচুর্যের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের অবস্থানও প্রাচীন ভারতে ও বাংলায় খুব বিরল ছিল না।

এমনকি যে সময়ে পৃথিবীর সমগ্র বার্ষিক সম্পদের এক চতুর্থাংশ উৎপাদন করতো ভারতবর্ষ, আর তার অর্ধেক, অর্থাৎ পৃথিবীর এক অষ্টমাংশ আসতো বাংলা থেকে, সেই মুঘল আমলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান আর কাব্যে, সাহিত্যে বর্ণিত উপর মহলের বিলাস ও আয়েশি জীবনের মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের বর্ণনায় (ইরফান হাবিব, ১৯৮৫) যদিও ভারতের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় মানুষের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান সম্বন্ধে কিছুটা সচ্ছলতার আভাস পাওয়া যায়, তবুও তা গণদারিদ্র্যের চিত্রকেই ফুটিয়ে তোলে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লেখেন, "বাংলার ব্যাপক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা উলঙ্গ হয়েই থাকে এবং কপনি (লুঙ্গি) ছাড়া আর কিছু পরেনা। তবে দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুনিকতার বিচারে বাংলা এবং মালবকে (এবং কিছুটা বিহারকে) সমগ্র মুঘল আমলে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। একমাত্র ১৬৬২-৬৩ সালে ঢাকার স্বল্পস্থায়ী অনটনকে ঐতিহাসিকগণ ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য করেছেন (ফথিয়া ইব্রিয়া, পৃ. ৮০ক, উদ্ধৃত ইরফান হাবিব, ১৯৮৫)। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে মুঘল ভারতে বাংলার আপেক্ষিক অগ্রসরতার সুফল সাধারণ জনগণের ভাগেও কিছুটা বর্তেছিল, কিন্তু তা কোন অর্থেই দারিদ্র্য বিহীন সোনার বাংলা পর্যায়ের ছিল না।

খ) বৃটিশ পর্ব

ঔপনিবেশিক আমলে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের দারিদ্র্য সম্বন্ধীয় উপাত্তের প্রধান উৎস ছিল ডিস্ট্রিক্ট ও ইম্পেরিয়্যাল গেজেটিয়ার, বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্ট, দশক-ওয়ারী শুমারি রিপোর্ট, সময়-সময় তৈরি করা দুর্ভিক্ষ-কমিশন রিপোর্ট সহ নানান সরকারি দলিল (GOI (1894a), GOI (1894b))। এই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ তৈরির একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শোষণকে নির্বিঘ্ন ও প্রশ্নহীন রাখার জন্য একটি দক্ষ ও তথ্য সমৃদ্ধ শাসনযন্ত্র গড়ে তোলা। তাই তথ্যসমূহ কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন ছিল। সাথে সাথে, বৃটিশ শোষণের কোন কুৎসিত চেহারা যেন বেরিয়ে না পরে তা নিশ্চিত করাও প্রশাসনের একটি বড় দায়িত্ব ছিল। তাই, প্রশাসনিক প্রয়োজনেই যতটা বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল এই সব রিপোর্ট ততটা অবশ্য হতে পারেনি; বড় দাগে বাংলার জনগণ সুখে আছে, এটা প্রতিষ্ঠিত করাই প্রশাসনের নৈতিক দায়িত্ব মনে করা হতো। যেমন, ১৮৮৮ সালে ঢাকার কমিশনারের রিপোর্ট হলঃ "Looking at their needs, the peasantry in East Bengal are the most prosperous in the world" (GOB, 1888, 91); বা The Bengal Report on the Material Condition of the People 1890-91 এর মতে : "Judged from their own standpoint, the peasantry of Bengal are happy and prosperous" (GOI, 1894a. p.9);

এই অলিখিত ও স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের মধ্যেও, কিছু বেপরোয়া সিভিল অফিসার, নিরপেক্ষ বিদেশি পর্যবেক্ষক বা দেশীয় গবেষকের লেখা থেকে অনেক সময় সরকারি প্রলেপন ভেদ করে প্রকৃত ছবিটি ঠিক উঠে এসেছে।

যেমন, Mr. Jack নামক এক ব্যক্তির (পরিচয় স্পষ্ট নয়) ১৯১৬ সালের এক তথ্য মতে ফরিদপুর জেলার অর্ধেক (৫০.৫%) মানুষ বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে (তার ভাষায় Below comfort) (Kamal Siddiqi Source: J.C. Jack (1916, 93)। আবার ১৯২৫ সালে মোমেন নামক (পরিচয় স্পষ্ট নয়) এক ব্যক্তি ১৯২১ সালে যশোর জেলার ৫৮টি গ্রামের যে চিত্র তুলে ধরেন তাতে দেখা যায়, ঐ জেলায় ১৫% পরিবার সচ্ছল (In comfort), ৩২% অসচ্ছল (Below comfort), ৩৩% কোন রকমে বেঁচে আছে (hand to mouth), আর ২০% অভুক্ত (starving)। অর্থাৎ, অন্ততপক্ষে ৫৩% কে বর্তমান ধারণার আলোকে দরিদ্র/হতদরিদ্রের দলে ফেলে দেয়া যায় (Momen 1925, p.72)।

এরূপ বিচ্ছিন্ন তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে বর্তমান বাংলাদেশই বলি আর বৃহত্তর বাংলাই বলি, স্বাধীনতার সাথে দারিদ্র্যের একটি বড় বোঝাও উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা বৃটিশ রাজ থেকে লাভ করেছিলাম।

এই দারিদ্র্যের একটা বিশ্লেষণও হয়েছিল। এখানেও আমরা দু'ধরনের ভাষ্য দেখতে পাই। সমসাময়িক যশোরের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে সরকারি ব্যাখ্যায় দায়ী করা হয় মানুষের অমিতব্যয়িতা, মামলাবাজি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপকে "(Thus extravagance, lethargy, litigation mania among cultivators, and unhealthy natural conditions of Jessore resulting in the preponderance of malaria are considered as the main reasons for the cultivators' poverty in some of the official documents (for example, O'Malley, 1912, p.86-7)) (উদ্ধৃতি K Siddiqi, p.54)। অন্যদিকে গবেষক মোমেনের পর্যবেক্ষণ হল সম্পূর্ণ বিপরীত। মলি'র বক্তব্যকে বাতিল করে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে মলির দেয়া কোন অপবাদই একজন দরিদ্র কৃষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মোমেনের যুক্তি সমূহ এতই চিত্তাকর্ষক যে পরিশিষ্ট আকারে K Siddiqi'র বয়ানিতে তা উদ্ধৃত করা হল (পরিশিষ্ট ক)। শুধু সরকারি ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করাই নয়, অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা, গবেষক বিশ্লেষক ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জন্য সরাসরি বৃটিশ উপনিবেশবাদকে দায়ী করেন। সর্বপ্রথম দাদাভাই নওরোজী, ১৮৮৭ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের সম্পদ পাচারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন, যা পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত "Drain Theory" নামে পরিচিত হয়। (Naoroji, 1887, 1901) মহাত্মা গান্ধী এ সম্বন্ধে বলেন, বৃটিশের তথাকথিত সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড- বাণিজ্য, কারেন্সি, রেল, অর্থসংস্থান নির্বিশেষে- সবই শোষণ পাকাপোক্ত ও তীব্রতর করার মাধ্যম মাত্র। এই শোষণের অবসান ঘটাতে না পারলে ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় (quoted in Vakil, 1963, p.23)। জাতীয় রাজনীতিতে দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া এবং তার সাথে ঔপনিবেশিক শোষণকে সম্পৃক্ত করা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি বড় মাইল ফলক, সন্দেহ নেই। তবে একই সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি দুর্বল দিকও এখানে ফুটে উঠে। সম্পদ পাচারের প্রক্রিয়ার সাথে গ্রাম ও শহরের শ্রেণি স্বার্থের নিবিড় বন্ধনটির দিকে নেতৃবৃন্দ কখনোই আঙ্গুল তোলেননি। বিশেষ করে বৃটিশ শোষণের সহায়ক এবং পরিপূরক হিসাবে জমিদারী প্রথার ভূমিকা, বাণিজ্যে অসম বিনিময়ের ক্ষেত্রে দেশীয় দালাল, মহাজন মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রায় অনুল্লেখিতই থেকে

গিয়েছে। তাই স্বাধীনতার সাথে নিজেদের ভাগ্যকে একসূত্রে বেঁধে যে বিরাট দুষ্ট জনগোষ্ঠী গান্ধী মহাত্মার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, স্বাধীনতার পরপরই তারা দেখল, ইংরেজ চলে গিয়েছে কিন্তু তাদের দারিদ্র্য যায়নি।

এই দুর্বলতাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় আরও একটি চিরস্থায়ী পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে, যার প্রধান ক্ষেত্র হল বাংলা বা আমাদের বাংলাদেশ। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকে যখন দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব হল তখন শোষিত পদদলিত মুসলিম দরিদ্র জনগোষ্ঠী তার সাথে নির্দ্বিধায় একাত্ম হয়ে গেল, কারণ তার হতদরিদ্র অবস্থার জন্য ইংরেজ শাসকের সাথে হিন্দু জমিদার এবং মহাজনের ধর্মীয় পরিচয়টিই তার কাছে স্পষ্ট ছিল, শোষক হিসাবে তাদের শ্রেণি পরিচয়টি তার কাছে কেউ কখনো স্পষ্ট করেনি। এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী ধারা সৃষ্টি করলেও সর্ব ভারতীয় রাজনীতির কাছে ফজলুল হকের শর্তহীন আত্মসমর্পণ এই ধারাটিকে অর্ধ পথে গতি-হারা করে দিল। এ কারণেই আবার পাকিস্তান প্রাপ্তির সাথে সাথে তার (দরিদ্র জনগোষ্ঠীর) অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায় সে নিজকে প্রতারিত মনে করল; এত জনপ্রিয় মুসলিম লীগ একরকম নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল '৫৪ এর নির্বাচনে।

যাই হোক, আগের কথায় ফিরে আসি। বৃটিশ বাংলায় (বৃহৎ অর্থে ভারতে) একদিকে ঔপনিবেশিক শোষণ অন্য দিকে তার সহযোগী এবং সমর্থনপুষ্ট দেশীয় শ্রেণি-শোষণের চরম প্রকাশ দেখতে পাই ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষে, যা কেড়ে নিয়ে ছিল ২০-৩০ লক্ষ প্রাণ। সাংবাদিক মধুশ্রী মুখার্জি প্রমাণ করেন যে সর্বশেষ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষটি ছিল বৃটিশ সরকারের অমানবিক নীতির ফল। এক দিকে পর পর কয়েক বছর ফসল হানি স্বত্ত্বেও চার্চিলের ওয়ার কেবিনেট ভারত থেকে চাল আমদানি অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে ভারত ভাইসরয়ের জরুরী অনুরোধ সত্ত্বেও ১০ লক্ষ টন গম পাঠানোর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে (Madhusree Mukherjee, 2010)।

এই ধরনের বড় দুর্ভিক্ষের অনেক তাৎক্ষণিক বাহ্যিক কারণই থাকে, যেমন এক্ষেত্রেও ছিল, কিন্তু বিরাট একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংবাৎসরিক চরম দারিদ্র্যাবস্থা বিরাজ না করলে সহজে তা এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে না। তাই সব শেষ কথা হল, একটি বিরাট আকারের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং দারিদ্র্য সৃষ্টির সকল সম্ভাব্য উপাদান নিয়েই ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়; এবং আজকের বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান পরিচয়ে তার নতুন যাত্রা শুরু করে। (পূর্ব বাংলার পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাওয়া সে আরেক কাহিনী, সে কথা অন্য সময়ে)।

গ) পাকিস্তান পর্ব

পূর্ব পাকিস্তানের দারিদ্র্য-ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই ইতিহাসের প্রথম কয়েকটি পাঁতা ছেড়া। আগে যেরকম গ্রাম বাংলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকারি কিছু ভাষ্য পাওয়া যেত তা পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলিতে একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনিক ওলট পালট, উদ্বাস্তু সমস্যা, ভূমি জরিপ কাজের ছন্দপতন ও স্থবিরতা, ইত্যাদি নানাবিধ কারণেই এই ছন্দপতন ঘটে। District Gazetteers নামে সরকারি একটা প্রকাশনা বের হত বটে, কিন্তু তার বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল একেবারেই তলানিতে। যার ফলে দারিদ্র্য সম্বন্ধে এই সময়ে আস্থাযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর কিছু রাজনৈতিক ঘটনা ইঙ্গিত দেয় যে দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষাবস্থা সহ নানান সামাজিক অস্থিরতা পূর্বের ন্যায়ই বিরাজমান ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম রাজনৈতিক গুলিবর্ষণটি হয়েছিল ভুখা মিছিলের উপর। (টীকা ১)

তথ্য দুর্বলতার কিছুটা উন্নতি ঘটার সুযোগ হয় ১৯৫৯ এ Central Statistical Office of Pakistan যখন Household Income-expenditure Surveyর কার্যক্রম শুরু করে। তবে এই সার্ভেও আস্থাশীল দারিদ্র্য তথ্য উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছে (K. Siddiqi, p. 60-61)। (টীকা ২)

সমগ্র পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ দারিদ্র্যাবস্থা সম্বন্ধে যে একটি মাত্র গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায় তা হলো, স্বদেশ বোসের রচনাটি। Bose S. R. (1968) তার গবেষণায় বোস দেখান যে সমগ্র পঞ্চাশের দশকটিতেই পূর্ব পাকিস্তানে প্রকৃত কৃষি মজুরি (যা ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের একমাত্র উৎস) ছিল ১৯৪৯ সালের নিচে। ফলে মাথাপিছু গ্রামীণ আয় হ্রাস পায় আর অন্য দিকে শহুরে আয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে শহরের এই আয় বৃদ্ধির সুফল ভোগ করে শুধুই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি। শহরের শিল্প শ্রমিকের মজুরি হ্রাসের কারণে নিম্নবিত্ত দরিদ্র শ্রেণি এই সুফল থেকে বঞ্চিত থাকে (Khan, A.R., 1967)। উপাত্তের অভাবে দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট হার সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকলেও পাকিস্তান আমলে গরিবের অবস্থার যে উন্নতি হয়নি, এ সম্বন্ধে তাই সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দু একটি গবেষণা থেকেও অনুরূপ চিত্র বেরিয়ে আসে। নিম্নের সারণিটি সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে পূর্ব পাকিস্তানে দরিদ্রের মিছিল যে ক্রমাগতই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল তা অনেকখানি স্পষ্ট করে তুলে।

Incidence of Rural Poverty in Bangladesh, 1963/64-75

(percentages)

Year	Absolutely poor		Extremely Poor	
	HH	Poor persons	HH	Poor persons
1963/64	51.7	40.2	9.8	5.2
1968/69	84.1	76.0	34.6	25.1
1975 (First Quarter)	70.3	61.8	50.5	41.0

Source: Khan, A.R. (1976, p.15)

"সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" প্রশ্নটির উত্তর না মিললেও বাংলা যে সত্যই শ্মশানের দিকেই ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিল তার আভাস মিলে এই সারণিতে।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে, অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানে দারিদ্র্যাবস্থার উন্নতি না ঘটে অবনতি কেন ঘটেছিল তার কয়েকটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ(?) ব্যাখ্যা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ এবং নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাখ্যাটি হল প্রকৃতিকে সব কিছুর জন্য দায়ী করা। সেই ৫০ থেকে ৭০ এর মধ্যে অন্তত গোটা সাতেক প্রলয়ংকরী বন্যা, প্রায় সমসংখ্যক ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস, তার সাথে সঙ্গতি রেখে বছরান্তের খরা ও অনাবৃষ্টি যে দেশে নৈমিত্তিক ব্যাপার, সে দেশের মানুষের ভাতের অভাবের জন্য আর কোন ব্যাখ্যার দরকার আছে বলেই দীর্ঘদিন কারো মনে হয়নি। তদুপরি দেশ বিভাগের পরপর বিত্তবান হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের দেশত্যাগ এবং সেই সাথে দেশীয় সম্পদের একটা বড় অংশ স্থানান্তরকেও দারিদ্র্যের অবনতির জন্য দায়ী করা হয়। উল্লেখিত দুটি ব্যাখ্যাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, কারণ তার মাধ্যমে সরকারি ব্যর্থতা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পদ পাচারের বিষয়টিকে কিছুটা লঘু করে দেখান যায়। কিন্তু, বিশেষ করে পশ্চিম অংশে এক ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে পূর্ব বঙ্গের পার্লামেন্টারি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিলোপের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে বহুমাত্রিক শোষণের কাহিনী এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে কোন ব্যাখ্যা দিয়েই তাকে আর ঢেকে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই দারিদ্র্য সহ পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় দুরবস্থার জন্য একক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি, তথা পাঞ্জাবী শোষণকে দায়ী করে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে একটি বৈরী মনস্তাত্ত্বিক আবহ সৃষ্টি হওয়া ছিল একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা।

একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে এই বহুল সমাদৃত (এবং অকারণে নয়) Drain theory ভিত্তিক ব্যাখ্যাটিকেও বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার মতই আংশিক এবং অপ্রতুল মনে হতে বাধ্য। কারণ, আমরা জানি দারিদ্র্য এবং সাধারণ পশ্চাৎপদতা সহগামী হলেও সমার্থক নয়। একটি দেশ মাথাপিছু আয়ের বিচারে পশ্চাৎপদ হলেও সম্পদ বন্টনে ন্যায্যতা বজায় থাকলে, সেখানে দারিদ্র্যের সাধারণ সংজ্ঞায় একটি মানুষও দরিদ্র না থাকতে পারে (কিউবা একটি উদাহরণ)। আবার উল্টা, আকাশ ছোঁয়া সম্পদের মাঝেও ক্ষুধার্ত মানুষের উপস্থিতি পৃথিবীতে বিরল উদাহরণ নয়। সম্পদ পাচারের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে, দিনের পর দিন দুই প্রদেশের বৈষম্যও বেড়ে চলেছে অনবরত, কিন্তু প্রদেশের অভ্যন্তরে কেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের তুলনায় আরো গরীব হল, এর ব্যাখ্যা কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না। ১৯৫৪ সালের যে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে, তার একটি পোস্টার কিন্তু চমৎকারভাবে এই দ্বিমুখী পরিণতির ব্যাখ্যাটি দিতে পারে। পোস্টারটি ছিল এরকম "পাটের দাম কমিয়ে এবং চালের দাম বাড়িয়ে দিয়ে যে অত্যাচারী মুসলিম লীগ সরকার বাংলার কৃষককে ধ্বংস করছে তাকে ভোট না দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিন"। ভাষাটি লেখকের শিশুকালের স্মৃতি থেকে নেয়া, সর্বত শুদ্ধ নাও হতে পারে; তবে পোস্টারটিতে পাকিস্তানের নতুন সরকারের কৃষি বনাম শিল্প নীতির চরিত্রটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। নতুন রাষ্ট্রে নতুন ধনিক শ্রেণি সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষিকে নিংড়ে বাণিজ্য ও শিল্প পুঁজির প্রাথমিক পুঞ্জীভবনই ছিল এই নীতির সার কথা। অর্থকরী ফসল হিসাবে পাটের উপর এই নীতির কোপটি পড়ে খুবই দৃশ্যমান ভাবে। একদিকে কৃষক নামমাত্র মূল্যে পাট বিক্রি করে নিঃস্ব হচ্ছে, অন্য দিকে গুদামে কম দামের পাট আসার পর নানান প্রণোদনার মাধ্যমে রপ্তানি কারক (যার প্রায় সবাই অবাঙালি) ফুলে কলাগাছ হচ্ছে, এই ছিল বাংলার অতি পরিচিত একটি দৃশ্য। এই প্রক্রিয়ায়ই নিম্ন, মাঝারি এমনকি মধ্যম-ধনী কৃষকও নিঃস্বের কাতারে চলে আসে। বামপন্থী কিছু রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী ব্যতীত স্বাধিকার রাজনীতির প্রধান স্রোতে এই প্রসঙ্গটি প্রায় অনুচ্চারিতই ছিল।

দুঃখের বিষয়, বাঙালি কৃষককে নিংড়ে নেয়া উদ্বৃত্ত (আসলে এটা উদ্বৃত্ত নয়, কৃষকের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদেরই অংশ) কোন ভাগ্যবান বাঙালি হবু পুঁজিপতির হাতে না পড়ে আন্তপ্রদেশ শোষণ কৌশলের মাধ্যমে চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের কিংবদন্তী ২২ পরিবারের জন্ম এভাবেই বাংলার কৃষকের

নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার আরেক দিক। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসে, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি খাত কি এই প্রাথমিক পুঞ্জীভবনের আওতার বাইরে ছিল? অবশ্যই নয়, সেখানেও কৃষকের একটি অংশ একই নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার বলি হয়েছিল; তবে সে আলোচনা এখানে নয়। এটুকু বলা যায় যে জেনারেল আইউব খানের শাসনামলে, হার্ভার্ড অ্যাডভাইজরি গ্রুপের পরামর্শে, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পুঁজিপতি সৃষ্টির প্রয়াসে এই নিঃস্বকরণ চরম রূপ লাভ করে।

খুবই হতাশার বিষয় হল, গ্রামীণ সম্পদের হস্তান্তর জনিত এই দারিদ্র্যায়ণ প্রক্রিয়াটি কী পূর্ব পাকিস্তানে, কী পশ্চিম পাকিস্তানে, কোথাও গুরুত্বের সাথে অধ্যয়নের চেষ্টা করা হয়নি । বস্তুত, সমগ্র পাকিস্তানকালে আমরা তিনটি মাত্র গ্রাম-পর্যবেক্ষণের (village studies) এর খবর পাই, যার কোনটিতেই গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্য উৎপাদন এবং স্থায়ীকরণের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে আসেনি (Beech, 1966; Bertocci, 1970, and Quadir, 1969)।

এভাবেই আমরা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি, যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এক বিরাট সংখ্যক হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হিসাবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

৩। বাংলাদেশঃ নতুন যাত্রা, নতুন আশা

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই দারিদ্র্যকে নতুন রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১২টি মূল লক্ষ্যের মধ্যে প্রথমটি ছিল বেকার এবং অর্ধ বেকারদের জন্য কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ সরকার)। জাতীয় আয়ের অভীষ্ট প্রবৃদ্ধি অর্জন বলি, আর অন্য সব সমষ্টিক-অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণই বলি, সব কিছু আবর্তিত হওয়ার কথা ছিল এই প্রধান লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।

প্রথম পরিকল্পনা নিয়ে অন্য কোন প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলে নেয়া উচিত যে, এই পরিকল্পনার অনেক দুর্বলতা ছিল। এত দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছিল যে, তার জন্য না ছিল প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত, না হয়েছিল যথেষ্ট সম্ভাব্যতা যাচাই, না ছিল যথেষ্ট সংখ্যক ভাল বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প। সত্যি কথা বলতে কি, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মত প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তিও বাংলাদেশের ছিল না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যায়েও ছিল বিস্তর বাধা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে তার স্বাভাবিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাই যেখানে ছিল

একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ, সেখানে এরকম একটি উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবশ্যই ছিল আরো বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে পরিকল্পনা কতদূর এগোতে পারত সেই প্রশ্ন এখন অবান্তর, কারণ ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হয়েছেন। যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং মানবতাবাদী আবেগের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি নির্মিত হয়েছিল তার প্রতি পূর্ণ অঙ্গীকার আর আমরা দেখতে পাইনা। তাই সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনাকে মূল্যায়ন করার তেমন কোন সুযোগ নেই। এই প্রসঙ্গে USAID এর একটি দলিলের কিছু পর্যবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

১৯৭৬ সালে USAID এর পক্ষ থেকে প্রথম পরিকল্পনার স্বাস্থ্য খাত বিষয়ক একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়, যেখানে প্রেক্ষিত হিসাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিকল্পনার দুর্বলতাগুলি ঐ দলিলটি থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে পরিকল্পনার আরো কিছু দুর্বল দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা বর্তমান প্রবন্ধে ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে দারিদ্র্য নিরসন সম্পর্কে নতুন রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে দলিলে যা বলা হয়েছে তা বেশ প্রণিধানযোগ্য।

"Rather than making precise, defined objectives, the Plan for the most part describes broad qualitative goals. Although qualitative objectives can be just as important as specific, measurable objectives, they are much more difficult to translate into action programs. Therefore, the twelve national development objectives of the Five-Year Plan serve a more useful function if viewed as long-term policy goals, rather than short-term objectives (Scott A. Loomis, 1976, p.42.) অর্থাৎ, আমরা যদি বাস্তবায়ন দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে (যা দেখা অবশ্যই অতি জরুরি, তবে বর্তমান আলোচনায় সে প্রসঙ্গ বাদ দিলে তেমন কোন অঙ্গহানি ঘটে না) নতুন রাষ্ট্রের অভিমুখীনতার দৃষ্টিকাণ থেকে দেখি তাহলে স্পষ্ট হয় যে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের সুদূর প্রসারী অভিমুখীনতাটি প্রথম পরিকল্পনাতেই স্থির করে ফেলেছিল, আর সেই অভীমুখীনতাটি কী ছিল তাও ঐ সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয়। যেমন, সমীক্ষা মতে,

"The Plan advocates the establishment of an integrated and comprehensive rural health care system aimed primarily at infants, children and mothers - a major step away from the current system of health care, which is urban-based and curative in nature. The Plan stresses the need to make low-cost health care available to the majority of the rural population, and the desirability of attacking communicable diseases, identified as the main source of mortality and morbidity, on a broad comprehensive front, rather than through a series of unipurpose programs." (Scott A. Loomis, 1976)

অর্থাৎ, বাংলাদেশ নিজ ভাগ্য নিজ হাতে নেবার পর প্রথমেই যে কাজটি করে তা হল, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পাকিস্তানি উন্নয়ন মডেলকে প্রত্যাখ্যান। মুষ্টিমেয় ধনীমুখী এবং নগরমুখী স্বাস্থ্য সেবার পরিবর্তে বিস্তৃত জনসাধারণকে তার আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিষয়ে তার কৌশল কেমন হবে তারও আভাস দিয়ে দেয়। নিম্ন ব্যয় নির্ভর, গ্রাম অভিমুখী, এবং সংক্রামক রোগ বৈরিতা(anti-contagious) ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার আভাস দেন যে, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এভাবেই গ্রামমুখী এবং দরিদ্রমুখী হবে।

বর্তমানে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বাংলাদেশের যে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে, তার প্রধান তাৎপর্য হল এই যে দারিদ্র্য দূরীকরণ সহ বিভিন্ন সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ই একমাত্র নিয়ামক নয়, এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকও নয়। আয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকেও সঠিক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যের অনেক সূচিতেই সাফল্য লাভ করা যায়। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। লক্ষ্যণীয়, বিশ্ব-ফোরামের MDG প্রস্তাবনার প্রায় দুই যুগ আগে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনায় আমরা এই প্রাগ্রসর চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ যে সময়ে তার প্রথম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ঠিক সেই সময়ই বিশ্বব্যাংক সহ গোটা ব্রেটন উডস পরিবার জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র হাতিয়ার (একটু নরম ভাবে বললে কেন্দ্রীয় হাতিয়ার) হিসেবে

বিবেচনা করা থেকে কিছুটা সরে এসেছে (অবশ্য পরে আমরা দেখব, এই সরে আসা কতটা বাহ্যিক আর কতটা আন্তরিক)।

তার পূর্বে, একটি দীর্ঘ সময় ধরে ব্রেটন উডস তথা সমগ্র ধনবাদী বিশ্ব সদ্য স্বাধীন উন্নয়নকামী দেশগুলির জন্য যে উন্নয়ন মডেলের সুপারিশ করে চলছিল তাকে এক কথায় বলা হয়, "চুঁইয়ে পড়া উন্নয়ন তত্ত্ব" ভিত্তিক মডেল। এই তত্ত্বের মূল কথা হল, একটা দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে টেনে তোলার একমাত্র উপায় হল প্রবৃদ্ধি, অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। সমাজের উচ্চ স্তরে আয় বৃদ্ধি পেলে (এই মডেলের মতে সেখানেই মূলতঃ আয় সৃষ্টি হয়) তা আপনা আপনিই নিম্ন দিকে, অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর চুঁইয়ে পড়বে। তাই আলাদা ভাবে দারিদ্র্যের দিকে নজর দেয়ার দরকার নেই। প্রবৃদ্ধির জন্য পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো, তথা ধনবাদী বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনই উন্নয়নশীল দেশগুলির একমাত্র কাজ। এই লক্ষ্যেই বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এবং গুরুত্বপূর্ণ দাতা দেশ সমূহ তাদের সাহায্য অব্যাহত রাখে। কিন্তু দশকের পর দশক এই প্রেসক্রিপশন চলার পরেও যখন দেশগুলির দারিদ্র্যাবস্থার কোন উন্নতিই হলনা, বরং উত্তরোত্তর তা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকেই যেতে থাকল, তখন বিশ্বব্যাংক গং তাদের চিন্তাটাকে একটু ঢেলে সাজাতে বাধ্য হল। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন উন্নয়ন চিন্তায় তারা দারিদ্র্যমুখীনতাকে (poverty focused) যুক্ত করে নিল ১৯৭৩ সালে। যেহেতু ঠিক এই সময়টিতেই বাংলাদেশ তার পাঁচ সালা পরিকল্পনার কাজ শুরু করে, তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশের উল্লিখিত দারিদ্র্যমুখী অবস্থান কতটুকু বিশ্বব্যাংকের এই নতুন অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত?

প্রশ্নটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট কৌতুহলদ্দীপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিশ্বব্যাংকের অবস্থানের সাথে প্রথম পরিকল্পনার কিছু কৌশলগত বৈসাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়। যেমনটা আগে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাংক "প্রবৃদ্ধি মাত্রই তা দারিদ্র্য বিমোচক" এই ধারণা থেকে সরে আসলেও "দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রবৃদ্ধিই একমাত্র পথ" এই ধারণাতে তখনো শতভাগ আস্থাশীল। তবে, দারিদ্র্য বিমোচন যে আপনা আপনি হবেনা, এই প্রবৃদ্ধিকে বিশেষ ভাবে দারিদ্র্য অভিমুখীন করে তুলতে হবে, এটাই ছিল তার চিন্তার মধ্যে নতুন উপাদান। তাই আমরা দেখি ১৯৭৩ সালে প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্র্য অভিমুখীন করার জন্য ক্ষুদ্রাকার সেচ প্রকল্প, গ্রামীণ রাস্তা ঘাট, কৃষিঋণ ইত্যাকার প্রকল্পগুলিতে অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির দিকে বিশ্বব্যাংক বিশেষ নজর দেয়। এই ধরনের অর্থ

ব্যয়ের দুটি দিক আছে। একদিকে সাময়িক কিছু কর্ম সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এককালীন আয় বৃদ্ধি করা যায়, তাতে অবশ্যই দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে, তবে এর মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে যা ঘটে তা হল কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। গ্রামের বিদ্যমান ভূমি বণ্টনের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে সৃষ্ট বাড়তি সম্পদ ধনী কৃষকের ঘরেই পৌছানোর কথা। কিন্তু গ্রামীণ এই বাড়তি আয়ের অন্তত একটি অংশ দরিদ্রের ঘরে পৌঁছানোর জন্য বাড়তি কোন উদ্যোগ বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপত্রে পরিলক্ষিত হয় না। যেন, বাকী কাজটি সেই চুঁইয়ে পড়া প্রক্রিয়ায় আপনা আপনিই ঘটে যাবে।

বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনায়ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গ্রামীণ পটভূমিকেই বেছে নেয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতের উদাহরণ থেকে এই দুই গ্রামীণ অভিমুখীনতার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেখানে স্বল্পব্যয় স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগ দমন, ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে সরাসরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবার কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে। তাই অনুমান করা যায়, গোড়ার দিকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কৌশল নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের প্রভাব (অনুমান সাপেক্ষে) কিছুটা থাকলেও তা নিরঙ্কুশ নয়। বিশেষ করে অভিমুখীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক, তথা দাতা গোষ্ঠীর চিন্তা চেতনার তুলনায় অনেকখানি এগিয়েই ছিল।

যে সমস্ত সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ কারণে বাংলাদেশ এহেন একটি গণমুখী, প্রগতিশীল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তথা দারিদ্র্য বিমোচন নীতি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হল তার সম্ভাব্য কিছু কারণ তুলে ধরা যায়।

১) একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে; সকল স্তরের জনগণ এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাই স্বাধীনতার সুফল সকল স্তরে পৌঁছে দেয়া একটি অলিখিত জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছিল। দারিদ্র্য পীড়িত একটি জনপদে দারিদ্র্য নিরসনের চেয়ে বড় জাতীয় আকাঙ্ক্ষা আর কী হতে পারে?

২) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উপনিবেশ বিরোধী চরিত্রের পাশাপাশি, এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবেই, ক্ষুধা দারিদ্র্য বিরোধী যে চরিত্র অর্জন করে বাংলাদেশ তার বাইরে ছিল না। তাই স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণী -নীতি গ্রহণের সুযোগ পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই দারিদ্র্য নিরসনকে এক নম্বর জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয়া হয়।

৩) স্বাধীনতার প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্র জাতীয় চার মূল স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে গৃহীত হয়। আর সমাজতন্ত্রের গণ-ধারণাই হল ক্ষুধা দারিদ্র্য মুক্ত একটি শোষণহীন সমাজ। তৎকালে বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থাকলেও তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অর্জন সারা পৃথিবীতেই স্বীকৃত ছিল। তাই নিজেদের মধ্যে নানান দুর্বলতা, অস্পষ্টতা, অসংগতি, অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের এই ধারাটির প্রতি একপ্রকার স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

৪) প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠনগত ভাবে ছিল আমলাতান্ত্রিকতা বিহীন, মুক্ত চিন্তার অধিকারী একটি সংগঠন। সদস্যগণের সকলেই ছিলেন পাকিস্তানের বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনার তুখোড় সমালোচক, নামকরা অর্থনীতিবিদ। সমাজে তারা প্রতিষ্ঠান বিরোধী (anti-establishment) অর্থনীতিবিদ হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। প্রাদেশিক স্বার্থের পাশাপাশি দারিদ্র্য জর্জরিত সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের যে আবেগপূর্ণ অঙ্গীকার (emotional commitment) গড়ে উঠেছিল তার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরিকল্পনা দলিলে। (টীকা ৩)

৫) সর্বোপরি, বঙ্গবন্ধুর সবল নেতৃত্ব পরিকল্পনা কমিশনকে এরূপ গণমুখী অবস্থান গ্রহণ করতে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ ও সাহসী করে তুলেছিল। মূলত তার এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী এবং নতুন কেবিনেটে অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের নির্ভীক, স্বাধীনচেতা অবস্থানের কারণেই প্রতিষ্ঠিত মুরুব্বীদের অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশ তার চলার পথ নির্ধারণ করতে সাহসী হয়েছিল। (টীকা ৪)

সে যাই হোক, আগে যেমনটি বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাটি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিরিখে একটি যুগান্তকারী দলিল হলেও বাস্তবায়ন যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই পরিকল্পনা মাফিক বাংলাদেশ তার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে কতদূর নিয়ে যেতে পারত তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতেই পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর এই জল্পনা কল্পনার কোন অবকাশই আর থাকেনা; কারণ, তারপর বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনেই আসে মৌলিক দিক পরিবর্তন। মূলনীতি হিসাবে "সমাজতন্ত্র" কার্যত পরিত্যাক্ত হয়। তার উন্নয়ন চিন্তার যোগানদাতা হিসাবে বিশ্বব্যাংক ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইডের (পড়ুন নির্দেশক)

আসনটি পাকাপাকি ভাবে দখল করে নেয়। বস্তুত বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিন্তাই বলি আর সামগ্রিক উন্নয়ন চিন্তাই বলি, তার সম্পূর্ণটাই হয়ে উঠে বিশ্বব্যাংকের তথা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন চিন্তার অনুগামী এবং সরাসরি প্রতিফলন। চিন্তা ও কর্মের এই রূপান্তর কী ভাবে ঘটে তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল। তবে, তার আগে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য চিন্তার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসটির সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিলে সুবিধা হয়।

৪। ব্রেটন উডসঃ নতুন যুগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা

এ কথা সুবিদিত যে বাংলাদেশের মত দরিদ্র/উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সর্বদাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থেকেছে বা এখনো আছে। এই নেতাদের মধ্যে যেমন আছে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যাদেরকে সাধারণ ভাবে ব্রেটন-উডস প্রতিষ্ঠান (Breton Woods Institutes) নামে ডাকা হয়, তেমনি আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপানের মত অর্থনৈতিক পরাশক্তি সমূহ। এই মুখাপেক্ষিতা যতটা না নিজেদের মেধাবী জনবলের অভাবের কারণে তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে। উন্নয়নের জন্য সাহায্য নির্ভরতার কারণেই মূলত দাতা দেশ এবং সংস্থার বিভিন্ন উপদেশ নির্দেশ মেনে এই দেশগুলির উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করতে হয়, অথবা দাতাদের তৈরি করা রাস্তায় হাঁটতে হয়। কালক্রমে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে চলে আসে যে দেশগুলি নিজেদের মেধার উপর নিজেরাই আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং উন্নয়ন দর্শন থেকে শুরু করে উন্নয়ন-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সব পর্যায়ে বাইরের পরামর্শ এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশ অনুযায়ী চলতে বাধ্য হয়। দারিদ্র্য বিমোচন সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। যত দিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আই এম এফ এর মত শক্তিশালী ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলি দারিদ্র্যকে উন্নয়ন সমস্যার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু তার থেকে আলাদা একটি আর্থসামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত না করেছে ততদিন পর্যন্ত স্থানীয় ভাবেও এই সমস্যার আলোচনা উন্নয়ন-ডিসকোর্সে জায়গা করে নিতে পারেনি। জায়গা যখন পেল তখনো তার কারণ, চরিত্র, ডাইনামিক্স নির্ধারণ এবং নিরসনের পথ নির্ধারণে ব্রেটন উডস এর কথাই হয়ে দাঁড়াল শেষ কথা। অতএব, ব্রেটন-উডস এর প্রতিভূ বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য চিন্তার সাথে পরিচিত না হয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের সঠিক ইতিহাস বিনির্মাণ সম্ভব নয়। এই পরিচিতিটুকু তাই আগে সেরে নেয়া যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন একে একে প্রাক্তন উপনিবেশগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হতে শুরু করল, তখন থেকেই দারিদ্র্যের বিষয়টি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন চিন্তার মধ্যে স্থান পেতে থাকে। কিছুটা সদ্য স্বাধীন দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সামাজিক-রাজনৈতিক চাপ, কিছুটা সদ্য শুরু হওয়া ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব, দারিদ্র্যের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। নতুন দেশগুলিকে নিজের প্রভাব বলয়ে রাখার তাগিদ থেকেই পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং তার সর্বোচ্চ মুখপাত্র বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যকে রাজনীতির কোন ইস্যুতে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখার নিমিত্তে এদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়।

ফলশ্রুতিতে, পুঁজিবাদী উন্নয়ন মডেলে আবির্ভাব ঘটে সেই বহুল বিতর্কিত তত্ত্বের, যা "চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব" বা ইংরেজিতে "Trickle down theory" নামে পরিচিত।

এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হল, একটি সমাজে গণহারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের উপস্থিতি তার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতারই ফল। তাই গণদারিদ্র্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হল দ্রুত গতিতে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটানো। তখন উন্নয়ন তত্ত্বে সদ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে হ্যারড-ডোমার মডেল নামের এক ধন্বন্তরি, যার ভাষ্য মতে একটি নির্দিষ্ট কারিগরি স্তরে কোন দেশে যত বেশি উৎপাদন মূলক বিনিয়োগ করা হবে, ঐ দেশের তত দ্রুত জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এদিকে আবার উৎপাদনশীল বিনিয়োগের তালিকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণমূলক বিনিয়োগের স্থান নেই, কারণ, এই মডেল মতে তারা সম্পদ ব্যয় করে, উৎপাদন করে না। স্বাভাবিকভাবেই এই তথাকথিত উৎপাদনশীল বিনিয়োগের দায়িত্বে ছিল ব্যক্তিগত খাত, কারণ এটাই পুঁজিবাদের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ। যখন উন্নয়নশীল দেশে দেশে প্রশ্ন উঠতে লাগল, এই প্রবৃদ্ধি গরিবের কতটা কাজে আসবে, তখনই আনুষঙ্গিক ভাবে চলে আসলো উপরোল্লিখিত "চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব", যার মূল কথা হল, সমাজের উচ্চ স্তরে আয় সৃষ্টি হলে তা বিভিন্ন পথে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিম্নস্তরে চলে আসবেই; তাই জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিই হল দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র চাবিকাঠি। Website. Wikipedia, Sept. 2012)

বাক্স-১

আসলে "চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব" মার্কিন রাজনীতিতে বেশ প্রাচীন একটি ধারণা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সে দেশে খুব কমই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে যেখানে রিপাবলিকান দল ধনীদের করভার লাঘবের সুফল বুঝানোর জন্য এই তত্ত্বের আশ্রয় নেয়নি, আর ডেমোক্রেটরা তার বিরোধিতা করেনি। জন কেনেথ গলব্রেথ মনে করিয়ে দেন, এই তত্ত্বটি সেই ১৮৯০ সালেই "Horse and sparrow theory" নামে যুক্তরাষ্ট্রে চালু ছিল। এর মূল কথা ছিল, যদি ঘোড়ার খাবারের বাস্কেটে কিছু বেশি করে দানা দাও তাহলে সে গাড়ি টেনে যেতে যেতে তা খেতে থাকবে আর ছিটাতে থাকবে; ফলে চড়াই পাখিরা আনন্দের সাথে সেই দানা খেতে পারবে। তত্ত্বটি হাস্যকর শুনালেও (চড়াই পাখিকেই যদি খাওয়ানোর ইচ্ছা তাহলে ঘোড়ার মাধ্যমে যাওয়ার কী দরকার, সরাসরি রাস্তায় কিছু দানা ছিটিয়ে দিলেইতো হয়!) আমেরিকান রাজনীতিতে বিভিন্ন মোড়কে চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বের প্রয়োগ আজও চালু আছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহিত্যে এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অবতারণা ঘটে ১৯৫০ এর দশকে, The *Merriam-Webster Dictionary* মতে, that the first known use of "trickle-down" as an adjective meaning "relating to or working on the principle of "trickle-down theory" was in 1944 while the first known use of "trickle-down theory" was in 1954.

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে তত্ত্বটি প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন চিন্তায় প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করল হঠাৎ, ৯০ এর দশকে এসে জানা গেল এরকম কোন তত্ত্বের অস্তিত্বই অর্থনীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোন সময় ছিল না, অনেকটা ধাপ্পাবাজির মতই এতকাল এই ভুতুড়ে তত্ত্বটি পৃথিবীতে দাবড়ে বেড়িয়েছে। (Aghion & Bolton, 1997, p.151-57) এত দিন বাদে এত প্রতাপশালী একটি তত্ত্ব থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা সেই বহুল প্রচলিত ইংরেজি প্রবাদটির কথাই মনে করিয়ে দেয় "success has a thousand fathers, failure is an orphan".

Philippe Aghion and Patrick Bolton, 1997

প্রায় দুই দশক ধরে "Trickle down theory"র একনিষ্ঠ ধারক থাকার পর বিশ্বব্যাংক অবশেষে অনুধাবন করল যে, এই তত্ত্বের ভিত্তিতে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল দারিদ্র্য বিমোচনের অভীষ্ট অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

এই বোধোদয়ের (!) পিছনে নানান অনুঘটক কাজ করেছে, এমনকি ব্যাংকের নিজস্ব গবেষকগণও অনেক সময় "চুঁইয়ে পড়া" তত্ত্বের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন, ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের (যেমন ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, তিউনিসিয়া , ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা সহ আরো অনেক দেশ) উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংক গবেষক ডেভিড মোরাজ (Moraetz, 1977) সিদ্ধান্তে আসেন যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সমাজের আয় বৈষম্য বৃদ্ধি-হ্রাস কিংবা দরিদ্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হ্রাসের কোন একমুখী সম্পর্ক নেই। উন্নয়ন কৌশল ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে প্রবৃদ্ধি কোন দেশে যেমন দারিদ্র্য এবং/অথবা বৈষম্য হ্রাস করতে পারে, তেমনি বৃদ্ধিও করতে পারে।

এই ধরনের বেশ কিছু উপাত্ত ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের ফলেই অবশেষে, ১৯৭০ সালের দিকে এসে আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের বোধোদয় হল যে, সম্পদ আসলে আপনা আপনি উপর থেকে নিচে চুঁইয়ে পড়েনা, তার জন্য এমন সব উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া দরকার যার ফলাফল সরাসরি দরিদ্রদের হাতে যায় (অর্থাৎ, দানা খাওয়াতে চাইলে সরাসরি তা রাস্তায় ছিটিয়ে দাও, ঘোড়ার মাধ্যমে যেন চড়ুই পাখিদের দানা খাওয়াতে না হয়)। এই উপলব্ধির ধারাবাহিকতায়, ১৯৭৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক তাদের চিন্তা ধারায় তথা-কথিত "দারিদ্র্য অভিমুখীনতা" (poverty focused) ধারণাটি যুক্ত করতে শুরু করে, এবং গ্রামীণ অবকাঠামো (ক্ষুদ্রাকার সেচ প্রকল্প, গ্রামীন রাস্তা ঘাট ইত্যাদি), কৃষি-ঋণ ইত্যাকার প্রকল্পগুলিতে অর্থায়নের দিকে বিশেষ নজর দেয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সম্পদ বিনিয়োগের ধারাটি গ্রাম অভিমুখীন করার চিন্তাটি ছিল একটি সঠিক চিন্তা। কারণ দরিদ্রদের বৃহদাংশেরই বাস যেহেতু গ্রামে, এবং তাদের আয়েরও মূল উৎস যেহেতু গ্রামীণ, তাই তাদের হাতে সম্পদ পৌঁছে দিতে হলে সেই সম্পদ গ্রামেই তৈরি হতে হবে।

কিন্তু সম্পদ তৈরি হলেই তো হবেনা- তা সে বাড়ির যত কাছেই হোক-তাকে তো দরিদ্রদের হাতে পৌঁছাতে হবে। এদিকে বিদ্যমান সম্পদ (মূলত ভূমি) মালিকানার ধরন এক্ষেত্রে ছিল বিরাট এক বাধা। তাই, মালিকানার বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা না থাকার কারণে এই নতুন উপলব্ধি নিয়েও পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হলোনা।

একটু নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করলে এই নতুন কৌশলের দুর্বল জায়গাটি খুঁজে পেতে কোন কষ্ট হয় না। কারণ, উল্লিখিত অবকাঠামো বিনির্মাণ তিন ভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করতে পারে, তার মধ্যে কোনটি কিভাবে এবং কতটুকু কার্যকর তার দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। প্রথমত, শ্রমঘন কর্মসূচি হওয়ার কারণে মজুরি হিসাবে এই ব্যয় সরাসরি দরিদ্র পরিবারের হাতে যাবে, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনিয়োগের শতকরা হিসাবে এই ব্যয় এতই ক্ষুদ্রাকার যে মাথাপিছু আয় সৃষ্টিতে তার অবদান হয় একেবারেই প্রান্তিক ধরনের। দ্বিতীয়, এলাকা ভিত্তিতে এ ধরনের ব্যয় সারা বছরতো থাকেইনা, এমনকি প্রতি বছরও থাকেনা। তাই আয়ের উৎস হিসাবে তা খুবই মৌসুমি ধরনের। তা দিয়ে চরম অভাবের দিনে দরিদ্রদের শারীরিকভাবে টিকে থাকার কিছুটা ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু তা দিয়ে তার দারিদ্র্যের স্থায়ী কোন সমাধান হয় না। তৃতীয়ত, অবকাঠামো উন্নয়নের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে স্থায়ী যে সুফল, তা হল উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় সাশ্রয় এবং বাজার সুবিধা গ্রহণ। একমাত্র ভূমি এবং অন্যান্য স্থায়ী উপকরণের উপর মালিকানা বা অন্য কোন প্রকার অধিকারের ভিত্তিতেই এই সুফলের অংশীদার হওয়া সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামীণ দরিদ্রই ভূমিহীন অথবা প্রায় ভূমিহীন বা খুব বেশি হলে দরিদ্র কৃষক পর্যায়ে থাকার কারণে উপরোক্ত সুফলগুলির কোনোটাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগে আসে না। এ ভাবেই বিশ্বব্যাংকের সদ্য ছুঁড়ে দেয়া তীরটি গ্রামীণ দরিদ্রের ভাগ্যের কান ঘেঁষে, সামান্য বাতাস লাগিয়ে বেরিয়ে যায়, তার মরমে প্রবেশ করতে পারেনা।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ১৯৭৩ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাংক যখন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছিল তখন তাদের বিশ্বাস ছিল, গ্রামীন আয় বৃদ্ধি পেলে তার কিছু অংশ অবশ্যই দরিদ্রদের ঘরে চুঁইয়ে পড়বে। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে এসেও বিশ্বব্যাংক সেই "চুঁইয়ে পড়ার" উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তাই উন্নয়নশীল দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ প্রথম থেকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন করতে চাইলেও চুঁইয়ে পড়া দর্শনের ঘোর না কাটার কারণে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ তা ক্রমাগত উপেক্ষা করে গেল।

শুধু তাই নয়, অবকাঠামো কর্মসূচির সাথে সাথে, এবং তার পরিপূরক (complementary) হিসেবে বিশ্বব্যাংক প্রাইমারি শিক্ষা, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন এর মত মানব ও গরীব হিতৈষী কর্মসূচি ও গ্রহণ করেছিল। আশা ছিল, আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র জনগণ এই সেবাগুলি লুফে

নিবে এবং তার ফলে দারিদ্র্য হ্রাস ত্বরান্বিত (accelerated) হবে। কিন্তু অভীষ্ট আয়বর্ধনই যেহেতু হল না, তাই এই প্রশংসনীয় উদ্যোগটিও দরিদ্রদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। অগত্যা, ১৯৮০ সালের দিকে এসে বিশ্বব্যাংককে স্বীকার করতে হল, "Increasingly it was recognized that these kinds of projects were less suited to the rural landless and the urban poor, who had few productive assets" (World Bank, 1982)। মনে হল, এই উপলব্ধির পর এবার হয়তো বিশ্বব্যাংক ঘুরে দাঁড়াবে।

কিন্তু ততোদিনে উপস্থিত হয়েছে আরেক উপসর্গ। দারিদ্র্য নিয়ে কার্যকর নতুন কিছু চিন্তা করার আগেই সমগ্র বিশ্ব পতিত হল অর্থনৈতিক মন্দায়, আর উন্নয়নশীল দেশ সমূহ হল ঋণ সঙ্কটে (Debt Crisis) জর্জরিত। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের অভাবনীয় মূল্য বৃদ্ধির কারণে উন্নত বিশ্বে এই মন্দার সৃষ্টি হলেও তা কালক্রমে উন্নত অনুন্নত সকল বিশ্বকেই ডোমিনো কায়দায় কব্জা করে ফেলে। মন্দার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয় এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটাই একটা অস্তিত্বের সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাই অন্য সব সমস্যাকে পিছনে ফেলে প্রবৃদ্ধি আবার হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব অর্থনীতির জপমন্ত্র।

এহেন পরিস্থিতিতেই উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বিশ্বব্যাংক নিয়ে আসে তার বিখ্যাত (বা কুখ্যাত, যাই বলি) কাঠামোগত সমন্বয় (structural adjustment program-SAP) কর্মসূচি। যে নব্য-ধ্রুপদী (Neoclassical) অর্থনৈতিক দর্শনের উপর এই সমন্বয় কর্মসূচি দাঁড়িয়ে আছে তার মূল কথা হলোঃ বাজারের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে কাজ করতে দিলেই কেবল কোন অর্থনীতি অব্যাহতভাবে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে চলতে পারে। অনুন্নত দেশগুলি যে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত ভাবে মার খাচ্ছে (এবং ঋণ সঙ্কটের মত পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে) তার প্রধান কারণ হল, বাজারের পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাকার নানান ধরনের বাধা ও হস্তক্ষেপ জনিত বিকৃতি (distortion)। তাই যে কোন মূল্যে বাজার বিকৃতির (market distortion) অবসান ঘটানোই হল উন্নয়নের চাবিকাঠি, আর কাঠামোগত সমন্বয় হল এর জন্য একমাত্র ব্যবস্থাপত্র। এই "ধন্বন্তরির" পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এই

নিবন্ধের পরিসরে তার বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব নয়, তবে এই নতুন "ধন্বন্তরি" ব্যাংকের দারিদ্র্য ধারণাটিকে কোথায় নিয়ে গেল, তা দেখা যেতে পারে। (টীকা ৫)

কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি যে অনুন্নত দেশগুলিতে (সাময়িক ভাবে হলেও!) দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে তার পূর্বাভাস বিশ্বব্যাংকের ছিল; তাই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য একটা উদ্ধার কর্মসূচির অবতারণা ঘটানো হল, যার নাম "মানব উন্নয়ন" বা Human Development। সত্যি বলতে কি, ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে এই ধারণাটি প্রথম সামনে আসে, কিন্তু তখন এটি ছিল ভৌত বিনিয়োগের পর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনেকটা অবশিষ্ট ব্যয়ের (Residual expenditure) মত। যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, প্রাইমারি শিক্ষা, মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন এর মত মানব ও গরীব হিতৈষী কর্মসূচি এই প্যাকেজেরই অংশ। দারিদ্র্যের কারণেই যে দরিদ্ররা এই কর্মসূচির সুফল ঘরে নিতে পারেনি তাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এবার প্যাকেজটি আসল একটি paradigm shift এর মধ্য দিয়ে। এতকাল মূল ধারা অর্থনীতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, ইত্যাকার মানব হিতৈষী কাজে ব্যয়কে দেখা হত ভোগব্যয় হিসাবে। এই প্রথম এই ধরনের ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসাবে দেখার প্রথা চালু হল। বিশ্বব্যাংকের তদানীন্তন সভাপতি রবার্ট ম্যাকনামারার ভাষায়,"---- the vital massage is that some steps we all have long known to be morally right- primary education for example- make good economic sense as well" (World Bank, 1980).

এই paradigm shift অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি সন্দেহ নেই; অধিকন্তু বিশ্বব্যাংকের জন্য এটি ছিল জোড়া আশীর্বাদ। আমরা জানি, দারিদ্র্যের সর্বাপেক্ষা কঠিন কশাঘাতটি আসে প্রথমে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর, এবং তার পরেই জীবনের গুণগত মান অর্থাৎ শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর। কাঠামোগত সমন্বয়ের প্রভাবে দারিদ্র্যাবস্থার সম্ভাব্য অবনতিকে সামাল দেবার জন্য এই খাতগুলিতে বিনিয়োগ তাই অপরিহার্য হয়ে পড়ল; অনুৎপাদনশীল হলেও (আগের ধারণা মোতাবেক) এই ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। এখন দেখা গেল, এ ধরনের ব্যয়ও উৎপাদনশীল ব্যয়। আরো দেখা গেল, ইতিবাচক বহিঃপ্রভাবের (externality) কারণে এই ব্যয়ের মোট সুফল প্রচলিত উৎপাদনশীল খাতের চেয়েও বেশি। তাই এই দুটি খাতে বিনিয়োগের সুফল বাজার আধিপত্যের পরিধি

পেরিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঘরে যাওয়ার অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। "কাঠামোগত সমন্বয়" এবং "মানব উন্নয়ন" এর দ্বৈরথ এভাবেই একদিকে দেশের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে, অন্যদিকে দারিদ্র্য লাঘবের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকবে না এটাই ছিল বিশ্বব্যাংকের প্রত্যাশা।

আপাতঃ দৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ (প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন দৃষ্টিকোণ থেকে) এই উদ্যোগটিও তার ঘোষিত অভীষ্ট অর্জনে সক্ষম হলোনা। কেন হলোনা তার অনেক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় এই ব্যর্থতার বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়ে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই পর্যায়ে কয়েকটি সাধারণ দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়।

যদি সামগ্রিকতার দিক থেকে দেখা হয় তা হলে বলতে হয়, দ্বৈরথের কাঠামোগত দুর্বলতাই এই ব্যর্থতার বড় একটি কারণ। দরকার ছিল এমন একটি কর্মসূচির যার মধ্যে উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উপাদানগুলি একে অপরের পরিপূরক হিসাবে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে থাকবে, অর্থাৎ দরকার ছিল একটি একক কাঠামোগত অভিমুখীনতা (holistic approach)। তা না হয়ে আমরা দেখতে পাই দুটি সমান্তরাল কর্মসূচি, যার একটিতে কাঠামোগত সমন্বয় বা (SAP) প্রাধান্য পেল--তার সকল নব্য-ধ্রুপদী উপাদান সহ--সামষ্টিক অর্থনীতির যান্ত্রিক প্রয়োগের মাধ্যমে, অন্যটিতে থাকল নানান কল্যাণমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য দমনের উদ্যোগ। যার ফলে উন্নয়নের জৈবিক অংশ হিসাবে (organic ingredient) দারিদ্র্য বিমোচনকে কল্পনা করা সম্ভব হলনা, সেটি উন্নয়নের আজ্ঞাধীন, কিন্তু পৃথক একটি কর্মসূচিতে পরিণত হল। যার ফলে এই দুই লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন, তাদের ভিতরকার জটিল কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ, ইত্যাদির দক্ষতা অদক্ষতার উপর বিষয়টি নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বিশেষ করে ব্যাংকের ঘোষিত নীতি এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলল। (টীকা ৬)

বাক্স-২

এমনকি ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবেই ছিল যে এই দু ধাপ কর্মসুচির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের সামর্থের উপর। ব্যাংকের ভাষায়," .....since these actions mean that a large share of income and more public spending will go to the poor, the principal trade-off, especially in the short run, is between the interest of the poor and those of the nonpoor. The two-part strategy is, therefore, more likely to be adopted in countries where the poor have a say in political and economic decision-making. (World Bank Development Report, 1990; Oxford University Press; p.3)

আসলে ব্যাংকের এই দ্বিধা মিশ্রিত কৌশলটিও ছিল একটা দ্বিতীয় সর্বোত্তম বিকল্প বা second best alternative, যেখানে ব্যাংকের ভাষ্য মতেই আরো কার্যকর প্রথম বিকল্প হতে পারতো ভূমি সংস্কারের মত সুদূর প্রসারী এবং মৌলিক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য সৃষ্টির ভিত্তিতে আঘাত করা, যা ব্যাংকের সাহসে কুলায়নি। প্রাগুক্ত দলিলেই ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ ছিল নিম্নরূপঃ "Although the two-part strategy does involve a politically sensitive trade-off between the poor and the nonpoor, it is likely to prove more feasible than other strategies. Large-scale redistribution of land has sometimes been successful. In Japan and the Republic of Korea, for example, land distribution was central to the reduction of rural poverty and laid the basis for the other policies advocated in this report. Where it can be done, redistribution of land should be strongly supported. But the political obstacles to such reform are great. In most countries, the two-part strategy outlined here, which sees investment in education as the best way of augmenting the assets of the poor, is more likely to succeed." (World Bank Development Report, 1990; Oxford University Press p. 3)

কাঠামোগত দুর্বলতা ছাড়াও SAP বাস্তবায়নের আরো কিছু বাস্তব চিত্র ছিল উল্লেখ করার মত। যেমন, প্রথমত, এই দেশগুলির দারিদ্র্যাবস্থা এতটাই চরমে যে মানবিক কিংবা রাজনৈতিক, কোন যুক্তিতেই তাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসাবে স্বীকার না করে উপায় ছিল না। অথচ, SAP গ্রহণের পর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় এক নম্বর করণীয়, দারিদ্র্য নেমে আসে দ্বিতীয় সারিতে। উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে জেনে বুঝে এরূপ নিশ্চিত ভাবে অজনপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; তাই অনেক দেশেরই এই কর্মসূচিতে অন্তর থেকে সায় থাকতোনা। কিন্তু যেহেতু SAP এর শর্ত পালনের উপরই নির্ভর করত একটা দেশের বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা ঐ পথে হাঁটতে বাধ্য হত। বাংলাদেশের জন্য এসম্পর্কে কী হুমকি বরাদ্দ ছিল তার কিছুটা আভাস আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি। তাই বলা যায়, SAP সব সময়ই একটা স্বত্ত্ব-সমস্যায় (ownership problem) ভুগত। অথচ, ব্যাংক সব সময়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে SAP গ্রহিতা দেশেরই নিজস্ব উদ্ভাবন। এই প্রসঙ্গে প্রফেসর রেহমান সোবহানের নিম্নে বর্ণিত পর্যবেক্ষণটি প্রনিধানযোগ্যঃ "The BWI (Breton Woods Institution) appropriated to itself a monopoly of the truth on development policy where they assumed that both their diagnosis of the problem of the Third World Countries (TWC) and their resultant reform prescriptions were beyond challenge. This imperial vision in the BWI was fostered by the financial vulnerability of most TWC, as well as their limited professional capabilities to challenge the intellectual presumptions of the BWI. Thus such economic reforms in most countries tended to be externally designed, with a **minimum of national ownership** over their conception and even implementation (রেহমান সোবহান, ১৯৯৪)।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মসৃণ গতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই যে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য SAP কর্মসূচির উদ্ভব ঘটেছিল তা একপ্রকার উন্মুক্তসত্য। তবে, এই কর্মসূচির সবকিছুই ঢালাও ভাবে দরিদ্র বিরোধী ছিল, কিংবা এই সব দেশের জন্য অপ্রাসঙ্গিক ছিল, তা কিন্তু সত্য নয়। ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ,

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণসহ অনেক কর্মসূচিই এ সব অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনতে সহায়ক হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হল, SAP কর্মসূচির অনেকগুলিই ছিল অনেকটা বালক, যুবা, বৃদ্ধ সবাইকে এক সাইজের জামা পরানো, বা টাইফয়েড ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নির্বিশেষে এক বোতলের মিকচার গেলানোর মত একটা ব্যাপার। একটা দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক অবস্থা যে রকমই থাকুকনা কেন, তাকে নব্য-চিরায়ত (Neo-classical) পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য একটাই প্রেসক্রিপশন ছিল তার ঝুলিতে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই একদিকে তাদের সমন্বয় কর্মসূচি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পুরাপুরি বা আংশিক ভাবে ব্যর্থ হত, অন্য দিকে দারিদ্র্যাবস্থার অবনতির যে ঝুঁকি গ্রহণ করা হত অনেক সময় তার চেয়ে বেশিই ক্ষতি স্বীকার করতে হত। তাই বেশ কিছু ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও মোটা দাগে SAP উন্নয়নশীল দেশসমূহে অজনপ্রিয়ই রয়ে যায়।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের দারিদ্র্য নীতির ইতিহাসে ১৯৯০ সালটি ছিল ব্যতিক্রমী। এবছর প্রকাশিত উন্নয়ন রিপোর্টটিকে দারিদ্র্য সম্বন্ধে ব্যাংকের সবচেয়ে পরিপক্ক ও বাস্তবতাপূর্ণ চিন্তা ধারার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রথম ব্যাংক তার দশক ব্যাপী কর্ম পরিকল্পনায় দারিদ্র্যকে মাছের চোখ করে কোন রিপোর্ট প্রকাশ করল। ব্যাংক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত) তার নীতিগুলি যে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায়নি, বরং অধিকাংশ স্থানেই তা ব্যর্থ হয়েছে তা অকপটে স্বীকার করল এবং চুঁইয়ে পড়ার উপর নির্ভর না করে সরাসরি দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় নির্ধারণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল।

এই নতুন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো হল একটি দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করে। একদিকে বাজার প্রণোদনা ও অন্যান্য কর্মসূচির সুযোগ সৃষ্টি করে শ্রম সম্পদের অধিকারী হিসাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, অন্যদিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি কিছু মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতি ঘটিয়ে মানব সম্পদ হিসাবে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, এই দুটি পরস্পর-দৃঢ়ীকরণকারী (mutually reinforcing) অঙ্গের সমন্বয়ে নতুন কৌশলটি গড়ে উঠে (লক্ষ্য করুন, আগের মত দুটি সমান্তরাল কর্মসূচি নয়, আবার একেবারে একক কর্মসূচিও নয়)।

দরিদ্রের দোরগোড়ায় পৌঁছার জন্য রিপোর্টে যে উপায়গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাও বেশ চমকপ্রদ। যেমনঃ ক) স্বল্প মজুরির (কিন্তু টেকসই) সরকারি কর্ম প্রকল্প খ) ক্ষুদ্র চাষি/উদ্যোক্তাদের জন্য যুৎসই কারিগরি উদ্ভাবন ও ঋণ ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে উচ্চারণটির জন্য বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্টটি অনন্য হয়ে আছে, তা হল নিম্নরূপঃ "Public spending that is well designed and accurately targeted can play an important part in the fight against poverty. But such programs, however cost effective, are not substitute for efforts to attune the broad stance of economic policy to the needs of the poor. Attacking poverty is not primarily a task for narrowly focused anti poverty projects, vital though these may be. It is a policy task for economic policy in the large." (The World bank, 1990 p.4)

অর্থাৎ, বিশ্বব্যাংক স্বীকার করে নিল যে, সরকারি ব্যয়ই বলি আর বিভিন্ন দারিদ্র্য নিরোধক কর্মসূচির কথাই বলি, আসলে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে হলে সমগ্র অর্থনৈতিক নীতিটাকেই দারিদ্র্য নিরোধের সুরে সুর মিলাতে হবে (attune)। বিশ্বব্যাংক বলুক বা না বলুক, এই কথার সোজা অর্থ হল, এখন থেকে কাঠামোগত সমন্বয় নয়, দারিদ্র্যই হবে কেন্দ্রীয় নীতি; অন্য সব কিছু তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আবর্তিত হবে। অন্য কথায়, উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন একই কর্মসূচির জৈবিক ভাবে সম্পর্কিত দুটি দিক, একটিতে অর্জন স্বয়ংক্রিয় ভাবে অন্যটির অর্জন বয়ে আনবে। বিশ্বব্যাংক কি তার এই নতুন উপলব্ধির প্রতি যথাযথ সুবিচার করতে পেরেছে? বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব।

৫। পঁচাত্তর, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশঃ দিক বদলের ইতিকথা

এবার দেখা যাক, সময়ের বাঁকে বাঁকে বিশ্বব্যাংক, তথা ব্রেটন উডস পরিবারের দিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কীভাবে তার দারিদ্র্য বিমোচন নীতি ও কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের "চুঁইয়ে পড়া" তত্ত্বের সোনালি যুগে বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান, অর্থাৎ পাকিস্তানের অংশ। ব্যাংকের, মতই, পাকিস্তান সরকারের উন্নয়ন চিন্তায় দারিদ্র্য নিয়ে আলাদা কোন উদ্বেগ ছিল না। তাই বিশেষ কোন উদ্যোগ বা নীতিও

তার ছিল না। ফলশ্রুতিতে, আমরা দেখতে পাই, ১৯৬৩-৬৪ সালে যেখানে ৫১.৭% পরিবার ছিল দারিদ্র্য সীমার নিচে, সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে তা উন্নীত হয় ৮৪.১% এ। এই সমগ্র সময়টিতে পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র, এমনকি তার ঠান্ডাযুদ্ধকালীন ঘনিষ্ঠ মিত্র-জোট SEATO এবং CENTO'র সদস্য। একই সময়ে (এবং মূলত এই সব কারণে) পাকিস্তান বিশ্বব্যাংকেরও প্রিয় পাত্র ছিল।

বিশ্বব্যাংক যখন ৭০ এর শুরুতে "চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বের" বাঁধন একটু আলগা করে তার উন্নয়ন চিন্তায় নতুন কিছু উপাদান সংযোগ ঘটাতে সচেষ্ট (যেমন, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ), তখন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা আগের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, সেই সময় বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিন্তা ছিল বিশ্বব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর। শুধু তাই নয়, প্রথম দিকে নিজের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের তত্ত্বাবধয়কসুলভ ভূমিকাকে পরিহার করে চলতে সচেষ্ট ছিল, যার জন্য তাকে অনেক খেসারতও দিতে হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু রাতারাতি বদলে গেল ১৯৭৫ সালে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর (টীকা ৭)। প্রথমেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্র কার্যত পরিত্যক্ত হল। তার সাথে সাথে আনুষঙ্গিক অনেক রাষ্ট্রীয় নীতি সহ পরিকল্পনা সম্বন্ধেও সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর দর্শনীয় পরিবর্তন ঘটল। যেমনঃ

পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বের অবনতি-প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল। অন্য দিক থেকে বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকার একটি সর্বাঙ্গীন, সুদুর প্রসারী এবং পরিকল্পিত কর্মসূচির আওতাধীনে অগ্রসর হওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। ৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর কী পরিকল্পনা, কী দারিদ্র্য বিমোচন, উভয় ক্ষেত্রেই মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রথমেই পরিকল্পনা কমিশনকে অর্থনীতির দিক নির্দেশকের আসন থেকে আর পাঁচটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাতারে নামিয়ে আনা হল। যেখানে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি (এই পদে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নুরুল ইসলাম), সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার, এখন প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তে একে ন্যস্ত করা হল একজন মন্ত্রীর অধীনে। ফর্মাল এই অবনমন অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব হ্রাসের যে ইঙ্গিত দেয় তার প্রতিফলন দেখা যায় প্রয়োগ ক্ষেত্রেও। প্রফেসর রেহমান সোবহানের ভাষায়, "There is no

evidence of serious national debate on any of the Five Year Plans nor any indication that top policy makers have any real interest in the plans, a strategic blue print for executive action" (Rehman Sobhan, 1985)। অর্থাৎ, পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা দায়সারা ভাব সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাতিঘর হিসাবে তার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনেকখানি গুরুত্বহীন করে তোলে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি উদাসীনতাঃ বর্তমান প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, দারিদ্র্য সম্বন্ধেও সরকারের একই প্রকার উদাসীনতা। এ বিষয়েও প্রফেসর রেহমান সোবহানের পর্যবেক্ষণ হতাশাময়। তার ভাষায়, "Notwithstanding the commitment to reduce poverty, no government has been able to gear its statistical system towards providing year to year measures of acceptable accuracy of trends in income and poverty. ..... . Till a government can equip itself to know what is actually happening to the rural poor, its claim to see an improvement in their condition will face a credibility gap" (Rehman Sobhan, 1985)। অর্থাৎ, দারিদ্র্য বিমোচনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার বজায় থাকলেও পরবর্তী কোন সরকারই (ঐ সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ সরকার) দারিদ্র্যের গতি প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য একটা কার্যকর পরিসংখ্যান পদ্ধতিও গড়ে তুলতে পারেনি বা তুলতে আগ্রহী হয়নি।

এই অবস্থান পরিবর্তনের কারণ কি? একটু নিবিড় পর্যবেক্ষণে প্রতিভাত হয় যে, একদিকে দেশের অভ্যন্তরে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা, এই দুই শক্তির যুগপৎ ক্রিয়াই সরকারের অবস্থানের এই দর্শনীয় পরিবর্তন ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য আওয়ামীলীগ ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তিসমূহের উপর নির্ভর করেন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক কোন নীতির প্রতি আনুগত্য রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমূহ সংশোধন করে তিনি পাকিস্তানি ভাবধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই পরিকল্পনার নতুন কেন্দ্রীয় ভূমিকা, কিংবা দারিদ্র্য বিমোচন-কেন্দ্রিক উন্নয়ন

চিন্তা কোনটার প্রতিই তার সরকারের কোন অঙ্গীকার রইলনা। এরশাদ সরকার নীতিগত দিক থেকে কার্যত জিয়া সরকারেরই প্রলম্বিত রূপ। তাই এই দুই সরকার মিলেই বাংলাদেশে একটি একক আর্থ-রাজনৈতিক কন্টিনাম (continuum) গড়ে তোলে। (টীকা ৮)

দেশের অভ্যন্তরের এই নতুন উর্বর ক্ষেত্রকে ব্যবহার করেই বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বব্যাংকের ভাবধারায় পুষ্ট নতুন উন্নয়ন কৌশল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতা রাষ্ট্র সমূহের কনসোর্টিয়াম (অন্য ভাষায় সমবেত চাপ প্রয়োগের প্লাটফর্ম) গঠনের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেই বাংলাদেশ তার প্রথম পরিকল্পনার যাত্রা শুরু করেছিল। (নজরুল ইসলাম, ১৯৮৭)।

সরকারের এই স্বাধীনচেতা মনোভাব দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক খুব একটা সমাদৃত হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। তাই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দাতা গ্রহীতা, উভয়ের জন্যই স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কাছে কোন সময়ই তেমন পছন্দসই ছিল না, কারণ তা বাজার সার্বভৌমত্বের নব্য-ধ্রুপদী (Neo-Classical) আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। তদুপরি, পরিকল্পনার ধারণাটি সমাজতন্ত্রের গর্ভ থেকে উত্থিত হওয়ার কারণে সাদরে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী সব সময়ই একটা আদর্শগত বাধা অনুভব করে এসেছে। কিন্তু সেই ১৯৫০ থেকেই সদ্য স্বাধীন অনেক দেশ পরিকল্পনাকে উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করার কারণে বিশ্বব্যাংকের পক্ষে তাকে শতভাগ অস্বীকার করারও উপায় থাকেনা। তাই পরিকল্পনা যত কম ব্যাপ্তিশীল, বিশ্বব্যাংকের কাছে তা তত বেশি সমাদৃত হয়। ৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের দায়সারা গোছের পরিকল্পনা তাই বিশ্বব্যাংকের প্রিয়ভাজন হতে বেশি সময় লাগেনি। অন্য ভাবে বলা যায়, বিশ্বব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের সমর্থনের তাগিদেই নতুন অবস্থানের উদ্ভব ঘটে।

অন্যদিকে, দীর্ঘ দিন "চুঁইয়ে পড়া" তত্ত্বে আবিষ্ট বিশ্বব্যাংক ১৯৭০ এর দিকে সবে মাত্র উন্নয়নের দারিদ্র্য অভিমুখীনতার দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছে, তবে তখনো বাজার মেকানিজমের বাইরে কোন প্রকার সম্পদ পুনর্বণ্টনের কথা তার চিন্তায় আসেনি। তাই বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনার বাজার বহির্ভূত বিশাল কর্মযজ্ঞের বিপরীতে ৭৫ পরবর্তী সরকারের ঢিলেঢালা অবস্থান তার জন্য ছিল অধিকতর স্বাচ্ছন্দময়। বস্তুতঃ ১৯৭৫ সালের পর থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মত

বাংলাদেশও তার দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে বিশ্বব্যাংকের চিন্তার আলোকে ঢেলে সাজায়; সময় সময় বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার দারিদ্র্য চিন্তায় যে সমস্ত নতুন নতুন ধারণার সংযোজন ঘটে তার যথা সম্ভব পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে দেশীয় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে (Anu Muhammad and others, 1998)।

তবে ব্যাংক তার চালকের ভূমিকাটি একবারেই দখল করে নিয়েছিল, এমনটি নয়। পাকা খেলোয়াড়ের মতই সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। তাজুদ্দিন-ম্যাকনামারার সেই ঐতিহাসিক কথোপকথনের পরপরই কিন্তু বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে বিশ্বব্যাংকের এবং তার আগে আই এম এফ এর সদস্য পদ গ্রহণ করে (কানাডা থেকে দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের স্বর্ণ কিনে সদস্য পদের চাঁদা পরিশোধ করা হয়)। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সাহায্যদানকারী দেশসমূহের একটি কনসর্টিয়াম গঠনের প্রস্তাব করে যা বাংলাদেশ সরকার সেই সময় ফিরিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের সময় বাধ্য হয়েই তা গ্রহণ করে (নজরুল ইসলাম, ১৯৮৭)। এরপর ব্যাংক আস্তে আস্তে তার অবস্থান সংহত করতে থাকে। ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে তাজুদ্দিনের রেজিগনেশনের পরে একটা সময় আসে যখন ব্যাংক মৃদু সাবধানবানী উচ্চারণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যেমন, একটি রিপোর্টের ভাষা ছিল এরকম, "This report indicates a number of economic reforms which Bangladesh must consider urgently..... . Bangladesh would need urgently US$1.2 billion of disbursements of external aid in 1975/76. The willingness of donors to continue providing aid will no doubt depend on its ability to demonstrate, by the implementation of satisfactory economic policies and measures...." (World Bank, 1975).

(এই রিপোর্টে কিছু অর্থনৈতিক সংস্কারের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যা বাংলাদেশকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে-------১৯৭৫/৭৬ সালে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের ১.২ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্যের দরকার হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তাবিত তাই অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে কতটা সক্ষম তার উপর নির্ভর করবে দাতাগণ সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবে কিনা এই প্রচ্ছন্ন (নাকি খোলা খুলি!) হুমকির ফল বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায়ই পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালের মে মাসে টাকার অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে ব্যাংকের রিফর্ম প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ নেয় বাংলাদেশ।

পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যাংক কীরূপ নিশ্চয়তা অনুভব করে তার আভাস পাওয়া যায় তার ১৯৭৬ এর দলিল থেকে।

"there have been some movement in the direction of a more market oriented economy. Steps have been taken recently to improve economic management and the administration. The Planning Commission has been re-staffed with a new Deputy Chairman and four members and the new government confirmed that it intended to introduce such further economic reform as subsidy reduction, agricultural taxation and import liberalization." (World Bank, 1976)।

অর্থাৎ শুধু বিশেষ কয়েকটি নীতির ক্ষেত্রে অবস্থানের পরিবর্তন নয়, পরিকল্পনা কমিশনের মত থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক পর্যায়কে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমেই ব্যাংক সরকারের নীতি নির্ধারণের চালকের আসনটি দখল করে নেয়।

তাই বলা চলে, স্বাধীনতার প্রথম বছর তিনেক বাদ দিলে, ৭৫ এর আগে থেকেই বাংলাদেশ একটু একটু করে বিশ্বব্যাংকের কিছু কিছু নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। ৭৫ এর পরে বিশ্বব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠী ঢালাও ভাবে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে একটা সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের ৮১% অর্থায়ণ হয় সাহায্যের টাকায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সেই বিখ্যাত উক্তি, "Money is no problem" এর আবির্ভাব ঘটে এই সময়টাতেই। নিম্নের সারণি থেকেই চিত্রটি পরিষ্কার হয়।

১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলা দেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির চিত্র

সন	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫	৭৫-৭৬	৭৬-৭৭	৭৭-৭৮	৭৮-৭৯	৭৯-৮০	৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩	৮৩-৮৪
বৈদেশিক সাহায্য (জিডিপির %)	৫.০	৬.২	১০.৩	৭.৪	৯.২	১০.২	১০.৪	৯.১	১০.৯	১১.৯	১০.২
বৈদেশিক সাহায্য (উন্নয়ন বাজেটের %)	৭৭	১৪৯	১১৬	৭৭	৯৯	৯২	৭৮	৭৬	৮৮	৯৭	৮৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন সংখ্যা।

ব্যাখ্যাঃ ১৯৭৪/৭৫ এবং ৭৫/৭৬ এ শতকরা শতভাগের উপর বৈদেশিক সাহায্য নির্দেশ করে যে সম্পূর্ণ উন্নয়ন বাজেটই নয়, অনুন্নয়ন বাজেটেরও একটা অংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে নির্বাহিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারকে ১৯৭৩ এর জ্বালানি-অভিঘাত (Oil-shock) থেকে উদ্ধারের জন্য ব্রেটন উডস পরিবারের স্ট্রাকচারাল এডজাষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SAP) বা কাঠামোগত সমন্বয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশও তার রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় অতি সহজেই তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরও তাতে কোন অসুবিধা হলনা। কারণ, যেমনটি বলা হয়েছে, পরবর্তী জেনারেল এরশাদের সরকার আদর্শের দিক থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না।

তাই আমরা বলতে পারি, ১৯৭৫ এর পর থেকে (বিশেষ করে ১৯৮০ সাল থেকে) বাংলাদেশের যত সাফল্য বা ব্যর্থতা, তা একদিকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভর করে গৃহীত বিবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, অন্যদিকে, আনুষঙ্গিক হিসাবে ব্যাংকের নানান সমন্বয় ও সংস্কার কর্মসূচিতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, এই দুই শক্তির সম্মিলিত ফলাফল হিসাবেই বিবেচিত, তা সে প্রবৃদ্ধিই হোক আর দারিদ্র্য হ্রাসই হোক।

৬। স্বাধীনতার সিকি শতাব্দীঃ না উন্নয়ন না বিমোচন

বাংলাদেশের দেশীয় আয়ের (GDP) প্রবৃদ্ধি হার স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ভাল ছিল । ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর গড় ৩.২% এর তুলনায় ১৯৭৫-১৯৯৩ সময়ে তা ৪.৩% এ উন্নীত হয়। ১৯৭৫ সালের পর বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভর করে দেশে একটি মধ্যমাকারের প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিক ভাবে অর্জিত হতে থাকে (১৯৭৫-৮০ সময়ে ৪.২%, ৮০-৮৮ সময়ে ৪.৪% এবং ৮৮-৯৫ সময়ে ৪.২%)। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ধারাবাহিক হ্রাসের (৭৫-৮০ সময়ে ২.৭%; আর ৮০-৯০ সময়ে ২%) কারণে মাথাপিছু দেশীয় আয়েরও (GDP) বৃদ্ধি (১.৪৬% হারে) লক্ষ্য করা যায় (A. R. Khan, 1995)। প্রথম দিকে, অর্থাৎ ১৯৭৫-৮৫র এক দশক মাথাপিছু আয়ের এই বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যের হার কমার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে খানা জরিপ (Household Expenditure Survey বা HES) এর পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কারণে ১৯৮১/৮২ থেকে ১৯৮৩/৮৪ সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের বিষয়ে অনেক গবেষকই

সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন (এ আর খান, ১৯৮৯)। যাই হোক, এই সময়ের পর গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলেও আশ্চর্য ভাবে দারিদ্র্য উল্টো পথে যাত্রা শুরু করে, এবং পরবর্তী এক দশক, অর্থাৎ ১৯৯৫ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) খানা ব্যয় জরিপ (HES) তথ্য অনুসারে, ১৮০৫ কিঃ ক্যালরির কম সমমানের খাদ্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত চরম দরিদ্র (Extreme Poor) জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৮৫/৮৬ সালের ২২% এর তুলনায় ১৯৯১/৯২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৮% (AR Khan 1995, Quoted from W. B 1995)।

বস্তুত, দরিদ্র সংখ্যা (head count), দারিদ্র্য ফাঁক (poverty gap) এবং বর্গকৃত দারিদ্র্য ফাঁক (squared poverty gap), এই তিন সূচকেই এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (পরিচ্ছেদ ৮ এ এই সূচকগুলি সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়েছে। দরিদ্রদের মধ্যেও বিভিন্ন অবস্থানগত তারতম্য এই সূচকগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠে)। আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও দারিদ্র্যাবস্থার এই ক্রমাবনতি "চুঁইয়ে পড়া উপকার" তত্ত্বের নিঃসারতা আরেক বার প্রমাণ করল।

এখন প্রশ্ন হল, কেন এই সময় কালে উন্নয়ন দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হল? তাত্ত্বিক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় এভাবেঃ

১) আমরা জানি বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের মূল উৎস হল কৃষি, তথা গ্রামীণ সেক্টর। যদি উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হয় শিল্প সহ বিভিন্ন আধুনিক সেক্টর, আর কৃষি সহ অন্যান্য গ্রামীণ সেক্টর সমূহ যদি পিছিয়ে থাকে তা হলে উন্নয়নের সুফল সরাসরি দরিদ্রদের হাতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা খুবই কম; তার জন্য দরকার বাড়তি কিছু ব্যবস্থা, যা গ্রাম-শহর বাণিজ্য শর্ত (terms of trade) গ্রামের অনুকূলে নিয়ে এসে সুফলের কিছু অংশ গ্রামে স্থানান্তর করতে পারে।

২) কৃষি খাতেও যদি যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, তাহলেও কতগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে নাও আসতে পারে। যেমন, যদি বাজার পরিস্থিতির কারণে অথবা সরকারি কোন নীতির কারণে ধনী কৃষক লাভবান হয় এং ক্ষুদ্র কৃষক কিংবা বর্গাদার কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে কৃষিতে প্রবৃদ্ধি স্বত্ত্বেও ক্ষুদ্র কৃষকের অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে, প্রান্তিক অবস্থানে থাকা অনেকেই দরিদ্রের কাতারে শামিল হতে পারে।

৩) বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের বিরাট একটি অংশ হল কৃষি মজুর অথবা ক্ষুদ্র অকৃষি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি। এখন কৃষিতে ভাল প্রবৃদ্ধির ফলে যদি মাঝারি এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি জোতে শ্রম-চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে পরিবারের ছদ্ম বেকার (টীকা ৯) জন শক্তি দিয়েই এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করা হবে, অর্থাৎ এই শ্রম চাহিদা প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখবেনা। এমন পরিস্থিতিতেও কৃষি প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর কোন অবদান রাখতে সমর্থ হবে না।

৪) ৪। কৃষি আয় বৃদ্ধি পেলে গ্রামে অকৃষি দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা অংশ সামান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সুযোগ গ্রহণ করে দারিদ্র্য থেকে উত্তোরণ পেতে পারে। কিন্তু এই সামান্য বিনিয়োগের মত মূলধনও যদি তার কাছে না থাকে তাহলে এই সুযোগটুকু গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

এই তাত্ত্বিক উপস্থাপনার আলোকে মধ্য ৮০ থেকে মধ্য ৯০ এর দারিদ্র্য চিত্রকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া যাক কৃষি প্রবৃদ্ধির দিকে।

পাকিস্তান আমলে, ১৯৬০ এর দশক থেকে সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির প্রভাবে কৃষিতে যে প্রবৃদ্ধির সুচনা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ দশকে বাংলাদেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি গড়ে মোটামুটি ৪% এর উপরে বজায় ছিল। ১৯৮০ সালের এক দশকে এই হার নেমে আসে ১.৬% এ। এমনকি ১৯৮৭/৮৮ এবং ৮৮/৮৯ এই দুই বছর প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক হারও দেখতে পাওয়া যা। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ৮১/৮২ থেকে ৯১/৯২ এই দশ বছরের ছয় বছরই প্রবৃদ্ধির ধারা ছিল নিম্নমুখী (রেহমান সোবহান, ১৯৯৩) অতএব, তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, আলোচ্য সময়ে কৃষিখাত যে স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তার অভিঘাত পড়ে দরিদ্রদের উপর। প্রথমতঃ, স্থবিরতার কারণে কৃষিতে নিয়োগ চাহিদা হ্রাস পায়, ফলে প্রকৃত মজুরিও হ্রাস পায়; যার সরাসরি ফল হল দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি। অন্যদিকে, কৃষি উৎপাদন হ্রাসের ফলে ধনী কৃষকের তুলনায় প্রান্তিক ও বর্গা চাষীরাই তুলনামূলক ভাবে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় (কারণটি একটু পরেই ব্যাখ্যা করা হবে), ফলে অনেক প্রান্তিক চাষীই দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যায়। গ্রামীণ দরিদ্রদের তৃতীয় যে জীবিকার

পথ-অকৃষি খাত, সেখানেও কৃষি স্থবিরতার কারণে চাহিদায় ধ্বস নামে, যা ইতোমধ্যেই আধা-মরা দরিদ্রের উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে নেমে আসে। অতএব আলোচ্য সময়টিতে তাত্ত্বিক সব কটি সম্ভাবনাই প্রকৃত অর্থে দরিদ্রদের প্রতিকূলে কাজ করে।

এখন দেখা যাক, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ৭০এর দশকেও যেখানে কৃষি মোটামুটি উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পেরেছিল, সেখানে ৮০র দশকে এসে এই স্থবিরতার কারণ কী। বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন প্রায় সকল অর্থনীতিবিদই এই স্থবিরতার প্রশ্নে অঙ্গুলিটি নির্দেশ করেছেন ব্রেটন উডস পরিবারের দিকে, এবং তার যথাযথ কারণও রয়েছে (টীকা ১০)।

আমরা জানি, মধ্য ষাটের দশকে কৃষিতে গতিশীলতা আসার প্রধান কারণ ছিল শতাব্দী প্রাচীন চাষ পদ্ধতির স্থানে একটু একটু করে সার, বীজ (উন্নত), কীটনাশক, এবং পানি, এই চার উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠা আধুনিক পদ্ধতির আবির্ভাব। প্রথমে বিনামূল্যে, এবং পরে ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করে সরকার উপাদানগুলিকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেয়। সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত এই উদ্যোগের সমালোচনা করার মত অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। পাকিস্তান পেরিয়ে বাংলাদেশেও এই সরকারি নীতি অব্যাহত থাকে, যার ফলে ৭০ এর দশকে ৪ শতাংশের উপরে কৃষি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু আমরা জানি ৭৫ এর পর থেকে দেশ আস্তে আস্তে বিশ্বব্যাংক আই এম এফ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে চলে যেতে থাকে। আমরা পূর্বের পরিচ্ছদে দেখেছি, ঠিক এই সময়টিতেই বিশ্বব্যাংক আই এম এফ তাদের SAP কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য-গগনে। ১৯৮২ সালে প্রথম, ১৯৮৬-৮৯ সময়ে দ্বিতীয় (Structural Adjustment Facility, SAF) এবং ১৯৯০-৯৩ সালে তৃতীয় (Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF) এই তিন ধাপে, তিনটি সরকারের আমলে (জাতীয় পার্টি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিএনপি) বাংলাদেশ এই সংস্কার কর্মসূচির অধীনে ব্রেটন-উডস প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, সমগ্র আশির দশক এবং নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেল কার্যত ব্রেটন উডস এর নব্য-ধ্রুপদি উন্নয়ন মডেলেরই বাংলাদেশ ভার্ষন। বাংলাদেশের কৃষিতে এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য (objective) ছিল সকল প্রকার ভর্তুকি বাতিল করে বাজার দামে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা। তৎকালীন বাস্তবতায় সম্পূর্ণ বাতিল সম্ভব না হলেও সার কীটনাশক থেকে বহুলাংশে এবং সেচ

যন্ত্র থেকে কিয়দাংশে ভর্তুকি হ্রাস করা হল। শুধু তাই নয়, আগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় (সরাসরি অথবা ডিলারশীপের মাধ্যমে) এই উপকরণগুলি সরবরাহ করা হত, এখন ব্যক্তি খাতে এগুলির বিপণন ছেড়ে দেয়া হল।

এর ফল হল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সার্বিক ভাবে কৃষিতে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেল (অংশতঃ ভর্তুকি হ্রাসের কারণে, এবং অংশতঃ ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেবার ফলে দাম বৃদ্ধির কারণে)। ফলে উপকরণ ব্যবহারের গতিতে ভাটা পড়ল, যা বড় ছোট নির্বিশেষে সকল জোতের উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলল। দ্বিতীয়তঃ বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতের কৃষকরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হল, কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতের কৃষকরা আধুনিক উপকরণ ব্যবহারে এগিয়ে ছিল, দাম বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি তাই তাদেরই বেশি হল। তৃতীয়তঃ, আনুপাতিক হারে সার কীটনাশকের তুলনায় সেচ যন্ত্রের ভর্তুকি হ্রাস যেহেতু কম হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও বড় কৃষকরা কম ক্ষতিগ্রস্থ হল, কারণ বাজারের উপর সরবরাহ ছেড়ে দেবার ফলে তারাই সেচ যন্ত্রের একচেটিয়া মালিকানা লাভ করেছিল; এত দাম দিয়ে ছোট কৃষকের পক্ষে তা ক্রয় করা সম্ভব ছিল না। যৌথ ভাবে যে কিনবে এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও গড়ে উঠেনি (যা হতে পারত কৃষিতে এক যুগান্তরকারী উদ্ভাবন)। এর ফলে ছোট কৃষক পানির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে বড় কৃষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল এবং নানান অসম ব্যবস্থার শিকার হল। শুধু বড় কৃষকই নয়, বাইরে থেকে অকৃষক ব্যবসায়ীরাও পানির মালিক হয়ে গেল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানি-মহাজন বা Water- Baron শব্দটি এভাবেই পরিচিত হয়ে উঠল।

শেষ বিচারে বলা যায়, বিশ্বব্যাংক আই এম এফ এর বাজার সংস্কার কর্মসূচির ফলে সব শ্রেণির কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় (water Baron জাতীয় কিছু পানি ব্যবসায়ী ছড়া), উৎপাদন হ্রাস পায়, এবং প্রান্তিক চাষীদের একটা বড় অংশ দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। কৃষি তথা গ্রামীণ আয় হ্রাসের অবধারিত ফল হিসাবে অকৃষি দ্রব্য এবং সেবার চাহিদাও হ্রাস পায়, যার ফলে গ্রামীণ কুটির শিল্পের মাধ্যমে দরিদ্রদের আয় সৃষ্টির পথটিও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ব্যাংকের হিসাব নিকাশ যাই থাকুকনা কেন, এভাবেই তার সংস্কার কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফল বয়ে আনে। (এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা)।

আসলে বিশ্বব্যাংকের সমস্যাটি কী? কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে সমস্যাটা হল তার জন্মদায়। আমরা জানি, ব্রেটন উডে বিশ্বব্যাংক এবং আই এম এফ এর জন্মই হয়েছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও ধারাবাহিক উন্নয়ন বজায় রাখার স্বার্থে বাজার ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন রাখার জন্য। আর এই ত্রুটিহীনতার অর্থ হল, তার দৃষ্টিতে, নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের আলোকে বাজারকে সব ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা। সময়ের সাথে সাথে তাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলেও (এবং তার আলোকে অনেক যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করলেও) ব্রেটন উডস সম্মেলনের আদি অবস্থান থেকে তারা একচুলও বিচ্যুত হয়নি। বরং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বাজার সংস্কার করার প্রক্রিয়ায় তারা অনেকটা গায়ের জোরে এবং যান্ত্রিক ভাবে তা চাপিয়ে দেয়। যত বিপত্তির জন্ম এভাবেই হয় (পরিচ্ছদ ৪ এ এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) আমরা জানি, অন্ততঃপক্ষে ১৯৮০-৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা আধুনিক সমষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এতটা পরিপক্কতা অর্জন করেনি যে দামের মাধ্যমেই সব ধরনের দক্ষতা এবং যৌক্তিকতা নিশ্চিত করা যাবে। দাম যৌক্তিক করণের সাথে সাথে দরকার ছিল এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যা মানুষকে অভীষ্ট আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় অর্থনীতিবিদ ইয়ানস করনাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য কথাটি বললেও (Kornai J, 1992) বাংলাদেশের মত দুর্বল বাজার ব্যবস্থায় তা সমান ভাবে প্রযোজ্য ছিল। কৃষি উপকরণে ভর্তুকি হ্রাস করা হল, অথচ বাড়তি দামে সার ক্রয়ের জন্য কৃষকের হাতে ঋণ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হলনা, তাই বাধ্য হয়েই তাদের সার ব্যবহার কমাতে হল; সেচ যন্ত্র ব্যক্তি হাতে ছেড়ে দেবার সাথে সাথে যদি কৃষকদের পানি-সমবায় গোছের কোন ব্যবস্থা করা যেত তাহলে ওয়াটার ব্যারণদের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি হতনা (একচেটিয়া বাজারও তো বাজার বিকৃতি, তাইনা?)। কৃষির বাইরেও এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে এক ধরনের বাজার বিকৃতি ঠেকাতে গিয়ে অন্য ধরনের বিকৃতির জন্ম দেয়া হয়েছে।

যে সমস্ত অসঙ্গতির জন্য কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি সারা বিশ্বে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, বাংলাদেশেও সেই অসঙ্গতিগুলির উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। অন্যান্য দেশের মত এখানেও একদিকে ছিল অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা একটি অপরিপক্ব বাজার কাঠামো, যেখানে সমষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ বিকৃতি

সারাতে গিয়ে নতুন বিকৃতির জন্ম দেয়; অন্যদিকে ছিল রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা, অদক্ষ আমলাতন্ত্র, সামরিক বেসামরিক এবং রাজনৈতিক শক্তি সমূহের দুর্নীতি কেন্দ্রিক আঁতাত সহ নানাবিধ আর্থসামাজিক বাস্তবতা। তাই এখানে সুষ্ঠু ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার প্রয়াসে গৃহীত বিরাষ্ট্রীকরণ কর্মসূচি জন্ম দেয় ক্রনিক ক্যাপিটালিজমের (আমলাতন্ত্রের সাথে আঁতাতের মাধ্যমে গড়ে উঠা নিকৃষ্ট ধরনের ধনিক শ্রেণি), সাবসিডি তুলে দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস ছোট ও মাঝারি শিল্পকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়, আর্থিক সহজীকরণের (monetary deregulation) অনুষঙ্গ হিসাবে আসে সর্বনাশা ঋণখেলাপী সংস্কৃতি। এমনকি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের (উপজেলা গঠন) মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার মত একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপও পর্যবসিত হয় দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণে। উল্লেখিত প্রতিটি পরিণতিই যে প্রবৃদ্ধির জন্য একটি বৈরী পরিবেশ তৈরি করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ১৯৮০-৯০ সময়ের মধ্যে জিডিপি বৃদ্ধির নেই বললেই চলে; মূল্য স্ফীতি হিসাবে নিলে তা মাত্র ১% এর মত (বাজার মূল্যে ৪% এর কিছুটা বেশি)।

আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে গেলে সমন্বয় কর্মসূচির কোনটিই বাজারকে শক্তিশালী করার দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের বিচিত্র বাস্তবতায় সব কর্মসূচিই সব দেশে প্রযোজ্য হবে, বা সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে এমনটি ধরে নেয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাই উচিত ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় কোন কর্মসূচির কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য, বা আদৌ বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা তা বিচার করা; ঢালাও ভাবে তাঞ্জানিয়া কিংবা কোষ্টারিকার আলখেল্লা তার গায়ে চাপিয়ে দেয়া নয়। বিশ্বব্যাংক অবশ্য দাবি করে যে প্রত্যেকটি দেশ ব্যাংকের সাহায্য নিয়ে নিজ কর্মসূচি নিজেই প্রণয়ন করেছে, তাই দেশের বাস্তবতা তাতে প্রতিফলিত না হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আসলে যে তা ঘটেনি তা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয় (রেহমান সোবহান, ১৯৯৯)।

সাধারণ ভাবে রিফর্মের ফল নেতি বাচক হলেও সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি ও কর্মসূচি অর্থনীতিতে কিছু ধনাত্মক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। যেমনঃ কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি আমদানি সহজীকরণ, রপ্তানী উৎসাহ প্রদান (সাবসিডি) প্রভৃতি একটা ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের সূচনা করে। ফলশ্রুতিতে রপ্তানী খাতে তৈরী পোশাক এক বিস্ময়কর উল্লম্ফন ঘটায় (১% থেকে ৪০%); ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির মধ্যেও প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশী শিল্প

উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়। আয় দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও এইসময়ে (এরশাদ আমল) ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বৃত্তি, শিশু মৃত্যু হার, মোট জন্ম হার, প্রাইমারি স্কুল ভর্তি, ইত্যাদি বেশ কিছু সামাজিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত করে। (Mujeri, Sen, 2006)

এভাবেই, অনেক নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু ইতিবাচক অর্জন নিয়ে বাংলাদেশ জন্মের পর সিকি শতাব্দী পার করে ৯০ এর দশকে প্রবেশ করে।

৭। গণতান্ত্রিক নব্বইঃ নতুন আশার এক ঝলক

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সব দিক দিয়েই ১৯৯০ এর দশকটি বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক সময়। দীর্ঘ দেড় দশক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সেনা শাসনের পর বাংলাদেশ আবার আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার (এক বছরের কম সময়), বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করে; প্রেসিডেন্ট শাসনের পরিবর্তে দেশে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য সম্বন্ধীয় কর্ম পরিকল্পনায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই আমরা দেখি, বাংলাদেশ তার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আবারও দারিদ্র্য বিমোচনকে এক নম্বর লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে। তার আগে, প্রথম পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য থাকলেও ধারাবাহিক ভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মনিয়োগ ছিল পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য, দারিদ্র্য বিমোচন নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিদায়ী এরশাদ সরকার চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে একনেক (ECNEC) অনুমোদন পর্যন্ত সমাপ্ত করে রেখেছিল, একটি অস্থায়ী, অনির্বাচিত এবং স্বল্পকালীন সরকার হওয়ার কারণে সাহাবুদ্দিন সরকার নীতিগত ভাবে পাঁচসালা পরিকল্পনার মত একটা দীর্ঘমেয়াদি দলিল চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং পরবর্তী খালেদা জিয়া সরকার এই পরিকল্পনা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করে। তবে শাহাবুদ্দিন সরকারের আমলে উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে দেশের প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেল (panel of experts) দারিদ্র্য বিমোচন সহ দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রণয়ন করে। তত্বাবধায়ক সরকার এই সুপারিশ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য রেখে যান (রেহমান সোবহান, ১৯৯২, পৃ. ২৮৭-২৯৯)।

ইতোমধ্যে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও তখন দারিদ্র্য সম্বন্ধে নতুন চিন্তার উদ্রেক লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বব্যাংক তার ১৯৯০ এর রিপোর্টে (WDR, 1990) প্রথম

স্বীকার করে যে দারিদ্র্য দূর করতে হলে দারিদ্র্যকেই হতে হবে সকল অর্থনৈতিক নীতি কর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু। শুধু তাই নয়, আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে ব্যাংক ঘোষণা করে যে গণ-দারিদ্র্যের উদ্ভব এবং পুনরোদ্ভব ঘটে মূলত উৎপাদন খাতে, এবং সম্পদ ও তার উৎপাদনশীলতা এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের মতে শ্রমই হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একমাত্র উৎপাদনশীল সম্পদ, অতএব শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত নিয়োগ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং তার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই দারিদ্র্যকে কার্যকর ভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। বাংলাদেশের চতুর্থ পরিকল্পনায় নতুন করে দারিদ্র্য বিমোচন প্রথম লক্ষ্য হিসাবে আবির্ভূত হওয়া এবং বিশ্বব্যাংকের নতুন নীতিগত অবস্থানের মধ্যে সাযুজ্য যে নেহায়েত কাকতালীয় নয় তা অনুমান করা কঠিন নয় (রেহমান সোবহান, ১৯৯২)।

আমরা জানি, ইতোমধ্যে একই সাথে, দশকের প্রথম দিকেই (এমনকি আশির দশকের শেষ দিকেই) বেশ কিছু প্রবৃদ্ধি বান্ধব কর্মসূচি গৃহিত হয়। যেমনঃ বাণিজ্য উদারীকরণ সহ কিছু বহির্মুখী নীতি গ্রহণ যেমনঃ বিশেষ রপ্তানি এলাকা (EPZ) গঠন, ১৯৮০ সালের পার্লামেন্টে পাশ হওয়া অ্যাক্ট এর অধীনে (জিয়া আমল) , ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামে প্রথম ইপিজেড (এরশাদ আমল) এর দশবছর পর, ১৯৯৩ সালে (বিএনপি আমল) কর-ছাড়, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সহজীকরণ (ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে গতিশীলতা প্রাপ্তি), এবং অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও শিল্প খাতে ব্যক্তি উদ্যোগের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় চলে আসা প্রভৃতি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই প্রথম দেশে ধারাবাহিক ভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির একটি প্রবণতা সূচিত হয়। ১৯৮০'র দশকের ৩.৭% এর স্থলে ৯০এ তা.৪.৮% এ উন্নীত হয় (আফসান সাবাব, বিশ্বব্যাংক ২০১৮)।

এই সকল ইতিবাচক অর্জনের ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের তুলনায় ৯০ এর দশকে দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ১৯৯১-৯২ সালের ৫০% থেকে ৯৫-৯৬ সালে (বিএনপি আমল) ৪১% এ নেমে আসে (গ্রামীণ ৫৩% থেকে ৪৬% আর শহুরে ৩৪% থেকে ২২% (Mujeri & Sen)। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন দারিদ্র্য পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে সকল পরিমাপের মধ্যে যা সাধারণ তা হল এই যে এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে (অবশ্য রেহমান সোবহানের মতে দারিদ্র্য ৫০% এর কোটায় আটকে থাকে)। আয়ের সাথে সাথে প্রাইমারি শিক্ষা স্তরে ভর্তি, শিশু মৃত্যু, শিশু অপুষ্টি, নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

খাতে লিংগ বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতি সামাজিক খাতেও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এভাবে আয় দারিদ্র্যের তুলনায়ও মানবিক দারিদ্র্য সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য উজ্জ্বলতর নতুন আরেকটি দিক।

৮০র দশকের তুলনায় ৯০ এর দশকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে আমরা বেশ কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও দেখতে পাই। প্রথমতঃ আমরা দেখেছি আশির দশকের শেষের দিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় থাকলেও দারিদ্র্যাবস্থার অবনতি ঘটেছিল মূলতঃ কৃষির ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে। ৯০ এর দশকে আমরা কৃষিরও ধনাত্মক ভূমিকা দেখতে পাই। প্রবৃদ্ধির খাতওয়ারী অবদান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মোট প্রবৃদ্ধির ১৬.৮৬% এসেছে কৃষি থেকে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৮৪/৮৫ থেকে ৮৮/৮৯ সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে; যার ফলে মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তখন দারিদ্র্যাবস্থার অবনতির জন্য এই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ৯০ এর দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির উর্ধগতি এবং জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি যুগপৎ ভাবে চলতে থাকায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হয়। এ সম্বন্ধে নিম্নের সারণিটি বেশ প্রাসঙ্গিক।

১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকের প্রবৃদ্ধির ছবি

খাত	পাঁচ-বছরের গড়				দশকের গড়	
	৮০/৮১থেকে ৮৪/৮৫	৮৫/৮৬থেকে ৮৮/৮৯	৯০/৯১ থেকে ৯৪/৯৫	৯৫/৯৬থেকে ৯৯/২০০০	৮০র দশক	৯০এর দশক
জিডিপি	৩.৭২	৩.৭৪	৪.৪	৫.২১	৩.৭৩	৪.৮১
জনসংখ্যা	২.১৩	২.১৯	১.৯৮	১.৬	২.১৬	১.৭৯
মাথাপিছু জিডিপি	১.৫৯	১.৫৫	২.৪১	৩.৬১	১.৫১	৩.০১

জিডিপি- একটি দেশের অভ্যন্তরে এক বৎসরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য

উৎসঃ BBS cited from Osmani SR. *The impact of globalization on poverty in Bangladesh*. Policy Integration Department, National Policy Group, International Labour Office. Geneva. 2005.

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই প্রথম আমরা সম্পূর্ণ নতুন দুটি বহির্মুখী খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাই, একটি হল তৈরি পোশাক খাত অন্যটি শ্রম রপ্তানি খাত। সেই আশির দশকের প্রথম দিকে যাত্রা শুরু করলেও এই সময়ে এসে তারা দুটি নির্ধারণী খাত হিসাবে আবির্ভূত হয়।

এই তিনটি নতুন উপাদানই নব্বই এর দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে একটি নতুন গতি প্রদান করে তাতে সন্দেহ নেই। মধ্য আশিতে যাত্রা শুরু করে মধ্য নব্বই এর মধ্যেই তৈরি পোশাক বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতের মূল্য সংযোজনে ২০% থেকে ২৫% এবং শ্রম নিয়োগে ৪০% থেকে ৫০% অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৮৩/৮৪ সালে যেখানে দেশের মোট রপ্তানির মাত্র ৪% আসে তৈরি পোশাক থেকে ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫% এ। একই ভাবে রেমিট্যান্স খাত মধ্য আশিতে হাঁটি হাঁটি যাত্রা শুরু করে ৯০ এর শেষদিকে এসে মোট রপ্তানী আয়ে প্রায় ৩০% অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কৃষির কথাতো আগেই বলা হয়েছে।

আমরা আগে দেখেছি, প্রবৃদ্ধি মানেই "চুঁইয়ে পড়া" নয়; প্রবৃদ্ধি মানেই দারিদ্র্য বিমোচন নয়। তাই বর্তমান ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত প্রবৃদ্ধি কী ভাবে দারিদ্র্যাবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখল তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ব্যাখ্যাটি এরকমঃ

একদিকে তৈরি পোশাক ও শ্রম রপ্তানী(রেমিট্যান্স) গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাড়তি আয়ের একটি প্রবল জোয়ার বয়ে আনে- রেমিট্যান্সের অর্থের প্রায় সম্পূর্ণটাই এবং তৈরি পোশাকে মজুরির বৃহৎ অংশ গ্রামমুখী (তবে দরিদ্রমুখী নয়)- তার সাথে কৃষির প্রবৃদ্ধি যুক্ত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অকৃষি দ্রব্য ও সেবার (যার বৃহৎ অংশ বিনিময় বহির্ভূত বা non-tradable items) চাহিদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে গ্রামে শ্রমের চাহিদা এবং তার সাথে মজুরি হার বৃদ্ধি পায়। তার সাথে কৃষি প্রবৃদ্ধিতেও মৎস, পোলট্রি,দুগ্ধ, ফল-বাগান প্রভৃতি উচ্চ মূল্য-সংযোজনকারী উপখাত যুক্ত হয়ে শ্রমের চাহিদা ও মজুরি উভয়েতেই পুঞ্জীভূত চাপ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি, একদিকে অকৃষি দব্যের চাহিদা বৃদ্ধি অন্য দিকে রেমিট্যান্স পুঁজির যোগান গ্রামীণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। মজুরি বৃদ্ধিতে এই উপাদানটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০০ সালের "খানা ব্যয় জরিপের (Household Expenditure Survey) বরাত দিয়ে New York Times পত্রিকার প্রতিবেদনে তাই লেখা হয়, "..... *Analysis of the 'Household Expenditure Survey of 2000' shows that salaried employment in the rural non-farm sector was much more rewarding for the poor than any other mode of employment*". The New York Times. Garment Factories, Changing Women's Roles in Poor Countries. USA, 2010.

উপরে বর্ণিত প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য বিমোচনের মিথস্ক্রিয়াটি নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়ঃ

• কৃষি প্রবৃদ্ধি • তৈরি পোশাক রপ্তানিতে উল্লম্ফন • রেমিট্যান্স বিপ্লব সম্মিলিত ফলঃ গ্রামীণ অকৃষি দ্রব্য ও সেবার (Non-Tradables) উচ্চ চাহিদা	→	• গ্রামীণ নিয়োগ বৃদ্ধি • গ্রামীণ নিয়োগ কাঠামোর পরিবর্তন • গ্রামীণ মজুরি বৃদ্ধি	→	বর্ধিত নিয়োগ সুবিধা এবং উচ্চ মজুরির কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ফলাফল

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য বিমোচন যোগসূত্রটি যতটা সরল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আদৌ ততটা সরল নয়, বরং আরো অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক উপাদানের জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফল।

যেমনটি পূর্বের পরিচ্ছদে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি আমদানি সহজীকরণ, রপ্তানী উৎসাহ প্রদান (সাবসিডি) প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট ব্যবসা বান্ধব পরিবেশের (বিশ্ব ব্যাংকের অবদান এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নেই), ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির মধ্যেও প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশী শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারী শিক্ষার প্রসারে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বৃত্তি প্রদান সহ নানাবিধ পদক্ষেপ (এরশাদ আমলে যার সুচনা), শিশু মৃত্যু হার, মোট জন্ম হার, প্রাইমারি স্কুল ভর্তি,ইত্যাদি বেশ কিছু সামাজিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন ইত্যাদি মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যে একটি উন্নয়ন বান্ধব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার সাথে বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য চিন্তার গুণগত পরিবর্তন মিলিয়ে দেশে এই প্রথম একটি ইতিবাচক পরিবেশের উদ্ভব ঘটে।

বহিস্থ দৈবযোগের ভূমিকাঃ ঠিক এই সময়েই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যায় এমন কয়েকটি ঘটনা যা বিশ্বব্যাংক বা বাংলাদেশ কারোরই নিয়ন্ত্রণে ছিল না বা ইচ্ছায় ঘটেনি, অথচ যেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় তৈরি পোশাক ও রেমিটেন্স খাতের ঐতিহাসিক উল্লম্ফনের প্রধানতম শক্তি। অর্থনীতি সহ অন্যান্য শাস্ত্রে এ ধরনের শক্তি বহিস্থ উপাদান (exogenous factor) হিসাবে পরিচিত। তৈরি পোশাকে এই বহিস্থ উপাদানটি হল যুক্তরাষ্ট্রের Multi-Fibre Agreement (MFA) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের Generalized System of Preferences (GSP) যা বাংলাদেশকে সস্তা নারী শ্রমের উপর ভর করে এই দুই বাজারেই প্রতিযোগিতা সুবিধা পেতে সাহায্য করে। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে বহিস্থ উপাদান হিসাবে কাজ করে মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো-ডলারের উপর ভর করে গড়ে উঠা বিশাল শ্রম বাজার। এ ক্ষেত্রে দেশের বিশাল উদ্বৃত্ত অদক্ষ শ্রম বাজার সস্তা শ্রম সরবরাহের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে জায়গা করে নেয়। ধর্মীয় পরিচয়ও কিছুটা সুবিধা পেতে সাহায্য করে। অতএব ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে বহিস্থঃ দৈবযোগকে (chance factor) অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই (G I S Olivieri, 2014)

৮। সহস্রাব্দের পথে যাত্রাঃ কাঁধে প্রাপ্তি/হতাশার ঝুলি

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতি নতুন সহস্রাব্দেও বজায় থাকার কারণে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কম-বেশি আগের নীতি কৌশলের ধারাবাহিকতাই বজায় থাকে। তবে নতুন সহস্রাব্দে যে নতুন উপাদানটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচিতে যুক্ত হয়েছে তা হল Poverty Reduction Strategy Papers বা PRSP; বাংলায় বলা যেতে পারে,"দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল পত্র"। কৌশল পত্র নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে মোটা দাগে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের চিত্রটি তুলে ধরা প্রয়োজন।

২০০০ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের চিত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ

২০০০ সালের ৪৮.৯% থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ২৪.৪% পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ২৪.৫ শতাংশে পৌঁছায়। অর্থাৎ, বাৎসরিক হ্রাসের হার ছিল ১.৫২৫% পয়েন্ট। ৯০ এর দশকের ০.৮১% এর সাথে তুলনা করলে এই হার অবশ্যই প্রসংশনীয়। চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকে হ্রাসের হার যেখানে ছিল ০.৬৭% পয়েন্ট নতুন শতাব্দীতে তা উন্নীত হয় ০.৭৫৬% পয়েন্টে। (টীকা ১১)

বাংলাদেশে দারিদ্র্যহার হ্রাসের চিত্র (১৯৯০-২০১৬)

সাল	১৯৯০**	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	বাৎসরিক হ্রাস ২০০০,১৬ (% পয়েন্ট)
দারিদ্র্যহার (%)	৫৭	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	২৪.৫	১.৫২৫ (৩.১২%)
চরম দারিদ্র্যহার (%)	৪১	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১৩.০	০.৭৫৬

সূত্রঃ Bangladesh Poverty Assessment, World Bank Group, 2019. ** 1990 data from Shahidur R. Khandker, Hussain A. Samad, Bangladesh's Achievement in Poverty Reduction: The Role of Microfinance Revisited in Yasuyuki Sawada • Minhaj Mahmud Naohiro Kitano Editors Economic and Social Development of Bangladesh Miracle and Challenges

শুধু যে সংখ্যার অনুপাতেই দারিদ্র্যহার হ্রাস পেয়েছে তা নয়, গভীরতা এবং তীব্রতার দিক থেকেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের তীব্রতা ও গভীরতা

	দারিদ্র্য			
	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
গভীরতা (%)	১২.৮	৯.০	৬.৫	৫.০
তীব্রতা (%)	৪.৬	২.৯	২.০	১.৬
	চরম দারিদ্র্য			
গভীরতা (%)	৭.৫	৪.৭	৩.১	২.৩
তীব্রতা (%)	২.৪	১.৩	০.৮	০.৬

সূত্রঃ Bangladesh Poverty Assessment, World Bank Group, 2019.

গড়ে একটা দেশ শূন্য দারিদ্র্যাবস্থা (বা দারিদ্র্য রেখা) থেকে কতটা নিচে অবস্থান করছে সে সম্বন্ধে ধারণা দেয় দারিদ্র্য-গভীরতা বা ইংরেজিতে Poverty Depth। যেমন, একজন দরিদ্র লোকের আয় যদি দারিদ্র্য রেখা আয়ের ১০% কম হয়, আর অন্য একজনের ক্ষেত্রে যদি তা ৩০% কম হয় তাহলে দুজনেই দরিদ্র হিসাবে পরিচিত হলেও শেষোক্ত জনের অবস্থান অনেক নিচে বা গভীরে। তাকে দারিদ্র্যাবস্থা থেকে তুলে আনতে তার আয় প্রথম জনের চেয়ে ২০% পয়েন্ট বেশি

বাড়াতে হবে। সাধারণতঃ শতকরা হিসাবে ০ থেকে ১০০ বা অনুপাত হিসাবে ০ থেকে ১ দিয়ে এই গভীরতা পরিমাপ করা হয়। যদি কোন দেশে গভীরতা শূন্যের কাছাকাছি হয় তার অর্থ হল মানুষ দরিদ্র হলেও গড়পড়তা হিসাবে তারা একেবারে হত দরিদ্র নয়। আয়ের অল্প বৃদ্ধিতে অথবা একটু অনুকূল পূনর্বণ্টনের মাধ্যমেই একটা বড় সংখ্যার দরিদ্রকে উপরে উঠিয়ে আনা সম্ভব। দুটি দেশের দারিদ্র্য অনুপাত সমান হলেও যার গভীরতা কম তার অবস্থা অন্যটির তুলনায় ভাল। দারিদ্র্যের তীব্রতা বা Severity থেকে ধারণা করা যায় কোন দেশের দরিদ্রদের মধ্যে একেবারে তলানিতে থাকা মানুষের সংখ্যা কেমন। এই পরিমাপটি যদি সময়ের সাথে কমে আসে তাহলে বুঝতে হবে একেবারে তলানির মানুষগুলির আয় আনুপাতিক হারে বেশি বেড়েছে, যদিও তারা এখনো দারিদ্র্যরেখার নিচেই আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দারিদ্র্যের গভীরতার বর্গ করলে দারিদ্র্যের তীব্রতা পাওয়া যায়। তাই হিসাবের পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে দারিদ্র্যের তীব্রতাকে বর্গকৃত দারিদ্র্য-গভীরতা বা squared poverty Gap ও বলা হয়ে থাকে। উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, আলোচিত সময়ের মধ্যে এই দুটি নির্দেশকই ধারাবাহিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। যার অর্থ হল, এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের শুধু পরিমানগত নয়, গুণগত ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বিগত শতকের বর্ণিত বহিস্থ এবং অন্তস্থ অনুকূল পরিস্থিতির ধারাবাহিকতাই যে নতুন শতাব্দীতে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তা আগেই বলা হয়েছে। যেমন, কয়েকটি গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য সময়কালে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের শতকরা ৬০ ভাগ এসেছে গ্রামীণ কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত সেক্টরের আয় থেকে আর এই আয় আসে মূলতঃ মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে। তাই, নতুন শতকেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিকে কাঠামোগত দিক থেকে আমরা মোটা দাগে দারিদ্র্য বান্ধব আখ্যায়িত করতে পারি (Gabriela Inchauste Sergio Olivieri, 2014)। তবে,আমরা যদি প্রারম্ভিক দশকের প্রথমার্ধের সাথে শেষার্ধের তুলনা করি তাহলে দেখা যায়, ২০০০-২০০৫ সময়ে মজুরি বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল নিয়োগের ক্ষেত্র বহুমুখীকরণ (employment diversification)। এ সময়ে অকৃষি খাতে উচ্চতর মজুরির কারণে নিয়োগ কৃষি খামার থেকে চলে যায় অকৃষি (গ্রামীণ শিল্প) খাতে। ফলে অকৃষি নিয়োগ থেকে আসে কৃষি নিয়োগের প্রায় দ্বিগুন আয়। অন্যদিকে ২০০৫-২০১০ সময়ে আয় বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল কৃষি শ্রমের

মজুরি বৃদ্ধি, যার কারণ ছিল মুলতঃ কৃষি পণ্যের দাম বৃদ্ধি (উৎপাদনশীলতার তুলনায়)। অর্থাৎ এই সময়ে কৃষি মজুরি বৃদ্ধির অনেকটাই ছিল ক্ষণস্থায়ী ধরনের; কারণ কৃষি পণ্যের দামের উঠানামা সর্বজন বিদিত। তবে বিশেষজ্ঞগণ আরো কিছু কাঠামোগত উপাদান চিহ্নিত করেন, যা গড় মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে মর্মে আভাষ পাওয়া যায়। যেমন, দশকের প্রথমার্ধে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে নিরক্ষর শ্রমিকের অংশ হ্রাস এবং প্রাইমারি/জুনিয়র পাশ শ্রমিকের অংশ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কৃষি থেকে শিল্প ও সেবায় নিয়োগ স্থানান্তরের ফলে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ও স্ব-নিয়োগের তুলনায় মাসিক বেতন ভিত্তিক নিয়োগের ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। এই কাঠামোগত পরিবর্তন পরিবারের আয় প্রবাহে কিছুটা স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে মনে করা হয়।

আগের মত নতুন সহস্রাব্দেও বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসে জনমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যেমন, জন্মহার হ্রাসের ফলে পরিবারের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, যার ফলে পরিবারের একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় (বিশ্বব্যাংক, ২০১২)।

পরিবারের নির্ভরশীল- উপার্জনক্ষম অনুপাত

	১৯৯১-৯২	২০০০	২০০৫	২০১০
পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা	৫.৭	৫.২	৪.৯	৪.৫
পরিবারের গড় উপার্জনক্ষম সদস্য	১.৩৮	১.৪৫	১.৪০	১.৩১
উপার্জনক্ষম প্রতি নির্ভরশীল সংখ্যা	৩.৯১	৩.৫৯	৩.৫০	৩.৪৩

Sources: HIES survey report 1995-96, 2000, 2005. Poverty Assessment 2008, 2003,1998; Bangladesh Microfinance Statistics 2009, Welfare Monitoring Survey, 2009.

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে দেশে পরিবারের আকার গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ক্রমাগত ভাবেই হ্রাস পেয়ে চলেছে। গড় উপার্জনক্ষম সদস্য সংখ্যা ২০০০ সাল থেকে কমে আসলেও তাদের বোঝা বৃদ্ধি পায়নি। পরিবারের আকার দ্রুততর হারে হ্রাস পাওয়ার কারণে তাদের উপর নির্ভরশীলের সংখ্যাও কমে এসেছে। ফলে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যহার হ্রাস পেয়েছে (১০)।

নতুন শতাব্দীতে এই অর্জন প্রসংশনীয় হলেও আর একটু নিবিড় বিশ্লেষণে দারিদ্র্য বিমোচনের বেশ কিছু দুর্বলতা বা অপূর্ণতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ক) হ্রাসের গতিতে মন্দন - এখনো দেশের প্রায় একচতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তার অর্ধেকই আবার চরম দরিদ্র। যদিও অল্প আগেই বলা হয়েছে যে পরিমাণগত এবং গুণগত উভয়দিক থেকেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে তার পরেও যে আরো অনেকখানি পথ হাঁটা বাকী রয়েছে এই চিত্রটি তাই মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, সামনের পথ যে পিছনের তুলনায় অনেকটাই দুর্গম তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় এই চিত্র থেকে। যেমন, দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাসের হার মন্থরের আভাস পাওয়া যায়।

১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গড় বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল ০.৮১% পয়েন্ট আর চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে তা ছিলো ০.৬৭% পয়েন্ট। ২০০০/২০০৫ (বিএনপি আমল) সময়ের মধ্যে এই হার বেড়ে হয় যথাক্রমে ১.৭৮% ও ১.৮৪%। অর্থাৎ ৯০ এর দশকে দারিদ্র্য হ্রাসে যে ইতিবাচক প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল তা আরো গতিশীলতা পায় নতুন শতাব্দীতে এসে। চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে তো বিষয়টি আরো চমকপ্রদ। ৯০ এর দশকে যেখানে তার হ্রাস হার ছিল সাধারণ দারিদ্র্যের ০.১৪% পয়েন্ট নিচে নতুন শতকে তা সাধারণ দারিদ্র্য হ্রাস হারকে ছাড়িয়ে যায় ০.০৬%পয়েন্ট (উভয় হারই ছিল উর্ধমূখী) কিন্তু তার পর থেকেই দুটি হারই ক্রমাগত ভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এই হ্রাসের ক্ষেত্রেও চরম দারিদ্র্য সাধারণ দারিদ্র্যকে ছাড়িয়ে যায় ধারাবাহিক ভাবে। অথচ এই সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

সময়কাল	১৯৯০-২০০০	২০০০-২০০৫	২০০৫-২০১০	২০১০-২০১৬	২০০০-২০১৬
বার্ষিক দারিদ্র্য হ্রাসের হার (%)	০.৮১	১.৭৮	১.৭০	১.১৭	১.৫২৫
বার্ষিক চরম দারিদ্র্য হ্রাসের হার (%)	০.৬৭	১.৮৪	১.৫০	০.৭৭	০.৭৫৬

এই হ্রাস মন্দনের বিষয়টি যদি আর একটু ভিতর থেকে দেখি তাহলে দেখব, শহর ও গ্রাম উভয় সেক্টরেই এবং সাধারণ এবং চরম উভয় ক্যাটাগরিতেই তা দৃশ্যমান। অর্থাৎ, সমগ্র অর্থনীতিতেই একটি নেতিবাচক শক্তি ক্রিয়াশীল যা দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচিগুলিকে ক্রমাগতই ভোঁতা করে দিচ্ছে।

নিম্নের সারণিটি দেখুন

বাংলাদেশে গ্রামীণ এবং শহুরে দারিদ্র্য হ্রাসের চিত্র (২০০০-২০১৬)

সাল	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
গ্রামীণ সাধারণ দারিদ্র্য (%)	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	২৬.৭
		(-১.৭)*	(১.৭২)	(-১.৪)
গ্রামীণ চরম দারিদ্র্য (%)	৩৭.৯	২৮.৬	২১.১	১৫.৫
		(-১.৮৬)	(১.৫)	(-.৯৩)
শহুরে সাধারণ দারিদ্র্য (%)	৩৫.১	২৮.৪	২১.৩	১৯.৩
		(-১.৩৪)	(-১.৪২)	(-০.৩৩)
শহুরে চরম দারিদ্র্য (%)	১৯.৯	১৪.৬(-১.০৬)	৭.৭ (-১.৩৮)	৮.০(+০.০৫)

সূত্রঃ Bangladesh Poverty Assessment, World Bank Group

- বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলি মধ্যবর্তী সময়ে বাৎসরিক হ্রাসের হার নির্দেশ করে। লক্ষ্যণীয় যে শহুরে চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ২০১০ সালের পর এই হার ধনাত্মক, অর্থাৎ এই সময়ে শহুরে চরম দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামীণ এবং শহুরে সাধারণ দারিদ্র্যের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই চরম দারিদ্র্য হ্রাসের হার দ্রুততর গতিতে কমে আসছে।

খ) সমস্যায় নতুন ক্ষেত্র-শহুরে দারিদ্র্য - বাংলাদেশের প্রথম দিকে শহুরে দারিদ্র্য ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও সময়ের সাথে সাথে তা সরকার, বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন-সহযোগীদের মনযোগ কাড়তে সমর্থ হয়। এর প্রধান কারণ হল দুটি। একদিকে, ৮০র দশকে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উপজেলা কেন্দ্রগুলিকে শহরের মর্যাদা দানের ফলে শহুরে জনসংখ্যার হঠাৎ উল্লম্ফন ঘটে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে, স্বাধীনতার প্রথম দিককার অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝা- বিক্ষোভ এবং ৮০র দশকে দারিদ্র্যাবস্থার অবনতির কারণে শহরমুখী অভিগমনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (এ ধরনের জন-বিচ্যুতিকে অর্থনীতিবিদগণ ধাক্কাজনিত অভিগমন নাম দিয়ে থাকেন)। আগের শহরায়নের সাথে এই শেষোক্ত শহরগমনের পার্থক্য এই যে মূলতঃ

ছিন্নমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠী শুধু মাত্র টিকে থাকার অন্বেষণে এই সময়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। ফলে আগে যদি ধনী গরীব সকলেই সরকারি ভাবে শহুরে হয়ে উঠে থাকে, এখন শুধুই গরীবরাই (বা মূলতঃ গরীব) শহরে এসে ভীড় জমায়; আগারগাঁও বস্তি, কড়াইল বস্তি, রেল লাইন জুড়ে বস্তির মত নতুন নতুন ছিন্নমূল কেন্দ্র গড়ে উঠে। ৯০এর দশক থেকেই এই পরিবর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ২০০০ এর পরেই শহুরে দারিদ্র্যের গতিধারাটি (dynamics) স্পষ্ট হতে শুরু করে। শহুরে দারিদ্র্য এখন দারিদ্র্য সমস্যার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায়। বিশেষ করে চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে শহুরে দারিদ্র্যই এখন একনম্বর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ) দারিদ্র্য রেখার উপরে কিন্তু বিপদসীমার ভিতরে - দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলে আনা যেমন একটি প্রধান লক্ষ্য, তেমনি আর একটি প্রধান লক্ষ্য হল এই মানুষগুলিকে দারিদ্র্য রেখা থেকে একটি নিরাপদ দূরত্বে ধরে রাখা, যাতে অভ্যন্তরীণ কিংবা বহিস্থ কোন প্রতিকূল ঘটনাই তাদেরকে পুনরায় দারিদ্র্য রেখার নিচে নামিয়ে আনতে না পারে। শুধুমাত্র দারিদ্র্য রেখার উপরে তুলে আনা যদি হয় দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমানগত বা সংখ্যাগত দিক, তাহলে তাদেরকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসা হল তার গুণগত দিক। পরিমানগত দিকের বর্তমান মন্দন দশার পাশাপাশি গুণগত দিকটিতেও যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা আমাদের দারিদ্র্য নিরসন কর্মকান্ডের আর একটি দুর্বল দিক।

উদাহরণ স্বরূপ, ২০০০ সালে দেশে দারিদ্র্য হার যখন প্রায় ৪৯% তখন, বলা যেতে পারে আরও প্রায় ৩৯-৪০% মানুষ তাদের ঘাড়ের কাছে দারিদ্র্যের উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করছিল। বাকী মাত্র ১১/১২% মানুষ ছিল মোটামুটি স্থায়ী ভাবে দারিদ্র্যমুক্ত। সময়ের সাথে সাথে যে হারে মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসল সে হারে কিন্তু বিপদসীমার উপরে উঠে আসতে পারলো না, ফলে এই অরক্ষিত (vulnerable) অংশটিই এখন বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। ২০০০ সালের ৩৯-৪০% থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছিল ৫৮/৫৯% এ (World Bank, 2019)। নিম্নের সারণিটি দেখা যেতে পারে।

সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের দারিদ্র্যাবস্থার অভ্যন্তরীণ চিত্র

সাল	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
দারিদ্র্য হার (%)	৪৯/৪৯	৩৫/৪০	২৭/৩১	১৯/২৪
অরক্ষিত (vulnerable) %	৩৯	৪৭	৫০	৫৯
বিপদ সীমার আওতায় (দরিদ্র+অরক্ষিত) %	৮৮/৮৮	৮২/৮৭	৮০/৮১	৭৮/৮৩
মধ্যবিত্ত ও তদুর্ধ %	১২/১২	১৮/১৩	২০/১৯	২২/১৭

উৎসঃ Bangladesh Poverty Assessment, World Bank Group, 2019, p.23 - বিঃদ্রঃ- উল্লেখিত উৎসের বার-গ্রাফ থেকে অনুমানের ভিত্তিতে গৃহীত, ফলে দৃষ্টিগত ত্রুটি থাকতে পারে, তবে তা উপেক্ষনীয়।

নতুন শতকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির চমকপ্রদ সব পরিসংখ্যানের বিপরীতে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণগত এবং গুণগত এই নেতিবাচক প্রবণতা আমাদের প্রচলিত উন্নয়ন মডেল সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। তার মধ্যে বিশেষজ্ঞ মহলে সবচেয়ে উচ্চারিত প্রশ্নটি হল, তাহলে কি আমাদের এত "বিশ্ব নন্দিত" উন্নয়নের রোল মডেলটি এখন আর আগের মত দরিদ্র বান্ধব নয়?

ঘ) জিডিপির দারিদ্র্য হ্রাস ক্ষমতার অবনতি - উপরের প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে দারিদ্র্য হ্রাসের জিডিপি-স্থিতিস্থাপকতা (GDP Elasticity of Poverty Reduction) কী বলে।

এক শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির ফলে যত শতাংশ পয়েন্ট দারিদ্র্য হ্রাস পায় তাকে বলা হয় দারিদ্র্য হ্রাসের জিডিপি স্থিতিস্থাপকতা। বাংলাদেশে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে গড়ে এই স্থিতিস্থাপকতা ছিল ১.১ এর মত, যা ২০০৫- ২০১০ সময়ের মধ্যে কমে আসে ০.৮৮ শতাংশে; ২০১০-১৬ সময়ে মধ্যে তা আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ০.৭৩ শতাংশে। চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে এই পতনটি আরো চোখে পড়ার মত। ২০১০ সালের ১.২৪% থেকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে তা হয় ০.৮৬% (World Bank Group, 2019, p-14) (টীকা ১২)। তাই বলা যায়, আমাদের প্রবৃদ্ধি আগে যে হারে দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারত এখন তা পারছে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমাদের এত উন্নতি এত প্রবৃদ্ধি কার ভোগে লাগছে?

ঙ) প্রবৃদ্ধির সুফলের বৃহদাংশ যাচ্ছে ধনী ও অতি-ধনীদের ঘরে - এই প্রশ্নের উত্তরটি লুকিয়ে আছে নিম্নের সারণিটিতে।

বাংলাদেশে স্তর (কোয়ান্টাইল) ভিত্তিক আয় বন্টনের (শতাংশ হিসাবে) চিত্র

কোয়ান্টাইল / সাল	১ম (দরিদ্রতম ২০%)	২য়	১ম+২য় (দরিদ্রতম ৪০%)	৩য়	৪র্থ	৫ম (ধনীতম ২০%)	ধনীতম (১০%)
১৯৭৩-৭৪	৭.০০	১১.৩০	১৮.৩০	–	–	৪৪.৪০	২৮.৪০
১৯৯১-৯২	৬.৫২	১০.৮৯	১৭.৪১	–	–	৪৪.৯৬*	২৯.৩২
১৯৯৫-৯৬	৫.৭১	৯.৮৩	১৫.৫৪	–	–	৫০.০৮	৩৪.৬৮
২০০০	৬.১৫	৬.৬৮	১২.৮৩	–	–	৫২.০১*	৩৮.০১
২০১০	৫.২২	৯.১০	১৪.৩২	–	–	৫১.৭৯*	৩৫.৮৫
২০১৬	৫.১২	৮.৯০	১৪.০২	–	–	৫০.৪৩	৩৪.৬৭
১৯৭৩-২০১০ সময়ে পরিবর্তন (শতাংশ পয়েন্ট)	-১.৭৮	-২.২০	-৩.৯৮	–	–	৭.৩৮	৭.৪৫
১৯৭৩-২০১০ সময়ে পরিবর্তন (মূলের শতাংশ হিসাবে)	-২৫.৪%					১৬.৬%	২৬.০%
৯১/৯২থেকে ২০০০	-৫.৭%					১৫.৭%	২৯.৯৪
২০০০ থেকে ২০১০	-১৫.১%					-০.৪২	

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৩।

দেশের মানুষকে আয়ের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে ৫টি সমান ভাগে ভাগ করলে এক একটি ভাগকে এক একটি কোয়ান্টাইল বলা হয়। এক এক কোয়ান্টাইলে থাকে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ মানুষ (একই ভাবে ১০টি ভাগ করলে প্রতিটি ভাগকে বলা হয় ডেসাইল। এক ডেসাইলে থাকবে মোট জনসংখ্যার ১০%)। প্রদত্ত সারণিটিতে দেখান হয়েছে বিভিন্ন সময়ে কোন কোয়ান্টাইলটি জিডিপির কত শতাংশ সম্পদের মালিক হতে পেরেছিল। যেমন, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১ম কোয়ান্টাইল, অর্থাৎ দরিদ্রতম ২০% মানুষের আয় ছিল সমগ্র জিডিপির ৭ শতাংশ। এই অংশ ক্রমাগত কমতে কমতে ২০১০ সালে নেমে আসে ৫.২২ শতাংশে। যার অর্থ হল, আমাদের জিডিপি বাড়লেও তাতে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর (যাদের একটা বড় অংশ চরম দরিদ্র) হিস্যা কমে গেছে। তাদের সাথে যদি যোগ করি ২য় কোয়ান্টাইল, অর্থাৎ আর একটু কম দরিদ্র ২০%, তাহলে সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (মোট জনসংখ্যার ৪০%) হিস্যা ১৮.৩০% থেকে কমে নেমে গেছে ১৪.৩২% এ। অন্যদিকে ৫ম কোয়ান্টাইল, অর্থাৎ ধনীতম ২০% এর হিস্যা ৪৪.৪% থেকে বেড়ে হয়েছে ৫১.৭৯

শতাংশ। অর্থাৎ বর্ধিত জিডিপির একটা বড় অংশই চলে গেছে ধনী জনগোষ্ঠীর হাতে। আরো একটু বিশদ ভাবে দেখার জন্য আমরা যদি ধনীতম ১০% কে আলাদা করে ডেসাইল হিসাবে দেখাই তাহলে দেখা যায় ধনীতম ১০%, বা যাদেরকে বলা যায় একেবারে চূড়ার মানুষ, তাদের হাতে গিয়েছে জিডিপির ৩৫.৮৫ ভাগ; স্বাধীনতার ঊষালগ্নে এই হিস্যা ছিল শতকরা ২৮.৪০ ভাগ মাত্র।

বাক্স ৩

পিপিপি, বা purchasing power parity (PPP): কোন দেশের জিডিপি বা মাথাপিছু জিডিপি প্রকাশ করা হয় ঐ দেশের মুদ্রার হিসাবে । তবে আন্তর্জাতিক তুলনার জন্য সব দেশের জিডিপিকে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারে কনভার্ট করা হয় (বস্তুত যে কোন দেশের মুদ্রাতেই কনভার্ট করা যায়, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের একচ্ছত্র অবস্থানের কারণে এই তুলনাগুলি ডলারের হিসাবেই করা হয়)। এজন্য ঐ সকল দেশের মুদ্রার সাথে ডলারের বিনিময় হারকে ব্যবহার করা হয়। সকল দেশের জিডিপি ডলারে প্রকাশিত হওয়ায় জিডিপির (বা মাথাপিছু জিডিপির) পরিমাণের ভিত্তিতে দেশগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো যায়। তবে সমস্যা হল, সব দেশে একই ডলার-সমপরিমানের মুদ্রা একই পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা নিশ্চিত করেনা, এই তারতম্য হয় স্ব স্ব দেশের মূল্যস্তরের (অর্থাৎ, নিজ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার) উপর। যেমন, আমাদের দেশে মধ্যম মানের একটা সেলুনে চুল কাটাতে গেলে ১০০ টাকার মত খরচ হয়। এই মানের একটা সেলুনে আমেরিকায় খরচ পড়ে ১৫/২০ ডলার যা আমাদের প্রায় ১২০০/১৬০০ টাকার সমান। একই ভাবে বাসে সমান দূরত্ব ভ্রমণ করতে এখানে যদি লাগে ১০০ টাকা ওখানে হয়তো লাগবে ১০ ডলার বা ৮০০ টাকার মত।আবার এক কেজি সরু চাল আমাদের দেশে এই দুর্মূল্যের বাজারেও ৭০/৮০ টাকার বেশি নয়, কিন্তু আমেরিকায় তা প্রায় ৫ ডলার বা ৪০০ টাকার মত। তাই বলা যায়, দুই ব্যক্তি বাহ্যত সমপরিমান আয় করা সত্ত্বেও ভোগ সম্ভাব্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকার নাগরিকের প্রকৃত আয় বাংলাদেশের নাগরিকের চেয়ে কম। এখন, দুই দেশের আয়কে তুলনীয় করতে হলে ক্রয়ক্ষমতা জনিত এই অসামঞ্জস্যতা দূর করতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশের অনেকগুলি দ্রব্য সেবা এবং সম্পদের দাম নির্ধারণ করতে হবে। মনে করি এই দাম ১০ হাজার টাকা । এখন আমেরিকার বাজারে এই পরিমাণ দ্রব্য, সেবা এবং সেবার ক্রয়মূল্য যদি হয় ২৫০ ডলার, তাহলে পিপিপি হিসাবে ডলার ও টাকার বিনিময় হার হবে ১ আমেরিকান ডলার = ১০,০০০/২৫০= ৪০ বাংলাদেশী টাকা। বাস্তব আন্তর্জাতিক বাজারে ডলার টাকার বিনিময় হার যাই হোকনা কেন পিপিপি হিসাবে তা হবে ১ ডলার = ৪০ টাকা বা ১:৪০। এই হার ধরেই বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপিকে ডলারে প্রকাশ করলে তা হবে মাথাপিছু জিডিপি (ডলার পিপিপি) ।

আমরা জানি আমেরিকার আয়স্তর বাংলাদেশে তুলনায় অনেক উচ্চ, তাই দামস্তরও অনেক উচ্চ। এই কারণেই বাজার বিনিময় হারের তুলনায় পিপিপিতে টাকার মূল্য বেশি হয়। আর এজন্যই পিপিপি ডলারে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় বাজার বিনিময় হারের হিসাব থেকে অনেকটা বেশী। বস্তুত প্রায় সকল কম আয়ের দেশ সম্বন্ধেই এই কথাটি খাটে। অন্যদিকে, উচ্চ আয়স্তরের অনেক দেশে পিপিপি জিডিপি সাধারণ জিডিপির চেয়ে কম হয় (যেখানে দামস্তর আমেরিকান বাজারের চেয়ে বেশী)।

যে দেশে দরিদ্রতম ৪০% মানুষের হাতে যায় জিডিপির মাত্র ১৪.৩২ শতাংশ আর ধনী ১০% এর হাতে যায় ৩৫.৮৫ ভাগ, আর দেশটি যদি হয় মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে পৃথিবীর ১৪৭তম দেশ (এটা ২০২২ সালের হিসাব, যখন আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৮৭৭ ডলার(পিপিপি) (বাক্স ৩) কথিত সময়ে আরো কম ছিল), সেই দেশে ৫-৭% হারে জিডিপি বৃদ্ধির করেও কেন দারিদ্র্য অভীষ্ট হারে কমিয়ে আনা যাচ্ছেনা তা আর বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝানোর দরকার হয় কি? হাঁড়িতে ভাত যখন কম থাকে তখন সমান ভাগ করে খেলেও সবার ভাগে কম পড়ে, আর যদি অল্প কয়েকজন মানুষ সব সাবাড় করে দেয় তখন অভুক্ত আধাভুক্ত মানুষের সংখ্যা তো বড় হবেই। কেবল মাত্র হাঁড়িটাকে যথেষ্ট বড় করলে অথবা ভাগটা একটু সমতার দিকে রাখলেই কেবল অভুক্ত মানুষগুলিকে কিছুটা খাবার দেয়া সম্ভব। তাই বলা যায়, একদিকে প্রবৃদ্ধি আর এক দিকে বন্টন, দুই জায়গাতেই সচেষ্ট না হলে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে আরো অনেক বছর পার করতে হবে। মাঝে দু একবার কভিডের মত কোন বহিস্থ উপাদানের উদ্ভব হলেতো কথাই নেই, মুহূর্তেই দারিদ্র্য রেখার কাছাকাছি মানুষগুলি আবার চলে যেতে পারে দরিদ্রদের দলে।

৯। PRSP - দারিদ্র্য নিরসনের নতুন কৌশলপত্র

এখন দেখা যাক, শতাব্দীর শুরুতে পি আর এস পি নামক যে দারিদ্র্য-নিরসন মডেলটি আমরা বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে লাভ করেছি এই দেড় দশকে, অর্থাৎ উল্লেখিত নেতিবাচক সূচকগুলির আবির্ভাব কালে তার ভূমিকা কী ছিল।

১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক আই এম এফ (ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান) "দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র" (Poverty Reduction Strategy Papers-PRSP) ধারণাটির অবতারণা করে অত্যাধিক ঋণ জর্জরিত দরিদ্র দেশগুলির (Heavily Indebted Poor Countries-HIPC) জন্য। কালক্রমে বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত সকল দেশকেই এর আওতাভুক্ত করা হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ নিজেও তার -IPRSP (Interim) প্রণয়ন করে যার শিরোনাম ছিল "A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development"। এরপর ২০০৫ সালে আসে PRSP, যার শিরোনাম ছিলঃ "Unlocking the Potential: National strategy for Accelerated Poverty Reduction",

লক্ষ্যণীয় যে মূল PRSPতে এসে Growth শব্দটি যে বাদ পড়ে গেছে তা একেবারেই কাকতালীয় নয়। বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য মোচন দর্শনের সাথে প্রবৃদ্ধি অভিধাটি যে ঐতিহাসিক ভাবে "চুঁইয়ে পড়া" তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা থেকে দলিলটিকে আড়াল করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

সে যাই হোক, আমাদের আলোচ্য সময় কালের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে এই PRSP এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। তাই বলা যায়, উপরে উল্লেখিত দুর্বলতাগুলির সাথে (দারিদ্র্য চরম দারিদ্র্য উভয় ক্ষেত্রেই) এর সম্বন্ধ খুঁজতে যাওয়া তাই মোটেই অযৌক্তিক নয়।

সাধারণতঃ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে PRSP'র কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথমতঃ ধারণাগত (conceptual), দ্বিতীয়তঃ স্বত্বগত (ownership question), তৃতীয়তঃ কৌশলগত (strategic question)।

ধারণাগত দিকঃ PRSP এর মাধ্যমে ব্রেটন উডস আনুষ্ঠানিক ভাবে তার দীর্ঘ লালিত "প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চকরণ (*যে কোন প্রকারে*- তাই)" নীতির বিপরীতে "দরিদ্র বান্ধব প্রবৃদ্ধির" নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের PRSP দলিলে তার প্রতিফলন ঘটে এভাবে, "Adoption of a pro-poor growth strategy is thus favoured over "growth maximization" as a means of achieving faster decline of poverty"(GED, 2004, 2.21)। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ব্রেটন উডস তার পূর্বের অবস্থান থেকে খুব একটা বেরিয়ে আসতে পারেনি। যেমন, " ... the content of PRSP is very similar to the previous structural adjustment packages. The neo-liberal policies are still the central elements of PRSP which emphasizes the Breton Woods Institutions' policies of liberalization, privatization, fiscal and administrative reform and asset management" (M. Syeed Ahmed, 2005)

স্বত্বগত দিকঃ স্বত্বগত প্রশ্নটি হল, PRSP দলিলটি কার উদ্যোগ এবং মস্তিষ্ক প্রসূত, এবং এর বাস্তবায়ন ও ফলাফলের দায় কার। ব্রেটন উডস এর ভাষ্য মতে PRSP'র বিশেষত্ব হল, (১) Country driven,অর্থাৎ কোন দেশ সম্পূর্ণ স্বপ্রণোদিত ভাবে, নিজ লোকবল দ্বারা, নিজের চাহিদার ভিত্তিতে PRSP প্রণয়ন করবে (২) PRSP হবে ফলাফল ভিত্তিক (result oriented) এবং বাস্তবায়নের রোডম্যাপ/পরিকল্পনা দ্বারা সমৃদ্ধ (৩) এটি হবে ব্যাপক (comprehensive) অর্থাৎ দারিদ্র্যের বহুমাতৃকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে রচিত (৪) Long-term বা দীর্ঘমেয়াদি, যার অর্থ হল অনেকগুলি সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে রচিত (৫) Based on partnership অর্থাৎ, সরকার, সিভিল সোসাইটি, ব্যক্তি খাত, দাতাগোষ্ঠী ইত্যাদি স্টেক-হোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে এবং তাদের সহযোগিতায় রচিত।

PRSP সম্বন্ধে যে সমালোচনাগুলি বিশেষজ্ঞ মহলে প্রচলিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মালিকানা (ownership) ও স্বপ্রণোদনার বিষয়টি। সেই ১৯৭০ এর দশক থেকেই WB, IMF এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা গ্রহীতা দেশকে বিভিন্ন শর্তের জালে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলে যে সেখানে দেশের নিজস্বতা বলতে কিছু থাকেনা; কেবল মাত্র ঋণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা শর্তগুলি মেনে নেয়, প্রতিপালনের জন্য নয়। আর এই কারণেই দেশে দেশে বিশ্বব্যাংকের ঋণের ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হচ্ছে। তাই PRSP'র বেলায় ব্যাংক মালিকানার বা স্বত্বগত বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন stake holder, যেমন সিভিল সোসাইটি ও খোদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। বলা হল, PRSP'র ক্ষেত্রে ব্যাংক content, অর্থাৎ বিষয়বস্তু নয় বরং process অর্থাৎ প্রক্রিয়াগত বাধ্যবাধকতাকে প্রাধান্য দেবে। অর্থাৎ, দলিলে কী লেখা হবে সে সম্বন্ধে ব্যাংকের কোন খবরদারি নেই, সে শুধু দেখবে সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

বিশ্বব্যাংকের এই নতুন উপলব্ধি ছিল বাস্তবতার দিকে আর এক ধাপ অগ্রগতি। কিন্তু ব্যাংকের লিখিত নীতি যাই থাকুক বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বলে যে PRSP নিশ্চিত ভাবে তাদের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে (টীকা ১৩)।

আসলে PRSP তৈরি এবং ব্যাংক কর্তৃক তার অনুমোদন প্রক্রিয়াটাই এমন যে ব্যাংকের মন যুগিয়ে দলিলটি প্রস্তুত না করে গ্রহীতা দেশটির কোন উপায় থাকে না। গ্রহীতা দেশের প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হত, যদি প্রথমে কোন দেশ বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কোন প্রকার সম্পৃক্ততা ছাড়াই দলিলটি প্রণয়ন করত এবং তারপর ব্যাংকের সাথে তা নিয়ে আলোচনায় বসতো এবং ব্যাংকের বিভিন্ন চাহিদাকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতো (Akash, 2004)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যা হয় তা হল প্রতি ধাপে

ব্যাংকের খবরদারী। ব্যাংক এবং আই এম এফ প্রথমেই দেশের নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের সাথে বসে নতুন কৌশলের একটি রূপরেখা সম্বন্ধে একমত হয় (এবং এখানেই মূলমন্ত্র যা দেবার দিয়ে দেয়া হয়); এই রূপরেখার ভিত্তিতে তৈরি কৌশলপত্র যাবে WB ও IMF এর কার্যকরী বোর্ডে। সেখানে চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হলেই কেবল তা Joint Assessment Report of WB and IMF এ স্থান লাভ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দাতা সংস্থার এক কর্মকর্তার তাই সহজ স্বীকারোক্তি,"Ownership exists when they do what we want them to do, but they do so voluntarily" (Helleiner, 2000).

শুধু তাই নয়, উপরের আনুষ্ঠানিক সুযোগ ছাড়াও অর্থায়নের সাথে কিছু ট্রেডিশনাল শর্ত যোগ করার মত অনানুষ্ঠানিক সুযোগের মাধ্যমেও ব্যাংক তার হস্তক্ষেপের রীতি অব্যাহত রাখে (CPD-2003) (টীকা ১৪)।

মালিকানা-বোধের এই অভাবের কারণে দলিলে যা লেখা হয় তার সব কিছুর প্রতি সরকার কিংবা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের কোন দায় বোধও থাকেনা। এভাবেই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে বিরাট দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

কৌশলগত দিকঃ আমরা যদি PRSP'র মূল কৌশলের দিকে (তৃতীয় দৃষ্টিকোণ) তাকাই তাহলে দেখা যায়, প্রধানত দুটি উপায়ে দারিদ্র্য নিরসনের কথা বলা হয়েছেঃ এক, বিভিন্ন হস্তান্তর প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি কিংবা ব্যয় লাঘব করা; দুই, প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতি একক জিডিপি বৃদ্ধির বিপরীতে অধিকতর সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করা। হস্তান্তর অপেক্ষাকৃত সহজ একটি সরাসরি প্রক্রিয়া, তাই এটি নিয়ে কোন সমস্যা নেই; যতটুকু সম্পদ হস্তান্তরিত হবে ততটুকুই (মোটা দাগে) দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে লাগবে। গণসন্তোষের (Popularism) একটি বড় উৎস হওয়ার কারণে হস্তান্তর সরকারের প্রিয় একটি খাতও বটে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা না থাকলে হস্তান্তরই হত দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে সহজলব্ধ হাতিয়ার।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দ্বিতীয় পন্থাটি, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্র্য বান্ধব করা অনেক বেশি জটিল, তার জন্য দরকার গভীর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, প্রগাঢ় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং গণমুখীনতা (খাত ভিত্তিক শ্রেণি স্বার্থের কারণে) এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য মেধাবী, নিবেদিত এবং সৎ কর্মী বাহিনী, যারা

প্রত্যেকেই এই কর্মসূচিকে নিজের বলে গ্রহণ করবে এবং অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প বাছাই, বাস্তবায়ন, রিপোর্টিং ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মালিকানা-অনুভূতির (ownership) ছাপ থাকবে।

PRSP বাস্তবায়ন কাল এবং তার পরবর্তীতে দারিদ্র্য হ্রাসের জিডিপি স্থিতিস্থাপকতার ক্রমাবনতির যে চিত্র দেখানো হল তা থেকেই অনুমান করা যায় যে PRSP'র তথাকথিত ownership শর্তটি অর্থনীতিতে এই অভীষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা আরও একবার লক্ষ্য করলাম, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অন্যতম সহযোগী এবং একচ্ছত্র পরামর্শদাতা/ নীতি নির্ধারক ব্রেটন উডস নতুন শতকেও তার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হল।

কেন ব্রেটন উডস বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করতে এসে বারবার ব্যর্থ হয়, এই নিবন্ধের বিভিন্ন সময় পর্বে তার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও রচনার শেষ প্রান্তে এসে বিষয়টি আবারো মনে করিয়ে দেয়াটা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

আসলে একটি কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে (মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে) বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিবেশকে নির্বিঘ্ন রাখার অভীষ্টকে সামনে রেখে। পরবর্তীতে, ১৯৫০ এবং ৬০ এর দশকে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রধান কারণও ছিল শিল্পোন্নত বিশ্বের পণ্য-বাজার এবং কাঁচামাল সরবরাহক হিসাবে তাদেরকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা। পুঁজির বহুজাতিক পর্যায়ে এসে শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি আরো অপরিহার্য হয়ে পড়ে, কারণ এখন এই অর্থনীতিগুলি কাঠামোগত ভাবে উন্নত বিশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। একই নব্য-ধ্রুপদী (Neoclassical) কাঠামোয় তাদের বেঁধে রাখা তাই আরো জরুরি হয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যের প্রসঙ্গটি তাই প্রথম থেকেই ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি প্রসঙ্গ। ব্রেটন উডস যে দশকে দশকে, একটু একটু করে দারিদ্র্য সম্বন্ধে বাস্তবমুখী হচ্ছিল, তার প্রধান কারণ হল, অন্যথায় এই দেশগুলির কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছিল। তদুপরি, দারিদ্র্য যে উন্নয়নেরই একটি বাস্তব প্রতিবন্ধক সেই ধারণাটিও তত্ত্বগত ভাবে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। এই বাস্তবতারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ এর দশকের কিছু radical উদ্যোগ (যার সুফল বাংলাদেশও পেয়েছে) এবং PRSP'র মাধ্যমে দারিদ্র্যকেই লক্ষ্যবস্তু করে একবিংশ শতাব্দীতে তার নতুন যাত্রা।

কিন্তু ব্যাংক কখনো ভোলেনি যে তার ঐতিহাসিক (এবং প্রাথমিক) দায়িত্ব হল বিশ্বের বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে খাড়া রাখা, দারিদ্র্য বিমোচন নয়। তাই দারিদ্র্য বিমোচন করতে যেয়েও ব্যাংক তার তথাকথিত ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা

ভুলে যায়নি। যেখানে এই দুই কর্তব্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন এসেছে, সেখানে ব্রেটন উডস নির্ভুল ভাবে তার প্রাথমিক দায়িত্বকেই বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন শর্তের নিগড়ে PRSP-কে বেঁধে ফেলে ব্রেটন উডস আরেকবার এই বাস্তবতাটাই প্রমান করল।

উপসংহার

এই রচনার ভূমিকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করতে যেয়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণের কারণেই বাংলার জনগণের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। বাঙালির যত দুঃখ দুর্দশা দারিদ্র্য সব কিছুর জন্য এই বঞ্চনাকেই তারা দায়ী করে। কালক্রমে এই অনুভূতিই বাঙালি জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করে, সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, পরিণামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটানোই ছিল বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রেরণা। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের আশা ছিল, এবার সব রকমের দুর্দশার অবসান ঘটবে, বিশেষ করে মনুষ্যত্বের চরম অপমান, দারিদ্র্যাবস্থা থেকে বাঙালি মুক্তি পাবে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই মুক্তির প্রতিভু হিসাবে ইতিহাসে স্থান পাবে। এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকে যারা ইতিহাসের দায় বলে গ্রহণ করেছেন "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" ধারণাটি তাদেরই মূল্যবান সম্পদ।

স্বাধীনতার পরপর বঙ্গবন্ধুর সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে কেন্দ্র করে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পরিচালিত করতে চেয়েছিল। তার নির্মম হত্যাকান্ডের পর দারিদ্র্য বিমোচন তার কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে অনেক দূরে ছিটকে চলে যায়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার" পশ্চাদাপসারণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে ব্রেটন উডস এর নেতৃত্বে বহির্মুরুব্বিদের চাপ যুগপৎ ভাবে এই ছিটকে দেবার দায়িত্বটি পালন করে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ তার পঞ্চাশতম বছরে যে অবস্থানে পৌঁছেছে তা একদিকে যেমন গর্বের অন্যদিকে তেমনি লজ্জারও। যারা আমাদেরকে "তলা বিহীন ঝুড়ি" খেতাব দিয়েছিল তারাই আজ আমাদের দেখছে "উন্নয়নের রোল মডেল" হিসাবে। SDG সহ অনেক সামাজিক আর্থিক সূচকে আমরা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছি, এবং সবচেয়ে শ্লাঘার বিষয়, বাংলাদেশ এখন "মধ্যম আয়ের দেশ" হিসাবে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত।

পাশাপাশি, পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসে আমাদের অপ্রাপ্তি এবং অতৃপ্তির পাল্লাও কম ভারী নয়। আমরা এখনো সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারিনি, যা ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। শুধু যে পারিনি তা নয়, সর্বশেষ যে পরিস্থিতি আমরা পর্যবেক্ষণ করছি তাতে কিছুটা নিরাশ হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ এখনো দরিদ্র। প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের ঘাড়ে দারিদ্র্যের উষ্ণ নিঃশ্বাস। আর ঠিক এই সময়ই উন্নয়ন হারিয়ে ফেলছে দারিদ্র্য দূর করার সক্ষমতা; হ্রাস পাচ্ছে সংশ্লিষ্ট স্থিতিস্থাপকতা। এর অন্যতম প্রধান কারণ, আমাদের উন্নয়ন ইদানিং কালে অধিক মাত্রায় ধনী মুখী হচ্ছে; সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে সবচেয়ে ধনী ১০% মানুষের হাতে। অথচ বিশ্বব্যাপী বহু উদাহরণ রয়েছে যে অধিকতর দরিদ্রমুখী বণ্টন উন্নয়নের অন্তরায় নয়। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় দরিদ্রের হাতে আয় না পৌঁছালে (এটারই সূচক হল দারিদ্র্যের জিডিপি স্থিতিস্থাপকতা) শুধুমাত্র কিছু পুনর্বণ্টন কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যকর দরিদ্র বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে দরিদ্রদের পুনর্বাসনের জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ করে বিগত এক দশকে তা ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে, যা সময়োচিত এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু অর্থনীতির মূল স্রোত কৃষি, শিল্প, সেবা খাতকে দারিদ্র্য নিরসনের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় না আনতে পারলে আরো অনেক দিন আমাদেরকে দারিদ্র্যের সাথে সহাবস্থান করতে হবে, যা "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার" সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের (ব্রেটন উডস পরিবারের) সাথে আমদের সম্পর্কটি ঠিক কী হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একদিকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, অন্যদিকে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখেছি, দারিদ্র্য নিরসনের প্রশ্নে তাদের অবস্থান প্রায়ঃশই আমাদের দেশের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। কেবল মাত্র সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমিক একটি গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেই সেই ক্রান্তিকালীন সময়গুলিতে নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকা সম্ভব।

টীকা

১। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপর, ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে যে ভুখা মিছিলটি বের হয় তাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই দুই প্রভাবের সম্মিলিত ফল হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। একদিকে স্বাধীনতার অল্প আগের, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের দগদগে ঘা এবং সাংবাৎসরিক মরা কার্তিক সাধারণ মানুষকে ক্ষুধা থেকে মুক্তির জন্য উদগ্রীব করে তোলে; অন্য দিকে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের শ্রেণি শোষণ বিরোধী ঘোষণা সমূহ নতুন রাষ্ট্রের কাছে তার দাবিকে তীব্রতর করে তোলে। এই দুই শক্তির মিলিত প্রভাবই এই ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে উৎসাহিত করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

২। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৯ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপ শুরু হলেও তা শুধু মাত্র গ্রাম এলাকায়, জনসংখ্যার তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন নমুনা নিয়ে পরিচালিত হয়। তদুপরি, ১৯৬১ সালে তাতে ছেদ পড়ে। ১৯৬৩-৬৪ সালে যখন নতুন করে জরিপ শুরু হয় তখন আগের তুলনায় কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ক) গ্রাম এবং নগর, দুই এলাকাই জরিপের আওতাভুক্ত হয়। খ) নমুনায় গ্রাম-শহরের আপেক্ষিক ভার রক্ষিত হয়। গ) নমুনা সাইজ আগের তুলনায় যথেষ্ট বড় করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ণ জরিপ সম্ভব না হলেও ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর জরিপ কাজ অব্যাহত থাকে, তবে রিপোর্ট প্রকাশ হয় মাত্র দু'টি, শুরুর বছর, অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালে, আর ১৯৬৬-৬৭ সালে। তথ্যের এই নিদারুণ ঘাটতি পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সরকারি উদাসীনতার একটি দিক বললে অত্যুক্তি হবেনা।

৩। স্বীকার করে নেয়া উচিত যে এই মূল্যায়ণটি অনেকটাই লেখকের নিজস্ব; এর সাথে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ রয়ে গেছে। তবে সদস্যদের মধ্যে কারো কারো ছাত্র হিসাবে, সমসাময়িক পত্রিকায় তাদের লেখার সাথে পরিচিতির ফলে এবং পরবর্তী কর্ম জীবনে ঘনিষ্টতার সূত্রে এই টীম সম্বন্ধে লেখকের ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

৪। এ প্রসঙ্গে, স্বাধীনতার পরপরই, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার বাংলাদেশ সফরকালে অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের সাথে বৈঠকটি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি পরিস্থিতি নির্দেশক। প্রফেসর রেহমান সোবহানের বর্ণনা মতে, আলোচনার এক পর্যায়ে ম্যাকনামারার প্রশ্ন ছিল, "বাংলাদেশের জন্য ব্যাংক কী করতে পারে?" এর উত্তরে তাজুদ্দিন আহমদ যা বলেছিলেন তার সুনির্দিষ্ট ভাষা নিয়ে বেশ মতান্তর আছে, তবে তার সুরটি যে

বিশ্বব্যাংক এর জন্য যথেষ্ট অপমানকর ছিল সে সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। (Rehman Sobhan, 1982; পুনরোল্লিখিত Anu Muhammad & others, 1998) এই উত্তরেই ব্যাংক বুঝে গিয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তার যে কমান্ড ছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা আশা করা যায়না। পরে এই ঘটনার অনেক ডালপালা মেলেছিল। অনেকে অনুমান করেন, ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে তাজুদ্দিনের নির্দেশিত ইস্তফা প্রদানের সাথে বিশ্বব্যাংকের বৈরিতা প্রচন্ড চাপ হিসাবে কাজ করেছিল।

৫। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, ১৯৭০ এর দিকেই ব্যাংক উপলব্ধি করে যে শুধু মাত্র প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়, তার জন্য দরিদ্রের হাতে বিশেষ ব্যবস্থায় আয় বা সম্পদ পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু কেবল মাত্র বাজারের মাধ্যমে এ ধরনের পুনর্বণ্টন সম্ভব নয়। বাজারের বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠান, প্রথা, সংস্কার গ্রামাঞ্চলে আয় সৃষ্টি ও বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কার্যকর বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠার পূর্ব পর্যন্ত এই পুনর্বণ্টন কার্যকর থাকতে পারত। কিন্তু এ পর্যায়ে এসেও বিশ্বব্যাংক তার (উন্নত অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে) পরম বাজার আনুগত্যকে ত্যাগ করতে পারলনা। তাই তার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের সুফল দরিদ্রের ঘরে যতটা পৌঁছাতে পারত ততটা পৌঁছালনা।

স্বাভাবিক ভাবে এই ফাঁকাটি পূরণ করাই হতে পারত ব্যাংকের দারিদ্র্য কর্মসূচির পরিবর্তী ধাপ। কিন্তু মাঝখানে কাঠামোগত সমন্বয়ের যাঁতাকলে পড়ে ব্যাংকের এই ইতিবাচক উপলব্ধিটিও উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু থেকে হটে অনেকটা দ্বিতীয় অবস্থানে চলে আসল।

৬। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আলোচনার সময় আমরা দেখতে পাব, কেমন যান্ত্রিক ভাবে, অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাবকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে কিংবা তাকে চরম ভাবে অবদমিত করে সমন্বয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছ; কিংবা কীভাবে কোন কোন বিনিয়োগকে জোর করে দারিদ্র্য নিরোধক কিংবা দরিদ্র বান্ধব তকমা দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

৭। নির্মম সত্য হল, বঙ্গবন্ধুর জীবিতাবস্থায়ই চরম ক্রাইসিস মোকাবেলার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশ্চাদাপসরণ ঘটেছিল, তবে তা মৌলিক নীতির বিষয়ে নয়।

৮। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, নজরুল ইসলাম ১৯৮৭, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা।

৯। কোন পরিবারে যদি ৪ জন কর্মক্ষম সদস্য থাকে এবং ঐ পরিবারের যা জমি আছে তা যদি ৩ জন সদস্যকে পূর্ণ মাত্রায় নিয়োগ করতে পারে, তাহলে ৪র্থ ব্যক্তি

ঐ পারিবারিক জমিতে নিয়োজিত হলেও আসলে সে কার্যকর অর্থে বেকার। কারণ, তার নিয়োগের কারণে ঐ জমি থেকে বাড়তি কোন ফসল বা আয় আসবেনা। এই ধরনের বেকারত্বকেই ছদ্ম বেকারত্ব বলা হয়।

১০। (রেহমান সোবহান, এ আর খান, কেইথ গ্রিফিন, নজরুল ইসলাম, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বিনায়ক সেন, এম এম আকাশ, এঁদের মধ্যে অন্যতম)।

১১। শতাংশ পয়েন্ট এবং শতাংশ এই শব্দদ্বয় এক রকম মনে হলেও তা ব্যবহারগত দিক থেকে আসলে সমার্থক নয়। যেমন, একটি গ্রামে ১০০ জন যুবক আছে যাদের মধ্যে ৫০ জনই বেকার। অতএব ঐ গ্রামে যুব-বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশ বা ৫০%। কিছুদিন বাদে যদি আরো ৫ জন বেকার হয়ে পড়ে তা হলে ঐ গ্রামে বেকারত্বের হার দাঁড়াবে ৫৫ শতাংশ বা ৫৫%। অর্থাৎ, ১০০ জনের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেল ৫ শতাংশ পয়েন্ট। কিন্তু কেউ যদি জানতে চায় ঐ গ্রামে বেকারত্ব বৃদ্ধির হার কত তা হলে হিসাবটা হবে (৫৫-৫০)/(৫০) x ১০০=১০% বা দশ শতাংশ (শতাংশ পয়েন্ট নয়)।

১২। স্থিতিস্থাপকতা পরিসংখ্যানগুলি উপরের উৎসের Figure E6 (implied growth-poverty elasticities, 2000-2016) এর গ্রাফ থেকে আনুমানিক ভাবে নেয়া হয়েছে, তাই শুদ্ধতার ব্যাপারে যৎসামান্য ঘাটতি থাকতে পারে। তবে তা আমাদের সিদ্ধান্তে কোন বড় ধরনের হেরফের ঘটাবে না।

১৩। PRSP যে শেষ বিচারে ব্যাংকের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে নিম্নের উদ্বৃতিগুলিই তার প্রমান।

"(১).....Furthermore, international financial institutions do in fact evaluate PRSP content, not process alone", Seshamani, Venkatesh (March 2005). "The same old wine in the same old bottle? Content, process and donor conditionalities of the PRSP".

(২) "The PRSP process has been scrutinized for increasing aid conditionality even though it was supposedly created to undo the imposition of policy conditions from the outside by increasing country ownership" (Dijkstra & Geske, 2011).

(৩) "Governments have also been unclear on how much they should incorporate the opinions of the poor into their PRSP, especially while also trying to appease the donors" (Kamruzzaman, 2009).

১৪) এ সম্বন্ধে CPDর পর্যবেক্ষণ ও আশঙ্কা প্রণিধান যোগ্য। "Reports published in the newspaper suggest that the IMF is trying to incorporate many of its traditional reform programs into the PRSP, which the government is not ready to buy. IMF is not and will not provide assistance unless these measures are also incorporated into the PRSP. On the other hand, the government cannot afford to forgo the donors' funding particularly in the form of fungible resources. Therefore, it is possible that the government may incorporate IMF reform agenda into the PRSP, even if this is not in line with the outcome of the public consultations on the PRSP. Such an emerging contradiction within the PRSP process may once again mean that the actual PRSP may not command authentic domestic ownership which may compromise the GOB's commitment to fully implement the strategy of the PRSP". (CPD: IRBD FY03 (Second Interim Report): I-PRSP Review page 52).

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট কঃ "He (the cultivator) is unfortunate, but not extravagant. Possibly, when the crops are good and he gets some ready money in hand, he is inclined to spend some money on an umbrella, a lantern, a coat, a good sari for his wife and some fish. This, however, we can hardly call extravagance. An umbrella is necessary to keep him comfortable during the rainy season, the lantern protects him from snake bite, and the sari brings a smile to the face of the hard-worked wife, which even a cultivator may be excused to long for and love to see. Nor is the cultivator litigious. He never goes to the court willingly unless he is driven to do so for the redress of some grievance.... .or to defend himself against the oppression of his landlord, when it becomes unbearable. It is only the half-educated upper class among the cultivators and the middlemen tenure holders who

frequent the law courts" (p.70). According to Momen, the people were not innately lazy either, but "..... stricken by malaria, have lost their physical vigour and energy and are incapable of hard work in the field or at home. Under normal conditions, the district could produce double as much crops as it now produces. During the malarial season, there is such an epidemic of the disease among the people that it it a wonder how the cultivators at all manage to get their lands cultivated and sown. There is a dearth of labour everywhere, and the lands do not get proper treatment. A lot of land lies fallow, and those that are cultivated do not yield full crops11 (p.21). However, Momen did not consider malaria as the primary cause of poverty: "I have heard officers and others who came to the district blame the poor villagers for being lazy and not making their surroundings sanitary by clearing jungle and digging wells to supply good water. They, however, forget that owing to poverty and disease these villagers are reduced to a state of callous inactivity, which renders them incapable of even nominal exertion" (p.20). And elsewhere: "Namasudras and others who cultivate lands in the beels get bumper crops, are well fed and have greater resisting power against attacks of malaria, In the course of settlement operations, not a single officer of the Settlement Department and very few Kanungos suffered from repeated attacks of malaria, whereas among the menials very few escaped. In the town of Jessore, very few adult Bhadraloks have got enlargement of the spleen and liver, whereas, among the poor classes it is an exception to find a man without an enlarged liver and spleen. Malaria has been causing havoc because of the poverty of the people. But for their poverty, the people could easily resist the germs of malaria from working into their system" (pp.20-2l). However, although Momen was able to dispel some of the "colonial" explanations of poverty, he failed to offer any alternative thesis for the growing poverty trend in the District over time which he so clearly brought out in his report (K. Siddiqi, 1980 p.55-56).

গ্রন্থপঞ্জী

Akash, M. M.	2004	Poverty situation in South Asia: A Need for an Empowerment Approach, in Regional Cooperatin in South Asia: A Review of Bangladesh's Development (CPD, 2004).
Anu Muhammad, Nurul Hoque, Tania Wahed, Abdullah Al Mamun	1998	Actors, Victims and the Rhetoric: A Deconstruction of 'Development' Exercises, in Abdul Bayes and Anu Muhammad Ed. Bangladesh at 25, The University Press Limited, Dhaka 1998.
Azizur Rahman Khan, Mahbub Hossain and Keith Griffin	1989	The strategy of Development in Bangladesh, The Macmillan Press Limited, 1989.
Bangladesh Bureau of Statistics		-HIES survey report 1995-96, 2000, 2005; -Poverty Assessment 2008, 2003,1998; -Bangladesh Microfinance Statistics 2009; -Welfare Monitoring Survey 2009.
Beech, M.J.	1966	Inside the East Pakistani Village, Asian Studies Papers, Michigan State University.
Bertocci, P.J.	1970	Elusive Village: Social Structure and Community Organisation in Rural East Pakistan, Ph.D. Thesis, Michigan State University.
Bose, S. R.	1968	Trend of Real Incomes of the Rural Poor in East Pakistan, 1963-6**-", Pakistan Development Review, vol. 8.

CPD	2007	State of the Bangladesh Economy in FY 2007-08 and Outlook for FY 2008-2009.
Datt, G., and M. Ravallion.	1992	Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures: A Decomposition with Applications to Brazil and India in the 1980s. Journal of Development Economics, 38: 275-296.
Debapriyo Bhattacharya	1995	Bangladesh's Experience with the Structural adjustment and enhanced Structural Adjustment Facilities. In Roy H Grieve and Mozammel Huq ed. Bangladesh Strategies for Development.
Dijkstra, Geske	2011	"The PRSP Approach and the Illusion of Improved Aid Effectiveness: Lessons from Bolivia, Honduras and Nicaragua". Development Policy Review. 1. 29: 111–133.
Jannuzi F. T and Peach J T.	1990	Bangladesh: A Strategy for Agrarian Reform in Meine Pieter van Dijk & Henrik Secher Marcussen (ed.) Frank Cass. London 1990.
Gabriela Inchauste Sergio Oliveri	2014	Understanding Poverty Reduction in Bangladesh: A Micro-Decomposition Approach, Bangladesh Development Studies Vol. XXXVII, March-June 2014, Nos.1&2.
GED, Planning Commission, GOB	2004	"Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction"-General Economic Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, December, 2004.
GOB	2003	A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development.
GOB (Bengal)	1888	Enquiry into the Material Condition of the Lower Classes of People in Bangladesh.
GOI	1894 a	Bengal Provincial Report on the Material Condition of the People, Simla*
GOI	1894 b	The Third Decennial Moral and Material Progress Report, 1891-92.
Helleiner, Gerald. K.	2000	"External conditionality, Local Ownership and Development," in Jim Freedman (ed.), Transforming Development, Foreign Aid for a Changing World. Toronto: University of Toronto Press.
Kamal Siddiqi, Kamrun Nahar	**1980**	Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh, Unpublished PhD Thesis Economic History of Bengal
Kamruzzaman, Palash	2009	"Poverty Reduction Strategy Papers and the rhetoric of participation". *Development in Practice*. **19** (1).
Khan, A.R.	1967	"What has been Happening to Real Wages in Pakistan?", Pakistan Development Review, vol. 7.

Khan, A.R.	1976	Poverty and Inequality in Rural Bangladesh, World Employment Research Programme, ILO, Geneva.
Khan, A.R.	1995	A quarter century of Economic Development in Bangladesh: Successes and Failures. The Bangladesh Development Studies Vol. XXIII. Sept-Dec. 1995, No. 3 & 4.
Kolenikov, S., and Shorrocks A..	2005	A Decomposition Analysis of Regional Poverty in Russia. ‖ Review of Development Economics, 9(1): 25-46.
Kornai J	1992	The Socialist System, The Political Economy of Communism.
M.Syeed Ahmed, Mohammad Ehsan	2005	Bangladesh's Poverty Reduction Strategy: An Analysis from the Labour Market Perspective, Asian Affairs, Vol. 27, No. 4: 51-66, October-December, 2005.
Madhusree Mukherjee.	2010	Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II, Paperback, Penguin 2010, US.
Mahabub Hossain	1998	"Perilous Poverty: Measurement, Trends and Determinants", Bangladesh at 25: An Analytical Discourse on Development, ed. Abdul Bayes, Anu Muhammad, The University Press Limited. 1998.
Martin Ravallion and Binayak Sen		When Method Matters: Monitoring Poverty in Bangladesh, Economic Development and Cultural Change, Vol. 44, No. 4 (Jul., 1996), pp. 76.
Momen, M.A.	1925	Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Jessore, 1920-24, Calcutta.
Mustafa K. Mujeri and Binayak SEN	**2006**	Economic Growth in Bangladesh, 1970-2000.
N. Islam	*1977*	*Development Planning in Bangladesh, C Hurst, London.*
Naoroji, D.B.	1887	Essays, Speeches and Writings, edited by C.L. Parekh, Bombay.
Palash Kamruzzaman	2014	Poverty Reduction Strategy in Bangladesh: Rethinking Participation in Policy Making, Publisher: Policy Press 2014.
Philippe Aghion, Patrick Bolton	1997	A Theory of Trickle-Down Growth and Development *The Review of Economic Studies*, Volume 64, Issue 2, April 1997, **https://doi.org/10.2307/2971707**
Quadir, S.A.	1969	Village Dhaniswar - Three Generations of Man-Land Adjustments in an East Pakistan Village, BARD, Comilla.
Ravallion, M. and M. Huppi.	1991	Measuring Changes in Poverty: A Methodological Case Study of Indonesia during an Adjustment Period. The World Bank Economic Review, 5 (5): 57-82.
Rehman Sobhan	1982	Crisis of External Dependence, UPL 1982, Dhaka.

Rehman Sobhan	1985	Bangladesh Journal of Political Economy, Vo. 7, No.1A, 1985. Reproduced in Challenging Injustice:
Rehman Sobhan	1985	Planning for the Poor: The Role of the state in Bangladesh. In Challenging Injustice: The Odyssey of a Bangladeshi Economist. Collected Works Volume 1.
Rehman Sobhan	1992	Rethinking the Market Reform Paradigm, Economic and Political Weekly, Vol. XXVII, No.30, 25 July,1992, PE66-PE 72.
Rehman Sobhan	1993	Structural Maladjustment: Bangladesh's Experience with Market Reforms, Economic and Political Weekly, XXVIII (19): 925-931, 8 May 1993.
Rehman Sobhan	1994	Decolonialising the Third World: Lessons for the Bretton Woods Institutions on Their Fiftieth Anniversary, The mainstream 34(42), September 1994, New Dehli, 7-10pp, republished in Collected works of Rehman Sobhan, Volume 3, CPD.
Rehman Sobhan	1997	Privatization without a privatization Policy- Holiday 5 September. 1997 (P-323 of Vol 3).
Rehman Sobhan	1999	Bangladesh, Experience with Economic Reforms: The Need for a Reppraisal, in Fumiko Oshikawa (ed.) 1999. South Asia Under the Economic Reforms, JCAS. Symposium Series 6. Osaka: Japan Centre for Area Studies.
Rehman Sobhan	2002	Policy Dependence and Political Accountability. The Financial Express, 30 November, 2002.
Scott A. Loomis, M.P.H	1976	An Analytic Series on the Interactions of Health and Socioeconomic Development. Volume XVII, Bangladesh, Bibliographic input sheet. US AID/US Department of Health Education and Welfare, 1976.
Sen Amartya	1981	Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, UK, 1981, ELBS edition, 1987.
Sen Binayak.	2003	Drivers of Escape and Descent: Changing household fortunes in rural Bangladesh. World Development 31(3):513-534.
Seshamani, Venkatesh	2005	"The same old wine in the some old bottle? Content, process and donor conditionalities of the PRSP".
Tajul Islam	2011	Approach of the International Development Community towards Poverty Eradication in Bangladesh. CPD-SACEPS Monograph Series 7, Centre for Policy Dialogue 2011.
United Nations	2006:	The Least Developed Countries Report 2006 NY and Geneva 2001.
Vakil, C.N.	1963	Poverty and Planning, Allied, Delhi (first published in 1933)
Wikipedia	2012	"Trickle Down' Theory and 'Tax Cuts for the Rich". Archived September 24, 2012, at WebCite. Wikipedia

World Bank 1975 Bangladesh: The Current Economic Situation and short-term Outlook.

World Bank 1976 Bangladesh: The Current Economic Performance and short-term Prospects, March 1976.

World Bank 1980 World Development Report. Washington D.C: World Bank.

World Bank 1982 IDA in Retrospective. Washington D.C.; Oxford University Press.

World Bank 1990 World Bank Development Report 1990, Oxford University Press.

World Bank 1995 Bangladesh: Recent Economic Development and Priority Reform Agenda for Rapid Growth. Washington D. C.

World Bank 2012 Report No. 67991. Bangladesh: Towards Accelerated, Inclusive and Sustainable Growth—Opportunities and Challenges (In Two Volumes) Volume II: Main Report June, 2012 Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit South Asia Region, World Bank, 2012.

World Bank 2019 Bangladesh Poverty Assessment, World Bank Group p-23, Washington, DC. Staff calculations using HIES 2000, 2005, 2010 and 2016 and World Development Indicators.

অজয় রায় বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাঃ সংকট ও সমাধান।

ইরফান হাবিব ১৯৮৫ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭) কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫.

এম এম আকাশ ২০১৫ দারিদ্র্য দূর করার জন্য শিক্ষাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ, সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, সংখ্যা ৯, সেপ্টেম্বর ২০১৫.

নজরুল ইসলাম ১৯৮৭ বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৭.

নজরুল ইসলাম ২০১২ আগামী দিনের বাংলাদেশ, প্রথমা প্রকাশনী ডাকা ২০১২.

নীহাররঞ্জন রায় ১৪০০ বাঙালির ইতিহাস আদিপর্বঃ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০০.

বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমা: ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান

তানভীর মোকাম্মেল*

পূর্বকথা

পাকিস্তানীরা বলত বৃষ্টি বেশি বলে পূর্ববঙ্গের জলজ আবহাওয়াতে আর্দ্রতা বেশি, ফলে এখানে সেলুলয়েডের সিনেমা হবে না। এভাবে সুকৌশলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বাজেটের অর্থ থেকে পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করে গোটাটাই পশ্চিম পাকিস্তানের স্টুডিওগুলোর বিকাশে ব্যয় করা হতো। পাকিস্তানীদের যুক্তিটা আসলে ছিল খুবই খোঁড়া! কারণ প্রায় একই অক্ষাংশে এবং একই রকম বৃষ্টিবহুল জলবায়ুর কলকাতার টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলোর তখন রমরমা অবস্থা। এরকমটাই চলে আসছিল যতদিন না ১৯৫৪ সালের *যুক্তফ্রন্ট* সরকারের আমলে তরুণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক মন্ত্রী হলেন। বাংলার জন্যে কিছু করতে তো তাঁরা সব সময়ই মুখিয়ে থাকতেন। সিদ্ধান্ত হলো, ঢাকায় ফিল্ম স্টুডিও নির্মাণ ও চলচ্চিত্র তৈরি শুরু করতে হবে। ১৯৫৬ সালে তেজগাঁওয়ে গড়ে উঠল *"ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন"* (*এফডিসি*)। শুরু হলো ঢাকাতেও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরির যাত্রা। প্রথম ছবিটা ছিল *"মুখ ও মুখোশ"*[১] (১৯৫৬)।

ঢাকার *এফডিসি*তে তৈরি প্রথম দিককার ছবিগুলোতে সমাজ-বাস্তবতাকে তুলে ধরার কিছু চেষ্টা ছিল–*"আসিয়া"* (১৯৫৮), *"সূর্যস্নান"* (১৯৬২), *"কাঁচের দেয়াল"* (১৯৬৪), *"নদী ও নারী"* (১৯৬৫)। পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ তখন সবে

* ডঃ মোঃ তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও প্রো ভিসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য (ভূতপূর্ব) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

১ *"মুখ ও মুখোশ"*, পরিচালক আবদুল জব্বার খান

গড়ে উঠছে। তাদের নাগরিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গ্রামের প্রতি স্মৃতিমেদুরতা ছিল এসব ছবির জনপ্রিয় বিষয়বস্তু– *"সুতরাং"* (১৯৬৩), *"আয়না ও অবশিষ্ট"* (১৯৬৭)। যদিও শহর হিসেবে তখন আধুনিক ঢাকাও গড়ে উঠছে, কিন্তু এ নগরের অধিবাসীদের এক পা তো তখনও গাঁয়ে। গ্রামীণ জীবনের সে স্মৃতিমেদুরতাকে পুঁজি করে তৈরি হলো যাত্রাপালার জনপ্রিয় নানা লোককাহিনী নিয়ে বেশ কিছু ব্যবসাসফল ছবি, যেমন *"রূপবান"* (১৯৬৫), *"জরিনা সুন্দরী"* (১৯৬৬), *"আবার বনবাসে রূপবান"* (১৯৬৬), *"বেহুলা"* (১৯৬৬), *"সাইমুল দুলক বদিউজ্জামান"* (১৯৬৭)।

ষাট দশকের শেষের দিকে দেশজুড়ে চলা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও উনসত্তরের আন্দোলনের কিছু ঢেউ সামান্য হলেও *এফডিসির* বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের পর্দাতেও এসে লাগল। তৈরি হলো দেশপ্রেমমূলক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার *"নবাব সিরাজউদ্দৌলা"* (১৯৭০) ও *"জীবন থেকে নেয়া"* (১৯৭০)। তবে মুক্তিযুদ্ধের অত বড় মহাকাব্যিক ঘটনার পরে *এফডিসি* থেকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো মহৎ সৃষ্টি বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না তেমন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি কিছু হয়েছে বটে– *"ওরা এগারো জন"* (১৯৭২), *"অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী"* (১৯৭৩), *"মেঘের অনেক রং"* (১৯৭৬)। *এফডিসির* ঘরানার বাইরে আলমগীর কবির করলেন— *"ধীরে বহে মেঘনা"* (১৯৭২), তারপরও বলব ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যিক ব্যাপকতা ও গভীরতা বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রে যেন অনেকটাই উপেক্ষিত হয়ে রইল। এটা দু:খজনক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী নিয়ে রুশ ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের চলচ্চিত্রকারেরা আজও সব অসামান্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছেন—মিখাইল কালাতোজভের *"ক্রেইনস আর ফ্লাইং"* থেকে সাম্প্রতিক রোমান পোলানস্কির *"দি পিয়ানিস্ট"*। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো এত মহাকাব্যিক একটা ঘটনা নিয়ে চলচ্চিত্রের পর্দায় আজও কালজয়ী সৃষ্টি তেমন একটা হয়নি। বরং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুজিবনগরে যে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল সেগুলোতেই মুক্তিযুদ্ধের সময়কার করাল ও নির্মম বাস্তবতা আমরা অনেক বেশি প্রতিফলিত হতে দেখি, যেমনজহির রায়হানের *"স্টপ জেনোসাইড,"* আলমগীর কবিরের *"লিবারেশন ফাইটার্স"* ও বাবুল চৌধুরীর *"দি ইনোসেন্ট মিলিয়নস্"*।

স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এদেশে এসে ঋত্বিক ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসটি নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় *"তিতাস একটি নদীর নাম"* (১৯৭৩) ও রাজেন তরফদার দেশভাগের ওপর *"পালঙ্ক"* (১৯৭৬) এসব ছবি সৃষ্টি করে গেলেও

বাংলাদেশের পরিচালকদের কাছে পূর্ব বাংলার জলজ প্রকৃতি ও গ্রামীণ জনজীবন যেন প্রায় অবহেলিতই হয়ে রইল। এক ব্যতিক্রম শেখ নিয়ামত আলী ও মাসিহ্উদ্দীন শাকেরের*"সূর্য দীঘল বাড়ী"* (১৯৭৯) ছবিটি।

যে সামাজিক বাস্তবতা আমরা এদেশের ষাটের দশকে এমনকি সত্তরের দশকের কিছু ছবিতেও দেখেছি, তা *এফডিসির* ছবি থেকে হারিয়ে গেল। ১৯৭৫-য়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মূল্যবোধগুলো যতই ভুলুণ্ঠিত হতে থাকল, একটার পর একটা ইতিহাস-ভুগোলহীন ছবি তৈরির মাধ্যমে এদেশের সিনেমার পর্দাও যেন ক্রমশই তত হয়ে উঠতে থাকল বিজাতীয় কিছু। ছবিগুলোর নামও হতে থাকল, বাংলা নয় বিজাতীয়—*"হুর-এ-আরব"*, *"তাজ আওর তলোয়ার"*। চলচ্চিত্র ক্রমশই পরিণত হতে থাকল কেবলই নোংরা টাকা জায়েজের নষ্ট এক মাধ্যম হিসেবে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র বা আর্ট ফিল্ম এবং বাণিজ্যিক ছবির মাঝামাঝি এক ধরনের *"মিডল সিনেমা"* থাকে। বাংলাদেশেও ছিল। আমজাদ হোসেনের *"গোলাপী এখন ট্রেনে"* (১৯৭৬), নারায়ণ ঘোষ মিতার *"লাঠিয়াল"* (১৯৭৬), সুভাষ দত্তের *"বসুন্ধরা"* (১৯৭৭)। কিন্তু দু:খজনক যে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সার্বিক অধ:পতনের ফলে *"মিডল সিনেমা"*-র এই ধারাটাও আস্তে আস্তে ক্রমে হারিয়ে গেল। চলচ্চিত্রের পর্দা প্রায় পুরোটাই দখল করে ফেলল *এফডিসির* মারদাঙ্গায় ভরা এক ধরনের লুম্পেনীয় ছবি। তৈরি হতে থাকল বিজাতীয় পোষাক পরা, বিজাতীয় সব সংলাপে ভরা লুম্পেনদের কাহিনী নিয়ে, লুম্পেনদের দ্বারা ও লুম্পেনদের জন্যে চলচ্চিত্র।

আর আজ তো দেশের বারো শ'র মধ্যে মাত্র শ' দুয়েক সিনেমা হল কোনো রকমে ধুঁকে ধুঁকে টিঁকে রয়েছে মাত্র। বড় রকম কোনো পদক্ষেপ না নিলে এসব সিনেমা হলও ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। অনেক সিনেমা হলই ভেঙ্গে সে জায়গায় শপিং কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত স্থূল ও রুচিহীন সব সিনেমা তৈরি ও সিনেমা হলগুলোর সার্বিক নিম্নমানের পরিবেশের কারণে এদেশের রুচিশীল দর্শকদের সঙ্গে দেশীয় চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হয়ে গেছে প্রায় বার্লিন ওয়ালের মতোই এক বিচ্ছিন্নতা।

বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমার জন্ম, সংগ্রাম ও বিকাশকে এদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রের এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও আবহেই বুঝতে হবে।

বিকল্প সিনেমার জন্মকথা

বিকল্প সিনেমার শুরুটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবেই হতে পারে। তার বিকাশের ধারা ও পরিণতিও পায় বিভিন্ন রকম। এটা নির্ভর করে সে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অবস্থা, দর্শকদের রুচিবোধ, সরকার ও কর্পোরেট পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতা বা বাধা দেবার ক্ষমতা, সেন্সরশিপের ধরন, প্রযুক্তির বিকাশ, এধরনের অনেক কিছুরই উপর। দু:খজনক যে, বাংলাদেশে এসব পূর্বশর্তের কোনোটাই বিকল্প সিনেমা গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল ছিল না।

এক অর্থে বলা চলে, এদেশে বিকল্পভাবে ছবি তৈরির শুরু বাংলাদেশের জন্মলগ্ন সেই ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই, যখন মুক্তিযুদ্ধের সময়কার চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই জহির রায়হান নির্মাণ করেন *"স্টপ জেনোসাইড"*, আলমগীর কবির *"দি লিবারেশন ফাইটার্স"*, বাবুল চৌধুরী *"দি ইনোসেন্ট মিলিয়নস"*। সেই দুর্যোগঘন সময়ে চরম আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিকূলতার মাঝেও কিছু পরিচালক বিকল্পভাবে কিছু ছবি তৈরির উদ্যোগ যে নিয়েছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়। দু:খজনক যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, অনেক বেশি সম্পদ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, এ ধারাটি আমরা আর তেমন চর্চিত হতে দেখিনি। সেটা আবার হতে দেখি মধ্য-আশির দশকে এসে, যখন সামরিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট পুরো জাতি এক দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিল। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন করা কিছু তরুণ তখন *এফডিসির* বাইরে, সিনেমা হলকে মাথায় না রেখে সম্পূর্ণ বিকল্পভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্য কিছু চলচ্চিত্র তৈরি ও বিকল্পভাবে সেসব ছবি প্রদর্শন করা শুরু করলেন– *"আগামী"* (১৯৮৪),*"হুলিয়া"* (১৯৮৫), যেসব চলচ্চিত্র তাদের বিষয়বস্তু, নির্মাণ প্রক্রিয়া ও অন্যান্য চারিত্র্যলক্ষণে ছিল পুরোপুরিই বিকল্প চলচ্চিত্র।

তৎকালীন চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মীরাই ছিল এ ধারাটির উদ্যোক্তা। এ ধারায় তানভীর মোকাম্মেলের *এজিট প্রপ* আঙ্গিকে নির্মিত *"হুলিয়া"* স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির শুটিং প্রথম শুরু হলেও যে ছবিটি প্রথম শেষ হয় সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্র

সংসদ আন্দোলনেরই আরেক কর্মী মোর্শেদুল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ***"আগামী"*** স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিটি। এ দুটো ছবিই *এফডিসির* বাইরে ১৬ মি:মি:-য়ে তৈরি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। ***"আগামী"*** ছবির দৈর্ঘ্য পঁচিশ মিনিট আর ***"হুলিয়া"*** আঠাশ মিনিটের। এ দুটো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র একসঙ্গে দেখানো হতো এবং দর্শকদের মাঝে তা বেশ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এখন কেন আমরা হঠাৎ আশির দশকে *এফডিসির* বাইরে ১৬ মি:মি:-য়ে বিকল্পভাবে ছবি তৈরি ও তা প্রদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম? সেই প্রেক্ষাপটটা একটু বিশদে তুলে ধরা যাক।

বাংলাদেশে ভালো চলচ্চিত্র তো খুব একটা তৈরি হয় না। কিন্তু সে সময়ে একটা ভালো ছবি তৈরি হয়েছিল– *"সূর্য দীঘল বাড়ী"*[২] (১৯৭৯)। কিন্তু আমরা গভীর দু:খের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে, বাংলাদেশের অর্থগৃধ্নু চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ প্রদর্শক-পরিবেশক-হলমালিকেরা, যে অশুভ ত্রিশক্তিকে আমরা *"ট্রয়কা"* নামে ডাকি, *"সূর্য দীঘল বাড়ী"* ছবিটাকে ঢাকার কোনো সিনেমা হলে রিলিজই হতে দিল না। ছবিটা শেষমেষ রিলিজ করতে হলো সুদূর মফস্বলের এক ছোট্ট শহর নাটোরে! এসব প্রদর্শক ও হলমালিকেরা জহির রায়হানের ছবি দেখাত না, আলমগীর কবিরের ছবি তো দেখায়ই না। ফলে বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রের ব্যাপারে তরুণ বয়সে আমরা ছিলাম খুবই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ।

যেহেতু চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন করতাম সেজন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা স্বপ্ন তো আমাদের ছিলই। কিন্তু *এফডিসির* কাজের নিম্ন মান, এদেশে রুচিশীল প্রযোজকের অভাব ও বাণিজ্যিক সার্কিটে ছবি রিলিজের দুরবস্থা দেখে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আমাদেরকে *এফডিসির* বাইরে থেকে বিকল্পভাবে ছবি তৈরি করতে হবে এবং দেশের মানুষদেরকে তা দেখাতেও হবে বিকল্পভাবে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন করতাম বিধায় আমরা তৎকালীন লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক চলচ্চিত্রনির্মাতারা যেভাবে বিকল্পভাবে ছবি তৈরি ও তা জনগণকে দেখাতেন সে সম্পর্কে জানতাম। তাছাড়া ভারতের বামপন্থী রাজ্য কেরালার *"ওদেসা ফিল্ম সোসাইটি"* বিভিন্ন শিল্পসম্মত ছবির ১৬ মি:মি: প্রিন্ট নিয়ে যেভাবে মফস্বলে ও গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে জনগণকে ছবি দেখাত সেটাও আমাদের জানা ছিল। অধিকন্তু

[২] আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত *"সূর্য দীঘল বাড়ী"* (১৯৭৯)। পরিচালক শেখ নিয়ামত আলী ও মসিহউদ্দীন শাকের।

ব্যক্তিগতভাবে বাম রাজনীতি করতাম বলে বা নাট্য-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণসংগঠনে সম্পৃক্ত ছিলাম বলে সিনেমা হলের বাইরের কোনো মিলনায়তনেও যে জনগণকে ছবি দেখানো সম্ভব সে বিশ্বাসটা আমার ছিল। সে কারণেই আমরা বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র বাণিজ্যিক কারখানা *এফডিসির* পুরোপুরি বাইরে থেকেই স্বাধীনভাবে আমাদের ছবিগুলো নির্মাণ ও সিনেমা হলের বাইরে তা প্রদর্শন করার আত্মবিশ্বাসটা অর্জন করেছিলাম। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের জন্যে চিরাচরিত যে বিশাল প্রডাকশন অফিস, ডিস্ট্রিবিউশন অফিস, এসব কিছুই আমাদের ছিল না। ছিল কেবল কিছু চলচ্চিত্রিক জ্ঞান, তারুণ্যের সাহস ও চেনা-অচেনা অসংখ্য মানুষের শুভাশিস।

"আগামী" ও *"হুলিয়া"* এ দুটি ছবিই সাদাকালো, ১৬ মি:মি:-য়ে অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে তৈরি। আজকের মানে দুটি ছবিরই কারিগরি মান বেশ পিছিয়ে পড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও, হয়তো বক্তব্যের কারণেই, ছবি দুটি বেশ জনপ্রিয়তা পায় এবং *"আগামী"*-*"হুলিয়া"* পথ দেখানোর পর থেকে এদেশে বেশ কয়েক ডজন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি হয় যার সবগুলো তেমন শিল্পমানসম্পন্ন না হলেও স্বল্পদৈর্ঘ্য তথা বিকল্পধারার একটা নতুন ঘরানা (Genre) এদেশে শুরু হয়ে যায়। আর এই সব ছবিই *এফডিসির* মূলধারার বাইরে বিকল্পভাবে নির্মিত। জনগণের কাছে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি মানেই তখন হয়ে ওঠে বাস্তবধর্মী, রাজনীতিসচেতন কোনো ছবি যার বিষয় ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ বা কোনো সামাজিক সমস্যা। পরে এ ধরনের ছবির দৈর্ঘ্য অনেক বড় হতে থাকলেও সেসব ছবিকেও এদেশের মানুষ "স্বল্পদৈর্ঘ্য" ছবি বা "শর্ট ফিল্ম" বলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন আমার *"নদীর নাম মধুমতী"*-এর (১৯৯৫) দৈর্ঘ্য দু'ঘন্টার উপরে, *"চিত্রা নদীর পারে"*-ও (১৯৯৮) প্রায় দু'ঘন্টার ছবি, কিন্তু জনগণ সে সময় এগুলোকে "স্বল্পদৈর্ঘ্য" বা "শর্ট ফিল্ম"-ই বলত! মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিংবা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ভিত্তিক যেকোনো চলচ্চিত্রকেই জনগণ তখন বলতে শুর করল "শর্ট ফিল্ম" বা "স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র", তা চলচ্চিত্রটার দৈর্ঘ্য যত বড়ই হোক না কেন! বস্তুত "স্বল্পদৈর্ঘ্য" অভীধাটি বাংলাদেশে একটা বর্গীয় প্রত্যয়ে, Generic টার্মে, পরিণত হয়ে পড়ল।

বাংলাদেশে আগে যেসব ভালো ছবি হয়েছে যেমন *"নদী ও নারী"*[৩] (১৯৬৫), *"কাঁচের দেয়াল"*[৪] (১৯৬৪), *"ধীরে বহে মেঘনা"*[৫](১৯৭২), *"সূর্য দীঘল বাড়ী"* (১৯৭৯), এ সবগুলো ছবিই ছিল কিছু বিচ্ছিন্ন নির্মাতার কিছু একক প্রয়াস। ফলে এ সব ছবিকে কোনো আন্দোলনের ধারা বলা চলে না। আন্দোলন তখনই হয় যখন কিছু ছবির মাঝে একটি বিশেষ ধারা, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক নেতৃত্ব এবং সচেতন ও সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ থাকে। যেমন, *ইতালীয় নিওরিয়ালিজম* বা *ফ্রান্সের নুভেল ভাগ বা নিউ ওয়েভ* সিনেমা। বাংলাদেশে, খুবই সীমিত আকারে, তেমনটি ঘটল মধ্য-আশির দশকে যখন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কিছু তরুণ চলচ্চিত্রকর্মী ১৬ মি:মি:-য়ে মুক্তিযুদ্ধ, দেশভাগ ও জাতির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো বিষয় নিয়ে সচেতনভাবে বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও তা প্রদর্শনের একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিকল্প সিনেমার বৈশিষ্ট্যসমূহ

এখন এই যে "বিকল্প সিনেমা," "বিকল্প সিনেমা" বলছি তার বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে কী? কাকে বলব "বিকল্প সিনেমা"?

প্রথমত, এসব ছবির বিষয়বস্তু দেখা যাক। গরুর গাড়ীতে করে একটা মৃতদেহ নিয়ে দুই দরিদ্র গাড়োয়ান মৃতদেহটির পরিবারকে খুঁজতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরছে—*"চাকা"*[৬] (১৯৯৩) কিংবা পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল শহরে এক হিন্দু পরিবারের জীবনে কী বিপর্যয় নেমে এল—*"চিত্রা নদীর পারে"*[৭] (১৯৯৮)। বিষয়বস্তু হিসেবে এগুলো এমন সব বিষয় যেগুলোকে মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র কখনোই কখনোই তাদের ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে বিচেনা করত না। যেটা বলতে চাইছি তা হলো বিকল্প সিনেমার বিষয়বস্তুও হতে হবে—বিকল্প কিছু।

তারপর এসব ছবির নির্মাণের ফর্মাট। এদেশের মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র ৩৫ মি: মি:-য়ে তৈরি ও প্রদর্শিত হতো। খুব সচেতনভাবেই বিকল্পধারার নির্মাতারা

[৩] *"নদী ও নারী"* (১৯৬৪), পরিচালক সাদেক খান
[৪] *"কাঁচের দেয়াল"* (১৯৬৪), পরিচালক জহির রায়হান
[৫] *"ধীরে বহে মেঘনা"* (১৯৭৩), পরিচালক আলমগীর কবির
[৬] *"চাকা"*, পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম
[৭] *"চিত্রা নদীর পারে"*, পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল

তাদের ছবিগুলো ১৬ মি:মি:-য়ে তৈরি করেছিলেন, বর্তমানে করছেন ডিজিটালে। এতে যে ছবি নির্মাণের খরচটাই ব্যাপকভাবে কমে এল তা নয়, ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নির্মাতারা পেলেন অপার স্বাধীনতা। কোনো ব্যবসায়ী প্রযোজক, প্রদর্শক ও হলমালিকের উপর তাকে আর নির্ভরশীল থাকতে হলো না। নিজের ছবির প্রিন্টের মালিক তিনি নিজেই হতে পারার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। নিজের সৃষ্ট শিল্পের উপর নিজের অধিকারটা তিনি বজায় রাখতে পারলেন যা যুগ যুগ ধরেই সব শিল্পীদের স্বপ্ন। ৩৫ মি:মি:-য়ের বদলে ১৬ মি:মি:-য়ে ছবি তৈরি করে, বলা চলে, উৎপাদন শক্তিতে পরিবর্তন এনে বিকল্প ছবির নির্মাতারা উৎপাদন সম্পর্কেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেন। প্রদর্শক, পরিচালক ও হলমালিকদের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ছবি যেখানে খুশী যেমন খুশী দেখানোর স্বাধীনতাটা তারা পুরোপুরিই অর্জন করলেন। ৩৫ মি:মি: ও ১৬ মি:মি:-য়ের মধ্যকার পার্থক্য তাই শুধু দুই ফর্মাটের মধ্যেকার পার্থক্যই ছিল না, ছিল চলচ্চিত্র সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং দুটি বৈরী সাংস্কৃতিক শক্তিরও অবস্থান ও দ্বন্দ্ব।

বিকল্প চলচ্চিত্রের নির্মাতারা তারকাপ্রথায় বিশ্বাস করেননি। ফলে তাঁদের ছবিতে বাণিজ্যিক ছবির তারকারা থাকেন না। অভিনয় করে থাকেন মূলত গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ও সাধারণ মানুষেরা।

আরেক পার্থক্য অর্থায়নে। বিকল্পধারার ছবিগুলোর ছবির বাজেট বেশ কম। অবশ্য বাংলাদেশে সেটুকু অর্থ যোগাড় করাও খুব সহজ নয়। যেহেতু এ ধরনের ছবিতে অর্থলগ্নীর জন্যে কোনো প্রযোজক এগিয়ে আসে না, পাওয়া যায় না ব্যাংক ঋণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সহায়তা, সেজন্য নানাজনের দান, অনুদান, ব্যক্তিগত ঋণ এই সব অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করেই তৈরি করা হয় এসব চলচ্চিত্র। আমার যে কোনো ছবির শেষ টাইটেল কার্ডের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে শেষ স্ক্রলটা পর্দায় চলতেই থাকে। খুবই লম্বা, যেন শেষই হতে চায় না! অসংখ্য নামের সুদীর্ঘ এক তালিকা। কারণ এসব অসংখ্য মানুষের দান, অনুদান, ঋণ ও নানা রকম সাহায্যে আমাদের বিকল্পধারার ছবিগুলো তৈরি। যদিও আমরা শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং কোনো রকম নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চাই না, কিন্তু সম্পদের দারিদ্র্য আমাদের উপর অলঙ্ঘনীয় কিছু নিয়ম ঠিকই চাপিয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে, আমাদের ছবির বাজেট হতে হবে খুবই কম, এবং তাই প্রয়োজন যতটা কম টাকায় সম্ভব একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করার কলাকৌশলগুলোকে রপ্ত করা।

ফলে ব্যয়বহুল কোনো উন্নত ক্যামেরা আমরা তেমন ব্যবহার করতে পারি না, পারি না ব্যয়বহুল কোনো সেট তৈরি করতেও। অত্যন্ত স্বল্প বাজেটে, প্রায় অবিশ্বাস্য অঙ্কের কম বাজেটে, তৈরি হয়েছে এসব চলচ্চিত্র। এমনকি ফুটেজ শুটিংও করা হয়ে থাকে খুবই স্বল্প পরিমাণে। অনেক সময়ে ২:১, এমনকি ১:১ শুটিং অনুপাতেও।

বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমা তাই পুঁজিঘন (Capital intensive) নয়, শ্রমঘন (Labor intensive)। নগদ অর্থের অভাবটা আমাদেরকে নিজেদেরই গায়েগতরে খেটে, মেধা দিয়ে, সৃজনশীলতা দিয়ে পূরণ করে নিতে হয়। এ অনেকটাই, যাকে বলে, *মাইন্ড-ওভার-ম্যাটার*, বস্তুগত সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে মানসিক শক্তির লড়াইয়ের ব্যাপার। ফলে দেখা যায় বিকল্প সিনেমা নির্মাণে তাঁরাই টিঁকে থাকতে পেরেছেন যাঁরা মানসিকভাবে খুব দৃঢ়, সৃজনশীল ও উদ্যোগী। ইদানীং অবশ্য *ক্রাউড ফান্ডিং* বা গণঅর্থায়ন এ ধরনের ছবির অর্থায়নের ক্ষেত্রে নতুন এক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে ছবির দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও বিকল্প হওয়া। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রগুলো সাধারণত দুই-আড়াই ঘন্টার সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষণরেখায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিকল্প সিনেমা হচ্ছে মুক্তদৈর্ঘ্যের সিনেমা। ছবি হতে পারে যে কোনো দৈর্ঘ্যেরই। *"আগামী"* মাত্র পঁচিশ মিনিটের ছবি। আমার *"১৯৭১"* প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার ছবি। ছবির দৈর্ঘ্য নিয়ে আমরা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ঘরানা দ্বারা চাপানো কোনো পূর্বকৃত ধারণার দাসত্ব করতে চাই না। মুক্তদৈর্ঘ্যের এই অন্বেষা, আমাদের জন্যে শিল্পীর স্বাধীনতার অন্বেষাই।

আসলে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র যে এই যে দুই-আড়াই ঘন্টার দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে, এটা পুরোপুরিই একটা বাণিজ্যিক প্রস্তাবনা। এর সঙ্গে শিল্পের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম যুগে সব চলচ্চিত্রই ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্যের – লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের, জর্জ মেলিয়ের বা এডুইন পোর্টারের ছবিগুলোর দৈর্ঘ্য স্মরণ করুন। গ্রিফিথ[৮] পর্যন্ত এমনই চলে আসছিল। পরে হলিউডের স্টুডিও বা কোম্পানিগুলো তৈরি হলো। চলচ্চিত্র একটা শিল্প (Industry) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। ক্রমে সিনেমা পরিণত হলো বিশ্ব জুড়ে এক ব্যাপক জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমে। গ্রিফিথ এক সময় সাড়ে তিন ঘন্টার ছবিও তৈরি করেছেন। কিন্তু শীঘ্রই অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে বিনোদনের

[৮] ডি.ডাব্লিউ. গ্রিফিথ (১৮৭৫-১৯৪৮), হলিউডের প্রথম জমানার অত্যন্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রনির্মাতা।

জন্যে ব্যয় করার মতো মানুষের হাতে কেবল নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা থাকে। মানে সিনেমা দেখার জন্যে একজন মানুষ একটা সন্ধ্যায় সে রকম সময়ই ব্যয় করতে পারে যা সে আগে কোনো নাটক দেখতে বা মিউজিক্যাল কনসার্ট শুনতে ব্যয় করত। কারণ মানুষটিকে তো পরদিন সকালে উঠে আবার অফিসে, কল-কারখানায় যেতে হবে, নারীটি হয়তো বাসায় সন্তান রেখে এসেছে বা তাঁকে রাঁধতে হবে। ফলে সিনেমার বিনোদনের সময়সীমাও মানে বাণিজ্যিক সিনেমার দৈর্ঘ্যও নাটক বা মিউজিক কনসার্টের সুনির্দিষ্ট সময়ের মতোই ওই দুই-আড়াই ঘন্টায় এসে দাঁড়াল। এটা বাণিজ্যিক সুবিধার একটা ব্যাপার মাত্র এবং এর সঙ্গে শিল্পের তেমন সম্পর্ক নেই। বিকল্প নির্মাতারা তাই মনে করেন একটা সিনেমার দৈর্ঘ্য ঠিক ততখানিই হওয়া কাম্য যতটা তার চিত্রনাট্য দাবী করে। চিত্রনাট্য চার ঘন্টার হলে ছবি চার ঘন্টার হবে, আর চিত্রনাট্য পাঁচ মিনিটের হলে ওই ছবিটার জন্যে ওই পাঁচ মিনিটই *পূর্ণদৈর্ঘ্য*। আর সে কারণেই আমরা সব সময়ই মুক্তদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের কথা বলে এসেছি এবং সেভাবেই ছবির দৈর্ঘ্য ঠিক করেছি। এ কারণেই আমাদের ছবিগুলো সব সময় সিনেমা হল সার্কিটে রিলিজ মাফিক দৈর্ঘ্যের হয় না ।

তবে বাংলাদেশের বিকল্প চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হয়তো সিনেমা হলের বাইরে, সম্পূর্ণ বিকল্পভাবে, এসব চলচ্চিত্রের প্রদর্শন। *ইন্ডিপেনডেন্ট সিনেমা* পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে। *ইন্ডিপেনডেন্ট* নির্মাতারা বাণিজ্যিক কাঠামোর বাইরে স্বাধীনভাবে তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন বটে, কিন্তু তাদের ছবিগুলো দেখানোর ক্ষেত্রে তারা আবার মূলধারার বাণিজ্যিক সার্কিট অর্থাৎ সিনেমা হলের উপরই নির্ভরশীল থাকেন। ফলে শেষমেষ তারা কোনো ব্যবসায়ী প্রযোজক কোম্পানি বা হলমালিকদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। কিন্তু বাংলাদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন পুরোটাই করে থাকেন বিকল্পভাবে। সিনেমা হলগুলো তাদের ছবি দেখায় না। ফলে টিকে থাকার জন্যে এসব নির্মাতাকে তাদের ছবি বিকল্পভাবেই প্রদর্শনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। প্রয়োজন এখানে যথার্থই আবিষ্কারের জননী হিসেবে কাজ করেছে। দর্শকেরা যদি ছবির কাছে না আসে তাহলে নির্মাতারা নিজেরাই তাদের ছবিগুলো দর্শকদের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে গেছেন। ঢাকা শহরে নিজস্ব উদ্যোগেই তারা দর্শনীর বিনিময়ে, মূলত শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে, আর জেলা ও উপজেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছোটবড় মিলনায়তনে, কলেজ-স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে, এমনকি খোলা মাঠেও পর্দা

টাঙ্গিয়ে তাদের ছবিগুলো দেখিয়েছেন। আর এসব ক্ষেত্রে তাদের চলচ্চিত্রগুলোর প্রদর্শনীতে সহায়তা করেছে স্থানীয় ফিল্ম সোসাইটিগুলো, ছাত্র সংগঠন, নাট্য সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ। বিকল্পধারার নির্মাতারা এভাবে কেবল কাহিনীচিত্র নয়, প্রামাণ্যচিত্রও দর্শনীর বিনিময়ে দেখিয়েছেন। অনেকেই হয়তো স্মরণ করতে পারেন তারেক মাসুদের *"মুক্তির গান"* শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনের দেখানোর সময় মাসের পর মাস ধরে দর্শকদের সুদীর্ঘ লাইনের কথা। সীমিত আকারে হলেও এদেশের বিকল্প সিনেমার নির্মাতারা তাদের চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শনের এক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন যা আর সিনেমা হলের উপর নির্ভরশীল নয়।

এছাড়া ইদানীং *ইউটিউব* ও ইন্টারনেটের অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমে ছবি প্রদর্শনের এক বিশাল সম্ভাবনা বিকল্প নির্মাতাদের সামনে সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি আমার *"রূপসা নদীর বাঁকে"* দর্শনীর বিনিময়ে অনলাইনে দেখানো হয়েছে। দেশ-বিদেশের জনগণ তাদের ঘরে বসেই ছবিটা দেখতে পেরেছে এবং তা আগামী দিনে বিকল্প চলচ্চিত্রকারদের জন্যে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। তা হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে ছবি দেখিয়ে কিছু অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। এ আসলেই সম্পূর্ণ নতুন ও বিপুল সম্ভাবনাময় এক জগৎ।

জীবনসত্যের কাছে সিনেমার পর্দায় দু'ভাবে পৌছানো যায়। সঠিক চিত্রনাট্য, লোকেশন শুটিং, সঠিক অভিনেতা-অভিনেত্রী, উপযুক্ত সংলাপ ও সঠিকভাবে *Mise-en-Scene*-গুলো শুট করার মাধ্যমে। কাহিনীচিত্রে তা করাই যায়– সত্যজিৎ রায়ের ছবি বা ইতালীয় *নিওরিয়ালিজম* আঙ্গিকের ছবিগুলো। তবে প্রামাণ্যচিত্রে সত্যের কাছে পৌছানো যায় আরও সরাসরি, প্রত্যক্ষভাবে ও বিশদে। অনেক বিকল্প নির্মাতাই তাই কাহিনী ছবি নির্মাণের পাশাপাশি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণেও তাদের সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিকল্পধারায় বেশ কিছু সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশে নির্মিত হয়েছে–*"মুক্তির গান"*, *"১৯৭১"*, *"সীমান্তরেখা"*, *"তাজউদ্দীন আহমেদ: নিঃসঙ্গ সারথি"*, *"সেই রাতের কথা বলতে এসেছি"*, *"কর্ণফুলীর কান্না"*, *"রোকেয়া"*।

গত শতকের ষাট ও সত্তর দশকে কলকাতায় এক ধরনের বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু আদর্শবোধের বিপরীতে আদর্শবাদী একজন রাগী যুবকের কাহিনীকে কেন্দ্রে রেখে—*"পদাতিক"*, *"ইন্টারভিউ"*, *"দূরত্ব"*,

"প্রতিদ্বন্দ্বী", *"দৌড়"*। নেপথ্যে নক্সালবাড়ী আন্দোলন। বাংলাদেশের বিকল্পধারার ছবিতে তেমনই এক প্রতীক যেন হয়ে উঠেছে ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধসমূহের অবক্ষয়ের পটভূমিকায় প্রতিবাদী কোনো তরুণ। নেপথ্যে ১৯৭৫-য়ে বঙ্গবন্ধু ও চার নেতাকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় ফিরিয়ে আনার সামরিক শাসকদের শাসনকাল। এসব ছবির কাহিনীতে তাই মুক্তিযুদ্ধই যেন হয়ে উঠেছিল, কেবল ছবির কাহিনীর চালচিত্র নয়, যেন একটা চরিত্রই—*"আগামী"*, *"নদীর নাম মধুমতী"*, *"জয়যাত্রা"*, *"ইতিহাসকন্যা"*, *"মাটির ময়না"*, *"রাবেয়া"*, *"গেরিলা"*, *"অনিল বাগচীর একদিন"*, *"আমার বন্ধু রাশেদ"*, *"জীবনঢুলী"*।

এর একটা কারণ বোধহয় এসব নির্মাতার অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ছিলেন কিশোর বা সদ্য তরুণ, যে বয়সে একজন মানুষের সংবেদনশীলতা সবচেয়ে তীক্ষ্ম থাকে। সে সময়ই তারা দেখলেন একাত্তরের ভয়াবহ সব গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শরণার্থীদের দু:খ-কষ্ট, সংখ্যালঘুদের উপর চালানো অমানবিক নিপীড়ন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, *রাজাকার-আলবদর* ও ইসলামী মৌলবাদীদের নৃশংস সব কার্যকলাপ, আবার মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ, তিতীক্ষা, সাহস ও দেশপ্রেম। এ সবই হয়তো তাদের তরুণ মনে এত গভীর এক অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল যে তারা নিজেরা যখন চলচ্চিত্র নির্মাণে এলেন তখন মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয় নিয়েই ছবি করার কথা তাদের প্রথম মনে এসেছে। পঁচাত্তর পরবর্তীকালে যখন দেশে ইসলামী মৌলবাদ সমর্থিত মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সরকারগুলো রাষ্ট্রক্ষমতায় এবং মুক্তিযুদ্ধের কথা যে সময়টাতে তেমন বলাই যেত না তখন যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গেই এদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারা, অনেকেই তখন বয়সে বেশ তরুণ, মুক্তিযুদ্ধের উপর চলচ্চিত্র নির্মাণ করে স্বদেশ ও ইতিহাসের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ রেখেছেন। আর জনগণও তাদের অনেক বেদনার স্মৃতিবহ সেই ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা বিকল্পধারার এসব সিনেমায় দেখতে পারার ফলে বিকল্পধারার ছবিগুলো মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এটা বিস্মিত করে না যে বিকল্পধারার নির্মাতাদের ছবিগুলো সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বেশি প্রদর্শিত হয়ে থাকে, যে মাসগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এদেশের জনগণের আবেগ থাকে অধিকতর তীব্র।

তবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরও চলচ্চিত্র তৈরি হওয়া প্রয়োজন। কারণ জীবন যাপন করতে হয় সামনের দিকে লক্ষ রেখে, কিন্তু জীবনকে বুঝতে হয় পেছনের দিকে

তাকিয়ে। এটা যেমন একজন ব্যক্তির জীবনে সত্য তেমনি একটা জাতির জীবনের ক্ষেত্রেও সত্য। ১৯৭১ সালকে তার সকল সামগ্রিকতায় ও গভীরতায় না বুঝলে আজকের বাংলাদেশকেও ঠিক বোঝা যাবে না। জাতি হিসেবে আমরাও সামনের দিকে খুব বেশি এগোতে পারব না। তবে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও সাতচল্লিশের দেশভাগ–*"চিত্রা নদীর পারে"*, *"সীমান্তরেখা"*, *"খাঁচা"*, নারীর অধিকার– *"সোনার বেড়ী"*, *"রোকেয়া"*, *"রাবেয়া"*–, শিশুশ্রম, পতিতাবৃত্তি এসব রাজনৈতিক ও সমাজসচেতন অনেক বিষয় নিয়েই বিকল্পধারার নির্মাতারা ছবি তৈরি করেছেন। পৃথিবীর সব দেশের বিকল্পধারার নির্মাতাদেরই একটা দায় থাকে রাষ্ট্র এবং সংখ্যাগুরু জাতি ও সম্প্রদায়ের হাতে বঞ্চিত, অবহেলিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর কথা তাদের ছবিতে বলা যাদের কথা রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম বা কর্পোরেট মিডিয়া তেমন বলে না। দায় থাকে ভাষাহীনদের কণ্ঠে ভাষা যোগানো (*give voice to the voiceless*)। বাংলাদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারা তাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে হলেও সে চেষ্টা কিছুটা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার নিজেরই দুটি ছবির কথা বলা যায়– *"কর্ণফুলীর কান্না"* ও *"স্বপ্নভূমি"*।

"কর্ণফুলীর কান্না" প্রামাণ্যচিত্রটি বাংলাদেশের খুবই স্পর্শকাতর এক বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্ব নিয়ে নির্মিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের উপর প্রথম দু:খ নেমে আসে যখন গত শতকের ষাট দশকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থানুকুল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে কৃত্রিমভাবে কাপ্তাই হ্রদটা সৃষ্টি করা হয়। এই নয়ানাভিরাম হ্রদটির জন্যে চাকমারা তাদের প্রায় চুয়ান্ন হাজার একর সেরা চাষের জমি হারিয়ে ফেলে। আর প্রায় এক লক্ষ চাকমা বাধ্য হয় নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে স্বদেশ ছেড়ে ভারতে যেয়ে আশ্রয় নিতে। পাহাড়িদের জীবনে আরেক দুর্ভোগ ঘটে যখন জেনারেল জিয়ার শাসনামলে প্রায় পাঁচ লক্ষ সমতলের বাঙালিকে এনে কৃত্রিমভাবে পাহাড়ে বসতি স্থাপন করানো হলো। ফলে অনিবার্যভাবেই শুরু হয় পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্ব। এক সময় সে দ্বন্দ্ব সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়। পাহাড়িরা গঠন করে সশস্ত্র *"শান্তি বাহিনী"*। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও নানা অভিযান চালাতে থাকে। পাহাড়ে ঘটতে থাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা নৃশংস ঘটনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সংঘাতের বিষয়টা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে, খুবই স্পর্শকাতর এক বিষয়। তাই এটা

আশ্চর্য্যের নয় যে *"কর্ণফুলীর কান্না"* প্রামাণ্যচিত্রটা বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল এবং আমাকে হাইকোর্টে রীট করে ছবিটা মুক্তির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

আরেকটা প্রামাণ্যচিত্র হচ্ছে, বাংলাদেশের বিহারীদের দুরবস্থা নিয়ে তৈরী– ***"স্বপ্নভূমি"***। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে বিহার ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, কলকাতা, এমনকি সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকেও অনেক উর্দূভাষী মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল। বাঙালিরা অবশ্য তাদের সবাইকেই বলে "বিহারী"। বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে, বিশেষ করে ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিহারীদের শত্রুতামূলক ভূমিকার কারণে বাঙালিদের কাছে বিহারীরা জনপ্রিয় নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও এসব বিহারী আজও নানা ক্যাম্পে আট-বাই-আট-ফুট ছোট্ট সব ঘরে গোটা পরিবার নিয়ে অমানবিক জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এদের দু:খ-দুর্দশা নিয়ে আমি ***"স্বপ্নভূমি"*** প্রামাণ্যচিত্রটা নির্মাণ করি। বিহারীদের নিয়ে ছবি করছি জেনে আমার অনেক বাঙালি জাতীয়তাবাদী বন্ধুই তখন বেশ অখুশী হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তো শিল্পী। মানুষকে যদি তার ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠে দেখতে না পারি, তা হলে লালন ফকির বা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা আর কী-ই বা শিখলাম!

বিকল্পধারার কোনো কোনো ছবির বিষয়বস্তু থেকে নির্মাণ পদ্ধতি, সিনেমায় প্রদর্শন ব্যবস্থা, সব কিছুই ছিল বিকল্প– *"নদীর নাম মধুমতী"*, *"চাকা"*, *"আদমসুরত"* , *"চিত্রা নদীর পারে"*। আবার কিছু কিছু ছবি আংশিক বিকল্প। অর্থাৎ এসব ছবির অর্থায়ন ও প্রদর্শন নানাভাবেই করা হয়েছে। পুরোপুরি বিকল্পধারার না হলেও এসব ছবিও বিকল্পধারার আন্দোলনটাকে সহায়তা ও সমৃদ্ধ করেছে।

স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি হচ্ছে মূলত বিন্দুতে সিন্ধু ধরার চেষ্টা। নানা রকম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রই হতে পারে। নিটোল একরৈখিক কাহিনী, সত্যজিৎ রায়ের *"সদ্গতি"* বা *"পিকু"*। আবার নিরীক্ষাধর্মী কোলাজ চলচ্চিত্র, মৃণাল সেনের *"১৯৭১"* চলচ্চিত্রটির স্বল্পদৈর্ঘ্য খণ্ডগুলো। বাংলাদেশে উভয় ধারাটাই দেখা গেছে। নিটোল গল্প বলার প্রথম ধারাটির উদাহরণ হতে পারে —মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে *"আগামী"* স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটা। নিরীক্ষাধর্মী দ্বিতীয় ধারাটা একটা কবিতা নিয়ে সিনেমা—*"হুলিয়া"*। তবে বাংলাদেশে এই উভয় ধারার স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিগুলোতেই ১৯৭৫-উত্তর আশির দশকের দম-বন্ধ-করা সামরিক শাসনবিরোধী এদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদী আবেগের ছাপটা রয়েছে। অনেক কারিগরি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব ছবি

একটা জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরতে পেরেছিল। অন্যথায় ঠিক ব্যাখ্যা মেলে না যে কেন কারিগরিভাবে দুর্বল এসব স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি এদেশের মানুষের কাছে শুধু গ্রহণযোগ্যও হয়নি, জনপ্রিয়ও হয়েছিল! বিশেষ করে, তরুণ সমাজের কাছে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলো তারা হয়তো এসব ছবিতে কিছুটা খুঁজে পেয়েছিল।

কেউ কেউ বাংলাদেশের বিকল্পধারার চলচ্চিত্রকে এদেশের গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। একটা পার্থক্য হচ্ছে এদেশে আগে কোনো বাণিজ্যিক থিয়েটার ছিল না। যেমনটা কলকাতায় ছিল। ফলে বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারগুলো যখন দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখানো শুরু করেন, তখন তাঁরা একটা ফাঁকা মাঠ পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এদেশের বিকল্পধারার নির্মাতাদেরকে খুবই শক্তিশালী একটা বাণিজ্যিক ঘরানার চলচ্চিত্রের সকল আর্থিক ও সামাজিক শক্তি, তাদের বড় বড় তারকা, মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ, সংবাদপত্র ও কর্পোরেট টিভির সমর্থন, এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করেই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। আর এ পথে প্রতি পদে পদেই ছিল পাথর ছড়ানো!

যেহেতু এসব ছবির কোনো প্রযোজক থাকে না, ফলে অর্থের কমতিটা বিকল্পধারার নির্মাতাদেরকে গায়েগতরে শ্রম দিয়ে খেটে পুষিয়ে নিতে হয়। আমার যেকোনো ছবিই হয়তো তার সাক্ষ্য দেবে। যেমন ধরা যাক *"জীবনঢুলী"* চলচ্চিত্রটার চুকনগর গণহত্যা দৃশ্যটা বা ওই যে হাজার হাজার শরণার্থী দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে এসব দৃশ্য, কিংবা *"রূপসা নদীর বাঁকে"* ছবিতে বাঁধ বাঁধার কাজে হাজার হাজার কৃষকের শ্রম ও অংশগ্রহণ, আপাততদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই বিশাল দৃশ্যগুলো শুট করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়েছিল। একেবারেই না। অর্থ আমাদের কোনো কালেও ছিল না। কেবল বহুদিন ধরে চেষ্টা করে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে, আশেপাশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে বাস করে, তবেই আমরা হাজার হাজার মানুষকে ক্যামেরার সামনে বিনা খরচে অভিনয় করাতে সক্ষম হয়েছিলাম। সিনেমা বানাতে যে সব ক্ষেত্রেই নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তা ঠিক নয়। অন্তত বিকল্প সিনেমার ক্ষেত্রে তো নয়ই। আগেও বলেছি, বিকল্প সিনেমাকে হতেই হবে শ্রমঘন (Labour intensive), পুঁজিঘন (Capital intensive) নয়।

ইদানীং বাংলাদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারা *ক্রাউড ফান্ডিং* বা *গণ অর্থায়নে* তাদের ছবি নির্মাণের চেষ্টা করছেন। উদ্যোগটা ভালো। কারণ তা নির্মাতাকে সরকার বা কর্পোরেট পুঁজির কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনতা দেয়। আমার নিজের শেষের দুটো ছবি,

প্রামাণ্যচিত্র *"সীমান্তরেখা"* ও কাহিনীচিত্র *"রূপসা নদীর বাঁকে"*, অনেকটাই গণ-অর্থায়নে নির্মিত। অবশ্য আমাদের ছবি নির্মাণের সেই প্রথম জমানা থেকেই আমরা জনগণের অর্থেই আমাদের ছবিগুলো তৈরি করেছি—জনগণের দান, অনুদান, ঋণ। তবে আগে তো *ক্রাউড ফান্ডিং* শব্দটার প্রচলন ছিল না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ছবিই ছিল জনগণের অর্থেই নির্মিত, বলতে গেলে এক ধরনের অঘোষিত *ক্রাউড ফান্ডিং* বা গণ-অর্থায়ন।

সিনেমা যেহেতু সামাজিক শিল্প তাই যেকোনো দেশের এক বিশেষ সময়কালের সিনেমা সেই বিশেষ যুগটাকে, তার সকল বৈশিষ্ট্যসহকারেই অনেকটা তুলে ধরে– যেমন *জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট সিনেমা* হিটলার-পূর্ব ভাইমার রিপাবলিক যুগের সামাজিক আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তাবোধকে, *ইতালীয় নিওরিয়ালিজম* যুদ্ধোত্তর ইতালীর বেকারত্ব, দারিদ্র ও সামাজিক অবক্ষয়কে, হলিউডের– *Film Noir* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরের পশ্চিমের নৈরাশ্যময় সময়কালটাকে। বাংলাদেশের বিকল্পধারার ছবিগুলোতে এ পর্যন্ত যে যুগবৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠতে দেখি, মোটা দাগে তা হচ্ছে, ১৯৭৫-য়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা-উত্তর বাংলাদেশের সামরিক শাসকদের দু:সহ সময়কালটা যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলাই যেত না, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জনগুলোই হয়েছিল ভুলুণ্ঠিত। মানুষের কোনোই গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না।

বিকল্পধারার দুর্বলতা ও সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের বিকল্পধারার চলচ্চিত্রগুলোর অবশ্য বেশ কিছু চোখে পড়ার মতো দুর্বলতাও রয়েছে। প্রথম দিককার অনেক ছবিরই প্রিন্ট ছিল ঘোলা, মেছেতা পড়া নেগেটিভ, সাউন্ডট্র্যাকে ঘর্ঘর শব্দ কিংবা সংলাপে ঠোঁট মেলে না, এসব দৃষ্টিকটু কারিগরি দুর্বলতা ছিল বেশ প্রকটই, যা তুলে ধরে যে এসব নির্মাতার অনেকেরই সিনেমা তৈরির প্রযুক্তিগত দিকগুলোর উপর দখল সম্পূর্ণতা পায়নি। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত একটা দেশের কারিগরি সীমাবদ্ধতার সকল উপাদানই যেন এসব ছবির শরীরে ছিল লেপ্টে। অধিকাংশ ছবিরই প্রস্ফুটন হয়েছিল অপেশাদার ল্যাবে। ফলে এসব ছবির কারিগরি মান আসলেই বেশ দুর্বল থেকে গেছে।

পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি আসার ফলে, কারিগরি মান হয়তো কিছুটা ভালো হয়েছে, তবে বিকল্পধারার অনেক ছবিই এখনও রয়ে গেছে কেবলই

ইস্যুভিত্তিক—নারী নিপীড়ন, শিশুশ্রম, যৌতুক, পতিতাবৃত্তি এরকম কোনো সমস্যানির্ভর বিষয় নিয়ে যা অনেকটাই টিভি রিপোর্টাজধর্মী। ঠিক চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি, শিল্প তো নয়ই।

এছাড়া বেশ কিছু চলচ্চিত্র হয়েছে টেলিভিশনের নাটকের মতোই কথাসর্বস্ব যেখানে সংলাপের আধিক্য খুবই বেশি, এক ধরনের "টকীজ" বা *"ক্যামেরা থিয়েটার"*, যা ঠিক সিনেমা হয়ে ওঠেনি। বড় জোর হয়ে উঠেছে, ভালো টিভি নাটক। তাছাড়া অনেক সময় সংবেদনশীলতাতেও সূক্ষ্মতার অভাব ছিল। অনেক ছবিতেই আবেগটা ছিল খুব বেশি, আর তা মূলত মধ্যবিত্তের কাঁচা এক আবেগ। শিল্প হয়ে ওঠার জন্যে আবেগকে পরিশীলিত হতে না দেওয়ার কারণে এসব ছবি উন্নত কোনো শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশের বিকল্পধারার অনেক চলচ্চিত্রই কারিগরি মানে তেমন মসৃণ নয়, আন্তর্জাতিক মানে তো একেবারেই নয়। তবে মনে রাখতে হবে এসব ছবির উদ্দেশ্য তো আন্তর্জাতিক দর্শক ছিল না। এসব ছবি নির্মাণের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের এক বিশেষ সময়কালের দর্শকেরা। ফলে শত কারিগরি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটা মানতেই হবে এসব ছবি বাংলাদেশের মানুষের সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধসমূহকে রক্ষা, প্রচার ও তা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

তবে বিকল্পধারার চলচ্চিত্রগুলোর প্রদর্শন আজও এক বড় সমস্যা। সিনেমা হলগুলো এসব চলচ্চিত্র তেমন দেখায় না, সরকারি বা কর্পোরেট পুঁজির টিভি চ্যানেলগুলোও দেখাতে চায় না তেমন। তাছাড়া বিকল্পভাবে যেসব মিলনায়তনে এসব চলচ্চিত্র দেখানো হয়ে থাকে, সেসব মিলনায়তনও সব সময় পাওয়া যায় না। নানা রকম প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক বাধা রয়ে গেছে এসব ক্ষেত্রে। তাছাড়া মিলনায়তনগুলোর ভাড়াও খুব বেশি। বিকল্পধারার অনেক নির্মাতাই ভাড়ার সে টাকাটা যোগাড় করতে পারেন না। ফলে খুব বেশি সংখ্যক জনগণের কাছে এসব ছবি তেমন পৌঁছায় না।

আসলে বাংলাদেশের বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের অনেক সমস্যাই প্রকৃতপক্ষে অনুন্নয়নের সমস্যা। তবে এর অন্য দিকও আছে। অবিকশিত ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের কারণেই, এবং এদেশে অনেক কিছুই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে সম্ভব হয় বলে,

আমরা হয়তো আমাদের ছবির মালিকানা এখনও নিজেদের হাতে রাখতে পারছি। কিন্তু যখন এদেশে বাজার অর্থনীতি ও কর্পোরেট সংস্কৃতি পুরোপুরিই কায্যকর হবে তখন বিকল্পধারার নির্মাতারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ইচ্ছায় আর তাদের ছবি নির্মাণ ও নিজেরা স্বাধীনভাবে সেসব ছবি প্রদর্শন কতটা করতে পারবেন সেটা দেখবার বিষয় হয়ে রইবে। কর্পোরেট পুঁজি ও সরকারি এস্টাব্লিশমেন্ট নানাভাবেই এসব নির্মাতার স্বাধীনতার আকাশটাকে সঙ্কুচিত করে ফেলতে চাইবে। তার কিছু কিছু আলামত আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি।

বিকল্পধারার সাফল্য ও সম্ভাবনা

এসব নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমার কিছু সাফল্য তো রয়েইছে। প্রথমত, সিনেমা যে নানা দৈর্ঘ্যের হতে পারে এবং সিনেমা যে সিনেমা হলের বাইরে বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন মাধ্যমেই দেখানো যেতে পারে, বাংলাদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারা এদেশে তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। *"আগামী"*-*"হুলিয়া"* এ দুটো ছোট ছবি পুরনো সকল জেলা শহরসহ একশ' ছাপ্পান্নটি উপজেলা, এমনকি অনেক গ্রামেও দেখানো হয়েছে। এমন সব গ্রামেও দেখানো হয়েছে যেখানে মূলধারার সবচেয়ে বাণিজ্যসফল চলচ্চিত্রগুলোও কখনও পৌঁছতে পারেনি। কারণ সেখানে কোনো সিনেমা হল নেই। এমনকি বিদ্যুৎও নেই। অন্তত তখন ছিল না। গ্রামাঞ্চলের আয়োজকেরা জেনারেটর ভাড়া করে আমাদের ছবিগুলো দেখিয়েছেন। তবে কিছু কিছু বিকল্পধারার ছবি অবশ্য সিনেমা হলগুলোও এক সময় দেখিয়েছে, বা বলা চলে, এসব ছবির জনপ্রিয়তার কারণে দেখাতে বাধ্য হয়েছে– *"মাটির ময়না"*, *"লালসালু"*।

ইরানের ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্রনির্মাতা আব্বাস কিয়ারোস্তমী সম্পর্কে জ্যাঁ লুক গদার বলেছিলেন, সিনেমা শুরু হয়েছিল গ্রিফিথের হাত ধরে, শেষ হলো আব্বাস কিয়ারোস্তমীর হাতে। অর্থাৎ হাল্কা ও ছোট নানা ডিজিটাল ক্যামেরায় অসাধারণ সব ছবি তৈরি করে কিয়ারোস্তমী সেই গ্রিফিথের আমল থেকে সিনেমা তৈরিতে চলে আসা বড় ফিল্ম স্টুডিওগুলোর বিশাল বিশাল সব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বৃহদাকার অনুষঙ্গ যে অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন। সেলুলয়েডের সিনেমা আজ প্রায় মৃত। পৃথিবীর দেশে দেশে হাজার হাজার চলচ্চিত্রনির্মাতা এখন ডিজিটাল মাধ্যমেই তাদের চলচ্চিত্রগুলো তৈরি করছেন। বাংলাদেশেও ডিজিটাল সিনেমার প্রবক্তা এদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারাই। তারাই এদেশে প্রথম ডিজিটালে তাদের পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি তৈরি ও প্রদর্শন করে পথ দেখিয়েছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে

চলচ্চিত্র নির্মাণের খরচ কমেছে, চলচ্চিত্র আরও বেশি সহজলভ্য ও গণতান্ত্রিক এক শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠেছে। মূলধারার চলচ্চিত্র জগতের লোকজনেরা ডিজিটাল প্রযুক্তির অনিবার্যতা বুঝতে অনেক বেশি সময় নিয়েছেন। ফলে তারা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়েছেন এবং অনেকেই ডাইনোসরের মতো হারিয়েও গেছেন। বাংলাদেশে ডিজিটাল সিনেমার অগ্রপথিক হিসেবেও বিকল্পধারার নির্মাতারাই ইতিহাসে পাইওনীয়র হয়ে রইবেন।

তবে বিকল্পধারার এক বড় সাফল্য হয়তো এই দুর্ভাগা দেশে, যেখানে ক্ষমতাসীনদের দ্বারা সব সময়েই আমাদের জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়, বা অপচেষ্টা করা হয় প্রকৃত ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেবার, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দুটো ঘটনা ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ ও ১৯৪৭-য়ের দেশভাগ নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র তৈরি করে এদেশের মানুষকে ইতিহাসসচেতন করা। চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্দেরা বলেছিলেন, *"Struggle of people against power is struggle of memories against forgetting"*[৯] (*"ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম"*)। এদেশের জনগণ ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের কথা ভোলেননি। ভোলেননি দেশভাগের বেদনার কথাও। কিন্তু শাসক শ্রেণিগুলোর একটা প্রবণতা থাকে তাদেরকে সেসব ভুলিয়ে রাখা, বা সেসব ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে উপস্থিত করার। এদেশের জনগণ ও স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বিকল্পধারার নির্মাতারা তাই বারে বারেই মুক্তিযুদ্ধ ও দেশভাগের উপর সৎ ও মননশীল ছবি বানিয়ে জনগণের মনে সেসব স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এটাই হয়তো ভবিষ্যতে, এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সবচেয়ে বড় অবদান হয়ে রইবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও দেশভাগ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা ছাড়াও এদেশের সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সমাজে নারীদের দূরবস্থানিয়েও অসংখ্য ছবি তৈরি করে, বিশেষ করে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে, বিকল্পধারার নির্মাতারা এদেশে *"ভাষাহীনদের কণ্ঠে ভাষা যোগাতে"* (*To give voice to the voiceless*) কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছেন। এটাও এই ধারার এক বড় সার্থকতা।

---

[৯] Milan Kundera

বাণিজ্য পুঁজির বিরুদ্ধে শিল্পসম্মত ছবি তৈরি করা কোনো দেশেই তেমন সহজ নয়। বাংলাদেশে তো তা আরও কঠিন কারণ দেশটা দরিদ্র। অন্তত বিকল্প সিনেমা যখন শুরু হয় বাংলাদেশ তখন খুবই দরিদ্র ছিল। সম্পদের অপ্রতুলতা ছিল ভয়াবহ। তবে এ দারিদ্র্য কেবল আর্থিক ক্ষেত্রে নয়, মানসিকতাতেও ছিল দীনতা। যেমন বাংলাদেশে হাজার কোটি টাকার মালিক অনেক ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাদের দুয়েকজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনিও। কিন্তু আমি যখন ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধের উপর আমার মেগা-প্রামাণ্যচিত্র **"১৯৭১"** তৈরি করছি তখন এদের কারো কারো কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলে বলেছিলেন, *"এখন ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না!"* এটা দু:খজনক কেননা ১৯৭১-য়ের যে মুক্তিযুদ্ধের কারণে আজ যারা কোটিপতি, সেই মুক্তিযুদ্ধের উপরই চলচ্চিত্র নির্মাণে তাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া কঠিন! ফলে **"১৯৭১"** ছবিটা বানাতে আমার সময় লেগেছিল সাত বছর! বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের ধনী পরিবারগুলো এখনও কোনো শিল্পকর্মে বিনিয়োগের মানসিকতাটা অর্জন করতে পারেনি। হয়তো আরও দুয়েক প্রজন্ম পরে তারা সেই সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও মানসিকতাটা অর্জন করতে পারবেন।

আর অর্থাভাবে আমাদের ছবি নির্মাণ প্রক্রিয়াটা সব সময়ই থেকেছে খুবই দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ। তারেক মাসুদের *"আদম সুরত"* শেষ করতে সময় লেগেছিল সাত বছর, আমার *"নদীর নাম মধুমতী"* পাঁচ বছর। এই দেরীর কারণে আমরা বিকল্পধারার নির্মাতারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলাবলি করতাম যে, বাংলাদেশে আমাদের *সিনেমা-ভেরিতে হচ্ছে সিনেমা দেরিতে*!

দারিদ্র্য আমাদেরকে শিখিয়েছে মিতব্যয়ী হতে। আমরা হয়তো সিনেমার চলচ্চিত্রনির্মাতাদের *ডগমা-তত্ত্বে* বিশ্বাস করিনি। কারণ শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেদের সৃষ্ট কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির কাছে নিজেরাই আবার বন্দি হয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। তবে দারিদ্র্যের কারণেই আমাদেরকে নিজস্ব কিছু শুটিং রীতি, চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া, বা বলা চলে, নিজস্ব চিত্রভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছে যা মূলত শ্রমঘন, পুঁজিঘন নয়। যেমন মূলধারার কোনো চলচ্চিত্রের শুটিং সাধারণত পঞ্চাশ-ষাট দিন হয়। আমরা আমাদের কোনো ছবির জন্যে পঁচিশ-ত্রিশ দিনের বেশি শুটিং করতে পারি না। আমার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ***"রাবেয়া"***-র শুটিং শেষ করা

হয়েছিল মাত্র একুশ দিনে! ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণের বাড়তি অনেক অনুষঙ্গ, তার মানে খরচও, আমরা বাদ দিতে পেরেছি। যেমন বিশাল প্রোডাকশন ইউনিট, চলচ্চিত্র তারকারা, যারা অযৌক্তিকভাবে ব্যয়বহুল, এমনকি একটা ক্লাপস্টিকও যে অপ্রয়োজনীয় এবং তা বাদ দিলে যে ছবিতে খরচ কমে তা প্রমাণ করা গেছে এবং এসব ছাড়াই যে এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় যা এক সময় অসম্ভব বলে মনে করা হতো তা করে দেখানো সম্ভব হয়েছে।

আসলে অর্থাভাবে ব্যয়বহুল কোনো প্রযুক্তি তো আমরা কখনোই ব্যবহার করতে পারিনি। ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা বরাবরই থেকেছে সেই হতভাগিনী বেহুলার মতোই:

"ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষারে আর বলে
বেহুলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গাজলে"।

আমার ***"হুলিয়া"*** ছবিটা শুট করা হয়েছিল মান্ধাতা আমলের ১৬ মি:মি: একটা পুরনো *বোলেক্স* ক্যামেরা দিয়ে যার ট্যাকোমিটারটাও ছিল আবার ভাঙ্গা! আর পুরনো লেন্সগুলোও ছিল ফাঙ্গাস পরা। অন্য ছবিগুলোর ক্ষেত্রেও তথৈবচ!

বর্তমানে অবশ্য ডিজিটাল প্রযুক্তি আসাতে ছবি নির্মাণ ও প্রদর্শন অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। জ্যাঁ ককতো বলতেন, *ক্যামেরার দাম যখন কলমের দামের মতো হবে, ফিল্মের দাম হবে কালির দামের মতো, কেবল তখনই সিনেমা একটা গণতান্ত্রিক শিল্প হয়ে উঠবে।* বাস্তবে আজ আমরা তার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হাতের মোবাইল ফোনটা দিয়েই এখন কেউ একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরি করে ফেলতে পারেন! পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে আজ সত্যিকার অর্থেই সিনেমার একটা গণতান্ত্রিক শিল্প হয়ে ওঠার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমার নির্মাতারা অনেক সময়ই বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। একটা সমাজকে, তার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে রাখে—ধর্ম। তাই সমাজের নানা অসংগতির সমালোচনা করা হবে অথচ ধর্মের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না এমনটা তো হতে পারে না। *"লালসালু"*,*"মাটির ময়না"*,

"লালন", *"রানওয়ে"*[১০], *"হিল্লা"*[১১] এসব চলচ্চিত্র ধর্মকে সমালোচনা করতে ছাড়েনি। বাংলাদেশে ধর্মের সমালোচনা খুবই স্পর্শকাতর এক বিষয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের শাসক সম্প্রদায় তাদের ধর্ম ইসলামের কোনো সমালোচনা সহ্য করতে নারাজ। তবে বিকল্প সিনেমার নির্মাতারা সাহসের সঙ্গেই সেটা করেছেন। তারা বিশ্বাস করেছেন ধর্মের মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত জোর থাকে সত্যের, সেই জোরেই তাকে টিকে থাকতে হবে। সমালোচনাকে স্তব্ধ করে দিয়ে নয়।

সিনেমা একটা আন্তর্জাতিক শিল্প মাধ্যম। কিন্তু তার একটা "জাতীয়" বা দেশজ চরিত্র রয়েই যায়। এবং সেটা কাম্যও। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটা এখনও অসমাপ্ত। এরকম এক পশ্চাৎপদ সমাজে "জাতীয়তা"-র বিপরীত তো আর "আন্তর্জাতিকতা" নয়, এরকম চেতনায় পশ্চাৎপদ এক সমাজে জাতীয়তার বিপরীত হচ্ছে—সাম্প্রদায়িকতা, যা এক অতীতমুখী ও প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন। ফলে বিকল্পধারার কিছু কিছু ছবিতে- *"নদীর নাম মধুমতী"*, *"মাটির ময়না"*, *"ইতিহাসকন্যা"*,[১২] *"চিত্রা নদীর পারে"*, *"অনিল বাগচীর একদিন"*[১৩], *"গেরিলা"*[১৪], *"আমার বন্ধু রাশেদ"*[১৫]- বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে প্রকাশ ও আকাঙ্ক্ষা, তা কোনো পশ্চাৎপদ চিন্তা ছিল না।

আমাদের মধ্যেকার সহমর্মিতার সম্পর্ককে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার কথা আমরা সেই তরুণ বয়সেই ভেবেছিলাম। সে ইচ্ছারই সাংগঠনিক রূপটা হচ্ছে বিকল্পধারার নির্মাতা ও নিমাণকর্মীদের সংগঠন *বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম*। সংগঠনটা চলচ্চিত্র উৎসব, চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক কোর্স ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করাসহ নানা কর্মসূচি নিয়ে এখনও এদেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। তাছাড়া *বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম* আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে নানা বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্রের সঙ্গে এদেশের তরুণদেরকে পরিচিত করানো ও নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে তাদেরকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করছে। দেশের ফিল্ম ইনস্টিটিউটগুলো ছাড়াও কোনো কোনো

[১০] *"রানওয়ে,"* পরিচালনা তারেক মাসুদ।
[১১] *"হিল্লা"*, পরিচালক রাকিবুল হাসান।
[১২] *"ইতিহাসকন্যা"*, পরিচালনা শামীম আখতার।
[১৩] *"অনিল বাগচীর একদিন"*, পরিচালনা মোর্শেদুল ইসলাম।
[১৪] *"গেরিলা"*, পরিচালনা নাসিরউদ্দীন ইউসুফ।
[১৫] *"আমার বন্ধু রাশেদ"*, পরিচালনা মোর্শেদুল ইসলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ও চলচ্চিত্রের উপর নানা কোর্স ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করছে। এর ফলে অনেক নতুন নতুন ছেলেমেয়েই এখন *এফডিসির* মূলধারার বাণিজ্যিক কাঠামোর বাইরে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে শুরু করছে।

তবে কিছু সমস্যা বিকল্পধারার নির্মাতাদের দিক থেকেও থাকতে পারে—কিছু বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) সমস্যা। অনেক সম্ভাবনাময় বিকল্পধারার নির্মাতাকেই আমরা *এনজিও*দের লোভনীয় প্রচারধর্মী তথ্যচিত্র নির্মাণের জগতে হারিয়ে ফেলেছি। ওখানে অর্থপ্রাপ্তিটা বেশি। আর প্রচুর আয়ের চটকদার কর্পোরেট বিজ্ঞাপনী ছবির জগতে তো আমরা এক ব্যাপক সংখ্যক নির্মাতাকেই হারিয়েছি। পুনে বা বিদেশের অন্যান্য ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে যারা পড়ে এসেছিলেন, তাদের অনেকেই অর্থের আকর্ষণে বিজ্ঞাপনী ছবি বানাতে যেয়ে ওই মধুর আঠাতেই আটকে গেলেন। কষ্ট করে আর শিল্পসম্মত ছবি বানাতে পারেননি, হয়তো বা আর চানওনি। ইদানীং ডক-ল্যাব জাতীয় পশ্চিমা কোনো কোনো দেশের প্রাইভেট টেলিভিশনগুলোর কর্পোরেট পুঁজি এদেশের অনেক তরুণ ও সম্ভাবনাময় বিকল্পধারায় নির্মাতাকে বড় অঙ্কের অর্থের প্রলোভনেও ফেলে দিচ্ছে। এছাড়া অনেকেই *ওটিটি*-র কর্পোরেট জগতে ঢুকে পড়ে চটজলদি নাম ও অর্থ অর্জনের সহজ পথে হাঁটতে চাইছেন। তারা বিকল্প সিনেমার কঠিন পথটাতে হাঁটতে তেমন আগ্রহী নন।

"পপুলার সিনেমা"-র রয়েছে ফর্মুলামাফিক কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, নিজস্ব তারকাপ্রথা, নিজস্ব অতিনাটকীয় চলচ্চিত্রভাষা, ছবির প্রচারের জন্যে বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা ও কর্পোরেট পুঁজির টিভি চ্যানেলগুলোর সঙ্গে দহরম-মহরম। ওদের চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শনেরও রয়েছে নিজস্ব তরিকা, বিশাল নেটওয়ার্ক ও ব্যাপক আম-দর্শক। *"পপুলার সিনেমা"* একটা আলাদা ঘরানাই (Genre)। সে দিক থেকে বিকল্প সিনেমা কোনো দিন *"পপুলার সিনেমা"* হবে না। বড়জোর হয়তো হবে "জনপ্রিয়"। আর সে জনপ্রিয়তাও হবে সমাজের একটা বিশেষ অংশের মধ্যে, মূলত সমাজের মধ্যস্তরের মানুষদের মধ্যে, যারা রাজনীতিসচেতন। দেখা যায়, সমাজের এই স্তরের মাঝে, বিশেষ করে এই স্তরের তরুণদের মাঝে, বাংলাদেশে বিকল্পভাবে নির্মিত অনেক চলচ্চিত্রই আজও বেশ "জনপ্রিয়"। এক সময় দেশে প্রায় বারো শ' সিনেমা হল ছিল, বর্তমানে তা মাত্র শ' দুই-য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং এ সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে *পপুলার সিনেমা* দেখানোর ক্ষেত্রগুলো দেশে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এবং বাংলাদেশে *এফডিসির* পুরনো ঘরানার মূলধারার ফর্মুলামাফিক

বাণিজ্যিক সিনেমার আয়ু যে দ্রুতই ফুরিয়ে আসছে, সেটা বুঝতে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হবার দরকার পড়ে না! ফলে জনগণের ভালো ছবি দেখার নান্দনিক ক্ষুধা মেটানোর দায় বিকল্পধারার নির্মাতাদের উপর ক্রমশই বাড়ছে।

ইদানীংকার তরুণদের কিছু ছবিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির অতিব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে স্পেশাল এফেক্টস ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এখন ছবি যদি শুধু স্পেশাল এফেক্টেরই হয় তা হলে কৃতিত্ব তো সেই সফটওয়্যার নির্মাতার। চলচ্চিত্রনির্মাতার সৃজনশীলতাটা তাহলে কোথায়? বিকল্পধারার নির্মাতাকে তাই হতে হবে সৃষ্টিশীল, মানবিক ও শৈল্পিক। হ্যাঁ, তাকে অবশ্যই চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে নিরীক্ষা করতে হবে, তবে তা যেন কেবলই প্রযুক্তির গিমিক হয়ে না যায়।

আসলে চলচ্চিত্র হচ্ছে বেশ কয়েকটি শিল্পমাধ্যমের এক সমন্বিত রূপ। একটা সমাজে শিল্পের অন্যান্য শাখাগুলো বিকশিত না হলে কেবল চলচ্চিত্রের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। বাংলাদেশের সাহিত্যের কী অবস্থা ? কী অবস্থা আমাদের ধ্রুপদী সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের? ফলে সিনেমা, যা বেশ কয়েকটি শিল্পের সমারোহে এক যৌগিক শিল্প, হঠাৎ করে এদেশে তা বিরাট কিছু করে ফেলবে এটা আশা করা ঠিক নয়।

কার্ল মার্কস তাঁর সময়কার বিপ্লবী কিছু জার্মান তরুণদের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন ওদের কবিতার *"শেক্সপীয়রীয়"* না হয়ে *"শীলারীয়"* হবার প্রবণতাটা বেশি। অর্থাৎ গভীর শিল্প হবার চেয়ে ওসব কবিতায় প্রচারধর্মিতা বেশি। বাংলাদেশের বিকল্পধারার কিছু কিছু ছবিতে ওরকম *"শিলারীয়"* মানে প্রচারধর্মিতাই যেন বেশি থেকেছে, *"শেক্সপীয়রীয়"* বা শৈল্পিক গভীরতার চেয়ে। তবে কিছু ছবিতে আবার জীবনের গভীরতর দিকগুলো স্পর্শ করার চেষ্টাও আছে– *"চাকা"*, *"লালন"*, *"মাটির ময়না"*।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সত্যকে দেখবার চোখটাওশ্রেণীবিভক্ত। সমাজের বাস্তবতাকে দেখানো, বা কীভাবে তা দেখানো হচ্ছে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে নির্মাতার শ্রেণি অবস্থানের উপর। পর্দায় প্রকৃত সমাজ সত্যকে তুলে ধরার কাজটা চিরকালই ছিল বেশ কঠিন। কোনো কোনো নির্মাতা শাসকশ্রেণির আনুকূল্য পেতে বা সস্তা জনপ্রিয়তার আকর্ষণে "ফীল গুড" জাতীয় পুতপুতু মার্কা ছবি বানিয়ে থাকেন। সিনেমায় সেটা আবার বেশ সহজ কাজই। তবে সমস্যা হচ্ছে এসব "ফীল গুড"

জাতীয় ছবি মূলত কৃত্রিম, সমাজের প্রকৃত বাস্তবতার কোনো প্রতিফলন নয়। ফলে তা আর শিল্প হয়ে ওঠে না।

কর্পোরেট পুঁজি, সরকারি এস্টাব্লিশমেন্ট ও বিকল্প সিনেমা

পুঁজির একটা নোংরা দিক আছে। সব কিছুকেই তা নোংরা করে ফেলে। সিনেমা তৈরিতে বেশ বড় অঙ্কের অর্থই লাগে। তাই পুঁজির জগৎটাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কর্পোরেট পুঁজি নানাভাবেই বিকল্প সিনেমার ক্ষতি করে থাকে। এদেশের বিত্তশালী সংস্থাগুলো বা তাদের পেছনের বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ফোন কোম্পানিগুলো, যাদের বিশাল পুঁজির আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, তারা সম্ভাবনাময় কিছু বিকল্পধারার নির্মাতাকে বিজ্ঞাপনচিত্রের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা প্রসারের কাজে নিয়োজিত করে ফেলে এবং এসব নির্মাতার তৈরি অনেক দুর্বল কাজকেও কর্পোরেট পুঁজির অর্থানুকূল্য পাওয়া বাজারী বড় সংবাদপত্রগুলো বা প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলো নানা রকম পুরস্কার-স্বীকৃতি এসব দিয়ে এস্টাব্লিশমেন্টের অংশ করে ফেলে। আর প্রকৃত বিকল্পধারার নির্মাতাদের ছবি সম্পর্কে তারা, পরিপূর্ণ নিস্পৃহতা দেখিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে, নীরবতা দিয়ে ধ্বংস কওে (*kill by silence*), অথবা তাদের সমাজসচেতন ভালো ছবিগুলোকে চোখের ও স্মৃতির আড়ালে ঠেলে দিয়ে শেষ করে দিতে চায়। আর এদেশের কর্পোরেট পুঁজিলালিত প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে মোটেই বিকল্পধারাবান্ধব নয় তা বোঝা যায় এ থেকে যে বিকল্পধারার ছবিগুলো তারা তাদের চ্যানেলগুলোতে প্রায় দেখায়ই না। অথচ জার্মানি, ফ্রান্স এসব দেশের প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলো সে দেশের বিকল্পধারার ছবিগুলো যে কেবল নিয়মিতভাবে দেখায় তাই-ই নয়, সেসব ছবির পৃষ্ঠপোষকতাও করে থাকে। বিশেষ করে প্রামাণ্যচিত্রকে। অথচ বাংলাদেশের প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলো প্রামাণ্যচিত্র তৈরিও করে না, পৃষ্ঠপোষকতাও করে না। যেমনটি বিদেশি চ্যানেলগুলো করে থাকে। এসব ছবি নিয়ে, এমনকি কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানও করে না। এসব ছবির সংবাদও এদেশীয় চ্যানেলগুলো তেমন দেয় না।

বাংলাদেশে ভালো ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আরেক সমস্যা, এদেশের মান্ধাতা আমলের সেন্সর ব্যবস্থা। চলচ্চিত্রে আদৌ কোনো সেন্সর প্রথা থাকা উচিত কি না তা নিয়েই আমাদের প্রশ্ন আছে। তার ওপর বাংলাদেশের সেন্সর নীতিমালার মূল উৎসটা

হচ্ছে সেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগের *"সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮"*, যে আইনটি বৃটিশ প্রভুরা করেছিল যেন চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী এক মাধ্যমে নেটিভরা এমন কোনো বেয়াদব বক্তব্য তুলে ধরতে না পারে যা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে। এই আইনটির উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানী আধা-ঔপনিবেশিক শাসনামলে তৈরি করা হয়েছিল ১৯৬৩ সালের ফিল্ম সেন্সর আইন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই সেন্সর আইনটারই এখানে-ওখানে যৎসামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটানো হলেও, যেমন *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ বিধিমালা ১৯৭৭* অথবা *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ কোড*, সেসবের মূল নির্যাসটা কিন্তু সেই একই রয়ে গেছে—কর্তৃত্ববাদী ও নিষেধমূলক। অন্তত আধুনিক ও গণতান্ত্রিক নয় মোটেই।

শ্লীলতা-অশ্লীলতা খুবই আপেক্ষিক শব্দ। তবে সেটা মূলত বাণিজ্যিক ঘরানার ছবিগুলোর সমস্যা। কারণ তারা অনেকেই বাণিজ্যিক লাভের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রে স্থূলভাবে যৌনতার ব্যবহার করে থাকেন। বিকল্পধারার নির্মাতারা এসব করেন না। বিকল্পধারার নির্মাতারা সেন্সর বোর্ডের হাতে যে ব্যাপারে বেশি ভুগে থাকেন তা হচ্ছেরাজনৈতিক সেন্সর। *"আগামী"*, *"একাত্তরের যীশু"*[১৬], *"নদীর নাম মধুমতী"* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এরকম একাধিক ছবি সেন্সর বোর্ড বিভিন্ন সময়ে আটকে দিয়েছিল। এ বড় অদ্ভুত যে একটা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া একটা স্বাধীন দেশের সেন্সর বোর্ড সে দেশেরই মুক্তিযুদ্ধের উপর কোনো ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে! আমার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক *"নদীর নাম মধুমতী"* চলচ্চিত্রটার ব্যাপারে সেন্সর বোর্ড দশটা ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছিল। ইংরেজি কাগজের এক সাংবাদিক কৌতুক করে লিখেছিলেন *"দি টেন কমান্ডমেন্টস!"* পরে আমি হাইকোর্টে রীট করে ছবিটা ছাড়াতে সক্ষম হই। ইতিমধ্যে আমার জীবন থেকে দুটি বছর হারিয়ে গেল! আবার সেন্সরের বাইরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপেও ছবি নিষিদ্ধ করার উদাহরণ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর নির্মিত আমার *"কর্ণফুলীর কান্না"* প্রামাণ্যচিত্রটা নিষিদ্ধ করা হয় সেন্সর বোর্ড দ্বারা নয়, সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে। জানা যায়, সেনাবাহিনীর উদ্যোগে *"কর্ণফুলীর কান্না"* ছবিটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে এ ছবিটাও আমাকে হাইকোর্টে রীট করে মুক্ত করতে হয়েছিল। সাধারণভাবে সেন্সর বোর্ড এদেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিয়ে কিছু বলা তেমন পছন্দ করে না। তাদের পছন্দ নয় ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাকেও। তাদের মতাদর্শগত ভিত্তি হচ্ছে,

[১৬] *"একাত্তরের যীশু"*, পরিচালনা নাসিরউদ্দীন ইউসুফ

বাঙালি মুসলমান শাসকশ্রেণির মতাদর্শটি—বাঙালিত্ব, কিন্তু সঙ্গে কিছুটা ইসলামী সাম্প্রদায়িকতার ভিয়েন।

আবার সেন্সর সনদ পেয়েও স্থানীয় আমলাতন্ত্র বা ইসলামী মৌলবাদীদের বাধার কারণে কোনো কোনো ছবি বাংলাদেশের কোনো কোনো জায়গায় দেখানো যায়নি, এরকম অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে। ছবিটার সেন্সর সনদ পাওয়া সত্ত্বেও *"লালসালু"* চলচ্চিত্রটার প্রদর্শনী সিলেটে ইসলামী মৌলবাদীদের বিরোধিতার কারণে করা যায়নি। মৌলবাদীরা অজুহাত দেখিয়েছিল যে সিলেটে একটা বড় মাজার রয়েছে, ফলে মাজারবিরোধী *"লালসালু"* চলচ্চিত্রটি সিলেটে দেখানো যাবে না! আর খুলনাতেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন *"লালসালু"*-র শো বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ ইসলামী মৌলবাদীরা নাকি হুমকি দিয়েছিল যে *"লালসালু"*-র শো হলে মিলনায়তনে বোমা মারা হবে! এই বোমার হুমকীর ব্যাপারটি হয়তো কেবলই ফাঁকা আওয়াজ ছিল না! কারণ এর কিছু দিন পরেই খুলনায় *"লালসালু"* ছবিটি প্রদর্শনের ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন *খুলনা প্রেস ক্লাবের* সে সময়কার সভাপতি সাংবাদিক মাণিক সাহাকে ইসলামী জঙ্গীরা প্রকাশ্যে দিনের বেলায় বোমা মেরে হত্যা করেছিল।

সেন্সরবোর্ডের কিছু স্থূল গ্রাম্যতাও আছে। যেমন *বিএনপি* সরকারের আমলে আমার *"নদীর নাম মধুমতী"* ছবিটাকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেন্সরবোর্ড যেসব আপত্তি তুলেছিল তার মধ্যে একটা আপত্তি ছিল, ছবিতে এত নৌকা কেন!! এখন গ্রাম-বাংলা নিয়ে ছবি, ছবির নাম *"নদীর নাম মধুমতী"*, নৌকা তো থাকতেই পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের কোন্ নদীর শট আপনি তুলতে পারবেন কোনো নৌকা ছাড়া!!

এখন কারা হন সেন্সরবোর্ডের সদস্য? মূলত সরকারি কিছু আমলা, আর সরকারি দলের স্বল্পমেধার কিছু পদলোভী বুদ্ধিজীবী যাঁদেরকে অন্য কোথাও আর বসানো যাচ্ছে না। এঁরাই হচ্ছেন বোর্ডের সদস্যদের বড় অংশ। আর থাকেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কিছু অফিসার। এরা সবাই সেন্সরবোর্ডের *"যথা নিযুক্তোহমি তথা করোমি"* অর্থাৎ সরকারে যে দল আছে সেই কর্তাদের ইচ্ছায় কর্ম করে থাকেন। আসলে সেন্সর ব্যবস্থাটাই, সেই প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে এই আধুনিক যুগেও, সব সময়ই রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে ছিল শাসনের এক বড় অস্ত্র। গ্রীক নগররাষ্ট্রে নগরপালের পরেই ছিল *সেন্সর* পদটার গুরুত্ব। এযুগেও সেন্সরের এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রটি কোনো শাসকশ্রেণিই যে সহজে হারাতে চাইবেন না সেটাই স্বাভাবিক।

তবে ইদানীং ডিজিটাল সিনেমা এবং ইন্টারনেটে *ইউটিউব*, *ফেসবুক* ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ একটা দ্রোহমূলক কাজ খুব সফলভাবেই করছে।

তা হচ্ছে, তারা সরকারি সেন্সর ব্যবস্থাকে কার্যত প্রায় অর্থহীন করে তুলেছে! এই নতুন সুযোগটাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের এক বিশাল সম্ভাবনা বিকল্পধারার নির্মাতাদের সামনে আজ এসে উপস্থিত হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে *ক্রাউড ফান্ডিং* বা গণঅর্থায়নের কাজেও আজ ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বিকল্পধারায় একাধিক ছবি হয়েছে, হচ্ছে, যার অর্থায়নের মূল ভিত্তিটা হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই *ক্রাউড ফান্ডিং* বা গণঅর্থায়ন।

চলচ্চিত্র কেবল একটা শিল্প নয়, একটা বাণিজ্যও। আর ব্যবসা ব্যবসায়ীরাই করবে। এ ব্যাপারে সরকারের খুব বেশি কিছু করার নেই। তারপরও আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটা উন্নয়নশীল দেশে সরকারই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠান—আর্থিক ও আইনি ক্ষমতায়। তাই সরকারের কাছে কিছু প্রত্যাশা করাই যায়। দেশে চলচ্চিত্রের সুস্থ বিকাশে সরকার কিছু কাজ করতে পারেন যেগুলো ব্যবসায়ীরা কখনোই করবে না। ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকার মূলত দুভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথম হচ্ছে দেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসার ঘটানো, আর দ্বিতীয় হচ্ছে ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। বাংলাদেশে আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষা শিক্ষার বিকাশ ঘটানোটা খুবই দরকারি হয়ে পড়ছে। সরকার অবশ্য সম্প্রতি দেশে একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদ্যোগটা ভালো। তবে সরকারি ফিল্ম ইনস্টিটিউটটা এখন অবশ্য কিছু মেধাহীন শিক্ষক ও দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের খপ্পরে পড়েছে। তাছাড়া ষোলো কোটি লোকের দেশে একটা মাত্র ফিল্ম ইনস্টিটিউট যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আরও ফিল্ম ইনস্টিটিউটের। এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য শহরেও। সরকারের আরেকটি কাজ হতে পারে ভালো চলচ্চিত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়া, যেটা বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর কয়েকটা পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান দেবার মাধ্যমে ইদানীং দিয়ে আসছেন। সরকারের অনুদান প্রথাটা ভালো। তবে চলচ্চিত্র নির্মাণে যাদের কোনোই অভিজ্ঞতা বা উৎকর্ষতা নেই, কেবল দলীয় বিবেচনায় সেরকম কিছু ভুল ব্যক্তি ও ভুল ছবিকে অনুদান দেওয়ায় প্রতি বছরই এই গরিব দেশের জনগণের করের অনেক টাকাই চিরকালের জন্যে *গন উইথ দি উইন্ড* হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে হচ্ছে! অনুদানের এই ভালো প্রথাটা ঠিকমতো চালাতে হলে এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আরও সৎ, চলচ্চিত্র বিষয়ে সুশিক্ষিত ও আরও সুবিবেচক হতে হবে।

আসলে এদেশে সুস্থ চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির বিকাশে সরকার নিজেও একটা সমস্যা। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মূল কেন্দ্র *এফডিসির* একজন মহাপরিচালক থাকলেও চলচ্চিত্র বিষয়ক মূল সিদ্ধান্তগুলো আসে মূলত তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে। এখন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী মন্ত্রী বা আমলারা আর যাই হোক আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষার বিষয়ে তেমন সুশিক্ষিত নন। ফলে তাঁদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোও থাকে ভুলভ্রান্তিতে ভরা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যেসব ভুলের একটা সামগ্রিক যোগফল হচ্ছে বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রের আজকের এই দেউলিয়াত্ব। প্রযোজক ও পরিচালক সমিতির নেতারাও এ সঙ্কট থেকে উত্তরণে পথ দেখানোর মতো তেমন মেধাবী নন। তাছাড়া *এফডিসির* বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগও সব সময় ছিল এবং এখনও আছে।

জাতীয় পুরস্কার যদিও কোনো শিল্পকর্মের নির্ধারক কোনো মাপকাঠি নয়, তবুও আমরা লক্ষ করেছি সরকার বিভিন্ন সময়ে বিকল্পধারায় নির্মিত ভালো ছবিগুলোকে বঞ্চিত করে নানা লবিংয়ের কারণে বা নানা দুর্নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ধারার দুর্বল সব চলচ্চিত্রকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার যেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এ ধরনের অবিচার ও নীতিগর্হিত কাজ রীতিমতো এক অপরাধই।

পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই যেমন একটি জাতীয় আর্ট গ্যালারী ও একটি ন্যাশনাল থিয়েটার থাকে তেমনই থাকে একটি ন্যাশনাল ফিল্ম সেন্টার। প্রতিটা বড় বড় সংস্কৃতিসচেতন শহরেই এরকম ফিল্ম সেন্টার রয়েছে, যেমন লন্ডনের সাউথব্যাঙ্কে *"ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার"*, প্রতিবেশী দেশের কলকাতা শহরে *"নন্দন"*। দু:খজনক যে, আমাদের ঢাকাতে তেমন কিছু নেই। ফিল্ম সেন্টার হচ্ছে মূলত একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম কমপ্লেক্স যেখানে দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবসমূহ অনুষ্ঠিত হবে, থাকবে একাধিক ছোটবড় মিলনায়তন, পাঠাগার, ক্যাফেটেরিয়া ও অনেকখানি খোলামেলা জায়গা যা হবে আগামী দিনের চলচ্চিত্রকারদের আলাপ-আলোচনার সূতিকাগার। দেশে একটা ন্যাশনাল ফিল্ম সেন্টারের ব্যাপারে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের কাছ থেকে আমরা একাধিকবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। আমি তাই মাঝে মাঝে ভাবি, সভা-সমিতিতে আমাদের দেশের মন্ত্রী-নেতারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন সে সব কী নিতান্তই *"অমৃতাং মন্ত্রীতাষিতম"*! না কী গল্পের সেই কাজীর

গরু, যা কেতাবে আছে গোয়ালে নেই! প্রতিশ্রুতিগুলো মানার ক্ষেত্রে কী কারোরই কোনো বাধ্যবাধকতা নেই?!

সরকারের মালিকানায় রয়েছে *বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি*। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক টেলিভিশন চ্যানেল ভালো চলচ্চিত্রসমূহ দেখিয়ে দর্শকদের রুচি উন্নত করে থাকে। *বিটিভি*ও দেশ-বিদেশের উন্নত চলচ্চিত্রসমূহ দেখিয়ে এদেশের মানুষদের চলচ্চিত্ররুচি উন্নত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারত। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখেছি *বিটিভি* এদেশের বিকল্পধারার শিল্পসম্মত ছবিগুলো দেখাতে তেমন আগ্রহী নয়। বরং *এফডিসির* বস্তাপচা সব সিনেমাকে প্রতি সপ্তাহে দেখানোতেই তারা বেশি তৎপর থাকে। অভিযোগ রয়েছে নেপথ্যে কাজ করে অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের নানা কারসাজি।

দেশে ইসলামী মৌলবাদ যে হারে বাড়ছে তাতে *"লালসালু"*, *"মাটির ময়না"*, *"লালন"* ও *"রানওয়ে"*-র মতো ছবি আজ খুবই প্রয়োজন। এদেশের শাসকদের বুঝতে হবে তাদের দশটা বক্তৃতা যা না পারে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে এ ধরনের একটা চলচ্চিত্রের প্রদর্শন তার চেয়ে অনেক ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। একটা আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারকে বুঝতে হবে যে একজন স্বাধীন চলচ্চিত্রনির্মাতার কণ্ঠস্বর আসলে গণতন্ত্রেরই কণ্ঠস্বর। তাকে রুদ্ধ করে, বিকশিত হতে না দিলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে না।

আর বিকল্প নির্মাতাদেরও বুঝতে হবে যে তাদের প্রাণভোমরাটা আসলে সরকারি স্বীকৃতি বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে নেই। রয়েছে এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের মাঝে। মধ্য-আশির দশকে সামরিক শাসনবিরোধী এ দেশের মানুষের গণতন্ত্রের জন্যে সাহসী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে বিকল্প সিনেমার জন্ম, এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও সমাজপ্রগতির আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শিল্পের সেই প্রতিবাদী ধারাটাকে বাঁচিয়ে রাখাটাও তাদের এক কর্তব্য হয়ে রয়েছে। আগামীতেও রইবে।

আর বিকল্পভাবে শুধু একবার একটি ছবি বানানোই যথেষ্ট নয়। সব সময়ই বিকল্প থাকাটা জরুরি। কারণ বিকল্পও এক সময় প্রতিষ্ঠান হয়ে যেতে পারে। হয়ও। ফলে বিকল্প নির্মাতাদের সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে যাতে তারা তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সব সময়ই যেন বিকল্প থাকতে পারেন।

ডিজিটাল বিপ্লব চলচ্চিত্রনির্মাতাদের সামনে আকাশের মতোই অসীম এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। প্রথমত, নানা রকম সফটওয়্যারের কল্যাণে ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্দায় ইদানীং প্রায় সব কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব। এমনকি আদৌ কোনো শুটিং না করেও! দ্বিতীয়ত, অন-লাইনে ছবি বিতরণে বর্তমানে এমন কিছু সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে যা অতীতে কখনোই ছিল না। ইন্টারনেট ও সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর মধ্য দিয়ে এখন যেকোনো ছবিকে, বাস্তবেই, কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। আগামীতে এ সম্ভাবনা আরও বাড়তেই থাকবে।

বিকল্প সিনেমা: নতুনদের প্রতি

"স্বভাবকবি" হওয়া যায়, কিন্তু স্বভাব চলচ্চিত্রকার হওয়া যায় না। চলচ্চিত্র একটা প্রযুক্তিগত মাধ্যম। এবং উচ্চ প্রযুক্তির জটিল এক শিল্পমাধ্যম। সেই প্রযুক্তিটা আপনাকে শিখতেই হবে।

তবে প্রযুক্তি ছাড়াও সিনেমা যেহেতু একটা সামাজিক শিল্প মাধ্যমও, সেজন্য একজন বিকল্পধারার নির্মাতাকে কেবল লেন্স, লাইট, ক্যামেরা বা কালার গ্রেডিং বুঝলেই চলবে না। তাকে হতে হবে সমাজ-সংলগ্ন। এদেশের জনগণের সামাজিক ইতিহাস ও জনগণের জীবন তাকে জানতে হবে। একজন স্বাধীন নির্মাতা হিসেবে তার ছবির জন্যে তহবিল সংগ্রহ, ছবি প্রদর্শন ও বিতরণের ব্যাপারে উদ্যোক্তাসূলভ কিছু গুণ থাকাটাও একজন বিকল্পনির্মাতার জরুরি। তাকে হতে হবে একজন সফল ও দক্ষ উদোক্তাও। এখন অনেক সৃজনশীল শিল্পীরই উদ্যোক্তাসুলভ এই গুণগুলো তেমন থাকে না। ফলে তারা ব্যর্থ হন।

তাছাড়া তাকে যৌথভাবে কাজ করা শিখতে হবে। কারণ কেউ একা একা বসে একটা ছবি আঁকতে পারেন, একটা কবিতা লিখতে পারেন। কিন্তু সিনেমা একটা সামাজিক শিল্পমাধ্যম এবং সিনেমা তৈরিতে অন্য মানুষদের প্রয়োজন। প্রয়োজন যৌথতা। জন ফোর্ডকে একবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন, সিনেমা বানানোর সবচেয়ে ভালো দিক কী? *"অনেকের সঙ্গে কাজ করা যায়,"* জন ফোর্ডের উত্তর। প্রশ্নকারীর পরের প্রশ্ন ছিল, সিনেমা তৈরির সবচেয়ে খারাপ দিক কী? *"অনেকের সঙ্গে কাজ করতে হয়!"* বলেছিলেন জন ফোর্ড।

যৌথতাবোধটা তাই খুবই জরুরি। কিন্তু বাঙালিমানসে যৌথভাবে কাজের ঐতিহ্যটা বেশ কম। ওই যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, *বাঙ্গালী যখন একা লড়ে তখন দশজনের মতো লড়ে, আর যখন দশজনে লড়ে তখন একজনের মতোও লড়ে না!* আমাদের জাতীয় গড়নে যুথবদ্ধভাবে কাজের চেতনার ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু বিকল্প সিনেমার আন্দোলন কেবল যৌথতার মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে পারে। কোনো একক পরিচালক, তা তিনি যতই প্রতিভাবান বা সাংগঠনিকভাবে দক্ষ হোন না কেন, এককভাবে এ ধারাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। *United we win, divided we fall*, এই পুরনো আপ্তবাক্যটি মিথ্যে নয় মোটেই। এবং সেটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে।

অর্থের সংকট এক বড় বাধা। যদিও বিকল্প সিনেমাওয়ালারা বেশ কম খরচে ছবি নির্মাণ করতে পারেন, কিন্তু ওটুকু অর্থও তো যোগাড় করতে হয়। এ ব্যাপারে ব্যাংক বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া যায় না। অপ্রাতিষ্ঠানিক, মানে ব্যক্তিগত ঋণ, দান, অনুদানই একমাত্র ভরসা। মনে রাখতে হবে ছবি নির্মাণের কাজ তো এক আনন্দময় সৃষ্টিশীল কাজ। সকলেই সৃজনশীল কাজ করতে চয়। কিন্তু ছবির জন্যে অর্থের সংগ্রহটাই বড় এক সংগ্রাম হিসেবে সামনে উপস্থিত হয়। এ এক চরম বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ সংগ্রাম। বিকল্পধারার নির্মাতাদের এ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ হতে হবে। স্বল্পব্যয়ে ছবি নির্মাণের কায়দাকানুনগুলো শেখারও কোনো বিকল্প নেই। কারণ বাজেট যত বড় হবে ততই কোনো না কোনো অর্থলগ্নীকারকের উপর নির্ভরতা বেড়ে যাবে। আপনি আপনার শিল্পীর স্বাধীনতা হারাবেন।

বিকল্পভাবে ছবি দেখিয়ে লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত আনা, এ আসলেই বেশ বড় রকম এক লড়াই। এবং আমি এ ব্যাপারে কোনো ভুল ধারণা দিতে চাই না। শিল্পসম্মত ছবি বানিয়ে অর্থ আয়ের স্বপ্ন, বাংলাদেশে অন্তত, সুদূরপরাহত। কাজটা খুবই কঠিন। এবং আমরা নিজেরাও তাতে সব সময় সফল হই না। তবে অর্থ তেমন না এলেও সান্ত্বনা এটাই যে একটা শিল্প তো সৃষ্টি হলো। জীবনের হিসাবের খাতায় সে লাভও তো কম নয়!

সৃজনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে একজন দক্ষ বিকল্পধারার নির্মাতার থাকতে হবে এস্টাব্লিশমেন্টকে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহারের দক্ষতাও। *এফডিসির* ভেতরে ও বাইরে

থেকে, মন্ত্রণালয়ের বাইরে ও ভেতরে থেকেও কাজ করা জানতে হবে। যেমন সরকারি অনুদান গ্রহণ আবার নিজের পুরো স্বাধীন সত্তাটা বজায় রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ। এসব ব্যাপারে তাই প্রয়োজন সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ। সরকারের সহায়তা নিতে হবে, আবার সরকারি এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে ধরা দিলেও চলবে না! নিজের স্বাধীনতাটাকে বজায় রাখতে হবে পুরোদস্তর। এ এক জটিল দ্বান্দ্বিক পথ। এবং কেবল বুদ্ধিমান, মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নির্মাতারাই সূক্ষ্ম ও দ্বান্দ্বিক এই দড়ি পথে হাঁটতে পারে। অন্যথায় পা হড়কে এস্টাব্লিশমেন্টের সাংস্কৃতিক হেজিমনির অংশ হয়ে ওঠার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

আর প্রতিষ্ঠান থাকলেই তার বিকল্পও থাকবে। প্রতিষ্ঠান সুযোগমতো তার রূপ, চরিত্র ও ধরন পাল্টাবে। বিকল্পধারাকেও সেটা করা শিখতে হবে। এ এক নিরন্তর ছায়াযুদ্ধ। নিরন্তর এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। এ ব্যাপারে প্রয়োজন সর্বদাই সচেতন থাকা এবং কোনো অবস্থাতেই এস্টাব্লিশমেন্টের সঙ্গে আপস বা এস্টাব্লিশমেন্টের অংশ না হয়ে পড়া। মনে রাখতে হবে বিকল্প সিনেমা হচ্ছে সারা জীবনই স্রোতের বিপরীতে নৌকা বাওয়া। প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নবায়ন করা। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে থেকে, বাইরে থেকে, অন্তর্ঘাতমূলক শিল্প সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানের ভাবাদর্শকে দুর্বল করে দেওয়া। এ এক সাংস্কৃতিক শ্রেণি সংগ্রামই। আর বিকল্প সিনেমার লক্ষ্যও তো তাই। সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে আমরা নিজেরাই যেন প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়ে যাই! সর্বদাই যেন থাকতে পারি—বিকল্প।

সিনেমা হল এসব ছবি দেখায় না। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও দেখাতে চায় না। তাই সামাজিক গণমাধ্যমই বর্তমানে বিকল্পধারার নির্মাতাদের ভরসার এক বড় জায়গা হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তি আর আকাশ সংস্কৃতির আজ অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশেও। সামাজিক মাধ্যমগুলোই আজ যেন পরিণত হয়ে পড়েছে গণমাধ্যমে। একে সঠিকভাবে ব্যবহারের কৃৎকৌশলগত দক্ষতাগুলোও বিকল্পধারার নির্মাতাদেরকে তাই অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশে ইদানীং *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*সহ বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ চালু হয়েছে। দেশে সরকারিভাবে একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও বেসরকারিভাবে আর দুয়েকটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট কাজ করছে। নতুন নতুন

ছেলেমেয়েরা চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসছে। আর ডিজিটাল প্রযুক্তি চলচ্চিত্র নির্মাণকে আজ অনেক সহজলভ্যও করে দিয়েছে। ছবি তাই অনেক হয়েছে। হচ্ছেও। তবে ওই যে জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন *"সকলেই কবি নয়/কেউ কেউ কবি"*। তো নতুন নতুন নির্মাতাদের মধ্যে কয়জন সত্যিকারের সৃজনশীল শিল্পী রয়েছেন সেটা বোঝা যাবে কেবল আগামী দিনগুলোতে।

একজন বিকল্পধারার নির্মাতাকে তার ছবির অনেক কাজ তাকে নিজেকেই করতে হয়—ছবির জন্যে গবেষণা, চিত্রনাট্য লেখা, ছবির লোকেশন, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও লেন্স বাছাই, গায়েগতরে খেটে ছবির শুটিংটা শেষ করা। নিজেই নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে সে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থাটাও নিজেকেই করতে হয়। আসলে বিকল্প সিনেমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো। তাই আত্মত্যাগের মানসিকতাটা থাকতে হবে। গীতার ওই উপদেশটি মনে রাখাটা ভালো হবে; *"কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়"*। পাওয়া না-পাওয়ার গেরস্ত হিসাব যারা করতে চান, বিকল্প সিনেমা ঠিক তাদের জন্যে নয়। ওই যে দেবযানী কচকে যা বলেছিল, এ বিদ্যাও দেবে তেমনি, কেবল *"দুঃখ নব নব"*। ঋত্বিক ঘটকের উদাহরণ তো বাঙালির সামনেই আছে! আর লাভ-লোকসানের গেরস্ত হিসাব দিয়ে কখনোই কোনো মহৎ শিল্প সৃষ্টি করা যায়নি। অন্তত সিনেমায়।

কোনো সমাজেই সৃজনশীল মানুষের সংখ্যা খুব বেশি থাকে না। যাদের মাঝে সেটা থাকে সমাজের উচিত তাদের সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়তা করা। কিন্তু বাংলাদেশ তেমন শিল্পবান্ধব দেশ নয়। টিকে থাকতে হলে তাই বিকল্পধারার নির্মাতাদেরকে নিজেদেরই পারস্পরিক সহযোগিতায় মাধ্যমে এগিয়ে যাবার মানসিকতাটা অর্জন করতে হবে। একা একা লড়তে গেলে *"মহাভারত"*-য়ের অভিমন্যুর মতোই অবস্থা হবে। কর্পোরেট পুঁজির বুহ্যের ভেতরে আপনি হয়তো ঢুকতে পারবেন, কিন্তু বের আর হতে পারবেন না!

বিকল্প সিনেমার এক ভালো লালনক্ষেত্র ও প্রকাশমাধ্যম হতে পারে প্রামাণ্যচিত্র। এদেশে সরকারের *ডিএফপি*[১৭], *শিশু একাডেমী*[১৮] বা *বিটিভি*তে কিছু তথ্যচিত্র তৈরি করা হয় বটে কিন্তু সেসব তথ্যচিত্রকে বড়জোর "ফুটেজ" বলা চলে, ঠিক পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্যচিত্র নয়। বরং বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্র ভালো যা তৈরি হয়েছে এদেশের বিকল্পধারার নির্মাতারা স্বাধীনভাবেই তা বানিয়েছেন—*"মুক্তির গান"*, *"১৯৭১"*, *"সীমান্তরেখা"*, *"সেই রাতের কথা বলতে এসেছি"*।

প্রথমে বড় ছবি না বানিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানানোই ভালো। *"আগামী"*-*"হুলিয়া"* এসব স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির মাধ্যমেই একদিন এদেশে বিকল্প সিনেমার যাত্রাটা শুরু হয়েছিল। স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি তৈরির সুবিধাগুলো হচ্ছে পুঁজি কম লাগে, ফলে আর্থিক ঝুঁকিটা থাকে কম। তাছাড়া হাত মক্কো করে শেখার সুযোগটাও থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা বাড়লে তখন বড় ছবি তৈরি করাই ভালো।

শেষের আগে

বাংলাদেশে এ কথা হয়তো সকলেই স্বীকার করবেন যে, এদেশের রুচিহীন চলচ্চিত্রের জগতে বিকল্প চলচ্চিত্রই বর্তমানে একমাত্র আশার আলো—মেধায়, আন্তরিকতায়, শিল্পের সুষমায়। এই ক্ষীণ প্রদীপটা বাঁচিয়ে রাখাটা তাই জরুরি।

কেউ কেউ বলে থাকেন বিকল্প সিনেমা বাঙালির আর দশটা হুজুগের মতোই একটা হুজুগ, এটা কেটে যাবে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমা কোনো হুজুগ ছিল না। এর পেছনে ছিল এদেশের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কর্মীদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন, প্রয়াস ও পরিকল্পনা। এটা ঠিক যে, সবকিছু আমাদের পরিকল্পনা মাফিক ঘটেনি। তবে খুব একটা ভিন্ন পথেও যায়নি। বরং আমাদের চলার বেগে পায়ের তলায় নতুন নতুন সব সম্ভাবনার রাস্তা জেগেছে।

বাংলাদেশের মূলধারার সিনেমা বর্তমানে এক গভীর সঙ্কটে রয়েছে। *এফডিসি* ভালো কিছুই আর সৃষ্টি করতে পারছে না। অন্যদিকে দেশে একটার পর একটা

[১৭] *দি ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্মস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিএফপি)*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
[১৮] *বাংলাদেশ শিশু একাডেমী*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সিনেমা হল বন্ধ হয়েই চলেছে। এ এক সত্যিকারের জটিল সঙ্কট। তবে বিকল্পধারার নির্মাতারা চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছবি তৈরিতে অভ্যস্ত। তাদের সে ধৈর্য্য ও ধীশক্তির প্রমাণ তারা অতীতে বহুবার রেখেছেন। ডিজিটালের নতুন সব প্রযুক্তি নতুন অনেক সম্ভাবনাও আজ সৃষ্টি করছে। আশা করা যায়, চীনাদের ভাষার মতো এদেশের চলচ্চিত্র জগতের এই "সংকট"-কে বিকল্পধারার নির্মাতারাই একদিন একটা "সম্ভাবনা" বানিয়ে ফেলতে পারবেন!

নতুন যুগে যা করতে হবে তা হচ্ছে, কতিপয় পেশাদার চলচ্চিত্রকারের জন্যে নয়, সমগ্র জনগণেরই সৃজনশীলতার উৎস মুখটাকে খুলে দিতে হবে। আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটা খুবই সম্ভব। তা হলেই ঘটবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। অসংখ্য মানুষ তখন তাদের ল্যাপটপে বা মোবাইল ফোনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারবে। তৈরি হবে নানা ধরনের অসংখ্য অগণন চলচ্চিত্র। আর এ সব ছবির প্রদর্শনও অবশ্যই হবে সিনেমা হলের বাইরে– বিকল্পভাবে। মানুষ ঘরে বসেই তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তার কাঙ্ক্ষিত ছবিটা দেখতে পারবে। চলচ্চিত্র তখন সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠবে একটা গণতান্ত্রিক শিল্প। সফল হবে জ্যাঁ ককতোর স্বপ্ন। এবং আমাদের স্বপ্নও। মনে হচ্ছে সে দিন আর খুব বেশি দূরে নেই!

আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়

নজরুল ইসলাম*

ভূমিকা

অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস, যার ফলে এ দেশের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বেশিরভাগ সময়েই এ দেশের সমৃদ্ধির জন্য বিনিয়োজিত হতে পারেনি। তার সাথে যোগ হয় মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত অবকাঠামোর ধ্বংস। সেজন্য সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশকে এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অনেকের মধ্যে এই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়ও ছিল। কিন্তু অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ একটি প্রতিশ্রুতিশীল দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ এখন স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের "স্বল্পোন্নত" দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে "উন্নয়নশীল" দেশের কাতারে উন্নীত হতে যাচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য হার বিশ শতাংশের নিচে নেমেছে। কৃষিতে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অংশ প্রায় ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। ইলেকট্রিক এবং ইলেক্ট্রনিক শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিভিন্ন সূচকে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি প্রথম পর্ব অতিক্রম করেছে।

কিন্তু বিকাশের নিয়মই এই যে, সাফল্য নতুন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ ডেকে আনে। এটা দু'ভাবে ঘটে। প্রথমত, যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হয় সেগুলিরই

* জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণার সাবেক প্রধান এবং এশীয় গ্রোথ ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং প্রফেসর।

কিছু নেতিবাচক প্রতিফল থাকে যেগুলো অবহেলিত হয়। সাফল্য অর্জিত হওয়ার পর সেগুলির প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন এবং সুযোগ হয়। দ্বিতীয়ত, শুধু নেতিবাচক ফলশ্রুতি নয়, সাফল্যের ইতিবাচক ফলশ্রুতিও নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং নতুন চ্যালেঞ্জ ডেকে আনে যেগুলো মোকাবেলার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা এই দুই ধরনের ফলশ্রুতিই দেখি। যেমন, বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রথম পর্বে অর্জিত শিল্পায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক ফলশ্রুতি হলো শিল্পদূষণ। এখন এই দূষণ মোকাবেলা করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, বিগত উন্নয়নের আরেকটি নেতিবাচক ফলশ্রুতি হলো বৈষম্যের বৃদ্ধি, যা এখন দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য বৈষম্যের প্রশমন এখন একটি বড় করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে বিগত উন্নয়নের ইতিবাচক ফলশ্রুতিও বাংলাদেশের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্রেক করেছে। যেমন, বিগত সময়কালে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমভিত্তিক শিল্পায়নে সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্য বাংলাদেশকে এমন স্থানে উপনীত করেছে যখন ভবিষ্যতে এগোতে হলে বাংলাদেশকে দক্ষতা ও জ্ঞানভিত্তিক উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করতে হবে। এটা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন নতুন ধরনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একইভাবে, বিগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের সংগ্রন্থন একটি নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটাও একটি ইতিবাচক ফলশ্রুতি, কিন্তু এই সংগ্রন্থনের পথে ভবিষ্যতে আরও এগোতে হলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি, সুদ হার বিষয়ক নীতি, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক নীতি, রাজস্ব নীতি ইত্যাদি আরও বিগদ্ধ হতে হবে এবং তার বাস্তবায়নও আরও সৎ এবং সুচারু হতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন আরও উন্নত এবং পরিপক্ব রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বন্দোবস্ত এবং তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিগত উন্নয়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ফলশ্রুতি ছাড়া আরেক সূত্রেও বাংলাদেশের জন্য নতুন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের উদ্রেক ঘটেছে। তার একটি উদাহরণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন। যদিও এই পরিবর্তন বহু আগে থেকেই বহমান, সময়ে এর অভিঘাতসমূহের তীব্রতা এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে এসব অভিঘাত মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য শুধু বিভিন্ন নতুন ভৌত কর্ম নয় বরং গ্রামীণ জনগণসহ সারা দেশের মানুষকে নতুনভাবে সংগঠিত করার করণীয় সমুপস্থিত হয়েছে।

এসব বিভিন্ন সূত্রে উদ্ভূত নতুন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রয়াসকে বিগত দশক সমূহের উন্নয়ন প্রয়াসের একটি সরলরৈখিক প্রসারণ হিসেবে না ভেবে উন্নয়নের একটি নতুন পর্ব হিসেবে ভাবাই শ্রেয় হবে। অনেক ক্ষেত্রেই এতকালের উন্নয়ন প্রয়াসের সাথে ছেদ টানতে হবে, বাঁক পরিবর্তন করতে হবে, এবং নতুন পথে চলতে হবে। ভবিষ্যতের উন্নয়নকে অতীত উন্নয়ন প্রয়াসের সরলরৈখিক প্রসারণ হিসেবে ভাবা হলে তা এসব করণীয় সম্পাদনের জন্য ভাবনাগত এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে ভবিষ্যতের যেসব লক্ষ্য – যেমন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়া – গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়িত করা কঠিন হতে পারে। সেজন্য এই প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ প্রয়াসকে উন্নয়নের একটি নতুন পর্ব হিসেবে ভাবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্নয়নের এই নতুন পর্বে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তার কিছু কিছু নিয়ে অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বের করণীয়সমূহের একটি সামগ্রিক ও সুসংবদ্ধ আলোচনা তেমন লক্ষ করা যায় না। এরূপ একটি আলোচনার সূত্রপাত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে বহু করণীয় রয়েছে। তবে এই প্রবন্ধে আমি নিম্নরূপ দশটি করণীয় প্রস্তাব করছি। এগুলো হলো:

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস;

(২) সুশাসন অর্জন;

(৩) গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন ও আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন;

(৪) পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা;

(৫) গ্রাম পরিষদ গঠন:

(৬) ভৌগোলিক বৈষম্যের অবসান;

(৭) সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি;

(৮) নারী, শিশু, তরুণ ও বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান;

(৯) সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন;

(১০) সার্বভৌমত্ব শক্তিশালীকরণ ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ।

এসব করণীয় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য সুশাসন প্রয়োজন, আবার সুশাসন অর্জন সহজ হবে যদি অর্থনীতিতে বৈষম্য

হ্রাস পায়। এদিকে সুশাসন এবং সামাজিক সংহতির জন্য আনুপাতিক নির্বাচন প্রয়োজন। আবার দেশের সার্বভৌমত্ব শক্তিশালী করার জন্য সামাজিক সংহতি প্রয়োজন। সেজন্য করণীয়ের যে ক্রমধারা উপরের তালিকায় প্রস্তাবিত হয়েছে সেটা অলঙ্ঘনীয় কিছু নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো এগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক অনুধাবন। আরও লক্ষণীয়, প্রতিটি করণীয়ের অভ্যন্তরে বহু উপ-করণীয় চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকেই তা বেরিয়ে আসবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত করণীয়সমূহকে একটি মোটা দাগের তালিকা বলেই ভাবা যেতে পারে।

এই প্রবন্ধের পরবর্তী দশটি অনুচ্ছেদে উপর্যুক্ত দশটি করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এসব করণীয়র পটভূমি, তার সুনির্দিষ্ট রূপ এবং তা সম্পাদনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে তথ্য ও অভিমত উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে এসব করণীয়ের পূর্ণোৎসারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে এরূপ কোনো দাবি নেই। বস্তুত এই প্রবন্ধটি একই শিরোনামে লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থের (ইসলাম, ২০২৪) একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। যাঁরা বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তাঁরা এই গ্রন্থটিও পড়তে পারেন। আমি আশা করছি যে, এই প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ অন্যদেরকেও এই আলোচনায় যোগ দিতে প্রবুদ্ধ করবে এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বের করণীয় বিষয়ে আরও সন্তোষজনক প্রস্তাবনা পাবো।

অনেকের নিকট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত আলোচনার অনুসরণ আয়াসসাধ্য বলে প্রতিভাত হতে পারে। সেজন্য সাধারণ প্রথার বাইরে গিয়ে এই প্রবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে। এসব উপসংহার থেকে পাঠক-পাঠিকারা অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যটি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী কোন অনুচ্ছেদের আলোচনায় কতখানি প্রবেশ করবেন সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সর্বোপরি, সকল করণীয় সম্পর্কে সকলের সমপরিমাণ আগ্রহ নাও থাকতে পারে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত উপসংহার উপকারী হবে। এসব উপসংহারের কারণে গোটা প্রবন্ধের কোনো দীর্ঘ উপসংহার সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। সেখানে শুধু এসব করণীয়ের সামগ্রিক কতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে এই দশটি করণীয় সম্পাদনের রাজনৈতিক সম্ভাব্যতার প্রশ্নটিও সংক্ষেপে উত্থাপিত হয়েছে।

১। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস

১.১ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি

উন্নয়নের প্রথম পর্বে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বিতরণের অসমতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত সূচক হলো গিনি সহগ। বাজার আয় এবং ব্যয়যোগ্য আয় উভয়ের ভিত্তিতেই এই সহগ নিরূপণ করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক অসমতা বিচারে ব্যয়যোগ্য আয়ভিত্তিক গিনি সহগই বেশি উপযোগী। সারণি ১.১-এ বাংলাদেশের বিগত কয়েক দশকে ব্যয়যোগ্য আয়ভিত্তিক গিনি সহগের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। এই চিত্র থেকে দেখা যায়, এই সহগ ১৯৯১-৯২ সালের ০.৩৮৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮৩-এ পৌঁছে। আন্তর্জাতিক তুলনায় সাধারণত গিনি সহগের মান ০.৩-এর নিচে থাকলে একটি দেশের আয় বিতরণকে "সমতাধর্মী," ০.৩ থেকে ০.৪-এর মধ্যে থাকলে "বৈষম্যপূর্ণ," এবং ০.৪ থেকে ০.৫ হলে "অত্যধিক বৈষম্যপূর্ণ" বলে আখ্যায়িত করা হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশের আয় বিতরণ অত্যধিক বৈষম্যপূর্ণ পর্যায়ের।

সারণি ১.১: বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশে আয় বিতরণে অসমতার গিনি সহগের মান

বছর	গিনি-সহগ
১৯৯১-৯২	০.৩৮৮
২০০০	০.৪৫১
২০১০	০.৪৫৮
২০১৬	০.৪৮৩

সূত্র: GoB (2020, p.37)।

আয় বিতরণের অসমতার সূচক হিসেবে গিনি সহগ অত প্রচ্ছন্ন নয়। সে বিচারে "পালমা অনুপাত" বেশি সহজবোধ্য। এই অনুপাত দেশের মোট আয়ে সমাজের উপরের ১০ শতাংশের ভাগ নিচের ৪০ শতাংশের ভাগের কতগুণ বেশি, তার পরিমাপ দেয়। এ বিষয়ে কিছু তথ্য সারণি ১.২-এ দেখানো হলো। আমরা দেখি যে, ১৯৯১-৯২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট আয়ে সমাজের নিচের ৪০ শতাংশের ভাগ ২৯.২৩ শতাংশ থেকে ১৩.০১ শতাংশে এবং মাঝের ৫০ শতাংশের ভাগ ৫৩.৩৬ থেকে ৪৮.৮৩ শতাংশে হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে এই একই সময়কালে উপরের ১০ শতাংশের ভাগ ১৭.৪১ থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.১৬ শতাংশে পৌঁছে। এর ফলে

আয় বিতরণের পালমা অনুপাত ১৯৯১-৯২ সালের ১.৬৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ২.৯৩ হয়। বলা দরকার যে, উপর্যুক্ত হিসাব করা হয়েছে খানা পর্যায়ে আয়-ব্যয় জরিপের ভিত্তিতে। সুবিদিত যে, এসব জরিপে উচ্চ আয়-বন্ধনীর (*টপ-কোডিং*) কারণে উচ্চ আয়ের মানুষদের আয় অনেক কম করে প্রতিফলিত হয়। এই সীমাবদ্ধতা না থাকলে পালমা অনুপাতের বৃদ্ধি যে আরও বেশি বলে পরিদৃষ্ট হতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[১]

সারণি ১.২: বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশের আয় বিতরণের পালমা অনুপাতের মান

বিষয়	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০৫	২০১৬
দেশের মোট আয়ে নিচের ৪০ শতাংশের ভাগ (%)	২৯.২৩	১৫.৫৪	১৪.৩৬	১৩.০১
দেশের মোট আয়ে মাঝের ৫০ শতাংশের ভাগ (%)	৫৩.৩৬	৪৯.৭৮	৪৮.০০	৪৮.৮৩
দেশের মোট আয়ে উপরের ১০ শতাংশের ভাগ (%)	১৭.৪১	৩৪.৬৮	৩৭.৬৪	৩৮.১৬
দেশের মোট আয় (%)	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পালমা অনুপাত	১.৬৮	২.২৩	২.৬২	২.৯৩

সূত্র: GoB (2020, p.37)।

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, পুঁজিবাদী পথে উন্নয়নের জন্য বৈষম্যের বৃদ্ধি অপরিহার্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অনেক কম বৈষম্য নিয়েও পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র ১.১ দেখায় যে, পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম আয় বৈষম্য নিয়ে পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। একইভাবে চিত্র ১.২ দেখায় যে, অনেক উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যেমন ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও জার্মানিতে আয় বৈষম্য বাংলাদেশের তুলনায় কম। বস্তুত আয় বৈষম্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর অনেক "চরম বৈষম্যপূর্ণ" দেশ (যেসব দেশে গিনি সহগের মান ০.৫-এর ঊর্ধ্বে) যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকোর কাছাকাছি পৌঁছেছে (চিত্র ১.৩)।[২]

[১] সুবিদিত, থমাস পিকেটি তাঁর আয় এবং সম্পদের বৈষম্য সংক্রান্ত গবেষণায় কর-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করেছেন, যার ফলে তাঁর পক্ষে আরও সঠিকভাবে আয় ও সম্পদের বৈষম্যের পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে (Piketty, 2014)।

[২] লক্ষণীয়, ১.১, ১.২, এবং ১.৩ চিত্রে প্রদর্শিত গিনি সহগ "ব্যবহারযোগ্য" (ইংরেজিতে, "ডিসপোজিবল") আয়ের ভিত্তিতে হিসাবকৃত। সে কারণে এতে পরিদৃষ্ট গিনি সহগের মান ১.১ নং সারণিতে প্রদর্শিত গিনি সহগের মানের চেয়ে কম। তবে সেটা অন্য দেশসমূহের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

চিত্র ১.১: জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের সাথে বাংলাদেশের গিনি সহগের তুলনা

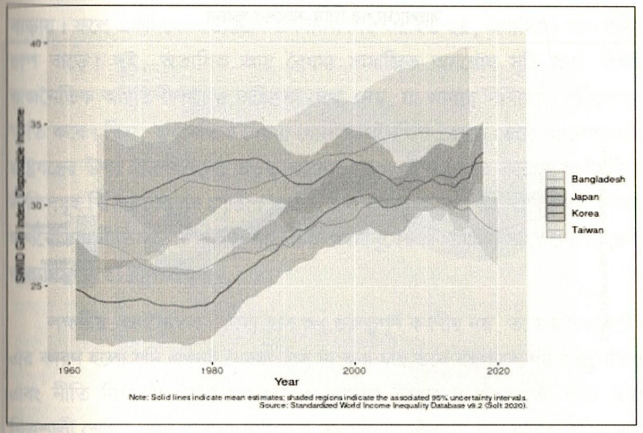

চিত্র ১.২: ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও জার্মানির সাথে বাংলাদেশের গিনি সহগের তুলনা

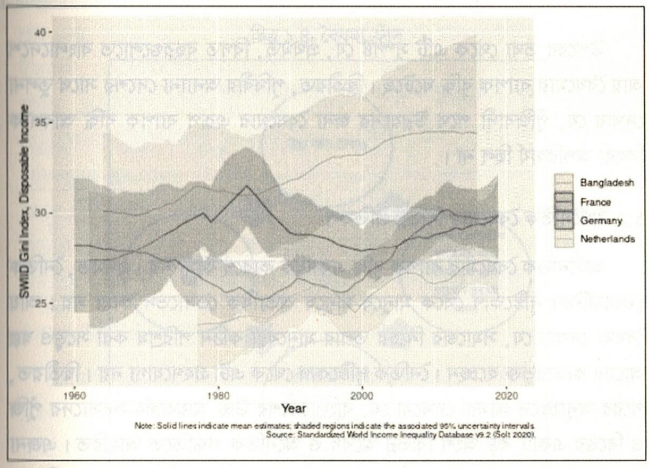

চিত্র ১.৩: দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর সাথে বাংলাদেশের গিনি-সহগের তুলনা

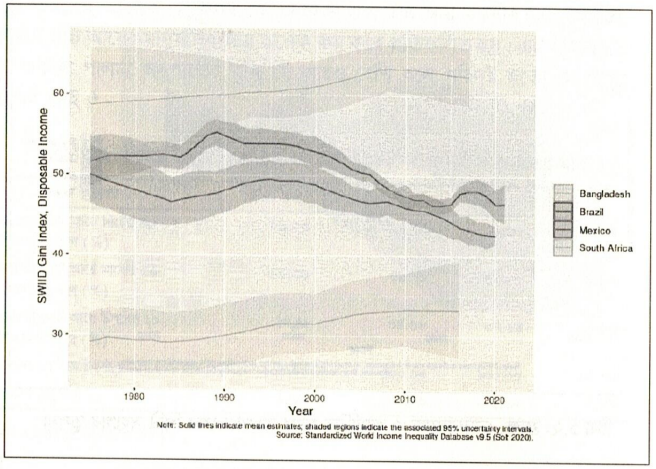

উপরের তথ্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, প্রথমত, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে আয় বৈষম্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা দেখায় যে, পুঁজিবাদী পথে উন্নয়নের জন্য বৈষম্যের এরূপ ব্যাপক বৃদ্ধি আবশ্যক কিংবা অপরিহার্য ছিল না।

১.২ অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন প্রতিফল

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপক বৃদ্ধি একাধিক কারণে কাম্য নয়। প্রথমত, নৈতিক (*নরমেটিভ*) দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষে-মানুষে অত্যধিক ভেদাভেদ কাম্য নয়। আয় বৈষম্য দেখায় যে, সমাজের নিচের তলার মানুষেরা কঠিন পরিশ্রম করা সত্ত্বেও স্বল্প আয়ের কাতারভুক্ত হচ্ছেন। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, পরের অনুচ্ছেদে আমরা দেখবো যে, বাংলাদেশের উচ্চ আয়বর্গের সদস্যদের পুঁজি ও বিত্তের একটি বড় অংশ বিভিন্ন অবৈধ ও অনৈতিক পদ্ধতিতে আহরিত। এজন্য বিদ্যমান আয় বৈষম্য শুধু যে অন্যায্য তাই নয়, অনেকাংশে গর্হিতও বটে। তৃতীয়ত, উচ্চ বৈষম্য একাধিক কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল নয়। এক, অসম

আয় বিতরণ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী বিলাসী পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। ফলে একদিকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয়, অন্যদিকে আমদানির চাপ বাড়ে। দুই, অত্যধিক আয় বৈষম্য সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে বিধায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, যা আবার বিনিয়োগ পরিবেশের ক্ষতি করে। তিন, অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন রাজনৈতিক বৈষম্য ডেকে আনে তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর উচ্চবিত্তদের প্রভুত্ব কায়েম হয়। এই প্রভুত্বের কারণে অর্থনৈতিক নীতিসমূহ বিভিন্ন বিত্তবান গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার দিকে বেশি ধাবিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক নীতিসমূহের যৌক্তিকতা এবং গণমানুষের ও সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য কল্যাণমুখীনতা হ্রাস পায়।

লক্ষণীয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস শুধু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় নয়, তা জরুরিও বটে। এর কারণ হলো যদি এখনই বৈষম্য হ্রাস না করা যায় তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং নীতি নির্ধারণী (তথা ক্ষমতা) কাঠামোতে বৈষম্যের পক্ষাবলম্বী শক্তি তথা বিত্তশালী শ্রেণির এমন প্রাধান্য সৃষ্টি হবে যে ভবিষ্যতে বৈষম্য হ্রাস আরও কঠিন হয়ে পড়বে। এটাকে বলা হয় "বৈষম্য ফাঁদ" (চিত্র ১.৪)।

চিত্র ১.৪: বৈষম্য ফাঁদ

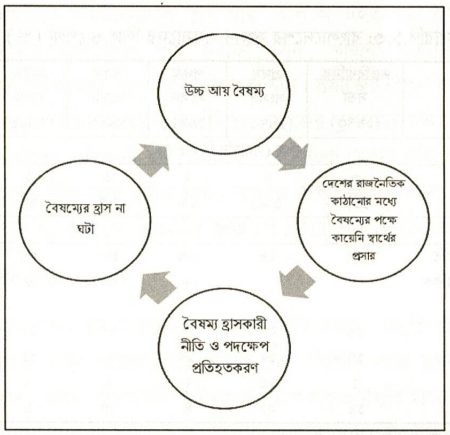

সূত্র: Islam (2014).

উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে বৈষম্য ফাঁদে পতিত হচ্ছে। এর একটি লক্ষণ হলো বাংলাদেশের সংসদ, মন্ত্রিসভা এবং অন্যান্য ক্ষমতা কাঠামোতে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান এবং আমুন্ডসেন (Jahan & Amundsen, 2010, p.32) কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণায় দেখা গেছে, সংসদে ব্যবসায়ী/শিল্পপতির সংখ্যানুপাত ২০০৮ সালের নবম সংসদেই ৫৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণি ১.৩)। আনুষ্ঠানিকভাবে যাদের পেশা ব্যবসায়ী/শিল্পপতি নয়, তারাও বিভিন্নভাবে ব্যবসা ও শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বাদশ সংসদে এই সংখ্যানুপাত ৭০ শতাংশ অতিক্রম করেছে বলে অনুমিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত হওয়া এখন এত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে যে, অতিশয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে সংসদে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। বলা বাহুল্য, সংসদে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের এই বিপুল সংখ্যাধিক্যের প্রতিফলন মন্ত্রিসভার মধ্যেও পড়েছে; ফলে এখন মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যেও বিরাট অংশ হলো ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। বিত্তশালীদের স্বীয় আর্থিক সামর্থ্য ব্যবহার করে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোসমূহে প্রাধান্য বিস্তারের এই প্রক্রিয়াকে "রাজনীতির করায়ত্তকরণ" (*ক্যাপচার অব পলিটিকস*) বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ার যেন একটি ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সারণি ১.৩: বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের লিঙ্গ ও পেশা (%)

	সাংবিধানিক সভা (১৯৭০)	প্রথম সংসদ (১৯৭৩)	পঞ্চম সংসদ (১৯৯১)	সপ্তম সংসদ (১৯৯৬)	অষ্টম সংসদ (২০০১)	নবম সংসদ (২০০৮)
লিঙ্গ (সরাসরি নির্বাচিত)						
মহিলা	০	০	২	৩	২	৬
পুরুষ	১০০	১০০	৯৮	৯৭	৯৮	৯৪
পেশা						
ব্যবসায়ী/শিল্পপতি	২৭	২৪	৫৩	৪৮	৫৭	৫৬
বেসামরিক/সামরিক আমলা	৩		৮	৮	৮	১০
আইনজীবী	৩০	২৭	১৯	১৭	১১	১৫
পেশাজীবী	১৭	১৫	১৪	৯	১১	৭
রাজনীতিবিদ	৫	১৩	২	৪	৭	৫
অন্যান্য	১৯	২১	৪	১৪	৬	৭

সূত্র: Jahan & Amundsen (2010, p. 32).

রাজনীতি বিত্তশালীদের করায়ত্ত হলে দেশের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এই শ্রেণির বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় এবং তা প্রায়শ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল হয় না। এর ফলে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে কারণেই দেখা যায় যে, চরম বৈষম্যপূর্ণ দেশসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "মধ্য আয় ফাঁদে" আটকে পড়ে এবং আর অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন যদি অব্যাহত রাখতে হয় তবে বৈষম্য হ্রাস একটি জরুরি করণীয়। প্রশ্ন হলো, কীভাবে বাংলাদেশে বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন হতে পারে?

১.৩ শ্রম আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাসের বিভিন্ন পন্থা

১.৩.১ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের দুই পন্থা

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে পারে সেগুলিকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম হলো আয়ের প্রাথমিক বিভক্তিকে সমতাধর্মী করা। প্রাথমিক বিভক্তির মধ্য দিয়েই সৃষ্ট হয় বাজার আয়। দ্বিতীয় হলো বাজার আয়ের সমতাধর্মী পুনর্বিতরণ। প্রাথমিক পর্যায়ে আয়ের বিভক্তি ঘটে মূলত শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে। শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকেরা পায় মজুরি, বোনাস, ভাতা ইত্যাদি, যেগুলিকে সামগ্রিকভাবে "শ্রম আয়" বলে অভিহিত করা যায়। অন্যদিকে পুঁজির বিনিময়ে মালিকেরা পায় মুনাফা, সুদ, খাজনা ইত্যাদি, যেগুলিকে সামগ্রিকভাবে "পুঁজি আয়" বলে অভিহিত করা যায়। সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয় মূলত শ্রম আয়ে সীমাবদ্ধ। বিপরীতে, সমাজের তুলনামূলকভাবে স্বল্প সংখ্যক মানুষ পুঁজি আয়ের অধিকারী হন। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায় যখন শ্রম আয়ের তুলনায় পুঁজি আয় বেড়ে যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের একটি অন্যতম উপায় হলো আয়ের প্রাথমিক বিভক্তির পর্যায়ে শ্রম আয়ের অংশ বৃদ্ধি করা।

১.৩.২ মজুরি বৃদ্ধির সুযোগ

শ্রম আয় বৃদ্ধির মূল উপায় হলো ন্যায্য মজুরি প্রদান। মজুরি বৃদ্ধির হার যখন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে পড়ে তখন আয় বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশে প্রকৃত মজুরি হারের বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করে যা সারণি ১.৪-এ দেখানো হলো। এই সারণির তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সমগ্র দেশের ভিত্তিতে শহুরে প্রকৃত মজুরির বার্ষিক

বৃদ্ধির হার ছিল ১.২৪ শতাংশ এবং গ্রামীণ প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ১.০৬ শতাংশ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হার ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছিল ৪.৯ শতাংশ এবং ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত ছিল ৫.৭ শতাংশ। এ থেকে স্পষ্ট যে, মজুরি বৃদ্ধির হার দেশের গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক কম ছিল। সুতরাং এটা বিস্ময়ের নয় যে, বিগত সময়কালে দেশে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১.৪: প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি (%), ২০১০-২০১৬

বিভাগ	গ্রামীণ/কৃষি মজুরি	গ্রামীণ/অ-কৃষি মজুরি	গ্রামীণ মজুরি	শহুরে মজুরি
বরিশাল	৭.০	৭.০	৬.৯	৭.০
চট্টগ্রাম	৪.০	৬.১	৫.০	৬.৮
ঢাকা	৬.৮	৬.০	৬.০	৮.৯
খুলনা	৬.৮	৮.৭	৭.৭	৭.৩
রাজশাহী	৫.৭	৮.১	৬.৭	৫.৯
সিলেট	৫.৪	১১.৪	৮.৬	৬.৪
বাংলাদেশ	৫.৯	৭.৫	৬.৫	৭.৭

সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। চিত্র ১.৫-এ প্রদত্ত তথ্য দেখায় যে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ অর্থবছরের মধ্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭.১৩ শতাংশ।[৩] অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি হার শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হারের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। অন্য ভাষায়, মজুরি বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ ছিল এবং আছে।

[৩] লক্ষণীয় যে, শ্রম উৎপাদনশীলতা সাধারণভাবে দুই পদ্ধতিতে হিসাব করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো "মোট" (গ্রস), তথা গোটা উৎপাদনকে শ্রমিকদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয় হলো, "নেট" ভিত্তিতে, যেখানে মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে পুঁজি এবং "মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা" (ইংরেজিতে, "টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি")- র অবদানকে আলাদা করে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। এখানে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা বলা হয় নাই। তবে দুই হারের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে, যে পদ্ধতিতেই এই হিসাব করা হোক না কেন, মজুরি বৃদ্ধির হার যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

চিত্র ১.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শ্রম উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি

(২০০৫-০৬ সালের মূল্যমানে হাজার টাকা)

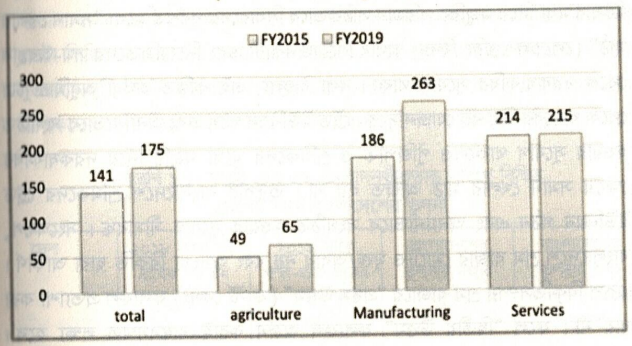

সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

১.৩.৩ *ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং মজুরি নিয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে সমতাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা*

মজুরি বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি হলো সরকার কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ। যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু পুঁজিবাদী দেশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় বলা হয় যে, মজুরি নির্ধারণের ভার শ্রম বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া শ্রেয়। ধারণা করা হয় যে, এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ বরং বিকৃতির উদ্রেক করবে এবং তা অর্থনীতির জন্য শুভ হবে না। বিশেষত, দাবি করা হয় যে, আইন দ্বারা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হলে তা নিয়োজন হ্রাস করবে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি করবে। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ডেভিড কার্ড এবং এল্যান ক্রুয়েগার (Card & Krueger, 1994, 2000) বিশদ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, শ্রম-উৎপাদনশীলতা এবং মজুরির মধ্যে বড় পার্থক্যের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধি বেকারত্ব বাড়ায় না। তদুপরি শ্রমের ঘূর্ণায়ন (*টার্নওভার*) হ্রাস এবং প্রণোদনা বৃদ্ধির কারণে মজুরির বৃদ্ধি শ্রম উৎপাদনশীলতা আরও বাড়াতে পারে; ফলে একটা শুভ চক্রের উদ্ভব হতে পারে।

প্রশাসনিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বৃদ্ধির পক্ষে আরেকটি যুক্তি হলো মজুরি নিয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে অসম পরিস্থিতি। শ্রম বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মজুরির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণের পূর্বশর্ত হলো "সমান খেলার মাঠ" (*লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড*) অর্থাৎ নিয়োজনকারী এবং নিয়োজিতদের সম-অবস্থান থেকে দরকষাকষির সুযোগ থাকা। বলা বাহুল্য, এই কল্পিত অথবা অনুমিত চিত্র থেকে বাস্তবের চিত্র বহু যোজন দূরে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং অন্যান্যভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ থাকলেও পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি নিয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে সমান খেলার মাঠ অর্জিত হয় না। তদুপরি বাংলাদেশে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং অন্যান্যভাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে, বাংলাদেশে শ্রম বাজার মোটেও মুক্ত/অবাধ নয় বরং অসংখ্য বিকৃতি দ্বারা আকীর্ণ। এরূপ বিকৃতিসম্পন্ন শ্রম বাজারে "প্রথম উত্তম" (ফার্স্ট বেস্ট) ফলাফল প্রত্যাশা করা যায় না। ফলে "দ্বিতীয় উত্তম" ফলাফল অর্জন করাই বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হবে। প্রশাসনিক পদ্ধতিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং বৃদ্ধি এরূপ "দ্বিতীয় উত্তম" ফলাফল বলেই বিবেচিত হতে পারে।

১.৩.৪ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রশ্ন

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিরুদ্ধে আরেকটি যে যুক্তি শোনা যায় তা হলো, এর ফলে বাংলাদেশ তার পণ্য রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাজার হারাবে। এটা ঠিক যে, সস্তা শ্রমই আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের মূল কারণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে তার রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের অত্যন্ত নিম্ন মজুরি দিতে হবে। প্রথমত, মজুরি রপ্তানি খাতের পণ্যের মোট উৎপাদন খরচের সামান্য অংশ। সুতরাং মজুরির কিছু বৃদ্ধির কারণে পণ্যের দামের তেমন পরিবর্তন বা হেরফের নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি অর্ডার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা নিজেদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মজুরি এবং পণ্যের দাম কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক চাপ প্রশমিত কিংবা প্রতিহত করতে পারে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের চেয়ে কম মজুরির দেশ পৃথিবীতে কম আছে।[৪] সুতরাং মজুরি কমিয়ে অধিক অর্ডার পাওয়া অথবা অধিক হারে মুনাফা অর্জনের প্রয়াস বাঞ্ছনীয় নয়। বরং মজুরি হ্রাসের পরিবর্তে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি আরও

[৪] দ্রষ্টব্য: www.minimum-wage.org

মনোযোগী হওয়াটাই শ্রেয়। এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটা বিশ্লেষণ সারণি ১.৫-এ উপস্থাপন করা হলো। আমরা দেখি যে, অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ মজুরির দিক দিয়ে যতটা পিছিয়ে আছে তার চেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে শ্রম উৎপাদনশীলতার নিরিখে। সুতরাং মজুরি কতটা কম রাখা যায় সে চিন্তা না করে বাংলাদেশের পোশাক কারখানার মালিকদের বেশি চিন্তা করা প্রয়োজন কীভাবে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

সারণি ১.৫: মজুরি এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতার নিরিখে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দেশ	২০১৮ সালে গড় বার্ষিক নিম্নতম মজুরি ($) *Asian Productivity Database 2018*	২০১৮ সালে ঘণ্টা-প্রতি শ্রমের উৎপাদনশীলতা ($) *Asian Productivity Database 2018*	বাংলাদেশের তুলনায় মজুরি অনুপাত	বাংলাদেশের তুলনায় শ্রম-উৎপাদনশীলতার অনুপাত
বাংলাদেশ	৭৯৮	৩.৪	১.০	১.০
চীন	১৫০০	১১.১	১.৮	৩.৩
ভারত	৮৫৭	৭.৫	১.১	২.২
মিয়ানমার	৪০১	৪.১	০.৫	১.২
শ্রীলংকা	১৬১৯	১৫.৯	২.০	৪.৭
ভিয়েতনাম	১০০২	৪.৭	১.৩	১.৪

সূত্র: Asian Productivity Database.

সুবিদিত, শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মূল উপায় দুটি। একটি হলো যেসব যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে একজন শ্রমিক উৎপাদন করে তার উন্নয়ন। অন্য কথায় শ্রমের সহযোগী অন্যান্য ভৌত উপকরণের মানোন্নয়ন। শ্রমের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতার উন্নয়ন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় হলো শ্রমের মানোন্নয়ন, যার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি। আরও প্রয়োজন শ্রমের প্রতি শ্রমিকদের একাগ্রতা, উৎসাহ ও একনিষ্ঠতা। আন্তর্জাতিক বাজারের সুরক্ষা শুধু স্বল্প মজুরির উপর নির্ভর করে না। উৎপাদিত পণ্যের মান,

আকর্ষণীয়তা, কর্ম পরিবেশের মান, সময়োপযোগী সরবরাহের নিশ্চয়তা ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আর এজন্য সেগুলোর প্রতিও নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ চিরকাল স্বল্প মজুরির দেশ হিসেবেই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করবে এমনটা প্রত্যাশিত নয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ উচ্চ হারে মজুরি প্রদান করেও আন্তর্জাতিক বাজারে সফল হতে পারে। সেজন্য বাংলাদেশকেও ক্রমশ উচ্চমূল্যের পণ্যের রপ্তানির দিকে অগ্রসর হতে হবে। সে লক্ষ্যে শ্রমিকদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আরও উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। শুধুমাত্র সস্তা শ্রমের উপর নির্ভরশীল থেকে গেলে বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।

১.৩.৫ শ্রম আয়ে বৈষম্য হ্রাস

সাধারণভাবে মজুরি বৃদ্ধির প্রয়াসের পাশাপাশি আরও যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হলো মজুরি সংক্রান্ত বৈষম্যের অবসান। বিভিন্ন পরিমাণ ও গুণের শ্রমের মজুরি ভিন্ন হবে, তা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অনেক সময় একই ধরনের শ্রমের জন্যও মজুরি বৈষম্য দেখা যায়। তার একটি উদাহরণ হলো নারী-পুরুষ (তথা লিঙ্গভেদে) মজুরির ব্যবধান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই ধরনের শ্রম প্রদান করেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পেয়ে থাকে (অষ্টম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। একই কথা প্রযোজ্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীভেদে শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রেও। যেমন চা-শ্রমিকদের অত্যন্ত নিম্ন মজুরির বিষয়টি তাদের সাম্প্রতিক ধর্মঘটের কারণে জাতীয় মনোযোগের মধ্যে এসেছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা যাতে বিশেষ শোষণ ও বঞ্চনার শিকার না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। একইভাবে তরুণ ও বয়স্ক শ্রমিকরাও যাতে মজুরি নিয়ে বৈষম্যের শিকার না হন তা নিশ্চিত করতে হবে (সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক জনগণের বিষয়ে সপ্তম অনুচ্ছেদে এবং নারী, শিশু ও যুবসমাজের বিষয়ে আমরা অষ্টম অনুচ্ছেদে আরও আলোচনা করবো)।

১.৩.৬ শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণ

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক তাৎপর্যসম্পন্ন করণীয় হবে শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণ (ফর্মালাইজেশন)। শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের ন্যূনতম আবশ্যকতা হচ্ছে একটি লিখিত চুক্তি থাকা যাতে কী শর্তের অধীনে একজন শ্রমজীবী নিয়োজিত হচ্ছেন তা লিপিবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য

অনুযায়ী, ২০১৩ সাল নাগাদ মোট নিয়োজনের মাত্র ৭.৩ শতাংশ ছিল আনুষ্ঠানিক; অর্থাৎ বাকি ৯২.৭ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক রূপে নিয়োজিত ছিল। চিত্র ১.৬ দেখায় যে, উন্নত দেশে ২০১০-১৭ সময়কালে অনানুষ্ঠানিক নিয়োজন মাত্র ১৪ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি স্বল্পআয়ের দেশেও এর পরিধি ছিল ৩৬ শতাংশ, বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

চিত্র ১.৬: বিভিন্ন ধরনের দেশে শ্রমের অনানুষ্ঠানিকতার মাত্রা

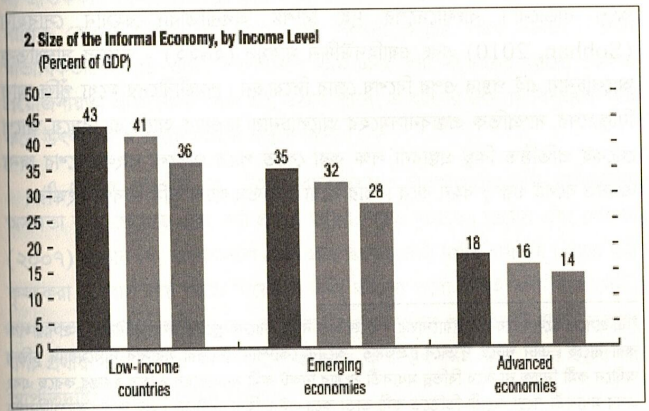

সূত্র: Delechat and Medina (eds.) (2021, p.4).
টীকা: নীল রঙ (১৯৯১-৯৯); লাল রঙ (২০০০-০৯); এবং সবুজ রঙ (২০১০-১৭)।

শ্রমের আনুষ্ঠানিকতার অভাবে শ্রমজীবীরা সাধারণত মালিক ও নিয়োজনকারীদের নিকট একরকম অসহায় অবস্থায় থাকেন। তদুপরি, অনানুষ্ঠানিক থেকে গেলে শ্রমজীবীদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে আনা কঠিন হয় (সপ্তম অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করবো)। সে জন্য জাতিসংঘের "আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা" (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, আইএলও) বরাবরই শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের ওপর জোর দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ যেহেতু ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে চাচ্ছে সেহেতু বাংলাদেশকে শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে আরও উদ্যোগী হতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রথমেই জোর দিতে হবে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের নথিবদ্ধকরণের (রেজিস্ট্রেশন) ওপর। বর্তমানে শুধু যে শ্রমজীবীরা অনানুষ্ঠানিক থেকে যান তাই নয়, যেসব প্রতিষ্ঠানে তারা

কাজ করেন অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোও সরকারের নথিবদ্ধ হয় না। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন এবং তাতে নিয়োজিত কর্মীদের আনুষ্ঠানিকীকরণ দেশের করভিত্তি সম্প্রসারণের জন্যও সহায়ক হবে (এ বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো)।[৫]

১.৪ পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাস

শ্রমজীবীদের প্রাথমিক আয় বৃদ্ধির আরেক পন্থা হলো পুঁজি আয়ে শ্রমজীবীদের অংশ বাড়ানো। বাংলাদেশের দুই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ–রেহমান সোবহান (Sobhan, 2010) এবং ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ (২০২২) - তাঁদের সাম্প্রতিক আলোচনায় এই পন্থার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। শ্রমজীবীদের মধ্যে পুঁজি আয় বিচ্ছুরণের সাম্প্রতিক প্রস্তাবনাসমূহের আলোচনায় যাওয়ার আগে এ বিষয়ে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত কিছু প্রস্তাবনা লক্ষ করা যেতে পারে যেগুলো বাংলাদেশের জন্য এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ভূমি ও বর্গা সংস্কার।

[৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শিল্পায়নোত্তর সমাজে এক নতুন ধরনের শ্রমের অনানুষ্ঠানিকতার প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা ঘটছে দু'ভাবে। প্রথমত, অনেক কোম্পানি নিজেরা সরাসরি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির অধীনে কর্মী নিযুক্ত না করে বিভিন্ন মধ্যবর্তী সংস্থার নিকট কর্মী সরবরাহের দায়িত্ব হস্তান্তর করছে এবং এসব মধ্যবর্তী সংস্থা অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মী ভাড়া করে এই চাহিদা মেটাচ্ছে। এর ফলে কোম্পানিসমূহ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধাদি যেমন পেনশন, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি পরিহার করতে পারছে; যেকোনো সময় যেকাউকে অনায়াসে বাদ দিতে পারছে এবং শ্রমজীবীদের ইউনিয়ন গঠন ও যৌথ দরকষাকষির বাধ্যবাধকতা এড়াতে পারছে। এভাবে শ্রমজীবীদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রম নিয়োজনের এই নতুন রূপের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্বতন "প্রোলেতারিয়াত"-এর পাশাপাশি "প্রিকারিয়াত" শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এটি এসেছে ইংরেজি "প্রিকারিয়াস" শব্দ থেকে যার ভালো/যুৎসই বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। সাধারণভাবে এটা "অনিশ্চয়তাপূর্ণ সঙ্গীনতা" বোঝায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক শ্রমিক ও কর্মীরাও ধরাবাঁধা সময়ানুবর্তীতাসম্পন্ন নিয়োজনের পরিবর্তে নমনীয় সময়সূচিসম্পন্ন, নিজেদের আবাসস্থল থেকে, অনেকটা ফ্রিল্যান্স কর্মীদের মতো কাজ করা পছন্দ করছে। তবে উন্নত দেশের "শিল্পায়নোত্তর অনানুষ্ঠানিকতা" বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অনানুষ্ঠানিকতা (যেটাকে "শিল্পায়ন-পূর্ব অনানুষ্ঠানিকতা" বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে) থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। এসব ক্ষেত্রে নিয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত নথিবদ্ধ থাকে এবং কর্মীদের সাথে চুক্তি লিখিত রূপ পায়। তবে শিল্পায়নোত্তর অনানুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন প্রতিফল প্রশমিত করার জন্য শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের নতুন রূপের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ শিল্পায়নোত্তর সমাজের জন্যও শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বাতিল হয়ে যায় না। এমনকি ফ্রিল্যান্স কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণেও শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে বাংলাদেশে এখনও শ্রমের প্রাথমিক ধরনের আনুষ্ঠানিকতাও অর্জিত হয়নি। আগামীর জন্য এটি একটি করণীয়।

১.৪.১ ভূমি ও বর্গা সংস্কার

কৃষিক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের পুঁজি আয়ের অধিকারী করার লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হলো জমি মালিকানার বিচ্ছুরণ। সে লক্ষ্যে পুনঃবিতরণমূলক ভূমি সংস্কার একটি পরিচিত পদ্ধতি। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও কার্যত কোনো পুনঃবিতরণমূলক ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়নি। একইভাবে বাংলাদেশে কখনো বর্গা সংস্কারও সাধিত হয়নি। সুতরাং সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যে কৃষি উৎপাদন অর্জিত হয়েছে তা সরকারের উদ্যোগে সাধিত কোনো প্রকার ভূমি এবং বর্গা সংস্কার ছাড়াই সম্ভব হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশে ভূমি এবং বর্গা সংস্কারের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। বরং প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরনের উদ্যোগ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে উৎপাদনকে আরও ব্যাহত করবে কিনা।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে জমি মালিকানার অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্গা প্রথাও আরও বিস্তৃত হয়েছে। বায়েস এবং হোসেন (২০০৭) জানান যে, বাংলাদেশে এখন প্রায় অর্ধেক জমি বর্গায় চাষ হয়। বস্তুত ধনী কৃষকেরা চাষবাস প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাদের পুরো জমিই বর্গা দিয়ে দেন। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, বর্গাপ্রথা উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটি বাধা। সুতরাং বর্গা প্রথার বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশে কীভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হলো তা আপাতদৃষ্টিতে একটি ধাঁধার বিষয়।

এর উত্তরে বলা দরকার যে, সরকারের পক্ষ থেকে উপর থেকে কোনো বর্গা সংস্কার না করা হলেও নিচ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্গা প্রথার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বেকার আধিয়ার (সাধারণভাবে, ভাগচাষ) বন্দোবস্ত থেকে বাংলাদেশে বর্গা প্রথা ব্যাপকভাবে নগদ চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রথার অধীনে জমি মালিকেরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তাদের জমি চাষিদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। অর্থনীতির ভাষায় এটাকে "পূর্ব-নির্ধারিত খাজনা" (*ফিক্সড রেন্ট*) ধরনের বর্গা প্রথা বলা হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দেখায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভাগচাষ পদ্ধতি যে প্রণোদনাহানী সৃষ্টি করে, নির্ধারিত খাজনা পদ্ধতি তা অনেকাংশে দূর করতে পারে। উপর থেকে প্রবর্তিত কোনো ভূমি সংস্কার ছাড়াই সাম্প্রতিককালে কৃষি উৎপাদন

কীভাবে বৃদ্ধি পেল সেই ধাঁধার উত্তর এই পরিবর্তনের মধ্যে বহুলাংশে নিহিত।[৬] লক্ষণীয়, বর্গার ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত খাজনা পদ্ধতিকে একটি দ্বিতীয় উত্তম (*সেকেন্ড বেস্ট*) সমাধান হিসেবে ভাবা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রথম উত্তম সমাধান হলো খোদ চাষীকেই জমির মালিকে পরিণত করা। সুতরাং বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হয়নি। আগামীতে কীভাবে এবং কীধরনের ভূমি সংস্কার বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হতে পারে তা একটি আলোচনার বিষয়।

ভূমি সংস্কার বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য: ইসলাম, ১৯৮৭, ২০১১, ২০১২, ২০১৭)। এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার মূলত দক্ষতা যুক্তির ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে।[৭] সুতরাং বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারকে ক্ষতিপূরণ ভিত্তিক হতে হবে। এরূপ ভূমি সংস্কারের উদাহরণ অন্যান্য দেশে রয়েছে। লক্ষণীয়, বাংলাদেশে ক্ষতিপূরণ ভিত্তিক ভূমি সংস্কার সম্পাদনের জন্য কিছু অনুকূল পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে। বায়েস এবং হোসেন (২০০৭) আরও দেখান যে, বর্তমানে গ্রামের বড় জমি মালিকদের অধিকাংশই "অনুপস্থিত মালিকে" (*অ্যাবসেন্ট ওউনার*) পরিণত হয়েছে। অনেকের

[৬] লক্ষণীয়, বাংলাদেশে বর্গাপ্রথার এই পরিবর্তনের পেছনে কাজ করছে প্রযুক্তির পরিবর্তন, বিশেষত অগভীর নলকূপের ভিত্তিতে সেচের প্রসার। আর এ কারণে শুষ্ক মৌসুমের বোরো ধান এখন দেশের প্রধান ফসলে পরিণত হয়েছে। এতে বৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসল উৎপাদনের যে অনিশ্চয়তা ছিল তা বহুলাংশে দূর হয়েছে। অর্থাৎ, জমি বর্গায় নিলে কী পরিমাণ লাভ হতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং তা তাদের পক্ষে মালিকদের পূর্ব নির্ধারিত নগদ খাজনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া (এবং পূর্ব-নির্ধারিত খাজনা ভিত্তিক বর্গা প্রথায় সম্মত হওয়াকে) সম্ভব করেছে। প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে যে উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়, মার্কসীয় এই সূত্রের এখানে একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে।

[৭] বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের পক্ষে দুই ধরনের যুক্তি রয়েছে। একটি হলো "দক্ষতা যুক্তি" (এফিশিয়েন্সী আর্গুমেন্ট), অন্যটি হলো "সমতা যুক্তি" (ইক্যুইটি আর্গুমেন্ট)। দক্ষতা যুক্তিটি হলো যে, বৃহৎ জমি মালিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট জমি মালিকদের উৎপাদনশীলতা বেশি, কারণ তাঁরা তুলনামূলকভাবে বেশি পারিবারিক শ্রম জমি চাষে নিয়োজিত করতে পারেন। অর্থাৎ এই যুক্তিটি পারিবারিক শ্রমঘন কৃষি উৎপাদনের জন্য বেশি প্রযোজ্য। পুঁজিঘন এবং অ-পারিবারিক শ্রমভিত্তিক কৃষির জন্য এই যুক্তি নাও প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং যদি বড় মালিকদের কাছ থেকে নিয়ে জমি ছোট মালিকদের নিকট বিতরিত হয়, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সমতা যুক্তিটি আরও স্পষ্ট, এবং তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। তবে লক্ষণীয় যে, গ্রামের পরিধিতে বড় জমি মালিকেরা ধনী বলে বিবেচিত হলেও জাতীয় পরিধিতে, বিশেষত শহুরে ধনীদের– শিল্প, ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের-তুলনায় তারা তেমন ধনী নয়। সুতরাং সমতা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি সংস্কার করতে হলে শহুরে ধনীদেরও সমধর্মী সম্পদ বিতরণের আওতাভুক্ত করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সমতা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণহীন, বাধ্যতামূলক ভূমি সংস্কারের যুক্তির মধ্যে সমস্যা থেকে যায়।

ছেলেমেয়েরা বিদেশে অভিগমন করেছে এবং তারা নিজেদের জমি বিক্রি করে দিতে ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ করে পুনর্বিতরণ করা সম্ভব। পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ভিত্তিক ভূমি সংস্কারকে অনেক সময় "বাজার-ভিত্তিক" সংস্কার বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমির বাজার মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। প্রাপ্ত জমির বিতরণেও বাজার-পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, বিগত সময়কালে গ্রামাঞ্চলে চাষকার্য ভিন্ন অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, যার ফলে জমি প্রত্যাশীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। জমি প্রত্যাশীদের উপযুক্ততা যাচাই করার পর যদি তাদের সংখ্যা লভ্য জমির তুলনায় বেশি হয়, তাহলে জমি বিতরণের ক্ষেত্রে নিলাম পদ্ধতিরও আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যাদের আর্থিক সামর্থ্য কম তাদেরকে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা এই নিলামে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। নিলামের মাধ্যমে জমি বিতরণের মূল লক্ষ্য হলো প্রাপ্ত জমি তাদের হাতে পৌছানো যারা জমির যথাযথ মূল্যায়ন করবেন এবং জমির কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। অন্য কোনো পদ্ধতিতে এই লক্ষ্য অর্জন করা গেলে সেটাও অনুসৃত হতে পারে।

ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নে বড় বাধা হলো স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে "অপারেশন বর্গা" কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃত্বসম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার সফল করতে হলে সৎ ও গণকল্যাণমুখী গ্রাম পরিষদ গঠন করা আবশ্যক হবে। এ বিষয়টি আমরা চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচনা করবো।

সবশেষ লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি সরকার কৃষিজমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা সিলিং ঘোষণা করেছে। এখন যাদের কৃষিজমি ৬০ বিঘার কম তারা তাদের মালিকানা এই পরিমাণের বেশি করতে পারবেন না। তবে যারা ইতিমধ্যে ৬০ বিঘার চেয়ে বেশি জমির মালিক তাদের বিষয়ে কী করা হবে তা এখনো তত পরিষ্কার নয়। কিছুটা হঠাৎ করেই এবং সরকার-বহির্ভূত তেমন কোনো রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই সরকার কর্তৃক ৬০ বিঘা সিলিংয়ের ঘোষণা সাধারণভাবে দেশে সম্পদ হিসেবে জমির আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাসকে প্রতিফলিত করে। বিগত কয়েক দশকে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সেবা খাতের বিকাশের ফলে এসব খাতের সম্পদই বড় সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আগে যারা অনেক জমির মালিক ছিলেন তাদের প্রায়

সকলেই এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপর্যুক্ত অন্যান্য সম্পদের মালিক হয়েছেন। ফলে কৃষি জমির মালিকানা তাদের নিকট এখন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকারের সাম্প্রতিক ৬০ বিঘা সিলিংয়ের পেছনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভবত এখানেই নিহিত। যাইহোক না কেন, এটা ভালো উদ্যোগ। এখন যেটা প্রয়োজন তা হলো যারা ইতিমধ্যে ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমির মালিক, তাদের সিলিং-উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ এবং খোদ কৃষকদের মধ্যে তার যথাযথ বিতরণ। আগামীর জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হতে পারে এবং তা শ্রমজীবীদের আয় বৃদ্ধি করবে।

১.৪.২ সমবায়ী মালিকানার সম্প্রসারণ

পুঁজি আয়ে শ্রমজীবীদের অংশ বৃদ্ধির আরেকটি প্রতিষ্ঠিত উপায় হলো অর্থনীতিতে সমবায়ী মালিকানার সম্প্রসারণ। একটি সমবায়ের সদস্যরা সে সমবায়ের একাধারে মালিক এবং শ্রমিক। সুতরাং একদিকে তারা শ্রমিক হিসেবে শ্রম আয় পেতে পারেন, অন্যদিকে সমবায়ের মালিক হিসেবে এর পুঁজি আয়েরও অংশীদার হতে পারেন। এর ফলে শ্রমজীবীদের মোট আয় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাতে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পেতে পারে।

শ্রমজীবীদের সমবায়ী মালিকানা সম্পর্কে রেহমান সোবহান বরাবরই উৎসাহী ছিলেন (Sobhan, 2021)। বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি অটো রিকশাচালকদের নিয়ে সমবায় গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একইভাবে তিনি বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিগমনকারীদের নিয়েও সমবায় গঠনের সম্ভাবনা দেখেন। তার এসব উদ্যোগ সে সময়ে সমাজতন্ত্রের ধারায় বাংলাদেশের উন্নয়নের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদ অভিমুখী হওয়ার কারণে সমবায়ী মালিকানা প্রসারের উদ্যোগের রাজনৈতিক পরিবেশ আর থাকেনি। কিন্তু রেহমান সোবহান তার সাম্প্রতিক আলোচনায় জোর দিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেও সমবায়ী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সফলভাবে কাজ করতে পারে (Sobhan, 2010)। এ ব্যাপারে তিনি ভারতের "আমল" কোম্পানির উদাহরণ দেন। সুবিদিত, ভারতের গ্রামীণ দুধ উৎপাদকেরা যাতে বাজারে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি ক্ষুদ্র পরিধিতে এই সমবায় গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই সমবায় বিস্তৃত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত

হয়। রেহমান সোবহান মনে করেন যে, আমলের অনুকরণে এবং আমলের সাফল্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশেও সমবায়ী মালিকানায় বাণিজ্যের পাশাপাশি উৎপাদন প্রসারের অনেক সুযোগ আছে এবং সে সুযোগ কাজে লাগানো প্রয়োজন।

১.৪.৩ ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

শ্রমজীবীদের মধ্যে পুঁজি আয় বিচ্ছুরণের উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবনার পাশাপাশি সাম্প্রতিক যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কোম্পানির মুনাফায় অংশীদারিত্ব প্রদান। এক অর্থে এই প্রস্তাবটি নতুন নয়। বস্তুত উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে এই প্রথাটি বেশ প্রচলিত এবং তা এসব দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুবিদিত, পুঁজিবাদের যৌথ মালিকানা ভিত্তিক (*জয়েন্ট স্টক*) কোম্পানির পর্যায়ে উপনীত হওয়া পুঁজি বিচ্ছুরণের সুযোগ করে দেয়।

সময় পরিক্রমায় বাংলাদেশেও পুঁজিবাজার বিকাশ লাভ করেছে এবং মাঝারি আয়ের এমনকি নিম্ন আয়ের মানুষরাও তাতে অংশগ্রহণ করছে। তবে ব্যাপক শ্রমজীবীরা পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ থেকে এখনও বহু দূরে। এর ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার কোম্পানিসমূহের পুঁজি আয়ের অংশীদারি হওয়ার ধারায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের সুযোগ এখনও সীমাবদ্ধ। তবে কোম্পানিসমূহ নিজেরা তাদের শেয়ারের মাধ্যমে শ্রমিকদের বোনাস ও অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করার মাধ্যমে কোম্পানির পুঁজি আয়ের অংশীদার করতে পারে। রেহমান সোবহান দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন (Sobhan, 2010)। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদও তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তিকায় অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের এই পদ্ধতির বিষয়ে উৎসাহী হয়েছেন (মাহমুদ, ২০২৩)। এটাকে তিনি "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক আয়ের ব্যাপক পুনর্বিতরণের মাধ্যমে স্ক্যান্ডিনেভীয় ধারার সমাজতন্ত্র (*সোশ্যাল ডেমোক্রেসি*) প্রতিষ্ঠা একটি প্রশ্নবিদ্ধ প্রস্তাব কারণ আয়ের এরূপ পুনর্বিতরণের জন্য যে ধরনের সুশাসন ও সংস্কৃতি প্রয়োজন তা বাংলাদেশে অর্জন করা কঠিন। তবে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহের মতো অত উঁচু মাত্রায় না হলেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণের ভূমিকাকে বাতিল

অথবা লঘু করে দেখা যায় না। বিশেষত, এই পুনর্বিতরণের অনেক পদ্ধতি আছে যেগুলো সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির জন্য এমন ভূমিকা রাখতে পারে যা ব্যক্তিগত কোম্পানি কর্তৃক তাদের শ্রমিকদের মধ্যে পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণ দ্বারা করা সম্ভব নয়। (এ বিষয়ে সপ্তম অনুচ্ছেদে আরও আলোচনা করা হবে।)

১.৪.৪ প্রত্যক্ষ উৎপাদনে সরকারি খাতের সম্প্রসারণ

বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ উৎপাদনে সরকারি খাতের সম্প্রসারণের বিষয়টিও সংক্ষেপে লক্ষ করা যেতে পারে। সুবিদিত যে, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঘোষিত জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশের শিল্প, অর্থায়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ সরকারি মালিকানায় আনা হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে পাকিস্তানি আমলের মতো অর্থনৈতিক বৈষম্যের উদ্ভব হতে না দেওয়া। বাংলাদেশের জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা এখনও বিতর্কিত। অনেকেই জাতীয়করণকে বিফল মনে করলেও রেহমান সোবহান, যিনি জাতীয়করণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, মনে করেন না যে, এই নীতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর মতে, প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষ পরিচালনার জন্য উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে এসব প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সাথে পরিচালনা সম্ভব ছিল (Sobhan, 2021)। বস্তুত বিশদ বিশ্লেষণ দেখায় যে, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষভাবে পরিচালনার সমস্যা বহুলাংশে পুঁজিবাদী কর্পোরেশনসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট "প্রিন্সিপ্যাল-এজেন্ট" সমস্যার অনুরূপ। সুতরাং এই সমস্যারও সমাধান সম্ভব। ফ্রান্স, সুইডেন, সিঙ্গাপুরসহ অনেক পুঁজিবাদী দেশের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায়। একইভাবে সাম্প্রতিককালের চীন এবং ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতাও দেখায় যে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুসারী দেশের সরকারি মালিকানাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে নয় এমনকি বিশ্ব বাজারেও সাফল্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। সুতরাং বৈষম্য হ্রাসকারী ব্যবস্থা হিসেবে নীতিগতভাবেই সরকারি মালিকানা নাকচ করে দেওয়ার ভিত্তি নেই (Islam, 2023)।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক এবং পরিশাসনগত পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে সরকারি মালিকানা সম্প্রসারণের প্রস্তাবে উৎসাহী হওয়া কঠিন। "বাংলাদেশ বিমান" সহ যেসব প্রতিষ্ঠান এখনো সরকারি মালিকানায় আছে সেগুলোর দুরবস্থা দেখলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তবে সুশাসনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত করণীয়সমূহ যদি সফলভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ উৎপাদনে সরকারি খাতের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে নিশ্চয়ই পুনর্ভাবনা করা যেতে পারে।

১.৫ প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাস

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের দ্বিতীয় ধারার উপায় হলো প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণ। উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, একজন মানুষের কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয়যোগ্য আয়ের ভূমিকাই মুখ্য। প্রাথমিক (বাজার) আয়ের পুনর্বিতরণ যদি সমতাধর্মী হয়, তাহলে সমাজে ব্যয়যোগ্য আয়ের বিতরণ প্রাথমিক আয়ের বিতরণের চেয়ে বেশি সমতাধর্মী হয়। তবে যদি পুনর্বিতরণ অসমতাধর্মী হয়, তাহলে এর উল্টোটাও হতে পারে। সকল উন্নত দেশেই প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পুনর্বিতরণ সমতাধর্মী হয়; ফলে এসব দেশে ব্যয়যোগ্য আয়ের বিতরণ প্রাথমিক আয়ের বিতরণের চেয়ে অনেক বেশি সমতাধর্মী হয়। উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যাভিসারী বাংলাদেশকেও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে এই পদ্ধতির প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে হবে। এই উপ-অনুচ্ছেদে আমরা প্রথমে পুনর্বিতরণের জন্য আয় সংগ্রহের বিভিন্ন পন্থার দিকে নজর দেব। তারপর আমরা এই সংগৃহীত আয় বিতরণের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো। তবে শুরুতে উন্নত দেশসমূহে প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণের মাত্রা এবং গুরুত্বের বিষয়টি লক্ষ করা যেতে পারে।

১.৫.১ উন্নত দেশসমূহে আয় পুনর্বিতরণের গুরুত্ব

উন্নত দেশসমূহে আয়ের পুনর্বিতরণের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য চিত্র ১.৭ ও ১.৮-এ উপস্থাপন করা হলো। চিত্র ১.৭ দেখায় যে, গড়ে ওইসিডি'র সদস্য দেশসমূহের জিডিপির প্রায় ৩৫ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের করের মাধ্যমে আহরিত ও

বিতরিত হয়।[৮] এক্ষেত্রে দেশভেদে তারতম্য রয়েছে। ফ্রান্স, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ইতালি এবং অস্ট্রিয়ায় জিডিপির ৪০ শতাংশের বেশি পুনর্বিতরিত হয়। নেদারল্যান্ড ও জার্মানিতে এই অনুপাত ৪০ শতাংশের চেয়ে কিছু কম। যুক্তরাজ্য ও কানাডায় এই অনুপাত ৩০ শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ডে এই অনুপাত ৩০ শতাংশের কম। অনেক সময় বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বিভিন্ন মডেল চিহ্নিত করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে যেমন "এ্যাংলো-স্যাকসন" এবং "সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক" মডেল। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, এ্যাংলো-স্যাকসন মডেলে বাজার নির্ধারিত ফলাফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়; পক্ষান্তরে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মডেলে বাজার নির্ধারিত ফলাফলকে রাষ্ট্র দ্বারা সংশোধিত করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। আরও ধারণা করা হয় যে, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহে পুঁজিবাদের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মডেল এবং যুক্তরাজ্যসহ ইংরেজি ভাষী অন্যান্য দেশে এ্যাংলো-স্যাকসন মডেল বিরাজ করে। তবে চিত্র ১.৭ দেখায় যে, অনেক অ-স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশেই (যেমন ফ্রান্স, ইতালি ও অস্ট্রিয়া) অধিক অনুপাতে জিডিপি পুনর্বিতরিত হচ্ছে। একইভাবে আমরা দেখি যে, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াতে পুনর্বিতরিত জিডিপির অনুপাত ৩০ শতাংশের চেয়ে কম হলেও যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডে তা ৩০ শতাংশের চেয়ে বেশি। সুতরাং এ্যাংলো-স্যাক্সন এবং স্ক্যান্ডিনেভীয় মডেলের সংজ্ঞায়নে অতিসরলীকরণের সম্ভাবনা আছে। যাহোক, সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, পুঁজিবাদের মডেল নির্বিশেষে উন্নত দেশসমূহে জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পুনর্বিতরিত হয়। চিত্র ১.৮ দেখায় যে, জিডিপির এই পুনর্বিতরণ উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ উন্নত দেশে বাজার-আয় ভিত্তিক গিনি সহগ ৪০ শতাংশের বেশি হলেও পুনর্বিতরণের ফলে ব্যয়যোগ্য আয় ভিত্তিক গিনি সহগ ৩০ শতাংশের নিচে নেমে আসে।

[৮] Causa & Hermansen (2019, p. 15).

চিত্র ১.৭: উন্নত দেশসমূহে আয় পুনর্বিতরণের মাত্রা

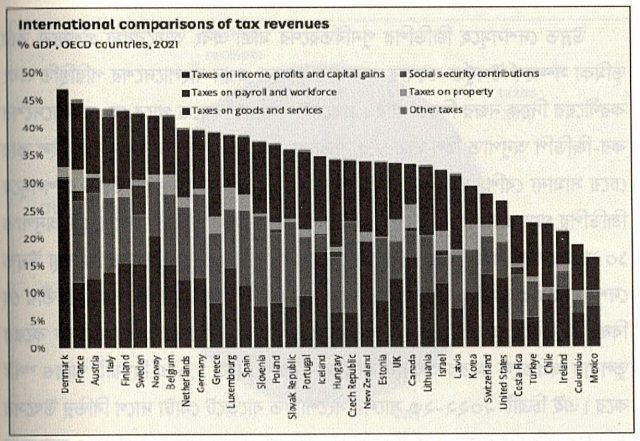

সূত্র: Keep (2023, p. 28).

চিত্র ১.৮: উন্নত দেশসমূহে আয় বৈষম্য হ্রাসে পুনর্বিতরণের ভূমিক

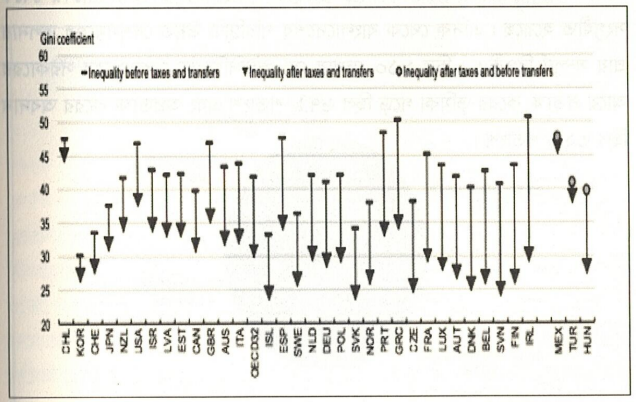

সূত্র: Causa & Hermansen (2019, p.30).

১.৫.২ বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজস্ব কাঠামো

উন্নত দেশসমূহে জিডিপির পুনর্বিতরণের মাত্রা এবং আয়বৈষম্য প্রশমনে তার ভূমিকা সম্পর্কে উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে আমরা এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং করণীয়ের দিকে নজর দিতে পারি। প্রথমেই লক্ষ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ছিল মাত্র ৮.৫ শতাংশ এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল তার চেয়ে সামান্য বেশি, ৯.৬ শতাংশ। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যেখানে উন্নত দেশসমূহে জিডিপির গড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ পুনর্বিতরিত হয়, সেখানে বাংলাদেশে এই অনুপাত ১০ শতাংশেরও কম। ফলে পুনর্বিতরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাসের যে পন্থা উন্নত দেশসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা থেকে বাংলাদেশ বহু দূরে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হলো বাংলাদেশে সরকারের রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় অপ্রত্যক্ষ করের অবদান কয়েকগুণ বেশি। চিত্র ১.৯ এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে। এই চিত্রটি ২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বাজেটে মোটা দাগে বিভিন্ন উৎসের ভূমিকার পরিমাপ দেয়। আমরা দেখি যে, প্রত্যক্ষ করের (আয়, মুনাফা ও মূলধনের উপর কর, ভূমি রাজস্ব এবং যানবাহন কর) অবদান আনুমানিক ২৮ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিল; বাকি প্রায় ৭২ শতাংশ বিভিন্ন অপ্রত্যক্ষ কর, শুল্ক ও অন্যান্য দেয় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এদিক থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি উন্নত দেশসমূহের তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। চিত্র ১.১০ দেখায় যে, ওইসিডিভুক্ত দেশসমূহের সরকারের আয়ে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা গড়ে ছিল ৬৭.৯ শতাংশ এবং অপ্রত্যক্ষ করের অবদান ছিল ৩২.১ শতাংশ।

চিত্র ১.৯: বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন উৎস (২০২৩-২০২৩)

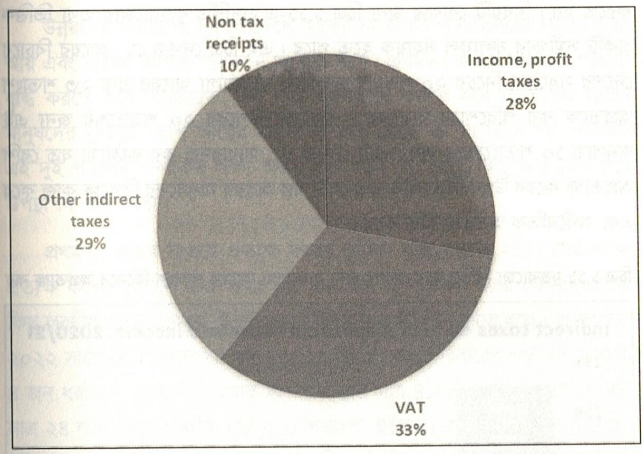

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

চিত্র ১.১০: উন্নত দেশসমূহের রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন উৎসের ভূমিকা

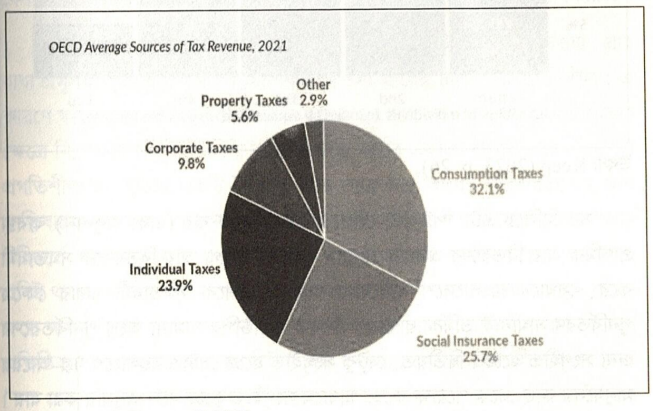

সূত্র: Bunn & Perez (2023).

লক্ষণীয়, দরিদ্র জনগণকেই অসমানুপাতিক হারে অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করতে হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য চিত্র ১.১১-এ প্রদর্শিত যুক্তরাজ্যের তথ্য ভিত্তিক একটি সমীক্ষার ফলাফল সহায়ক হতে পারে। এই চিত্র দেখায় যে, আয়ের বিচারে দেশের সবচেয়ে নিচের ২০ শতাংশ জনগণের ব্যয়যোগ্য আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ অপ্রত্যক্ষ কর পরিশোধে ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে উপরের ২০ শতাংশের জন্য এই অনুপাত ১০ শতাংশেরও কম। এটা দেখায় যে, সাধারণত কর কাঠামো যত বেশি অপ্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভরশীল তত সেটা স্বল্প আয়ের মানুষদের বিপক্ষে কাজ করে এবং অর্থনৈতিক অসমতা বৃদ্ধি করে।

চিত্র ১.১১ যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন আয় গ্রুপের জন্য ব্যয়যোগ্য আয়ের শতাংশ হিসেবে অপ্রত্যক্ষ কর

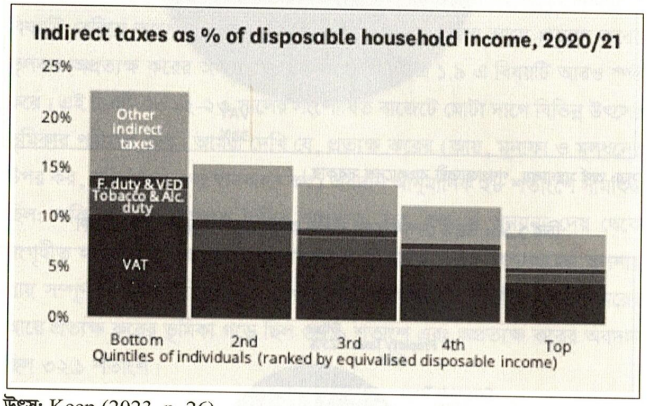

উৎস: Keep (2023, p. 26).

সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে, যেখানে উন্নত দেশে কর (এবং অনুদান) ব্যবস্থা প্রাথমিক আয় বিতরণের অসমতাকে হ্রাস করে ব্যয়যোগ্য আয় বিতরণকে সমতাধর্মী করে, সেখানে বাংলাদেশে ব্যয়যোগ্য আয় বিতরণকে সমতাধর্মী করার ক্ষেত্রে পুনর্বিতরণ সামান্যই ভূমিকা রাখছে। প্রথমত, জিডিপির সামান্য অংশ পুনর্বিতরণের জন্য সংগৃহীত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যেটুকু সংগৃহীত হচ্ছে সেটাও বহুলাংশে স্বল্প-আয়ের মানুষদের কাছ থেকে পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহীত হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়।

১.৫.৩ রাজস্ব সংগ্রহে করণীয়

উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশে আয়ের সমতাধর্মী পুনর্বিতরণের লক্ষ্যে রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ের ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। প্রথমত, রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই বৃদ্ধি এমনভাবে করতে হবে যাতে স্বল্প আয়ের মানুষদের তুলনায় বেশি আয়ের মানুষদের কাছ থেকে তা সংগৃহীত হয়। কীভাবে এই দুই পরস্পর সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব সে বিষয়ে কিছু আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত, রাজস্ব সংগ্রহে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করের দুই মূল উৎস তথা আয় কর এবং সম্পদ কর উভয় ক্ষেত্রেই অনেক কিছু করণীয় আছে। যেমন, উভয় করের ভিত্তি সম্প্রসারিত করতে হবে। বাংলাদেশে ২০২২ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৭ কোটি; যদি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪ জন ধরা হয়, তাহলে পরিবার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪.২৫ কোটি। অথচ সে বছর মাত্র ২৪ লাখ মানুষ (অর্থাৎ মাত্র ৫.৬ শতাংশ পরিবার) কর রিটার্ন জমা দিয়েছে। এই ২৪ লাখের মধ্যে ৮ লাখ ছিল সরকারি কর্মচারী (যাদের জন্য কর রিটার্ন জমা দেওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক)। কাজেই সরকারি কর্মচারীদের বাদ দিলে অর্থাৎ বেসরকারি জনগণের মধ্যে মাত্র ৩.৮ শতাংশ পরিবার আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছে।

বিপরীতে, বেশিরভাগ উন্নত দেশে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক। এসব দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে কর হারের চরিত্র হয় প্রগতিশীল। এ কারণে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর উপর করের হার সাধারণত কম হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো তাদের প্রদত্ত করের একাংশ ফেরত পায়। তদুপরি প্রগতিশীল কর হারের একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য নেতিবাচক কর হার। সেক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের পরিবারসমূহ নিট হিসেবে কর দেওয়ার পরিবর্তে বরং অনুদান পায়। অর্থাৎ কর-ব্যবস্থার মধ্যেই পুনর্বিতরণের মেকানিজম প্রবিষ্ট থাকে, যা নিম্ন আয়ের পরিবারদেরকেও কর রিটার্ন জমা দেওয়াতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে বাধ্যতামূলক না হলেও কর রিটার্ন জমা দেওয়া একটি সার্বজনীন প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশও কর রিটার্ন জমা দেওয়ার প্রথাকে উৎসাহিত করার জন্য "কর রেয়াত" এবং "কর অনুদানে"র সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো।

ব্যক্তি আয়করের মতো বাংলাদেশে কর্পোরেট (অর্থাৎ কোম্পানি কিংবা ব্যবসা) আয় করের পরিধি এবং পরিমাণ বৃদ্ধিরও বিরাট সুযোগ রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কর ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদনে "মুনাফা" (তথা কর্পোরেট) করকে আলাদা করে দেখানো হয় না। সুতরাং কত সংখ্যক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কী পরিমাণ মুনাফা কর আদায় হচ্ছে সে বিষয়ে তথ্য সহজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে বিগত সময়কালে ব্যাপক সংখ্যায় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এসব প্রতিষ্ঠান লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মুনাফা করের প্রতি এত কম মনোযোগ বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। আগামীতে দেশের সকল শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় আনার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যক্তি আয়ের মতো কোম্পানি আয়ের উপর ধার্যকৃত করও প্রগতিশীল হারে নির্ধারণের পাশাপাশি বিভিন্ন রেয়াত ও অনুদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাহলে ক্ষুদে ব্যবসায়ীরাও রিটার্ন জমা দিতে উৎসাহী হবে এবং তা একটা সর্বজনীন অভ্যাসে পরিণত হবে।

লক্ষণীয়, কর জালের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি এবং কর ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন হলো আয় সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা। সেজন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান ও নিয়োজনের নিবন্ধন এবং শ্রম ও অর্থনীতি এ দু'য়ের আনুষ্ঠানিকীকরণ। চিত্র ১.৯ দেখায় যে, ভ্যাট থেকে দেশের মোট রাজস্বের প্রায় ২৮ শতাংশ আহরিত হয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন এবং তার মাধ্যমে অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণের মাত্রা বৃদ্ধি ভ্যাট সংগ্রহের জন্যও প্রয়োজন। এরূপ নিবন্ধন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিক-কর্মচারীর আয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহকে সুগম করবে; ফলে তা ব্যক্তি আয়করের ব্যাপ্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যও সহায়ক হবে।[৯]

প্রত্যক্ষ করের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে সম্পদ কর। পরিতাপের বিষয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিসংখ্যানে সম্পদ কর সম্পর্কে তথ্যও সহজে লভ্য নয়। অথচ বিগত সময়কালে দেশে প্রচুর সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু ব্যক্তি বিত্তশালী হয়েছেন। এটা ঠিক যে, আয় বহুলাংশে সম্পদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আয়ের উপর প্রগতিশীল হারে কর আরোপ পরোক্ষভাবে সম্পদ

[৯]পরবর্তী আলোচনায় আমরা নিবন্ধনের আরও অনেক প্রয়োজনীয়তার সাক্ষাৎ পাব। বস্তুত শ্রম নিয়োজনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন গোটা অর্থনীতিকে একটা নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই প্রয়োজন। অন্যকথায়, উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য এটা একটি আবশ্যিক শর্ত।

বৈষম্যের প্রভাবকে প্রশমিতকরণে সহায়তা করতে পারে। তবে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য সম্পদের উপর প্রত্যক্ষভাবেও কর আরোপ করা প্রয়োজন। প্রায় সকল উন্নত দেশেই তা করা হয়। সে লক্ষ্যের অভিযাত্রী বাংলাদেশেরও সেদিকে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটা ঠিক যে, বিভিন্ন ধরনের পণ্যের জন্য বিভিন্ন হারের মূসক (মূল্য সংযোজন কর) আদায়ের মাধ্যমে ভ্যাটের কারণে অসমতা বৃদ্ধিকে প্রশমিত করা যাতে পারে। তবে বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন হারে মূসক আদায় একটি আয়াসসাধ্য কাজ। সুতরাং সাধারণভাবে রাজস্ব আদায়ে অপ্রত্যক্ষ করের ভূমিকা হ্রাস এবং প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা বৃদ্ধিই অসমতা হ্রাসের একটি শ্রেয় পন্থা।

১.৫.৪ রাজস্ব ব্যয়ে করণীয়

প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক হচ্ছে কিনা তা অনেকাংশে বিতরণের ধরনের উপরও নির্ভর করে। আয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন, বিতরণের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিকেও তেমনি মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। উভয় ক্ষেত্রেই বিতরণ যত প্রগতিশীল হবে ততই তা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক হবে।

১.৫.৪.১ প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের বিভিন্ন দিক

পুনর্বিতরণ প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করে যখন সরকার কর্তৃক সংগৃহীত আয় নগদ, দ্রব্য, বা সেবার রূপে সরাসরিভাবে স্বল্প আয়ের জনগণের নিকট বিতরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো নেতিবাচক আয়কর (প্রদত্ত আয়কর ফেরত পাওয়া এবং কর-অনুদান পাওয়া) যার কথা রাজস্ব আয় সংগ্রহ সম্পর্কিত উপরের আলোচনায় ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ বিতরণের আরেক পদ্ধতি হলো স্বল্প আয়ের নাগরিকদের আলাদাভাবে নগদ অর্থ, দ্রব্য ও সেবা প্রদান। এ ধরনের প্রত্যক্ষ বিতরণ আবার দু'ভাবে হতে পারে। একটি হলো "শর্তহীন" আর অন্যটি হলো "শর্তাধীন"। স্বল্প পরিধিতে হলেও বাংলাদেশে এই উভয় ধরনের বিতরণের কিছু উদাহরণ ইতিমধ্যে রয়েছে। যেমন, সরকার বিধবা এবং বয়স্কদের জন্য ভাতা চালু করেছে। যারা এসব ভাতা পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন তারা তা শর্তহীনভাবেই পাচ্ছেন। অর্থাৎ এর জন্য

বিনিময়ে তাদের কিছু করতে হচ্ছে না।[১০] অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য স্বল্প আয়ের নাগরিকদের নিকট প্রদান শর্তহীন পুনর্বিতরণের আরেকটি পন্থা।[১১] এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য স্বল্পআয়ভুক্তদের কিছু প্রদান করতে হয় না, যদিও তাদেরকে প্রায়শ দীর্ঘসময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ঝামেলারও সম্মুখীন হতে হয়।[১২]

বাংলাদেশে শর্তাধীন পুনর্বিতরণেরও কিছু কর্মসূচি চালু আছে। পাকিস্তান আমলের (ষাটের দশকে প্রবর্তিত) "পল্লী পূর্ত কর্মসূচি" (*রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম*) এরূপ একটি কর্মসূচি ছিল। এর অধীনে মন্থর মৌসুমে গ্রামীণ শ্রমজীবীরা বিভিন্ন নির্মাণকাজে শ্রম দেওয়ার বিনিময়ে আয়ের অধিকারী হতেন।[১৩] বর্তমানের "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি এই কর্মসূচিরই একটি সংস্করণ এবং এটিও শর্তাধীন, যা এটার নাম থেকেই স্পষ্ট।

নব্বইয়ের দশকে ব্রাজিলসহ বেশ কিছু দক্ষিণ আমেরিকার দেশে ব্যাপকহারে "শর্তাধীন নগদ প্রদান" (*কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার*) কর্মসূচি চালু হয়। তার মধ্যে ব্রাজিলের *বোলসা ফ্যামিলিয়া* (পরিবার জোরদারকরণ) নামক কর্মসূচি বেশ প্রচার লাভ করে। এই কর্মসূচির অধীনে স্বল্প আয়ের পরিবারসমূহকে নগদ অর্থ দেওয়া হয় এই শর্তে যে, তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণ করবে কিংবা টিকা কর্মসূচিতে

[১০] বাংলাদেশ এ ধরনের কিছু কার্যক্রম আগে থেকেই চালু ছিল এবং সাম্প্রতিককালে আরও কিছু যোগ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার এখন দুঃস্থ ভাতা এবং বিধবা ভাতা চালু করেছেন। এর ফলে এই দুই ধরনের স্বল্প আয়ের নাগরিকরা কিছু অর্থ পাচ্ছেন এবং সেটা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করছে। এ ধরনের কর্মসূচির পরিধি এবং পরিমাণ আরও বাড়ানো যায় কিনা সে বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

[১১] বর্তমানে টিসিবি'র মাধ্যমে এ ধরনের বিতরণ করা হচ্ছে।

[১২] প্রত্যক্ষ প্রদানমূলক আরেকটি যে কর্মসূচি বর্তমান সরকার উৎসাহের সাথে বাস্তবায়িত করছে তার নাম হলো "আশ্রয়ন কর্মসূচি"। এই কর্মসূচির আওতায় গ্রামের সকল ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে খাস জমিতে ঘর নির্মিত হচ্ছে এবং তা ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে রেজিস্ট্রি করে প্রদান করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে স্ত্রীর নামে যাতে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এই কর্মসূচি ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে এবং সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী গৃহহীনতার সমস্যা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালু থাকবে।

[১৩] বস্তুত ভারতের সাম্প্রতিক "মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতি প্রকল্প"কে পূর্বোক্ত "গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচি"র বৃহত্তর সংস্করণ বলে ভাবা যেতে পারে। এই কর্মসূচির অধীনে গ্রামীণ শ্রমজীবীদের জন্য বছরে ১০০ দিন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়। এই কর্মসূচিরও মূল লক্ষ্য গ্রামীণ শ্রমজীবীদের ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি; তবে তা অনুদানের মাধ্যমে না করে শ্রমদানের শর্তাধীন করা হয়েছে।

অংশগ্রহণ করবে। স্পষ্টতই, এসব কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যের সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যের সংযুক্তি সাধন। ব্রাজিলে আয় বৈষম্য হ্রাসে বোলসা ফ্যামিলিয়া কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে গবেষকেরা মনে করেন। বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাও এ বিষয়ে আগ্রহী হয় এবং ক্রমে এধরনের কর্মসূচি অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশেও তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন, বাংলাদেশে প্রবর্তিত "শিক্ষার বিনিময়ে ভাতা" এ ধরনের একটি কর্মসূচি, যার লক্ষ্য হলো কন্যা শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য পিতা-মাতাদের উৎসাহিত করা। বাংলাদেশে স্কুলে মেয়েদের অংশগ্রহণের হারের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশে শর্তহীন এবং শর্তাধীন উভয় ধরনের কিছু বিতরণমূলক কর্মসূচি আগে থেকেই চালু ছিল এবং সম্প্রতিকালে তার সাথে আরও কিছু নতুন কর্মসূচি যোগ হয়েছে।

তবে প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে এবং তা শর্তহীন এবং শর্তাধীন উভয় ধরনের কর্মসূচির জন্য প্রযোজ্য। তার মধ্যে একটি হলো সম্ভাব্য দুর্নীতি ও অদক্ষতা। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচি মানুষকে শ্রমবিমুখ করে দিতে পারে। প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগটি আরও গভীর চরিত্রের। সেটি হলো এই যে, এভাবে আলাদা করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হলে তারা সমাজের বাকি (বৃহত্তর) অংশ থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত হন এবং এক ধরনের সামাজিক বিরূপতার বা লজ্জার (*স্টিগমা*) সম্মুখীন হয়, যেটা তাদের আত্মমর্যাদার জন্য হানিকর।[১৪] সুতরাং আয় পুনর্বিতরণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

[১৪] এখানে চিন্তাটা হলো এই যে, যাদের আয় স্বল্প তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আয় স্বল্প হওয়ার মূল কারণ হলো যে, তারা স্বল্প সম্পদের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ তাদের আচরণের কারণে তাদের আয় স্বল্প নয়; নেহাত আপতিক কারণেই তারা স্বল্প আয়ের অধিকারী। তারা সমাজের বাকি অংশ থেকে পৃথক কিছু নন। সুতরাং স্বল্প আয়ের জন্য তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে কিছু অর্থ এবং দ্রব্য প্রদান বৃহত্তর সমাজের সাথে তাদের সম্পৃক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করে না, বরং বৃহত্তর সমাজ থেকে তাদেরকে আরও পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করে।

১.৫.৪.২ পরোক্ষ পুনর্বিতরণের বিভিন্ন দিক

পুনর্বিতরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো পরোক্ষ বিতরণ। এটা বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে পারে। একটি হলো শুল্ক নীতির মাধ্যমে মৌলিক চাহিদামূলক পণ্য সমূহের দাম কমিয়ে রাখা। এটা একদিকে অপ্রত্যক্ষ, অন্যদিকে সার্বজনীন। সকলেই এই সুবিধা ভোগ করতে পারে; শুধুমাত্র স্বল্প আয়ের মানুষরা নন। এতে স্বল্প আয়ের মানুষদের সামাজিক লজ্জার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তবে অপ্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের এই সুনির্দিষ্ট রূপের একটি নেতিবাচক দিক হলো এ যে, পণ্য ও সেবার দাম কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রাখার ফলে অর্থনীতিতে অদক্ষতার উদ্ভব ঘটতে পারে এবং ধনীরা অযাচিত সুবিধা পেতে পারে যা আবার সামাজিকভাবে অন্যায্য।

পরোক্ষ বিতরণের সাথে অমর্ত্য সেনের "সক্ষমতা তত্ত্বে"র সম্পর্কটি লক্ষ করা প্রয়োজন। অমর্ত্য সেনের মতে, উন্নয়নের লক্ষ্য হলো মানুষের মুক্তি; আর মানুষের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে তার "ইচ্ছাপূরণে"র (*ফাংশনিং*) জন্য প্রয়োজনীয় "সামর্থ্য" (*ক্যাপাবিলিটি*) অর্জন করতে পারে। সামর্থ্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়, তবে এটা পরিষ্কার যে, এই সামর্থ্য অর্জনের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ একটা আবশ্যকীয় শর্ত। মৌলিক চাহিদার মধ্যে নিঃসন্দেহে খাদ্যের কথাই প্রথমে আসে। বস্তুত সামর্থ্য সংক্রান্ত তত্ত্বের দিকে অমর্ত্য সেনের অভিযাত্রা খাদ্যের অভাব তথা দুর্ভিক্ষের আলোচনা দিয়েই শুরু হয়েছিল। যাহোক, খাদ্য ছাড়া আরও যে দুটি বিষয়ের উপর অমর্ত্য সেন জোর দিয়েছেন তা হলো শিক্ষা ও চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ।

অপ্রত্যক্ষ বিতরণের একটি উদাহরণ হলো সরকারি অর্থসংস্থান দ্বারা সার্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এর ফলে স্বল্প আয়ের সদস্যরাও সমাজের অন্যান্যদের মতো চিকিৎসা পেতে পারে এবং তাদের সন্তানেরা সমাজের অন্যান্যদের সন্তানদের মতো শিক্ষা পেতে পারে। যেহেতু এরূপ সার্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য সরকারি অর্থসংস্থানে ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কর বেশি ভূমিকা রাখবে সেহেতু এটাও একধরনের অপ্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণ এবং এর চরিত্র সাধারণভাবে প্রগতিশীল। এ ধরনের পুনর্বিতরণ দ্বারা একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, অর্থনৈতিক বৈষম্য কার্যত হ্রাস পায়, কারণ নগদ আকারে অর্থ না পেলেও সার্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের যে অর্থ ব্যয় করতে হতো তা থেকে তারা মুক্তি পায়। ফলে তাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা এবং চিকিৎসার "বহিঃসারিত উপকার" (*পজিটিভ এক্সটারনালিটি*) আছে; কাজেই স্বল্প আয়ের মানুষরা ভালো শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পেলে গোটা সমাজ লাভবান হতে পারে। তৃতীয়ত, এ ধরনের পুনর্বিতরণ দ্বারা স্বল্প আয়ের মানুষদের "সামাজিক লজ্জা"র সম্মুখীন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের "মানবাধিকার ঘোষণা"তে শিক্ষা এবং চিকিৎসা পাওয়ার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, এটাকে তারই বাস্তবায়ন হিসেবে দেখা যেতে পারে। সবশেষে, সরকারি অর্থসংস্থান দ্বারা পরিচালিত সার্বজনীন শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে সমাজ আরও সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং তা অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক হতে পারে (এ বিষয়ে সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা আরও আলোচনা করবো)।

১.৫.৪.৩ বাংলাদেশের সরকারের ব্যয় কাঠামো

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা প্রথমে বাংলাদেশে সরকারের ব্যয় কাঠামোর দিকে নজর দিতে পারি। বাংলাদেশের ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী খাতওয়ারি ব্যয়ের পরিমাণ এবং মোট ব্যয়ে তার অনুপাতের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের বাজেটে প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের সুযোগ মূলত একটি মাত্র মন্ত্রণালয় তথা "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" মন্ত্রণালয়ে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য খাতেও এ ধরনের পুনর্বিতরণের কিছু সুযোগ থাকতে পারে, তবে বাজেটের লাইন-আইটেমের তালিকা থেকে তা বোঝার উপায় নেই। আমরা দেখতে পাই যে, ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৫.৪ শতাংশ। ২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বাজেটে এই অনুপাত ছিল আরও কম, মাত্র ৪.২ শতাংশ। আরও লক্ষণীয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দের ৯৩ শতাংশ ব্যয় হয় "পরিচালন" বাবদ এবং নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের জন্য তা ৮২ শতাংশ। সুতরাং, স্পষ্ট যে, এসব মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের সামান্যই প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে।

পরোক্ষ পুনর্বিতরণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্পষ্ট যে, এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রাখে শিক্ষা ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে এই দুই মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের যথাক্রমে ১৩.৭ ও ৫.০ শতাংশ। ২০২২-২৩ সালের সংশোধিত বাজেটে তা ছিল যথাক্রমে ১২.৯ ও ৪.৫ শতাংশ। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দ নৈরাশ্যজনক। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ কতখানি পরোক্ষ পুনর্বিতরণের জন্য সহায়ক হচ্ছে তা নির্ভর করে বরাদ্দকৃত অর্থ কীভাবে ব্যয়িত হচ্ছে। সেটা জানার জন্য এসব খাতের আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন (সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা তার কিছু চেষ্টা করবো)।

১.৫.৪.৪ যুক্তরাজ্যের সাথে তুলনা

বাংলাদেশে বাজেটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পুনর্বিতরণের যে চিত্র আমরা উপরে পেলাম তা উন্নত দেশসমূহ থেকে কত দূরে সেটা বোঝার জন্য আমরা যুক্তরাজ্যের বাজেটের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, যুক্তরাজ্য একদিকে এ্যাংলো-স্যাক্সন মডেলের পুঁজিবাদী দেশ, অন্যদিকে জিডিপির পুনর্বিতরণের মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে তা ওইসিডি'র গড়ের চেয়েও কিছুটা বেশি। সুতরাং যুক্তরাজ্য উন্নত দেশসমূহের একটি মাঝারি চিত্র দিবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র ১.১২ যুক্তরাজ্যের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের আয়ের দিকটি তুলে ধরে। আমরা দেখি যে, রাজস্বের প্রায় ৬০ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর থেকে সংগৃহীত হয়। লক্ষণীয়, আয়কর এবং পুঁজি কর ছাড়াও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে "জাতীয় বীমাতে অবদান," যা সরকারের আয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৭.৫ শতাংশ) যোগায়।

চিত্র ১.১২: যুক্তরাজ্যের ২০২২-২৩ সালের বাজেটে সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎসের অবদান

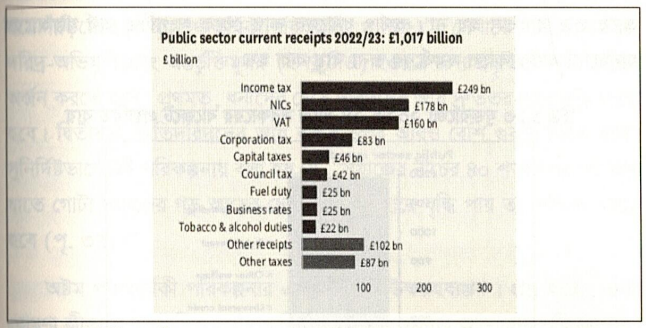

সূত্র: Keep (2023, p. 6).

টীকা: NIC: National insurance contributions. Capital taxes- এর মধ্যে অন্তর্গত হলো স্ট্যাম্প আদায়, পুঁজি মূল্য বৃদ্ধি (ক্যাপিট্যাল গেইন) এবং উত্তরাধিকার কর। Corporation tax-এর অন্তর্গত হলো জ্বালানি মুনাফার উপর লেভি (EPL).

একইভাবে চিত্র ১.১৩ যুক্তরাজ্যের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ব্যয়ের প্রস্তাব তুলে ধরে। আমরা দেখি যে, স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের ১৪.৮ শতাংশ, শিক্ষার জন্য ৬.৯ শতাংশ, অন্যান্য গণসেবার জন্য ১১.৭ শতাংশ, পেনশন বাবদ ১০.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের জন্য ৭.৩ শতাংশ। অর্থাৎ এই কয়টি লাইন আইটেমের জন্য বাজেটের ৫১.২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। "অন্যান্য ব্যয়" শীর্ষক বাজেটের একটি বড় অংশ (২৫.৭ শতাংশ) বিস্তারিত করা হয়নি। তবে আশ্চর্য্যের হবে না যদি এই আইটেমের মধ্যেও পুনর্বিতরণমূলক উপাদান থাকে। সুতরাং, আমরা দেখি যে, যেখানে বাংলাদেশের বাজেটে পুনর্বিতরণের সম্ভাবনাসম্পন্ন বরাদ্দ হলো বাজেটের ১৭ কিংবা ১৮ শতাংশ, সেখানে যুক্তরাজ্যের জন্য এই অনুপাত হলো কমপক্ষে ৫১.২ শতাংশ এবং সম্ভবত ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের বাজেটের মূল লক্ষ্যই হলো পুনর্বিতরণ। লক্ষণীয়, এই পুনর্বিতরণের দুটি দিক আছে। একটি হলো "আন্ত-ব্যক্তি" বিতরণ, অর্থাৎ সমাজের ধনীদের কাছ থেকে স্বল্প আয়ভুক্তদের অভিমুখে বিতরণ। অন্যটি হলো "আন্ত-সময়" বিতরণ যার অভিপ্রকাশ দেখি পেনশনের মধ্যে। তবে আন্ত-সময় পুনর্বিতরণের মধ্যেও আন্ত-ব্যক্তি পুনর্বিতরণের উপাদান নিহিত থাকে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে সকলের বেতন থেকে প্রায় ১২ শতাংশ সামাজিক বীমার জন্য রাখা হয়। কিন্তু ৬৫ বছর অতিক্রম করার পর

যখন সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল থেকে আয় প্রদান করা হয় তখন ব্যক্তিভেদে এই আয়ে তত ব্যবধান হয় না। অর্থাৎ ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ স্বল্পআয়ের মানুষদের বার্ধক্যকালে সমর্থনের জন্য ব্যয় করা হয়।

চিত্র ১.১৩ যুক্তরাজ্যে ২০২৩-২৪ সালে সরকারের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয়

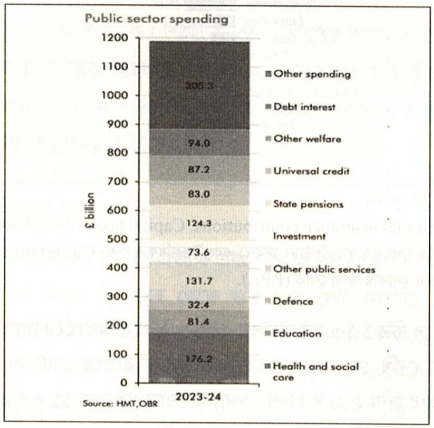

সূত্রঃ HMT, OBR.

স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বাজেটে এসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। বাংলাদেশে এখনও মানুষ বৃদ্ধকালে নিজেদের ভরণপোষণের জন্য সম্পূর্ণত হয় নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সঞ্চয়ের উপর কিংবা নিজেদের সন্তানদের এবং নিকট আত্মীয়দের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে আরও সামাজিক চরিত্র গ্রহণ করতে হবে এবং বাজেটকে আরও বেশি পুনর্বিতরণ অভিমুখী করতে হবে। তবেই প্রাথমিক আয় ভিত্তিক অসমতা প্রশমিত করা যাবে এবং ব্যয়যোগ্য আয় বিতরণ আরও সমতাধর্মী হবে।

১.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের প্রসঙ্গ

লক্ষণীয়, বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সেখানে বলা হয় যে, "প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্র-অভিমুখী করা" এবং

"ক্রমবর্ধমান বৈষম্য মোকাবেলা" করা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে (অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ. ৩৫)"। সেখানে জানানো হয় যে, দরিদ্র-অভিমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (*ইনক্লুসিভ*) হওয়ার জন্য প্রবৃদ্ধিকে দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। প্রথমত, ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের আয় দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, অতিদরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, "সমাজের নীচের ৪০ শতাংশের গড় আয় যাতে গোটা সমাজের গড় আয়ের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করতে হবে (পৃ. ৩৭)।"

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এসব ঘোষণা উৎসাহব্যঞ্জক। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ঘোষণা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে? এ বিষয়ে এই পরিকল্পনার আলোচনা পরিচ্ছন্ন নয়। তবে কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে যেসব চিন্তার উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে আমরা প্রাথমিক আয়ের বৈষম্য হ্রাস এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের মাধ্যমে এই বৈষম্য আরও হ্রাস করে অপেক্ষাকৃত কম বৈষম্যপূর্ণ ব্যয়যোগ্য আয় বিতরণে পৌঁছানোর যেসব পদ্ধতির কথা উপরে আলোচনা করেছি তার প্রতিফলন দেখা যায়। সেখানে বলা হয় যে, দরিদ্র-অভিমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন তিনটি নির্ধারকের উপর নির্ভর করে। এগুলি হলো: নিয়োজনের বৃদ্ধি; শ্রম-উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি; এবং প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি। নিয়োজনের বৃদ্ধি সম্পর্কে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তিনটি উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ করে। প্রথমত, জিডিপি-নিয়োজন সম্পর্কের প্রাবল্য (*ইলাসটিসিটি*) হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ একই পরিমাণ জিডিপি বৃদ্ধির ফলে আগে নিয়োজন যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন তা আর পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, বস্তু প্রস্তুতকারী (ম্যানুফ্যাকচারিং) শিল্প খাতে এবং বিশেষত নির্মাণ খাতে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৬/১৭ সালে নিয়োজন হ্রাস পেয়েছে। তৃতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতে নিয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রমের মজুরি কম এবং (নিয়োজনের স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে) নিরাপত্তাহীন। এসব নেতিবাচক প্রবণতা রোধ করার জন্য এই পরিকল্পনা নিম্নরূপ ৭-দফা কৌশল প্রস্তাব করে (পৃ. ৪৬) :

(১) শ্রমঘন, রপ্তানিমুখী শিল্পের নেতৃত্ব সম্পন্ন প্রবৃদ্ধি;
(২) কৃষির বহুমুখীকরণ;
(৩) কুটির এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্পে গতিশীলতা আনয়ন;
(৪) আধুনিক সেবা খাতের শক্তিশালীকরণ;

(৫) নন-ফ্যাক্টর সেবাসমূহের রপ্তানি উৎসাহিতকরণ;
(৬) তথ্য-যোগাযোগ-প্রযুক্তি (*আইসিটি*) ভিত্তিক উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ;
(৭) বিদেশে নিয়োজনের বৃদ্ধি।

স্পষ্ট যে, এসব প্রস্তাব প্রবৃদ্ধি এবং নিয়োজন বৃদ্ধিকারক এবং তার মধ্যে কিছু প্রস্তাব শ্রম আয় বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। কিন্তু সবগুলো কৌশল যে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য অনুকূল হবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যেও কিছু প্রস্তাব করে। এতে লক্ষ করা হয় যে, পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সমতাপূর্ণ প্রবৃদ্ধি আপনা থেকেই হয়নি বরং তার জন্য পুনর্বিতরণমূলক নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষত গণভিত্তিক (*ব্রড-বেইজড*) মানবসম্পদ গঠনের জন্য বিশাল পুনর্বিতরণমূলক নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরও লক্ষ করে যে, পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, পুনর্বিতরণমূলক আর্থিক (*ফিসকাল*) নীতির ফলে মাথাপিছু উচ্চ আয়ের সাথে আয় বিতরণের সমতাধর্মীতার সম্মিলন ঘটানো যায় (পৃ. ৩৮)। এসব অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিম্নরূপ ৬টি নীতি কিংবা পদক্ষেপের প্রস্তাব করে (পৃ. ৪০):

(১) অল্প বয়স থেকেই শিশুদের বিকাশের প্রতি মনোযোগ প্রদান এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা;
(২) সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা;
(৩) উচ্চমানের শিক্ষায় সার্বজনীন অভিগম্যতা;
(৪) দরিদ্র পরিবারদের জন্য নগদ সহায়তা;
(৫) সড়ক নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহসহ গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন; এবং
(৬) প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা

এই তালিকায় উপরের উপ-অনুচ্ছেদ ১.৬ এবং ১.৭-এ যেসব প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন, "প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা" এবং "দরিদ্র পরিবারদের জন্য নগদ সহায়তা" হলো প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের নীতি। বাকি চারটি হলো অপ্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণমূলক নীতি। এ প্রসঙ্গে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লক্ষ করে যে, "সামাজিক নিরাপত্তা"মূলক নীতি "দরিদ্র এবং বিপন্ন (*ভালনারেবল*) জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি করে" এবং তাদেরকে "মানব সম্পদ গঠন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ এবং শ্রম বাজারে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে (পৃ. ৫০)"। এ প্রসঙ্গে অষ্টম পরিকল্পনা আরও লক্ষ করে যে,

"নিয়োজন এবং সামাজিক নিরাপত্তা পরস্পরকে শক্তিশালী (*রি-ইনফোর্স*) করে, এবং সে কারণে সামাজিক নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপসমূহকে নিয়োজন সহজিকরণ (*ফ্যাসিলিটেটিং*) কর্মসূচি বলে অভিহিত করা যেতে পারে (পৃ. ৫০)"। স্পষ্ট যে, বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে অষ্টম পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ মূলত "সুযোগের সমতা" এবং জমি, শ্রম, পুঁজি বাজারে অধিকতর অভিগম্যতার উপর নিবদ্ধ। কিন্তু প্রস্তাবিত নীতিসমূহের প্রয়োগ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত হিসাব এই পরিকল্পনায় পাওয়া যায় না। ফলে বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্য কতটা অর্জিত হবে তা অনিশ্চিত থেকে যায়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় "সম্পদের অসমতা" হ্রাস নিয়েও কিছু বক্তব্য ও প্রস্তাব রাখা হয়। তবে সম্পদ বলতে মূলত বোঝানো হয় "জমি এবং শিক্ষা"। স্বীকার করা হয় যে, সম্পদহীনতা দারিদ্র্যের একাধারে কারণ এবং ফলাফল। বলা হয় যে, সম্পদ বিতরণের অসমতা হ্রাস, কর আরোপ এবং আয় হস্তান্তরের (*ট্রান্সফার*) মাধ্যমে আয়ের পুনর্বিতরণ (যদি তা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়) এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা অর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে যোগ করা হয় যে, প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা একে অপরের পরিপূরক এবং দরিদ্ররা তাদের জীবিকার জন্য ব্যাপকভাবে (*উন্মুক্ত*) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। আরও স্বীকার করা হয় যে, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত পৃথিবীর সর্বনিম্নের মধ্যে একটি।

সম্পদ বৈষম্যের হ্রাস সম্পর্কে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর্যুক্ত আলোচনার একাধিক দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, সম্পদ শুধু জমি এবং শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তদুপরি সম্পদ হিসেবে জমি এবং শিক্ষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষা হচ্ছে একটি অঙ্গবদ্ধ (*এমবডিড*) সম্পদ যা এই সম্পদের মালিকের কাছ থেকে শারীরিকভাবে আলাদা করা যায় না। অন্যদিকে জমি একটি অঙ্গবহির্ভূত (*ডিজএমবডিড*) সম্পদ, যা সম্পদের মালিকের শরীর থেকে পৃথক। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ "বহিঃসারিত উপকার" আছে; পক্ষান্তরে জমির জন্য তা ততটা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সরকারি ব্যয় শিক্ষা বা মানব সম্পদের বিতরণকে সমতাধর্মী করতে পারে। কিন্তু সনাতনী ধরনের সরকারি ব্যয় জমির বিতরণকে সমতাধর্মী করতে পারে না। এর জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করে না। দ্বিতীয়ত, সম্পদ ও আয় বিতরণের অসমতা হ্রাস এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা – এই তিনটি লক্ষ্যকে সমান্তরালরূপে এক বাক্যে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু এই তিনটি লক্ষ্যের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক উদঘাটনের কোনো চেষ্টা করা হয় না। এরূপ প্রয়াস ছাড়া

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের চিন্তা করা কঠিন। তৃতীয়ত, "যদি তা অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়" শর্ত যোগ করার মাধ্যমে আয় পুনর্বিতরণের লক্ষ্যটি অনিশ্চিত করে দেওয়া হয়, কারণ আয়ের সঞ্চয়ের মাধ্যমেই সম্পদের সৃষ্টি হয়। সুতরাং আয় বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে সম্পদ বিতরণের অসমতা হ্রাসের লক্ষ্যের আন্তরিকতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কর্তৃক "প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্র-অভিমুখী করার" লক্ষ্যের ঘোষণা একটি ইতিবাচক বিষয়। সমাজের গড় আয়ের চেয়ে নিচের ৪০ শতাংশের আয়ের দ্রুততর হারে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যের অভিপ্রায়ও প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিকল্পনা থেকে নিশ্চিত হওয়া কঠিন যে, এসব লক্ষ্য বস্তুতই অর্জিত হবে।

১.৭ দরিদ্র-অভিমুখী উন্নয়ন কৌশলের পূর্ব প্রস্তাবনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কর্তৃক আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়নকে দরিদ্র-অভিমুখী (*প্রো-পুওর*) করার অভিপ্রায় বাংলাদেশে পুঁজিবাদী উন্নয়ন ধারার সূচনালগ্নে এই উন্নয়নকে দরিদ্র-অভিমুখী করার প্রস্তাবসমূহকে স্মরণ না করিয়ে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, আশির দশকের শুরুতে পুঁজিবাদী উন্নয়ন ধারার যেটুকু ফলাফল পরিদৃষ্ট হয়েছিল তার ভিত্তিতেই *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা: বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট ও বিকল্প পথের প্রশ্ন* (ইসলাম, ১৯৮৭) শীর্ষক গ্রন্থে বর্তমান লেখক কর্তৃক এই ধারার বৈষম্য বৃদ্ধিকারী ফলাফল নিয়ে শঙ্কা প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বিদ্যমান উন্নয়ন কৌশলের নিম্নরূপ চারটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছিল:

(ক) ধনী অভিমুখীনতা;
(খ) শহর অভিমুখীনতা;
(গ) ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান প্রদান; এবং
(ঘ) বৈদেশিক নির্ভরতা।

এই গ্রন্থে এসব বৈশিষ্ট্যের সুনির্দিষ্ট চরিত্র বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে নিম্নরূপ চারটি মৌল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিকল্প উন্নয়ন ধারা প্রস্তাবিত হয়েছিল:

(ক) দরিদ্র অভিমুখীনতা;
(খ) গ্রাম অভিমুখীনতা;
(গ) সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান প্রদান; এবং
(ঘ) আত্মনির্ভরতা।

তখনও অভিবাসন এবং সেই সূত্রে প্রবাসী আয় (*রেমিট্যান্স*) অর্জন এবং বিশ্বায়নের অধীনে রপ্তানিমুখী শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার পুরো চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিশেষত গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল (Islam, 2022c)। সাধারণভাবে পুঁজিবাদের মধ্যে থেকেও এই বিকল্প উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। সেটা হতো পূর্ব-এশীয় ধারার একটি পথ-পরিদর্শিত (*গাইডেড*) পুঁজিবাদী ধারায় উন্নয়ন। কিন্তু প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলাদেশে একটি বহুলাংশে অবাধ পুঁজিবাদী ধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। তাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু এই উন্নয়ন ধারার বহু নেতিবাচক প্রতিফল এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উঁচু মাত্রার অর্থনৈতিক বৈষম্য তার একটি উদাহরণ। উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে সে জন্য অন্যতম করণীয় হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস।

১.৮ উপসংহার

অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়নের অন্যতম নেতিবাচক প্রতিফল। পুঁজিবাদী ধারায় উন্নয়ন হলেই তাকে বৈষম্য বৃদ্ধিকারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সম্প্রতিকালে পুঁজিবাদী ধারায় সবচেয়ে সফল যে পূর্ব-এশীয় দেশসমূহ -- যাদেরকে এশীয় টাইগার বলা হয়--সেসব দেশ অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি না করেই উন্নয়ন অর্জন করেছে। বস্তুত উন্নয়ন অর্থনীতিতে এটা এখন স্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি না করে উন্নয়ন সম্ভব শুধু নয়, বরং অর্থনৈতিক সমতা প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশের পক্ষেও সম্ভব ছিল পূর্ব-এশীয় দেশসমূহের মতো একটি সমতাধর্মী উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা। ইসলাম (১৯৮৭) গ্রন্থে এ ধরনের কৌশল প্রস্তাবও করা হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশ সে কৌশল অবলম্বন না করে এমন উন্নয়ন ধারায় অগ্রসর হয় যা ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে এবং বর্তমানে বিশ্বের উচ্চ আয়-বৈষম্যসম্পন্ন দেশসমূহের একটিতে পরিণত হয়েছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার বহুবিধ পন্থা আছে। মোটা দাগে এগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হলো প্রাথমিক আয়ের বিতরণকে আরও সমতাধর্মী করা। সেলক্ষ্যে যেসব ধারায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার মধ্যে রয়েছে শ্রম-আয় বৃদ্ধি করা। সেজন্য প্রয়োজন নিয়োজন এবং মজুরি বৃদ্ধি, শ্রম-আয়ে বৈষম্য হ্রাস

এবং শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণ। প্রাথমিক আয়ের বিতরণকে আরও সমতাধর্মী করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় করণীয় হলো শ্রমজীবী ও স্বল্প আয়ের নাগরিকদের পুঁজি আয়েরও অংশীদার করা। এই লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে ভূমি ও বর্গা সংস্কার, সমবায়ী মালিকানার সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের মুনাফায় শ্রমজীবীদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা।

কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক আয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যয়যোগ্য আয়। ব্যয়যোগ্য আয়ের বিতরণকে প্রাথমিক আয় বিতরণের চেয়ে আরও বেশি সমতাধর্মী করার জন্য প্রয়োজন সমতাভিমুখী পুনর্বিতরণ। সেজন্য প্রয়োজন রাজস্বের সংগ্রহ এবং বিতরণ উভয়েরই সমতা অভিমুখী হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ আয় ও সম্পদ কর হারকে সমতাধর্মী করা। পরোক্ষ উপায়ের রাজস্ব সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন অপ্রত্যক্ষ কর ও শুল্ক হার নির্ধারণকে সমতাধর্মী করা প্রয়োজন। সংগৃহীত রাজস্বের সমতাধর্মী বিতরণের প্রত্যক্ষ বিভিন্ন পন্থার মধ্যে রয়েছে নেতিবাচক কর হারের প্রবর্তন; স্বল্প আয়ের নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে শর্তহীন অথবা শর্তাধীন নগদ অর্থ কিংবা দ্রব্য ও সেবা প্রদান। পরোক্ষ বিতরণের মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যয়ে সার্বজনীন শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান। গবেষকেরা প্রত্যক্ষ বিতরণের কিছু নেতিবাচক দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তার মধ্যে একটি হলো সমাজের মধ্যে বিভক্তি বৃদ্ধি এবং সংহতি হ্রাস। সেজন্য তারা বরং পরোক্ষ পুনর্বিতরণকে শ্রেয় মনে করেন। এ ধরনের বিতরণের ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমন সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকে উন্নয়ন প্রয়াসের একটি পার্শ্ব পদক্ষেপ হিসেবে না ভেবে এই প্রয়াসের একটি মূল লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ করতে হবে যে, আয়ের সমতাধর্মী বিতরণ প্রবৃদ্ধিকে দ্রুততর করতে পারে। আর এর ফলে একটি শুভ চক্রের সৃষ্টি হতে পারে। উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশকে এই শুভ চক্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

২। সুশাসন

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন ঘটনা দেখায় যে, সুশাসনের অভাব দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০২২ সালে সূচিত ডলার সংকট, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের অনিয়ম এবং অদক্ষতা, সুদ ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে অদক্ষতা, বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণের ঘনায়মান দায় পরিশোধের সামর্থ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, অব্যাহত পুঁজি পাচার, প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়, শৃঙ্খলা এবং প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক মাপকাঠি প্রয়োগে শৈথিল্য ইত্যাদি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গুণগত মান হ্রাসের ইঙ্গিত বহন করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে এখনও গণতন্ত্র স্থিতিশীল হতে পারেনি। বিশেষত সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা বহুলাংশে বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে বৈষয়িক সুবিধাদি প্রদানের উপর নির্ভর করছে। ফলে অবৈধ ও অনৈতিক সুবিধা অর্জনের একটি সংস্কৃতি সমগ্র সমাজে বিস্তৃত হয়েছে এবং তা মূল্যবোধের পাশাপাশি নৈতিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য এই পরিস্থিতি শুভ নয়। সুতরাং এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সুশাসন অর্জন আগামী বাংলাদেশের একটি জরুরি করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে বাংলাদেশে সুশাসন অর্জন করা যেতে পারে তা নিরূপণের জন্য প্রথমেই সাধারণভাবে পরিশাসন কাঠামো সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

২.১ পরিশাসন কাঠামো

নিবিড় পর্যালোচনা দেখায় যে, মর্মের দিক থেকে পরিশাসনের সমস্যা হলো অর্থনীতিতে যাকে "মালিক-পরিচালক" (*প্রিন্সিপ্যাল-এজেন্ট*) সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা হয় তার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ। সাধারণভাবে এই সমস্যার উদ্ভব ঘটে যখন কোনো সম্পদের মালিক (*প্রিন্সিপ্যাল*) নিজে পরিচালনা না করে অন্য কাউকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করে। ফলে সম্পদের মালিক এবং পরিচালক ভিন্ন হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পরিচালক কর্তৃক মালিকের স্বার্থে সম্পদের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার সমস্যাই হলো মালিক-পরিচালক সমস্যা। সমাজ বিজ্ঞানের বহু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই সমস্যার স্বরূপ এবং তার নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থনীতিতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা তার একটি উদাহরণ। উন্নয়নশীল দেশের কৃষি খাতের বর্গা সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দেখা গেছে। একটি দেশের

পরিশাসনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। একটি দেশের মালিক হলো সে দেশের জনগণ। কিন্তু জনগণের পক্ষে দেশ পরিচালনা করে সরকার। সরকার কর্তৃক জনগণের স্বার্থে দেশের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করাই হলো দেশের পরিধিতে পরিশাসন সমস্যা।

চিত্র ২.১ একটি দেশের পরিশাসন কাঠামোটি তুলে ধরে। এটা দেখায় যে, সাধারণত পরিশাসনের দুটি মূল উপাদান থাকে। একটি হলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর অন্যটি হলো প্রশাসন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিভূ হলো সংসদ এবং মন্ত্রিপরিষদ। প্রশাসনের সাধারণভাবে দু'টি অংশ থাকে। একটি হলো বেসামরিক প্রশাসন, অন্যটি হলো সামরিক বাহিনী। বিচার ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হলেও একটা স্বকীয় অবস্থানের অধিকারী হয়। পরিশাসনের উপাদান হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার আচরণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে এবং জবাবদিহি করতে হয়। সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে এটা হয়ে থাকে। বিপরীতে, প্রশাসনকে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। তাদেরকে বরং প্রত্যক্ষভাবে জবাবদিহি করতে হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট। ফলে জনগণের নিকট তাদের জবাবদিহি হলো পরোক্ষ, যা রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

চিত্র ২.১: পরিশাসন কাঠামো

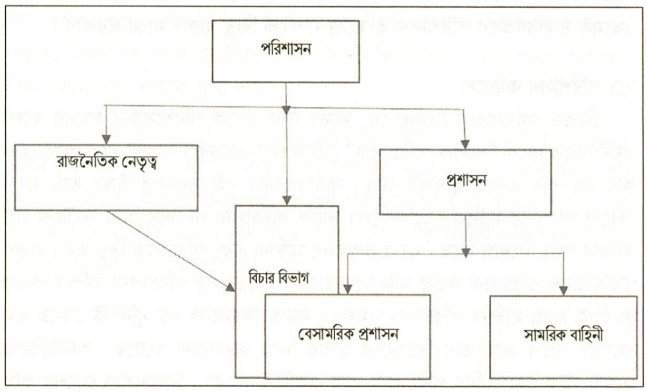

সূত্র: Islam (2016, p. 4).

উপরে উল্লিখিত হয়েছে, বৃহত্তর অর্থে প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বিচার ব্যবস্থার কিছু স্বকীয়তা থাকা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। দেশ ভেদে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো দেশে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র) কিছু ক্যাটাগরির বিচারকেরা নির্বাচিত হন। এসব বিচারকেরা সরাসরি জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন এবং জবাবদিহি করেন। তবে সাধারণত, যেমন বাংলাদেশে, বিচারকেরা নির্বাচিত হন না। চিত্র ২.১ বাংলাদেশের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে দেখায় যে, বিচার ব্যবস্থার নিম্নস্তর বহুলাংশে বেসামরিক প্রশাসনের অন্তর্গত হলেও উচ্চ আদালত কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে কারণ এসব আদালতের বিচারকেরা সরাসরি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে নিচে আমরা লক্ষ করবো, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার বিষয়টি এখনো পুরোপুরি মীমাংসিত হয়নি।[১৫]

রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল কাজ হলো নীতি নির্ধারণ এবং প্রশাসন দ্বারা সেসব নীতি বাস্তবায়নের তদারকি করা। প্রশাসনের ভূমিকা দ্বিবিধ। একদিকে তা রাজনৈতিক নেতৃত্ব কর্তৃক নির্ধারিত নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করে, অন্যদিকে তা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের এই সম্পূরক ভূমিকার কারণে এই দুয়ের মধ্যে দ্বিমুখী নির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে দুই ধরনের চক্রাকার সম্পর্কের উদ্ভব ঘটতে পারে। একটিকে বলা যেতে পারে "শুভ পরিশাসন চক্র" (চিত্র ২.২ক) আর অন্যটিকে বলা যেতে পারে "অশুভ পরিশাসন চক্র" (চিত্র ২.২খ)।

[১৫] "মাজদার বনাম রাষ্ট্র" মামলার একটি ফলাফল হিসেবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি অধিকতর স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে অভিযোগ রয়েছে যে, এই স্বাধীনতা এখনও পূর্ণভাবে অর্জিত হয়নি।

চিত্র ২.২ক: শুভ পরিশাসন চক্র

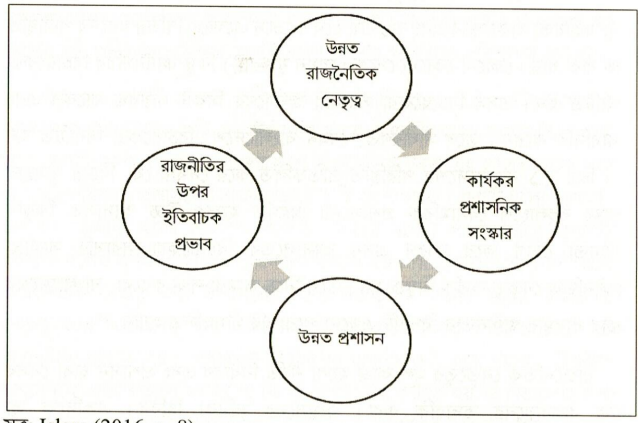

সূত্র: Islam (2016, p. 8).

চিত্র ২.২খ: অশুভ পরিশাসন চক্র

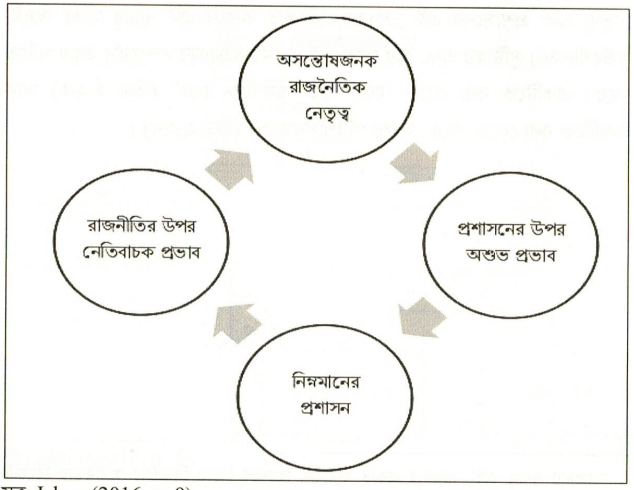

সূত্র: Islam (2016, p. 9).

চিত্র ২.২ক দেখায় যে, কোনো দেশে যদি ভালো রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকে তবে তা প্রশাসনের মান উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে পারে। এই উন্নতমানের প্রশাসন তখন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তার ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বও আরও উন্নত হতে পারে। এভাবে একটি শুভ চক্র অগ্রসর হতে পারে। বিপরীতে চিত্র ২.২খ দেখায় যে, কোনো দেশে যদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব অসন্তোষজনক হয়, তবে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রশাসনের উপর পড়ে এবং তার ফলে প্রশাসনের মানের অবনতি ঘটে। এই অবনতি তখন রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে এবং রাজনীতির মান নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়ে যায় অথবা তার আরও অবনতি ঘটে।

২.২ বাংলাদেশের পরিশাসন পরিস্থিতি

পরিশাসনের মান বিচার করা কঠিন। এই মানের পরিমাণগত পরিমাপ করা আরও দুরূহ। বিশ্বব্যাংক এ বিষয়ে একটি উদ্যোগ নিয়েছে এবং কতগুলো সূচকের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিশাসনের মানের পরিমাণগত পরিমাপ করায় প্রয়াসী হয়েছে। এই প্রয়াসের ফল হলো নিম্নরূপ ছয়টি "বিশ্ব পরিশাসন সূচক" (*ওয়ার্ল্ড গভর্নেন্স ইনডিকেটরস*)[১৬]:

(১) মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা (*ভয়েস অ্যান্ড একাউন্টেবিলিটি*);

(২) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহিংসতা/সন্ত্রাসের অনুপস্থিতি (*পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি অ্যান্ড এবসেন্স অব ভায়োলেন্স/টেরোরিজম*);

(৩) সরকারের দক্ষতা (*গভর্নমেন্ট এফেক্টিভনেস*);

(৪) নিয়ন্ত্রণের মান (*রেগুলেটরি কোয়ালিটি*);

(৫) আইনের শাসন (*রুল অব ল'*); এবং

(৬) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ (*কন্ট্রোল অব করাপশন*)।

বিশ্বব্যাংকের এসব সূচকের বহু সমালোচনা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সূচক মতামত জরিপের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। এজন্য এক্ষেত্রে বিষয়গত (*সাবজেকটিভ*) ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও এসব সূচক বহুল প্রচলিত এবং তা একটি দেশের পরিশাসনের মান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিতে পারে। এসব সূচকের মান অনুসারে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় তা চিত্র ২.৩ক থেকে ২.৩চ-এ দেখানো হলো।

[১৬] বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে এসব সূচকের মান পরিবেশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য https://info.worldbank .org/ governance/wgi/

চিত্র ২.৩ক: "মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সালের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি-২.৫ থেকে ২.৫)

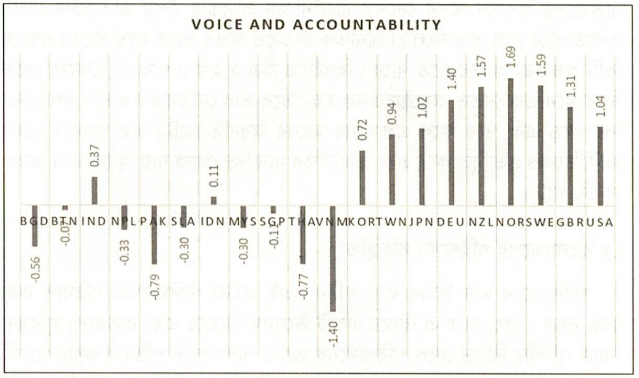

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank.

চিত্র ২.৩খ: "রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সহিংসতা/সন্ত্রাসের অনুপস্থিতি" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সালের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি -২.৫ থেকে ২.৫)

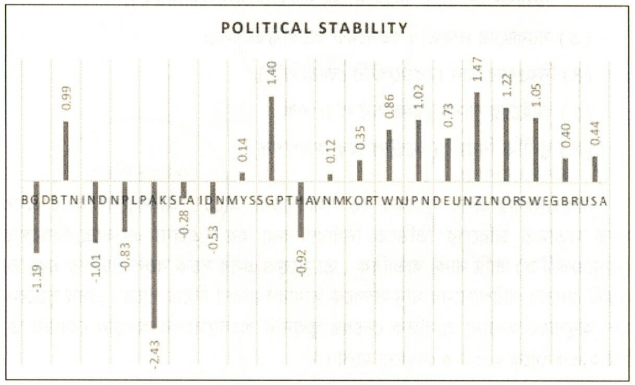

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank.

চিত্র ২.৩গ: "সরকারের দক্ষতা" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সালের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি -২.৫ থেকে ২.৫)

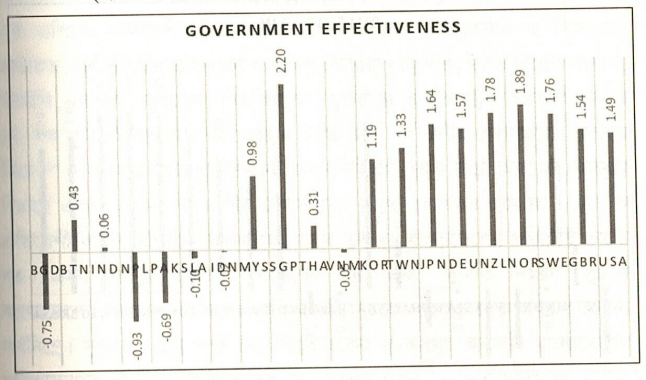

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank.

চিত্র ২.৩ঘ: "নিয়ন্ত্রণের মান" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

(২০১১-২০২০ সালের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি -২.৫ থেকে ২.৫)

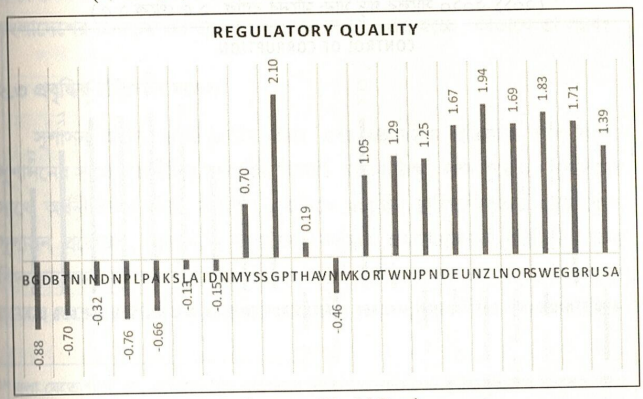

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank.

চিত্র ২.৩ঙ: "আইনের শাসন" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা
(২০১১-২০২০ সালের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি -২.৫ থেকে ২.৫)

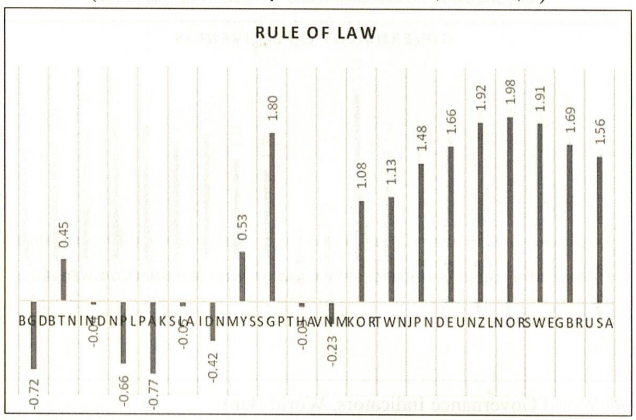

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank.

চিত্র ২.৩চ: "আইনের শাসন" সূচক: বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা
(২০১১-২০২০ সালের গড় মান; মানের ব্যাপ্তি -২.৫ থেকে ২.৫)

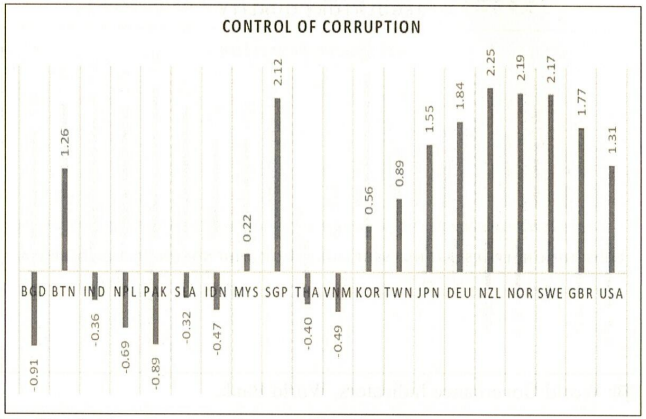

সূত্র: World Governance Indicators, World Bank.

চার ধরনের দেশকে এই তুলনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল ও ভুটান। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুর। তৃতীয়ত, পূর্ব এশিয়ার তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া। চতুর্থত, উন্নত বিশ্বের জাপান, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। চিত্রসমূহ দেখায় যে, সব সূচকেই বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত এবং পূর্ব এশীয় দেশসমূহের তুলনায় নিচে।[১৭] কেবলমাত্র "মত প্রকাশ এবং জবাবদিহিতা" সূচক ছাড়া অন্য সব সূচকের বিচারে একথা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সাথে তুলনায়ও প্রযোজ্য। এমনকি প্রতিবেশী দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সাথে তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। এসব দেশের তুলনায় "নিয়ন্ত্রণের মান" এবং "দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ" সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। বাকি চারটি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বনিম্নে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাংকের সূচকসমূহ অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিশাসনগত পরিস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বাংলাদেশের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেও এটা স্পষ্ট। প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললেই চাঞ্চল্যকর দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অদক্ষতা, আইনের শাসনের লঙ্ঘন, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং অন্যান্য অনাচারের খবর পাওয়া যায়। সুতরাং, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে সুশাসন অর্জন। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে তা সম্ভব?

২.৩ প্রবৃদ্ধির "নিঃসরণ মডেল"

সুশাসন অর্জন একটি কঠিন কাজ এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ার দাবি করে। সুশাসনের সাথে রাজনীতির সম্পর্কের বিষয়টি আমার উপরে লক্ষ করেছি। সুশাসনের সাথে অর্থনীতিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একদিকে প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্বশীলতার জন্য যেমন সুশাসন প্রয়োজন, অন্যদিকে সুশাসনের বর্তমান অসন্তোষজনক পরিস্থিতির জন্য বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মডেলও বহুলাংশে দায়ী। আবার এই মডেলের পেছনে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রশাসন, রাজনীতি এবং অর্থনীতি –

[১৭] বলা যেতে পারে যে, প্রয়োজন ছিল পরিশাসন বিষয়ক বাংলাদেশের বর্তমানকালের সূচকের সাথে উন্নত দেশসমূহ যখন বাংলাদেশের মতো মাথাপিছু আয়ের পর্যায়ে ছিল তাদের তখনকার সূচকের সাথে তুলনা করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এত আগের সূচক মান লভ্য নয়। যাহোক, বর্তমান কালের দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে তুলনা এ দৃষ্টিকোণ থেকে অসংগত নয়। তাদের সাথে তুলনাতেও আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের সূচকের মান নিচু।

দেশের এই তিন দিকের পরিস্থিতি একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা সম্ভব নয়। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, গণতন্ত্রের দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে রাষ্ট্রক্ষমতাকে বহুলাংশে সুবিধাদি প্রদানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি বাজেট বিশেষত উন্নয়ন বাজেট থেকে নিঃসরিত সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেকারণে বর্তমান প্রবৃদ্ধির মডেলকে "নিঃসরণ মডেল" (লিকেজ মডেল) বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। চিত্র ২.৪-এ এই মডেলের একটি রেখাচিত্র উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ২.৪: প্রবৃদ্ধির "নিঃসরণ মডেল"

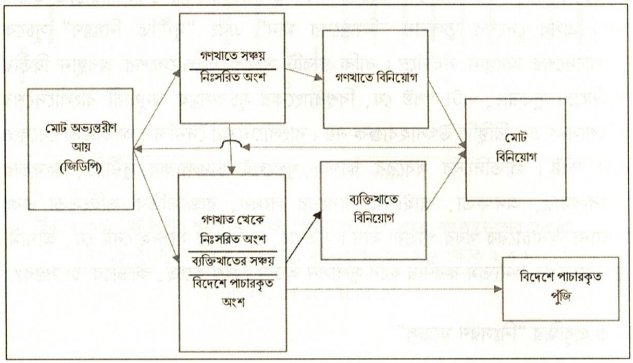

সূত্র: Islam S. N. (2022c, p. 23).

টীকা: এই চিত্রে প্রদর্শিত বক্সসমূহের আকৃতি সেসবে উল্লিখিত বিষয়ের পরিমাণের সমানুপাতিক নয়।

যেকোনো দেশে সঞ্চয়ের দুটি অংশ থাকে। একটি হলো ব্যক্তিখাতের সঞ্চয়, অন্যটি হলো সরকারি তথা গণখাতের (পাবলিক সেক্টরের) সঞ্চয়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। যেদিক থেকে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম তা হলো গণখাতের সঞ্চয়ের একটি বড় অংশ বিভিন্ন অনৈতিক ও অবৈধ পথে ব্যক্তিখাতে নিঃসরিত হচ্ছে। গণখাত থেকে সঞ্চয়ের এই নিঃসরণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংঘটিত হতে পারে (চিত্র ২.৫)। সাধারণভাবে দুটি পদ্ধতি চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি হলো "যোগসাজশ সহকারে," আরেকটি হলো "যোগসাজশ ব্যতিরেকে"। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই

নিঃসরণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশেই ঘটে। কিছু নিঃসরণ যোগসাজশ ছাড়াও হতে পারে। কী কী সুনির্দিষ্ট উপায়ে যোগসাজশপূর্ণ এবং যোগসাজসবিহীন ধারায় নিঃসরণ ঘটে তার সাথে মোটামুটি সকলেই পরিচিত। সেজন্য এখানে তা বিস্তারিত করার প্রয়োজন নেই।

চিত্র ২.৫: নিঃসরণর বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি

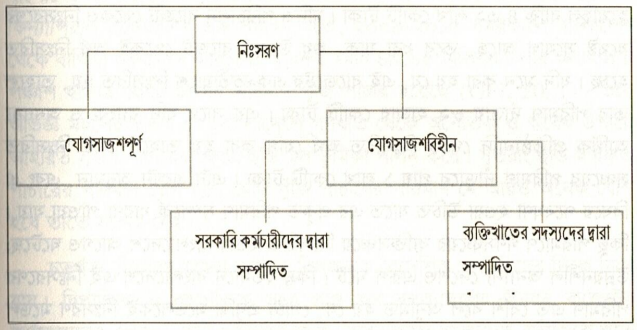

সূত্র: লেখক

লক্ষ করা দরকার যে, সরকারের বাজেট ছাড়া গণখাতের সঞ্চয়ের ব্যক্তিখাতে স্থানান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো দেশের ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থায়ন (*ফিন্যান্সিয়াল*) প্রতিষ্ঠান। ব্যাপক বিরাষ্ট্রীয়করণের পরও বাংলাদেশের বেশ কিছু ব্যাংক সরকারি মালিকানায় রয়ে গেছে। এগুলো অবশ্যই গণখাতের অংশ। তবে লক্ষণীয়, ব্যক্তিখাতের ব্যাংক, বীমা ও লিজিং কোম্পানিসমূহও জনগণের আমানতের উপর নির্ভর করে। ফলে এগুলোতে জমা হওয়া সঞ্চয়কেও এক অর্থে গণসঞ্চয় বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। পরিতাপের বিষয় এই যে, আর্থিক খাতের এসব প্রতিষ্ঠান থেকেও বিপুল পরিমাণ গণসঞ্চয় অবৈধ ও অনৈতিক পন্থায় ব্যক্তিখাতে নিঃসরিত হচ্ছে। খেলাপি ঋণ তার একটি পন্থা। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ঋণের হালনাগাদ করার বহু উদার সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। ঋণ খেলাপির চেয়েও বেশি অন্যায় এবং বেআইনি, বস্তুত দুর্বৃত্তমূলক পন্থায়ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত গণসঞ্চয় ব্যক্তিখাতে নিঃসরিত হচ্ছে।

মোট কত পরিমাণ সঞ্চয় গণখাত থেকে ব্যক্তিখাতে নিঃসরিত হচ্ছে, তার সঠিক পরিমাপ দুরূহ। তবে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন আপতিক তথ্যপ্রমাণ (*এনেকডোটাল এভিডেন্স*) থেকে স্পষ্ট যে, এর পরিমাণ বিরাট। এ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার জন্য লক্ষ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের ২০২২-২৩ সালের বাজেটের মোট পরিমাণ ছিল ৬.৭৮ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ ছিল ২.৪৬ লাখ কোটি টাকা এবং পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল বাকি ৪.৩২ লাখ কোটি টাকা। যদিও পরিচালন বাজেট থেকেও নিঃসরণের যথেষ্ট সুযোগ আছে, তবে ধরা যাক, শুধু উন্নয়ন বাজেট থেকেই অর্থ নিঃসরিত হচ্ছে। যদি মনে করা হয় যে, এই বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ নিঃসরিত হয়, তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২ হাজার কোটি টাকা। এর সাথে যদি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানাদি থেকে নিঃসরিত অর্থ যোগ করা হয় তাহলে মোট নিঃসরিত সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। এটা একটা অনুমান, এবং এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত যাতে এর প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিছু পরিমাণে গণসঞ্চয়ের ব্যক্তিসঞ্চয়ে নিঃসরিত হওয়া বাংলাদেশে আগেও ঘটেছে; উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশেও এরূপ ঘটে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে এই নিঃসরণের পরিমাণ এত বেশি বলে অনুমিত হয় যে, গোটা প্রবৃদ্ধি মডেলকেই নিঃসরণ মডেল বলে আখ্যায়িত করা যায়।

২.৪ প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেলের বিভিন্ন প্রতিফল

প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেলের বিভিন্ন প্রতিফল রয়েছে। নিচে সংক্ষেপে তার কয়েকটি উল্লিখিত হলো। প্রথমত, এর ফলে দেশের উন্নয়ন বাজেটের বিকৃতি ঘটে। একদিকে উন্নয়ন বাজেটের আকার বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বাজেটে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল প্রকল্পের সমাবেশ ঘটে। উন্নয়ন বাজেটের আকার বৃদ্ধি পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে দূষণীয় নয়, যদি এই বাজেট প্রকৃতই উৎপাদনশীল প্রকল্প অভিমুখে পরিচালিত হয়। কিন্তু এই বিনিয়োগ প্রত্যাশিত মাত্রায় উৎপাদনশীল না হলে তা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে।

দ্বিতীয়ত, নিঃসরণের ফলে গণখাতে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে গণখাতে যতটা বিনিয়োগ হয়েছে বলে মনে হয়, ভৌত মাপকাঠিতে ততটা হয় না। তদুপরি যেটুকু ভৌত বিনিয়োগ সংঘটিত হয় তাতেও বহু দুর্বলতা থেকে যায়।

তৃতীয়ত, নিঃসরণ মডেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফল হলো পুঁজি পাচার বৃদ্ধি। গণখাত থেকে সঞ্চয়ের ব্যক্তিখাতে নিঃসরণ দেশের জন্য ততটা ক্ষতিকর হতো না যদি এ সঞ্চয়ের পুরোটা দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োজিত হতো। কিন্তু যেহেতু গণখাত থেকে অনৈতিক ও অবৈধ পথে এই সঞ্চয় আহরিত হয়, সেহেতু এটা কালো টাকায় পরিণত হয় এবং তা দ্রুত বিদেশে পাচার করে দেওয়ার তাগিদের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের পাচারকৃত পুঁজির মোট পরিমাণ কত তা নিয়ে বিতর্ক আছে। *গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি*'র এক সমীক্ষা মতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্য লেনদেনে কারচুপির মারফত মোট ৪৯.৬৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার পরিমাণ পুঁজি পাচার হয়েছে (GFI, 2021)। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, বাংলাদেশে গণখাত থেকে অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে আহরিত সঞ্চয় পাচারের ক্ষেত্রে হুন্ডি মূল ভূমিকা পালন করে। সুতরাং হুন্ডি মারফত পাচারের পরিমাণ যোগ হলে মোট পুঁজি পাচারের পরিমাণ যে আরও অনেক বেশি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

চতুর্থত, নিঃসরণ মডেল দেশকে বিপজ্জনক বৈদেশিক ঋণ-ফাঁদের দিকে নিয়ে যায়। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সূত্রে প্রাপ্ত ঋণ বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থসংস্থানের এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অধুনাকালে বাংলাদেশ বাণিজ্যিক শর্তে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ দ্বারা অর্থায়িত অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই ঋণ "সরবরাহকারীর ঋণ" (*সাপ্লায়ার'স ক্রেডিট*)-এর রূপ গ্রহণ করছে। এসব ঋণের সুদ হার উঁচু এবং ঋণ পরিশোধের শর্তাদি অনেক কঠিন। ফলে তা ঋণ ফাঁদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। প্রতিবেশী শ্রীলংকার অভিজ্ঞতা দেখায় যে, বিদেশী ঋণের কারণে একটি তুলনামূলকভাবে ভালো অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমত, নিঃসরণ মডেল ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের জন্য বৈধ অর্থ প্রাপ্তিকে কঠিন করে তোলে। বৃহদাকার উন্নয়ন বাজেট "ভিড়জনিত বিতারণ" (*ক্রাউডিং আউট*) প্রভাব সৃষ্টি করে; ফলে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের জন্য বৈধ তহবিল সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে। কর আরোপ, ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয়পত্র বিক্রি ইত্যাদি যে

পদ্ধতিতেই গণখাতে সঞ্চয় সংগৃহীত হোক না কেন, সব পদ্ধতির জন্যই একথা প্রযোজ্য।[১৮]

ষষ্ঠত, নিঃসরণ মডেল গণ-কল্যাণমুখী বিনিয়োগের তুলনায় ব্যক্তি-স্বার্থমুখী বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। সেকারণেই দেখা যায় যে, একদিকে যখন ঢাকা শহরে অগণিত সুরম্য বিপণী বিতান আর বসতভবন নির্মিত হচ্ছে, সেখানে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে হয়তো একটি অতীব প্রয়োজনীয় সেতুর জন্য দশকের পর দশক অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

সপ্তমত, নিঃসরণ মডেল সমাজে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করে কেননা নিঃসরণ সূত্রের অর্থ সমাজের কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছায়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে অসাধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনীতিবিদ এবং তাদের সাথে যোগসাজশকারী ঠিকাদারসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী। সাধারণ জনগণ নিঃসরণের প্রত্যক্ষ ভাগীদার হয় না। ফলে সমাজে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

অষ্টমত, নিঃসরণ মডেল সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় ডেকে আনে। এই মডেলের সার কথা হলো ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জন। যখন দেশের কর্তাব্যক্তিরা এই তৎপরতায় লিপ্ত হন তখন গোটা সমাজ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়; সর্বস্তরে অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রথা ও অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে নৈতিকতার বিপর্যয় ঘটে।

নবমত, নিঃসরণ মডেল রাজনীতিতে বিকৃতি ঘটায়। রাজনৈতিক পদের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেই প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ সূত্রের অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব হয়; এর ফলে রাজনৈতিক পদ বিত্তশালী হওয়ার একটি সহজ পন্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। গণকল্যাণ অভিমুখী একটি ব্রত হওয়ার পরিবর্তে রাজনীতি অর্থ উপার্জনের জন্য একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। এতে রাজনীতির পাশাপাশি রাজনীতিবিদদেরও অধঃপতন ঘটে।

[১৮] যদি অর্থনীতিতে অলস উৎপাদন সক্ষমতা বিরাজ করে এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের মাধ্যমে গণখাতের বিনিয়োগ সে সক্ষমতার ব্যবহারকে সুগম করে, তবে তা গতিশীল বিচারে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং গণ ও ব্যক্তি উভয় খাতের ভবিষ্যৎ সঞ্চয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘাটতি সৃষ্টি না করে গণখাতে অধিক বিনিয়োগ ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের জন্য লভ্য বৈধ সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস করে।

দশম, প্রবৃদ্ধির এই মডেল প্রশাসনের মানেরও অবনতি ঘটায়। এটা কিছুটা কূটাভাসমূলক; কারণ ধারণা করা যেতে পারে যে, নিঃসরণ মডেল দেশের প্রশাসনকে অনেক উদ্যমী করবে কেননা সরকারের বাজেট তাদের হাত দিয়েই ব্যয়িত হয়; ফলে এর নিঃসরণ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ তাদেরই বেশি থাকে। তা সত্ত্বেও কেন প্রশাসনের মানে অবনতি ঘটে সে বিষয় নিয়ে আমরা উপ-অনুচ্ছেদ ২.৭-এ আলোচনা করবো।

উপর্যুক্ত বিভিন্নমুখী নেতিবাচক প্রতিফলের কারণে নিঃসন্দেহে আগামী বাংলাদেশের জন্য অন্যতম করণীয় হলো প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল থেকে সরে আসা এবং একটি সুষ্ঠু ও উপযোগী মডেলের প্রবর্তন করা। উপরের আলোচনা আরও স্পষ্ট করে দেখায় কীভাবে প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল এবং পরিশাসন একে অপরকে প্রভাবিত করে। একদিকে নিঃসরণ মডেল পরিশাসনকে দূষিত করে, অন্যদিকে দূষিত পরিশাসন নিঃসরণ মডেলকে জিইয়ে রাখে। সেজন্য উভয় ধারাতেই পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রথমে লক্ষ করা যাক প্রশাসনের মানোন্নয়নের জন্য কী করা যেতে পারে।

২.৫ প্রশাসনের সংস্কারের বিভিন্ন ধারা

প্রশাসনের সংস্কার বিষয়ে পূর্বে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আমি আলোচনা করেছি (Islam, 2016)। এজন্য এখানে তার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি না করে সংক্ষেপে নিম্নরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

২.৫.১ স্থায়ী-অরাজনৈতিক বনাম অস্থায়ী-রাজনৈতিক মডেল

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসন যন্ত্র মূলত বৃটিশ ঔপনিবেশিক সূত্রে পাওয়া এবং মূলগতভাবে স্থায়ী-অরাজনৈতিক চরিত্রের। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী-অরাজনৈতিক খোলসের অন্তরালে বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনিক যন্ত্র বহুলাংশে রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করেছে আর সেকারণে প্রশাসনের গুণগত মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ একদিকে স্থায়ী-অরাজনৈতিক প্রশাসনের পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্থায়ী-রাজনৈতিক প্রশাসনের সুফলও পুরোপুরি পাচ্ছে না। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্থায়ী-রাজনৈতিক মডেল প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি কম। এজন্য স্থায়ী-অরাজনৈতিক মডেলের পরিচ্ছন্ন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনের মান উন্নত করার দিকেই বরং মনোনিবেশ করা শ্রেয় হবে।

২.৫.২ *প্রশাসনের শ্রেণি বিভক্তি*

বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বর্তমানে চার শ্রেণিতে বিভক্ত। এই অনুভূমিক বিভক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রশাসন উল্লম্বিকভাবেও বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে বহু ক্যাডার সার্ভিসের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের মধ্যে মূল দুই ভাগ চিহ্নিত করা হয়। একটি হলো "সাধারণ" (*জেনারেল*) আর অন্যটি হলো "পেশাজীবী" (*প্রফেশনাল*)। সাধারণের মধ্যে ১৫টি এবং পেশাজীবীদের মধ্যে ১৪টি ক্যাডার চিহ্নিত করা হয়। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বহু বাস্তবায়নকারী সংস্থা, যাদেরকেও ব্যাপকতর অর্থে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের অংশ বলেই গণ্য করা হয়। এই শ্রেণি এবং ক্যাডার সংক্রান্ত বহু ইস্যু আছে যেগুলোর মীমাংসা অথবা আরও সঠিক সমাধান প্রয়োজন। এসব মীমাংসা এমন হতে হবে যাতে একদিকে প্রশাসনের দক্ষতা নিশ্চিত হয়, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.৫.৩ *কোটা বনাম মেধা*

বাংলাদেশের প্রশাসনের আরেকটি যে ইস্যু গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সাধারণভাবে বেসামরিক প্রশাসনে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কোটা বনাম মেধার ভূমিকা। বিভিন্ন বিবর্তন সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও ৫৫ শতাংশ পদ কোটার অধীনে। বাংলাদেশে তরুণ সমাজের মধ্যে কোটা পদ্ধতি নিয়ে অসন্তুষ্টি রয়েছে এবং সম্প্রতিকালে তারা এই ইস্যু নিয়ে জোরালো আন্দোলনও করেছে। কোটার বিষয়টির একটি সামগ্রিক পুনর্নিরীক্ষণ প্রয়োজন, যাতে প্রশাসনের মানের অবনতি না ঘটে; তরুণদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি না হয়; এবং ন্যায্যতা রক্ষিত হয়।

২.৫.৪ *প্রশাসনের আকার*

সূচনায় এ দেশের প্রশাসন শুরু হয়েছিল মাত্র দুটি পদ দিয়ে --- একটি হলো খাজনা আদায়কারী (*সিও*) এবং অন্যটি হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী (*ওসি*)। ক্রমে তা ২৯টি ক্যাডারে বিস্তৃত হয়েছে এবং তা এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ২০০৭ সালে সম্পাদিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৩৮টি মন্ত্রণালয়, ১১টি ডিভিশন, ২৫৪টি ডিপার্টমেন্ট এবং ১৭৩টি বিধিবদ্ধ (*স্ট্যাটুটরী*) সংস্থায় মোট প্রায় ১০ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ জন হলো প্রথম শ্রেণির বিসিএস অফিসার। তাদের ৭০ শতাংশ উপর্যুক্ত ২৯টি ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত; বাকিরা এমন সব দায়িত্বে নিযুক্ত যেগুলোকে উপর্যুক্ত কোনো নির্দিষ্ট ক্যাডারে ফেলা যায় না। বলা বাহুল্য, সময়ে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি

পেয়েছে। তবে প্রশাসনের অযাচিত বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়, কেননা প্রশাসন কোনো বস্তুগত উৎপন্ন বা উপভোগ্য সেবা তৈরি করে না। প্রশাসনের আকার যাতে অপটিমাম আকার ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।[১৯] লক্ষণীয়, প্রশাসনের আকার যত ছোট হবে ততো তার মান রক্ষা সহজ হবে। প্রয়োজন একটি মেদহীন কিন্তু দক্ষ ও উদ্বুদ্ধ প্রশাসন যার কাজের ফলে অর্থনীতি ও সমাজ আরও লাভবান হতে পারে।

২.৫.৫ *প্রশাসনের উন্নয়নে অন্যান্য ধারা*

বাংলাদেশের প্রশাসনের উন্নয়নে অন্যান্য ধারার অনেক প্রয়াসেরও প্রয়োজন। তার মধ্যে রয়েছে রিক্রুটমেন্ট, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি। রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে পিএসসির বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা প্রায়ই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমনকি কোনো কোনো বছর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও উঠেছে। কাজেই রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরও উন্নতি প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের বিষয়ে সাম্প্রতিককালে কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। অন্তত প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নতি বেশ দৃশ্যমান। তবে প্রশিক্ষণের সারবত্তার বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি আরও বেশি প্রয়োজন, কেননা ভালো রিক্রুটমেন্ট এবং প্রশিক্ষণ হলেও তা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে না যদি রিক্রুটকৃত/নিয়োগকৃত ও প্রশিক্ষিত অফিসারেরা তাদের কাজের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ না হয়। তবে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত জটিলও বটে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় কাজ করে। একটি হলো মনোভাবগত (অথবা বিষয়ীগত), অন্যটি হলো প্রণোদনাগত (বিষয়গত)।

২.৬ প্রশাসন এবং বস্তুগত প্রণোদনা

প্রশাসনের মানের সাথে বস্তুগত প্রণোদনা তথা পারিতোষিকের (বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা) বিষয়টি জড়িত। গবেষণা দেখায় যে, পারিতোষিক যৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছালে তা একটি শুভ চক্রের সূচনা করতে পারে (চিত্র ২.৬ক)। পক্ষান্তরে পারিতোষিক যৌক্তিক পর্যায়ের নিচে নেমে গেলে তা একটি অশুভ চক্রের জন্ম দিতে পারে (চিত্র ২.৬খ)।

---

[১৯] নিঃসন্দেহে, প্রশাসনের অপটিমাম আকার নির্ধারণ সহজ কাজ নয়। তবে তা করার একটি উপায় হলো নতুন কোনো সরকারি দপ্তর খোলার আগে বিদ্যমান দপ্তরসমূহ দ্বারাই কাজটি সমাধা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা। একইভাবে বিদ্যমান দপ্তর বা পদ অপরিহার্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য ঐ দপ্তর বা পদ বিলুপ্ত হলে কোনো গুরুতর অসুবিধা হবে কিনা তা বিবেচনা করা।

চিত্র ২.৬ক: প্রশাসনের মান এবং পারিতোষিকের মধ্যে শুভ চক্র

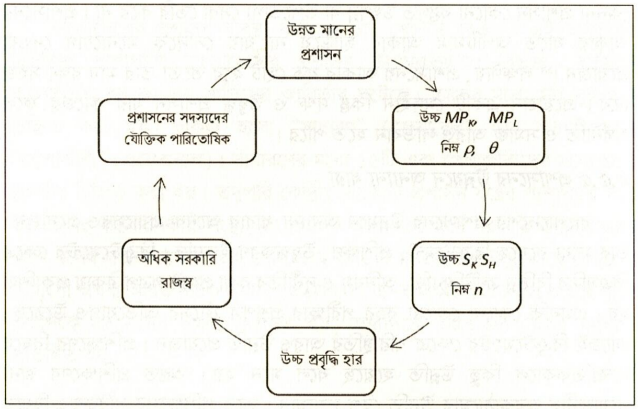

চিত্র ২.৬খ: প্রশাসনের মান এবং পারিতোষিকের মধ্যে অশুভ চক্র

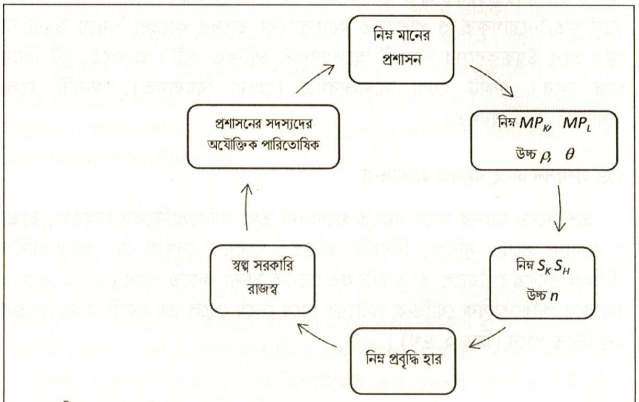

সূত্র (চিত্র ২.৬ক এবং ২.৬খ): Islam (2016, p. 186)
টীকা (চিত্র ২.৬ক এবং ২.৬খ):
MP_K, MP_L = যথাক্রমে পুঁজি এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা;
ρ = ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের হার;
θ = সময়ান্তরে প্রতিস্থাপনের নমনীয়তার হার;
n = জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

কীভাবে বাংলাদেশে সরকারি প্রশাসনের পারিতোষিক যৌক্তিক করা যায়, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি (Islam, 2016)। এখানে তার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে শুধু মূল কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমে লক্ষণীয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তিন ধরনের বেতন কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে। প্রথমটি হলো "সরকারি বেতন স্কেল" যা সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের জন্য প্রযোজ্য।[২০] দ্বিতীয় হলো "দেশীয় ব্যক্তিখাতের বেতন স্কেল"। তৃতীয়টি হলো "আন্তর্জাতিক স্কেল"। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এখন বহু আন্তর্জাতিক কোম্পানি ও সংস্থা কাজ করে; তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক (তথা, উন্নত দেশসমূহে বিরাজমান) হারে বেতন দেওয়া হয়। তবে এসব সংস্থায় নীচু পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য একটি ভিন্ন স্কেলে বেতন দেওয়া হয়, যেটা মোটা দাগে দেশীয় ব্যক্তিখাতের বেতন স্কেল অনুসরণ করে।

সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, সরকারি খাতে বেতন কম আর সে কারণে সরকার কিছু বছর পরপর বেতন কমিশন গঠন করে এবং এই কমিশন নতুন পে-স্কেলের প্রস্তাব করে। এসব প্রয়াসের দুই ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, পে-স্কেলের পরিবর্তন অস্থায়ী (এডহক) চরিত্র গ্রহণ করে এবং তার পেছনে কোনো শক্ত নীতিমালা থাকে না। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির কারণে সরকারি বেতনের প্রকৃতমূল্য (তথা ক্রয়ক্ষমতা) দ্রুতই হ্রাস পায় এবং এজন্য তখন পুনরায় বেতন-কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং প্রশাসনের মানোন্নয়নের জন্য এডহক ধরনের পরিবর্তনের পরিবর্তে একটি নীতিভিত্তিক সমাধানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন যাতে সরকারি খাতের বেতন কাঠামো যৌক্তিক হয় এবং সময়ের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাওয়াতে পারে। তাহলে কিছু বছর পরপর ভারসাম্যহীনতার উদ্ভব এবং তা মোকাবেলা করার জন্য নতুন করে বেতন কমিশন গঠন করার আর প্রয়োজন হবে না। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের নীতিভিত্তি কী হতে পারে?

প্রথমেই যে নীতির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো, একই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সরকারি খাতের বেতন দেশীয় ব্যক্তিখাতের বেতনের কাছাকাছি হওয়া প্রয়োজন। কারণ তা না হলে সমধর্মী পদে সরকারি খাতে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন নিয়োজিত হবে এবং তার ফলে প্রশাসনের

[২০] আধা-সরকারি এবং সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বেতন কাঠামোও সরকারি বেতন কাঠামো অনুসারে নির্ধারিত কিংবা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মানের অবনতি ঘটবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সমান বেতনের এই নীতির প্রয়োগে বেশ কিছু সমস্যা আছে। তার একটি কারণ হলো সরকারি খাতে নগদ বেতনের পাশাপাশি দ্রব্য/বস্তু-আকারে (ইন-কাইন্ড) অনেক পারিতোষিক দেওয়া হয় - যেমন বাসস্থান (*কোয়ার্টার*), গাড়ি, পিওন, ফ্ল্যাট, প্লট ইত্যাদি। এমনকি নগদ বেতনও বহুধা-বিভক্ত আকারে দেওয়া হয়, যেমন মূল বেতন, বাড়ি ভাড়া ভাতা, মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি। সুতরাং সব মিলিয়ে সরকারি কর্মচারীর বেতন-ভাতা-সুযোগ-সুবিধার নগদ মূল্য কত তা নিরূপণ করা সহজ নয়। পক্ষান্তরে দেশীয় ব্যক্তিখাতে এবং আন্তর্জাতিক খাতে বেতন সাধারণত পুরোটা একত্রে নগদ আকারে দেওয়া হয়। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারিতোষিক সমান হলো কিনা সেটা বোঝা সহজ নয়।

উপর্যুক্ত কারণে সরকারি খাতের পারিতোষিক সংস্কারে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন সমস্ত বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নগদ আকারে প্রদান করা। এর ফলে বেসরকারি খাতের বেতনের সাথে সরকারি পারিতোষিকের তুলনা ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। এই পদক্ষেপের আরও কয়েকটি উপকার রয়েছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দেখায় যে, সমপরিমাণ মূল্যের বেতন দ্রব্য/বস্তু আকারে না দিয়ে নগদ আকারে দিলে একজন ব্যক্তির মোট কল্যাণ বেশি হয়। সুতরাং এই বিচারেও সরকারি কর্মচারীদের পারিতোষিকের বিভিন্ন উপাদানের নগদে রূপান্তরকরণ মঙ্গলকর হবে। দ্বিতীয়ত, নগদে রূপান্তর সরকারি পারিতোষিকের মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানকে সহজ করবে। পারিতোষিক নগদ হলে তাকে সহজেই মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সূচকবদ্ধ (ইন্ডেক্সড) করা যায়। তাহলে শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতির কারণে সরকারি বেতন বৃদ্ধির জন্য কিছু বছর পরপর বেতন কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না।[২১]

লক্ষণীয়, সরকারি খাতের বেতনকে যে বেসরকারি খাতের বেতনের একদম সমান হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কারণ, প্রথমত, সরকারি চাকুরির একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এর স্থায়িত্ব এবং তদ্ভূত নিরাপত্তা।[২২] এই স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা

[২১] সরকারি বেতনকে মুদ্রাস্ফীতির সাথে সূচকবদ্ধ করার ভাল-মন্দ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (2016, p.)।

[২২] বেসরকারি চাকুরি থেকে সহজেই বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে সরকারি চাকুরি মোটামুটি স্থায়ী।

সরকারি চাকুরির পারিতোষিকের আরেকটি দিক যার নগদায়ন সহজ নয়। যেসব তরুণের মধ্যে দেশপ্রেম ছাড়াও সাধারণ জনগণের কল্যাণের প্রতি অঙ্গীকার প্রবল তাদের জন্য সরকারি খাতে কাজ করা একটি বাড়তি সন্তোষের বিষয় হওয়ার কথা। কাজেই বেসরকারি খাতের সমপরিমাণ বেতন না পেলেও তাদের সরকারি খাতে কাজ করায় আগ্রহী হওয়ার কথা। এই আগ্রহ আরও প্রবল হবে যদি সরকারি খাতে কাজ করাকে সমাজে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। তবে এটা তখনই হবে যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে যে সরকারি খাতের কর্মচারীরা সৎ এবং তারা দেশপ্রেম দ্বারা তাড়িত হয়ে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করছেন। আরও ধারণা করা হয় যে, ব্যক্তিখাতের তুলনায় সরকারি কর্মচারীদের কাজের চাপ কম থাকে, অর্থাৎ তাদের কম সময় ধরে ও কম মানসিক চাপ সহকারে কাজ করতে হয়। সেটিও এক্ষেত্রে একটি বিবেচনার বিষয় হতে পারে।

বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীদের পারিতোষিক এবং বেসরকারি খাতের সাথে তার তুলনা বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণায় মুস্তাফিজুর রহমান এবং মামুন আল-হাসান (Rahman & Al-Hasan, 2019) লক্ষ করেন যে, বেসরকারি খাতের সাথে তুলনার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি খাতের বেতনের তিনটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়। একটি হলো স্বাধীনতার পর থেকে আশির দশক পর্যন্ত যখন ব্যক্তিখাতের চাকুরির তুলনায় সরকারি খাতের চাকুরি বেশি আকর্ষণীয় ছিল।

বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে নব্বই দশক থেকে এক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে এবং সরকারি চাকুরির পরিবর্তে বেসরকারি চাকুরি বেশি আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু ২০১০ এবং বিশেষত ২০১৫ সালের বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর থেকে পুনরায় সরকারি চাকুরি বেশি আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে। তাঁরা আরও লক্ষ করেন যে, বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতে বেতন বেশি হতে পারে দুই কারণে। একটি হলো সমদায়িত্ব সম্পন্ন পদে বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতে নিয়োজিতদের যোগ্যতা (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বেশি হতে পারে। অন্যটিকে তারা সরকারি খাতের "প্রিমিয়াম" বলে আখ্যায়িত করেন, কারণ এই ব্যবধানকে যোগ্যতার পার্থক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাদের গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতের বেতন গড়ে ২৯.৫ শতাংশ বেশি ছিল। এর মধ্যে ১৫.৬ শতাংশ যোগ্যতার পার্থক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়; বাকি ১৩.৯ শতাংশ সরকারি খাতের প্রিমিয়াম বলে প্রতীয়মান হয়। সুবিদিত যে, ২০১৫ সালের ড. ফরাসউদ্দীনের সভাপতিত্বে গঠিত বেতন কমিশনের সুপারিশ

অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা হয়। ফলে আশ্চর্যের নয় যে, ২০১৫-১৬ সালের জন্য সম্পাদিত অনুরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেসরকারি খাতের বেতনের চেয়ে সরকারি খাতের বেতন ৪১.৯ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ১৮.৮ শতাংশ যোগ্যতার পার্থক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়; বাকি ২৩.১ শতাংশ হলো সরকারি খাতের প্রিমিয়াম। ২০১৬-১৭ সালে গড়ে বেসরকারি খাতের সাথে সরকারি খাতের বেতনের পার্থক্য ৫২.০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুস্তাফিজুর রহমান এবং মামুন আল-হাসানের বিশ্লেষণ আরও দেখায় যে, বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতের বেতনের আধিক্য নিম্নবর্গের কর্মচারীদের জন্যই বেশি প্রযোজ্য। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, বেসরকারি খাতের উপরের বর্গের কর্মচারীরা সরকারি খাতের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজেদের বেতনও কিছুটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বেসরকারি খাতের নিম্নবর্গের কর্মচারীদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয়নি। কেন এই ভিন্ন পরিস্থিতি তা নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

সুতরাং, আমরা দেখি যে, বর্তমানে সরকারি খাতের বেতন বেসরকারি খাতের বেতনের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবধান আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, সরকারি খাতের কর্মচারীদের মোট পারিতোষিকের নগদায়ন একটি কঠিন কাজ। রহমান এবং আল-হাসান সে বিষয়ে সচেতন এবং যতটা পারা যায় চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও এটা সম্ভব যে, বেশ কিছু জটিল ধরনের অ-নগদ পারিতোষিক তাদের হিসাবের বাইরে থেকে গেছে। লক্ষণীয়, এই গবেষকেরা তাদের বিশ্লেষণ করেছেন ঘণ্টা-প্রতি বেতনের ভিত্তিতে। সে উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কর্মচারীদের মাসিক বেতনকে অনুমিত কাজের ঘণ্টা দিয়ে ভাগ করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টি এই গবেষকেরাও লক্ষ করেছেন, বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের তুলনায় সরকারি কর্মচারীদের কর্মঘণ্টা কম হওয়ায় কথা, যদিও সেসম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন।

এই উভয় দিকের আরও সঠিক পরিমাপ পাওয়া গেলে সরকারি কর্মচারীদের মোট পারিতোষিক আরও বেশি বলে প্রমাণিত হলে তা বিস্ময়ের হবে না। সরকারি খাতের বেতন যে বেসরকারি খাতের তুলনায় এখন অনেক বেশি আকর্ষণীয় তা অন্যান্য তথ্য এবং পরিলক্ষণ থেকেও স্পষ্ট। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকেই বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয় বিসিএস পরীক্ষার প্রতি এবং এই পরীক্ষায় সফল হওয়াই তাদের মূল আরাধ্য হয়। ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবল কোটা বিরোধী আন্দোলনও সরকারি চাকুরির প্রতি আকর্ষণের সাক্ষ্য দেয়।

তবে আনুষ্ঠানিক বেতনের পার্থক্য বর্তমানে পরিদৃষ্ট সরকারি চাকুরির প্রতি আকর্ষণের সম্ভবত পুরোটা ব্যাখ্যা করতে পারে না। এক্ষেত্রে বড় একটি প্রভাবক হলো প্রবৃদ্ধির বর্তমান নিঃসরণ মডেল। এই মডেল সরকারি কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। অনেকের মতে সরকারি চাকুরি যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে আলাউদ্দিনের প্রদীপ! এর একটি আপতিক সাক্ষ্য হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক অভিমত যে, কানাডার বেগম পাড়ায় সরকারি আমলাদের বাড়িই বেশি। সরকারি পদ ব্যবহার করে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন কেবল উপরের মহলেই সীমাবদ্ধ নয়। ছোটখাট সরকারি কর্মচারীদেরও শত শত কোটি টাকার মালিক হওয়ার ঘটনা অহরহ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এরূপ প্রলোভনের মুখে প্রশাসনের অপেক্ষাকৃত সৎ সদস্যরাও তাদের বৈধ পারিতোষিকে সন্তুষ্ট থেকে আন্তরিকভাবে দেশের এবং দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য একাগ্র চিত্তে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিক বেতন ব্যক্তিখাতের তুলনায় দেড়গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের মান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এই অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রদত্ত পরিশাসন বিষয়ক বিশ্বব্যাংকের সূচকসমূহের মান তারই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং সুশাসন অর্জন করতে হলে আগামীতে বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল থেকে সরে আসতে হবে।

২.৭ উপসংহার

সুশাসন অর্জন আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয়। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পিছিয়ে আছে। পরিশাসনের দুটি মূল উপাদান রয়েছে। একটি হলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অন্যটি হলো প্রশাসন। এ দুই উপাদান একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করে এবং শুভ ও অশুভ উভয় ধরনের চক্রের জন্ম দিতে পারে। বাংলাদেশে সুশাসনের অভাবের একাধারে প্রতিফল এবং কারণ হলো প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল। এর ফলে দেশের গণখাতের সঞ্চয়ের একটি বড় অংশ ব্যক্তিখাতে নিঃসরিত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল পরিশাসনের উভয় উপাদানের জন্য বিকৃত প্রণোদনা সৃষ্টি করা ছাড়াও অর্থনীতি ও সমাজের জন্য বহু নেতিবাচক প্রতিফল ডেকে এনেছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বৃটিশ শাসনের উত্তরাধিকারসূত্রে "স্থায়ী-অরাজনৈতিক" মডেলের প্রশাসন পেয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মডেলের বিকল্প দেখা কঠিন, সেহেতু এই মডেলের অধীনেই দক্ষতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হতে হবে। বাংলাদেশের প্রশাসন অনুভূমিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণি-বিভক্ত এবং উল্লম্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু

সাধারণ এবং পেশাজীবী ক্যাডারে বিভক্ত। আন্তঃক্যাডার রেষারেষির অবসান ঘটাতে হবে। কোটা ব্যবস্থার পুনর্নিরীক্ষণ প্রয়োজন যাতে প্রশাসনের মানোন্নয়নে বাধা এবং তরুণদের জন্য ক্ষোভের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রিক্রুটমেন্ট, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই আরও বহু পদক্ষেপ নিতে হবে। কয়েক দফা বেতন বৃদ্ধির ফলে বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতের বেতন এখন প্রায় দেড়গুণ বেশি। কিন্তু প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল সরকারি কর্মচারীদের অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে এত বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে যে, বৈধ বেতন বৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত শুভ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সেজন্য সুশাসন অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল পরিত্যাগ করে একটি সুষ্ঠু মডেলে উত্তরণ করতে হবে।

৩। গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন ও আনুপাতিক নির্বাচন

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। দেশে একাধিকবার সামরিক শাসন জারি হয়েছে। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির এবং প্রধানমন্ত্রীকে মূল নির্বাহী করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের মধ্যে অদলবদল ঘটেছে। ১৯৯১ সনের পর থেকে মূলগতভাবে শেষোক্ত পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে এখনও বিতর্ক অব্যাহত আছে। ১৯৯৬ সনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পদ্ধতি চালু হয়েছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে সেই পদ্ধতিও প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং তা বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রথা চালু করা হয়। কিন্তু তারপর অনুষ্ঠিত তিনটি (২০১৪, ২০১৮, এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত) নির্বাচন নিয়েই বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রার গুণগত মান ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেনি। সেলক্ষ্যে বাংলাদেশকে আরও অগ্রসর হতে হবে।

বৃটিশ শাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়। দেশের গণতন্ত্র স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে তা সবই এই নির্বাচন ব্যবস্থার অধীনে করা হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দেখায় যে, এই ব্যবস্থার অধীনে থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং দেশকে পৌনঃপুনিক সংকটে নিপতিত হতে হচ্ছে। আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা এই সংকট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ করে দিতে পারে।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশের জনগণ আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে অপরিচিত হলেও বিশ্বজুড়ে বেশিরভাগ দেশে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থাই অনুসৃত হয়। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল উন্নত দেশ আনুপাতিক নির্বাচন অনুসরণ করে। বাংলাদেশ যেহেতু ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হতে চাচ্ছে সেহেতু উন্নত দেশের যে প্রায় সার্বজনীন নির্বাচন ব্যবস্থা, তথা আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সেজন্য আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় উত্তরণ।

৩.১ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্যার তলবর্তী কারণ

গণতন্ত্র বলতে সাধারণভাবে আমরা যেটা বুঝি তা হলো একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি; নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন; সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার; মত প্রকাশের স্বাধীনতা; স্বীয় মতের পক্ষে জনগণকে টানা ও উদ্বুদ্ধ করার স্বাধীনতা; এবং বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা। এসব বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত গণতন্ত্র শিল্পায়িত পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাজনৈতিক উপরিকাঠামো হিসেবে কাজ করে। শিল্পায়িত পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকশিত হওয়ার সহগামী প্রক্রিয়া হিসেবে এই গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এবং তারজন্য কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছে।[২৩] অর্থনীতি শিল্পায়িত হলে যে গণতন্ত্র সুগম হয় তার সাম্প্রতিক উদাহরণ দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। দুটি দেশই দীর্ঘকাল সামরিক ধরনের একনায়কত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার অধীনে শিল্পায়িত হয়েছে এবং এখন উভয় দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গণতন্ত্রের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতে হবে এবং কেবলমাত্র শিল্পায়ন শেষ হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বরং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায় যে, অসম্পূর্ণ শিল্পায়ন এবং কম মাথাপিছু আয় নিয়েও গণতন্ত্রের চর্চা সম্ভব। প্রতিবেশী ভারত তার বড় দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কোস্টারিকাসহ

[২৩] সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসই এই প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য দেয়। যেমন, ১৬৮৮ সালের গ্লোরিয়াস বিপ্লবের ফলস্বরূপ ১৬৮৯ সালে ইংল্যান্ডে যে "অধিকার তালিকা" (*বিল অব রাইটস*) গৃহীত হয়, তাতে ভোটাধিকার শুধুমাত্র সম্পত্তির মালিকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রমিকদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্য চার্টিস্টদের ১৮৩৮-১৮৪৮ সময়কালে প্রবল আন্দোলন করতে হয়। এতৎসত্ত্বেও নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ইংল্যান্ডে ভোটাধিকার পাওয়ার জন্য নারীদেরকেও আন্দোলন করতে হয় এবং রাশিয়ার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব এবং সেদেশে নারীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালে তারা সেটা অর্জন করে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রেও বহুকাল ভোটের অধিকার কমপক্ষে ৫০ একর জমি অথবা সমমূল্যের অন্যান্য সম্পদের মালিকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক আন্দোলনের পর ১৯২০ সালে সেদেশে নারীরা ভোটাধিকার পায়; আর কৃষ্ণাঙ্গরা প্রবল আন্দোলনের পর কার্যত ভোটাধিকার পায় আরও বহু পরে।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও তার সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে পূর্ণ শিল্পায়ন এবং উচ্চ মাথাপিছু আয়ে পৌঁছানোর আগেও গণতন্ত্রের চর্চা সম্ভব। তদুপরি গবেষণা দেখায় যে, গণতন্ত্র দ্রুতহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়কও হতে পারে। সুতরাং সব উন্নয়নশীল দেশেরই উচিত স্বীয় পরিস্থিতির এমনসব বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা যা গণতন্ত্র চর্চার জন্য সহায়ক এবং তা ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এই মুহূর্তে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার অভাবই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ও মানোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থাই এমন যে তা অস্থিতিশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। সে কারণে বাংলাদেশের প্রয়োজন আনুপাতিক নির্বাচন যা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করে। ক্ষুদ্র ভৌগোলিক আকৃতি; জনগণের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক আপেক্ষিক একশিলা বৈশিষ্ট্য (*হোমজেনিটি*); রাজনৈতিক দলসমূহের আপেক্ষিক শক্তিগত পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে আনুপাতিক নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

৩.২ আনুপাতিক নির্বাচন সংক্রান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে বাংলাদেশে প্রথম থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে বাংলাদেশের জনগণ এত দীর্ঘকাল ধরে এই নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে পরিচিত যে অনেকে এটাকেই একমাত্র নির্বাচনী ব্যবস্থা বলে মনে করেন। অথচ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। চিত্র ৩.১ দেখায় যে, ১০৭টি দেশের মধ্যে ৬৪টি দেশ তথা ৬০ শতাংশ দেশেই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। উন্নত দেশসমূহে এর প্রচলন আরও বেশি। উন্নত দেশসমূহের সংস্থা, *অর্গানাইজেশন অব ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (ওইসিডি)*-ভুক্ত নব্বই দশকের আগের ২২টি দেশের মধ্যে ১৯টি দেশই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করে। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, নব্বইয়ের দশকে পূর্ব ইউরোপের যেসব দেশ এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব প্রজাতন্ত্র একদলীয় শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় শাসন প্রবর্তন করে সেগুলোর সবই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লক্ষণীয়, এসব দেশের জন্য ইতিহাস-সৃষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক অথবা আনুপাতিক যেকোনো নির্বাচন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু তারা নির্বাচনী ব্যবস্থা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থাকেই শ্রেয় মনে করেছে।

চিত্র ৩.১: বিশ্বে আনুপাতিক নির্বাচনের বিস্তৃতি

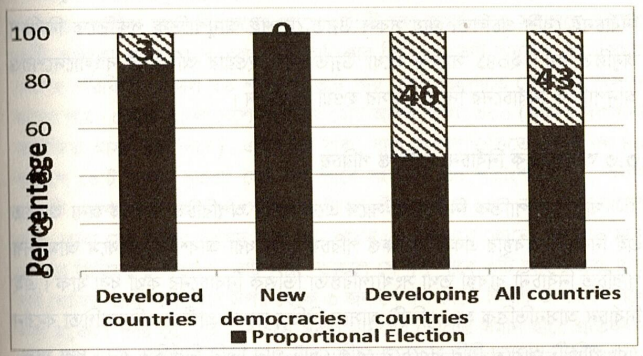

সূত্র: Islam, N. S. (2016).

উন্নত দেশগুলোর মধ্যে মূলত যুক্তরাজ্যে এবং যেসব দেশ ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল তথা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা দেখা যায়। তবে এসব দেশেও আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। নিউজিল্যান্ড ইতিমধ্যে আনুপাতিক নির্বাচন গ্রহণ করেছে। যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট এবং ওয়েলশ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের এসেম্বলিসমূহ নির্বাচনের জন্য আনুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডের লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টি তার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রাথমিক নির্বাচনে (*প্রাইমারি ইলেকশন*) আনুপাতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। রিপাবলিকান পার্টিও প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য আনুপাতিক পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছে। কানাডাতেও আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে মত ও শক্তি গড়ে উঠেছে। ফলে উন্নত দেশসমূহের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রায় সার্বজনীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

লক্ষণীয়, অনেক (বস্তুত প্রায় অর্ধেক) উন্নয়নশীল দেশেও আনুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থা বিরাজমান। দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহেও আনুপাতিক নির্বাচন বিস্তৃতি লাভ করছে। শ্রীলংকায় অনেক আগে থেকেই আনুপাতিক ব্যবস্থা চালু আছে। সম্প্রতি নেপালও আংশিকভাবে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুতরাং

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশের জন্য অপরিচিত হলেও, বিশ্বের পরিধিতে আনুপাতিক নির্বাচনই বেশি প্রচলিত; প্রায় সকল উন্নত দেশেই আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার অভিপ্রায়ী বাংলাদেশেরও আনুপাতিক নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

৩.৩ আনুপাতিক নির্বাচন: সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যারা আনুপাতিক নির্বাচনের সাথে একেবারেই অপরিচিত তাদের জন্য শুরুতে এই নির্বাচন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা আবশ্যক। প্রথমে আমাদের পরিচিত নির্বাচনী ব্যবস্থা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের কথা ধরা যাক। এই নির্বাচন আসনভিত্তিক হয়; প্রতিটি আসনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা প্রতিযোগিতা করেন এবং প্রতিটি আসনে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান তিনি নির্বাচিত হন। ধরা যাক, একটি আসনে ৫টি রাজনৈতিক দল– ক, খ, গ, ঘ, ঙ - প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, এবং তার মধ্যে ক, খ ও গ দলের জনপ্রিয়তা ২০ শতাংশ করে এবং ঘ ও ঙ দলের জনপ্রিয়তা যথাক্রমে ১৯ ও ২১ শতাংশ। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে এই আসনে ২১ শতাংশ ভোট পেয়ে ঙ দলের প্রার্থী জিতে যাবেন এবং বাকি ৭৯ শতাংশ ভোটের কোনো প্রতিফলন নির্বাচনের ফলাফলে থাকবে না। ফলে এই নির্বাচনের ফলাফল বহুলাংশে আপতিক চরিত্র গ্রহণ করে। লক্ষণীয়, বিজয়ী প্রার্থীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রয়োজন নেই। সে কারণে এই নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অনেক সময় "প্রথমে নিশানা অতিক্রমকারী" (*ফার্স্ট পাস্ট দি পোস্ট*, সংক্ষেপে *এফপিটিপি*) অথবা "বিজয়ী কর্তৃক সম্পূর্ণ আহরণ" (*উইনার টেকস অল*) নির্বাচনী ব্যবস্থা বলেও আখ্যায়িত করা হয়।[২৪]

[২৪] এই সমস্যা লাঘবের জন্য অনেক সময় শর্ত আরোপিত হয় যে, বিজয়ী প্রার্থীকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে। এই পদ্ধতিকে "নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন" বলে অভিহিত করা হয়। এতে নির্বাচনকে দুই ধাপ বিশিষ্ট করা হয়। প্রথম ধাপে যদি কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পায় তবে যে দুই প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পায় শুধু তাদেরকে প্রার্থী করে দ্বিতীয় ধাপে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে দ্বিতীয় ধাপে বিজয়ী প্রার্থী কর্তৃক ৫০ শতাংশের বেশি ভোট প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের অন্যায্য ও আপতিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা লাঘব হয়। তবে দু'টি সমস্যা থেকেই যায়। প্রথমত, দ্বিতীয় ধাপে পরাজিত প্রার্থী যে ভোট পায় তার কোনো প্রতিফলন নির্বাচনী ফলাফলে থাকে না। দ্বিতীয়ত, দুই ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট বাড়তি প্রয়াসের পাশাপাশি অর্থ ব্যয়েরও প্রয়োজন হয়।

বিপরীতে, আনুপাতিক নির্বাচন আলাদা আসন ভিত্তিক না হয়ে সারা দেশের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের আগে প্রতিটি দল ক্রমাধিকার সহকারে তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে এবং সেই তালিকার ভিত্তিতে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশের পরিধিতে যে দল যত শতাংশ ভোট পায়, সেই অনুপাতে সেই দল সংসদে আসন পায়। যেমন, বাংলাদেশে সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩০০ (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে)। এখন ধরা যাক, সারা দেশের ভিত্তিতে একটি দল ৪০ শতাংশ ভোট পেল। সুতরাং সেই দল পাবে সংসদের ৪০ শতাংশ আসন, অর্থাৎ ১২০টি। তখন সে দলের পূর্ব ঘোষিত তালিকার উপর থেকে ১৪০ নম্বর পর্যন্ত যাদের নাম, তারা সেই দলের সাংসদ বলে গণ্য হবেন। একইভাবে কোনো দল যদি সারা দেশের ভিত্তিতে ১ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে সে দল পাবে ৩টি আসন এবং তার পূর্ব ঘোষিত প্রার্থী তালিকার উপর থেকে ৩ জন সে দল থেকে নির্বাচিত সাংসদ বলে গণ্য হবেন। স্পষ্ট যে, এই নির্বাচনে সকল মানুষের ভোটের সমান হারে প্রতিফলন ঘটে; অন্যদিকে এই নির্বাচনের ফলাফল দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তার হার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়। ফলে এই নির্বাচনের ফলাফলের কোনো আপতিক বৈশিষ্ট্য থাকে না।

৩.৪ আনুপাতিক নির্বাচন, সুশাসন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

লক্ষণীয়, আনুপাতিক নির্বাচনের সাথে সুশাসন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায় যে, আনুপাতিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহে পরিশাসনের মান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসারী দেশের চেয়ে অনেক উঁচু। পরিশাসনের মান পরিমাপের জন্য বিশ্বব্যাংকের ছয়টি সূচকের সাথে আমরা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছি। সারণি ৩.১ দেখায় যে, জাতিসংঘের যেসব সদস্য দেশ (৮৪টি) আনুপাতিক নির্বাচন অনুসরণ করে তাদের জন্য পরিশাসনের প্রতিটি সূচকের গড় মান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসারী (৭৫টি) দেশের চেয়ে অনেক বেশি। সারণি ৩.১ আরও দেখায় যে, যদি এই তুলনা শুধুমাত্র উন্নয়নশীল (অর্থাৎ ওইসিডি-র সদস্য নয় এমন) দেশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলেও ছয়টি সূচকের মধ্যে চারটির বিচারেই আনুপাতিক নির্বাচন অনুসারী দেশসমূহে পরিশাসনের মান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক দেশসমূহের চেয়ে উঁচু। সুতরাং আনুপাতিক নির্বাচনের সাথে সুশাসনের যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা কঠিন। সারণি ৩.১ আরও দেখায় যে, আনুপাতিক নির্বাচনের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হারেরও একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। ধারণা করা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যান্য নির্ণায়ক বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলে এই ইতিবাচক সম্পর্ক আরও প্রবলতার সাথে দেখা দিবে।

সারণি ৩.১: নির্বাচন পদ্ধতি, সুশাসন এবং উন্নয়ন

সুশাসন সূচক	জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ		উন্নয়নশীল (ওইসিডি-বহির্ভূত) দেশসমূহ	
	সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহ (৭৫)	আনুপাতিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহ (৮৪)	সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহ	আনুপাতিক নির্বাচন অনুসরণকারী দেশসমূহ
মতপ্রকাশ ও জবাবদিহিতা	-০.০৭২	০.২৬৬	-০.২১৭	-০.০৮৭
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা/অহিংসতা	-০.০৬১	০.০৫৯	-০.০৬৩	-০.০৩৪
প্রশাসনের দক্ষতা	-০.১৫৪	০.১৬১	-০.৩৪৪	-০.২৬৬
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান	-০.২৪৯	০.২৪০	-০.৪৩৬	-০.১৫৮
আইনের শাসন	-০.০৬০	০.১১২	-০.২৩৯	-০.৩৩১
দুর্নীতি দমন	-০.০৪৬	০.১২১	-০.২২৮	-০.৩০৯
বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার	২.০১	২.১০	১.৮৬	১.৮৯

সূত্র: লেখক, World Bank Governance Indicator data'র ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৩.৫ বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের বিভিন্ন সুফল

প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির কারণে কোনো একটি দেশে সুশাসন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে আনুপাতিক নির্বাচন অন্য দেশের তুলনায় বেশি সহায়ক হতে পারে। বিশদ পর্যবেক্ষণ দেখায় যে, বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আনুপাতিক নির্বাচন নিম্নরূপ ১১টি সুফল বয়ে আনতে পারে।

৩.৫.১ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সুফল হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি। আনুপাতিক নির্বাচনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এই নির্বাচন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তার সামান্য পরিবর্তনের কারণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পট পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সারণি ৩.২ এবং চিত্র ৩.২ এ বিষয়টি তুলে ধরে।

সারণি ৩.২: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে দুই নির্বাচন ব্যবস্থার তুলনা

	প্রথম দল	দ্বিতীয় দল	তৃতীয় দল	চতুর্থ দল	পঞ্চম দল
সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচন-সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা					
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২০	২০	২০	১৯	২১
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	০	০	০	০	৩০০
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২১	২০	২০	১৯	২০
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৩০০	০	০	০	০
আনুপাতিক নির্বাচন-সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা					
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২০	২০	২০	১৯	২১
প্রথম নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৬০	৬০	৬০	৫৭	৬৩
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটানুপাত	২১	২০	২০	১৯	২০
দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৬৩	৬০	৬০	৫৭	৬০

সূত্র: লেখক।

চিত্র ৩.২: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে দুই নির্বাচন ব্যবস্থার তুলনা

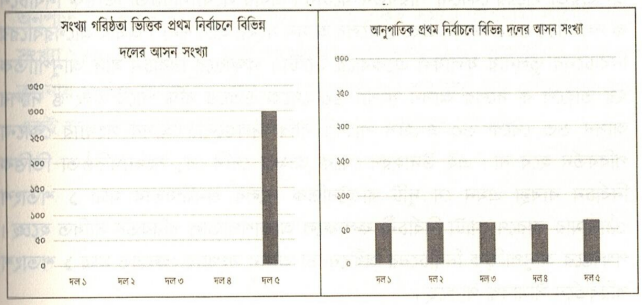

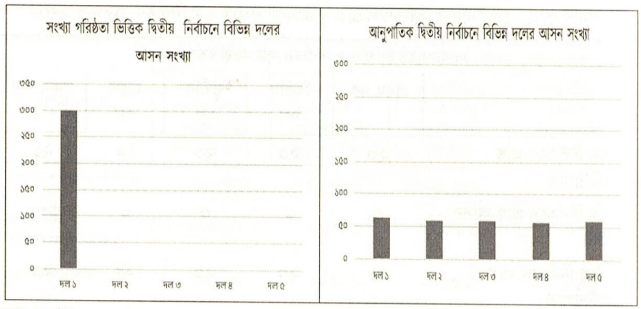

সূত্র: লেখক।

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, যদি একটি আসনে ৫টি রাজনৈতিক দল থাকে— ক, খ, গ, ঘ, ঙ -- এবং তারমধ্যে ক, খ ও গ প্রত্যেক দলের জনপ্রিয়তা ২০ শতাংশ এবং ঘ ও ঙ দলের জনপ্রিয়তা যথাক্রমে ১৯ ও ২১ শতাংশ হয়, সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে এই আসনে ঙ দল জিতে যাবে। এখন ধরা যাক সারা দেশে, অর্থাৎ সব আসনেই এই পাঁচ দলের জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত অনুপাতের। সেক্ষেত্রে প্রতিটি আসনেই ঙ দল জিতে যাবে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল হবে ঙ দলের ৩০০ আসন এবং বাকি সব দলের শূন্য আসন। কিন্তু নির্বাচন যদি আনুপাতিক হয় তাহলে ক, খ ও গ প্রতিটি দল পাবে ৬০টি করে আসন, ঘ দল পাবে ৫৭ আসন এবং ঙ দল পাবে ৬৩টি আসন। এখন ধরা যাক, ৫ বছর পর আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই সময়ে ক দলের জনপ্রিয়তা ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১ শতাংশ হয়েছে এবং ঙ দলের জনপ্রিয়তা ১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০ শতাংশ হয়েছে। অন্য তিন দলের জনপ্রিয়তা হারের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে ক দল পাবে ৩০০ আসন এবং ঙ দলের আসন সংখ্যা হবে শূন্য। অর্থাৎ আগেরবারের নির্বাচনের তুলনায় ফলাফল একেবারে উল্টো। পক্ষান্তরে নির্বাচন যদি আনুপাতিক হয় তাহলে ক দলের আসন সংখ্যা ৬০ থেকে ৬৩তে বৃদ্ধি পাবে এবং ঙ দলের আসন ৬৩ থেকে ৬০-এ হ্রাস পাবে। বাকি দলগুলোর আসন সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না। এই উদাহরণ থেকে আমরা দেখি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা এমন যে দুটি রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তার মাত্র ১ শতাংশ ওঠানামার কারণে গোটা নির্বাচনী ফলাফলে আকাশপাতাল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে আনুপাতিক নির্বাচনের অধীনে তা আসন সংখ্যার ক্ষেত্রেও মাত্র ১ শতাংশ পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ থাকছে।

উপরের উদাহরণ দেখায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের অধীনে রাজনৈতিক দলসমূহের জনপ্রিয়তার সামান্য পরিবর্তন নির্বাচনী ফলাফলের ব্যাপক পরিবর্তন ডেকে আনে। এটাকে বলা যেতে পারে "বহুগুণিতকরণ অভিঘাত" (*এমপ্লিফিকেশন এফেক্ট*)। অনেক সময় এই বহুগুণিতকরণ অভিঘাত এত প্রকট হয় যে তা "বিপরীত অভিঘাত" (*রিভার্সাল এফেক্ট*) সৃষ্টি করে। এটা হয় যখন সমগ্র দেশের বিচারে একটি দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে সেই দলের আসন সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে বরং কমে যায়। বহুগুণিতকরণ এবং বিপরীত অভিঘাতের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন একটি দেশের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে দেয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহের অভিজ্ঞতা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। সারণি ৩.৩ এবং চিত্র ৩.৩ ও ৩.৪ এই প্রমাণ দেখতে সহায়তা করে। আমরা দেখি যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২০০৮ সালে ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭৭ শতাংশ আসন পেয়েছিল। আবার ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ২১ শতাংশ আসন পেয়েছিল। একইভাবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২০০১ সালে ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬৪ শতাংশ আসন পেয়েছিল। আবার ২০০৮ সালে ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ১০ শতাংশ আসন পেয়েছিল। এগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের বহুগুণিতকরণ অভিঘাতের উদাহরণ। বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের বিপরীত অভিঘাতের উদাহরণও দেখি। যেমন ১৯৯৬ সালের ৩৭ শতাংশের তুলনায় ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের ভোট অনুপাত ৪০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ একই সময়ে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা ১৪৬ থেকে ৬২-তে হ্রাস পেয়েছিল। একইভাবে ১৯৯১ সালের ৩১ শতাংশের তুলনায় ১৯৯৬ সালে বিএনপির ভোট অনুপাত ৩৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ একই সময়কালে আসন সংখ্যা ১৪০ থেকে ১১৬-তে হ্রাস পেয়েছিল।

সারণি ৩.৩: সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহে বৃহৎ দলসমূহের ভোট ও আসন অনুপাত

বছর	আওয়ামী লীগ		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)		জাতীয় পার্টি		অন্যান্য	
	ভোট অনুপাত (৫)	আসন অনুপাত (%)	ভোট অনুপাত (%)	আসন অনুপাত (%)	ভোট অনুপাত (%)	আসন অনুপাত (%)	ভোট অনুপাত (%)	আসন অনুপাত (%)
১৯৭৯	২৪.৫০	১৮.০০	৪১.২০	৬৯.০০	...	...	৩৪.৩০	১৩.০০
১৯৯১	৩০.১০	২৯.৩৩	৩০.৮০	৪৬.৬৭	১১.৯০	১১.৬৭	২৭.২০	১২.৩৩
১৯৯৬	৩৭.৪০	৪৮.৬৭	৩৩.৬০	৩৮.৬৭	১৬.৪০	১০.৬৭	১২.৬০	২.০০
২০০১	৪০.০২	২০.৬৭	৪৭.০০	৬৪.৩৩	...	...	১৮.৯৮	১৫.০০
২০০৮	৪৯.০০	৭৬.৬৭	৩৩.২০	১০.০০	৭.০০	৯.০০	১০.৮০	৪.৩৩
২০১৪	৭৯.১৪	৭৮.০০	...	...	১১.৩১	১১.৩৩	৯.৫৫	১০.৬৭

Source: Islam, S.N. (2016).

চিত্র ৩.৩: সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহে আওয়ামী লীগের ভোট ও আসন অনুপাত

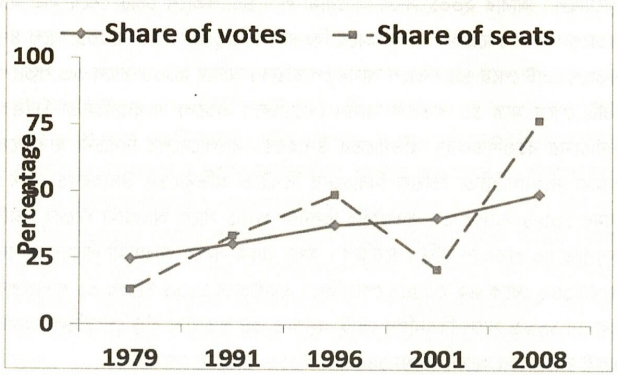

Source: Islam, S.N. (2016).

চিত্র ৩.৪: সাম্প্রতিক নির্বাচন সমূহে বিএনপি-র ভোট ও আসন অনুপাত

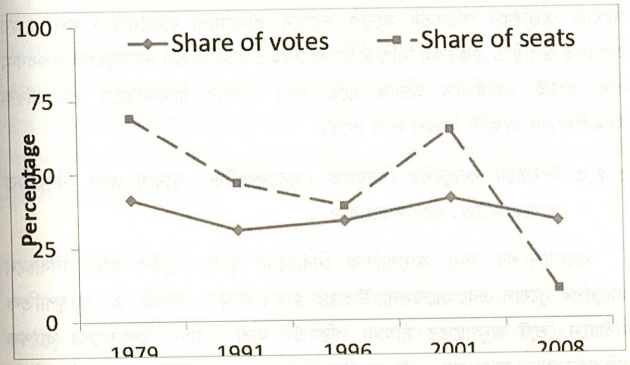

Source: Islam, S.N. (2016).

সুতরাং বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন অন্যায্য ও আপতিক ফলাফলের জন্ম দেয়। সামগ্রিকভাবে দেশে একটি দলের জনপ্রিয়তার যতটা পরিবর্তন হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি তার সংসদে আসন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি একটি দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলেও তার আসন সংখ্যা কমে যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের এই বহুগুনিতকরণ এবং বিপরীত অভিঘাত নির্বাচনী ফলাফল ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে। পক্ষান্তরে আনুপাতিক নির্বাচনে বহুগুণিতকরণ কিংবা বিপরীত কোনো অভিঘাতেরই সুযোগ নেই। ফলে নির্বাচনী ফলাফলের কোনো আপতিক চরিত্র থাকে না এবং তা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখে।

৩.৫.২ *রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহাবস্থান ও সহনশীলতার তাগিদ বৃদ্ধি*

বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের দ্বিতীয় সুফল হলো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহনশীলতার তাগিদ বৃদ্ধি। এটা আনুপাতিক নির্বাচন সৃষ্ট নির্বাচনী ফলাফলের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার একটি ফলাফল। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, আনুপাতিক নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের আসন সংখ্যার নাটকীয় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম থাকে। ফলে কোনো রাজনৈতিক

দলের একেবারে কোণঠাসা বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম হয়। যেহেতু আসন সংখ্যার অল্পবিস্তর পরিবর্তন সত্ত্বেও সংসদে প্রতিযোগী রাজনৈতিক দলসমূহের অব্যাহত উপস্থিতি একরকম নিশ্চিত থাকে সেহেতু রাজনৈতিক দলসমূহকে একরকম বাধ্য হয়েই সহাবস্থানে অভ্যস্ত হতে হয়। এভাবে রাজনীতিতে পারস্পরিক সহনশীলতার সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে।

৩.৫.৩ *নির্বাচনে কারচুপির বিষয়গত (অবজেকটিভ) সুযোগ এবং বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) প্রণোদনার হ্রাস*

বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের তৃতীয় সুফল হলো নির্বাচনে কারচুপির সুযোগ এবং প্রণোদনা উভয়ের হ্রাস। আমরা দেখেছি যে, আনুপাতিক নির্বাচনে ভোট অনুপাতের সামান্য পরিবর্তন দ্বারা নির্বাচনী ফলাফলের ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির নির্বাচনে ফলাফলের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য ভোট অনুপাতেরও ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য ব্যাপক মাত্রার কারচুপির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অল্প কারচুপি যত সহজে করা যায়, বড় কারচুপি তত সহজে করা যায় না। ফলে নির্বাচনী ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন আনার মতো কারচুপি করা কঠিন হয়। এই উভয়বিধ কারণেই আনুপাতিক নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফল ব্যাপক পরিবর্তন করার সুযোগ হ্রাস পায়।

বিপরীতে, উপরে আমরা লক্ষ করেছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে সামান্য পরিমাণের ভোট শতাংশের পরিবর্তন নির্বাচনী ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন কারচুপি করে নির্বাচনী ফলাফল পরিবর্তিত করার জন্য বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি করে। তদুপরি এলাকা ভিত্তিক হওয়ার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে কারচুপির জন্য প্রবল প্রণোদনার সৃষ্টি হয়, কারণ এলাকার প্রার্থীদের ভাগ্য সেখানকার নির্বাচনী ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের বিদ্যমান নিঃসরণ ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি মডেলের কারণে সংসদের সদস্যপদ বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পদ পাওয়ার জন্য প্রার্থীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় (বিনিয়োগ) করে। এই বিনিয়োগ বিফলে যাক এটা তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন হয়। সেকারণে তারা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে এবং ছলেবলে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করে। ফলে কারচুপির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে

আনুপাতিক নির্বাচনের ফলাফলের সাথে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের ভাগ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। তাদের ভাগ্য পরোক্ষভাবে গোটা দেশের ভোট অনুপাতের উপর নির্ভর করে। স্থানীয় পর্যায়ের ভোট অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করা এবং মরিয়া হওয়ার তাড়না অত চরম হয় না। ফলে কারচুপির জন্য প্রণোদনা হ্রাস পায়। অর্থাৎ কারচুপির জন্য বাস্তব সুযোগ ও প্রণোদনা উভয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের তুলনায় আনুপাতিক নির্বাচনে কম হয়। ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।

৩.৫.৪ *উচ্চমানের প্রার্থী*

আনুপাতিক নির্বাচনের চতুর্থ সুফল হলো নির্বাচনে উচ্চমানের প্রার্থীর সমাবেশ। যেহেতু এই নির্বাচন সমগ্র দেশের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু রাজনৈতিক দলসমূহকে এমন প্রার্থীদের তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রবুদ্ধ করবে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেছেন। লক্ষণীয়, জাতীয় সংসদের মূল দায়িত্ব হলো বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। স্বীয় অবদানের মাধ্যমে যারা জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তারাই এই কাজের জন্য বেশি উপযোগী। আনুপাতিক নির্বাচন তাদেরকে জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করে; ফলে শুধু যে সংসদের মান উন্নত হয় তাই নয়, সংসদে অনুষ্ঠিত আলোচনা, প্রণীত আইন ও গৃহীত সিদ্ধান্তের মানও উন্নত হয়। বিপরীতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন যেহেতু আসন ভিত্তিক হয় সেহেতু জাতীয় পরিচয়ের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট আসনে একজন প্রার্থীর স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তি কতখানি সেটাই তার যোগ্যতা যাচাইয়ের মূল নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনেক সময় এমনসব ব্যক্তি মনোনয়ন লাভ করেন এবং জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন যারা জাতীয় পর্যায়ের সমস্যাবলির বিশ্লেষণ এবং তা নিরসনের জন্য কী ধরনের আইন ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য ততটা পারঙ্গম নয়। তাদের অনেকের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় কীভাবে সাংসদ পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আরও বিত্ত অর্জন করা যায়। এর ফলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা আরও ঘোরতর রূপ ধারণ করেছে, কারণ অর্থ ও পেশী শক্তি দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক এবং পেশী শক্তির অধিকারী

ভিন্ন কোনো সাধারণ দেশ-দরদী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে সংসদে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রকৃতপক্ষে যারা যোগ্য এবং যাদের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়া উচিত তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন এবং মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করেন না। সেকারণে বাংলাদেশের সংসদ এখন বহুলাংশে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত হয়ে পড়েছে। আনুপাতিক নির্বাচন এই অশুভ পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারে। এই নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রার্থী হওয়ার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে কাজ করে না। যোগ্যতা ও জাতীয় পর্যায়ে সুপরিচিতি ব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সংসদের সদস্য হতে পারবেন। এর ফলে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রাজনীতিতে যোগদানে উৎসাহী হবেন এবং রাজনীতির মানোন্নয়নের একটি শুভ প্রক্রিয়ার সূচনা হবে।

৩.৫.৫ উঁচুমানের নির্বাচনী প্রচারাভিযান

আনুপাতিক নির্বাচনের পঞ্চম সুফল হলো নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মানোন্নয়ন। আসন ভিত্তিক হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে মনোযোগ উপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয় এবং অবশেষে তা স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন লঘু গুরুত্বের ইস্যুর দিকে ধাবিত হয়। যেমন কে কার আত্মীয়, কার সাথে কার পূর্ব শত্রুতা আছে, কার বাড়ি নির্বাচনী এলাকার কোনদিকে ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব লাভ করে। ফলে মূল জাতীয় ইস্যুর আলোচনা ও বিতর্ক ধামাচাপা পড়ে যায়। জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে জনগণের তথ্য, জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে নির্বাচন ততটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না। পক্ষান্তরে যেহেতু আনুপাতিক নির্বাচন জাতীয় পরিধিতে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু মনোযোগ জাতীয় ইস্যুসমূহের উপর নিবদ্ধ হয়। মূল জাতীয় ইস্যুগুলো কী এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান কী সেগুলো আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। জনগণ সে সম্পর্কে আরও তথ্য ও জ্ঞানলাভ করে; ধারণাগুলো আরও স্বচ্ছ হয়; সচেতনতা আরও তীক্ষ্ণ হয়। স্থানীয় ইস্যুসমূহ এসব জাতীয় ইস্যু থেকে মনোযোগ সরাতে পারে না। অর্থাৎ, মনোযোগ নিচ থেকে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মানের উন্নতি ঘটে।

৩.৫.৬ প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস

আনুপাতিক নির্বাচনের ষষ্ঠ সুফল হলো প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস। প্রত্যেক দল স্বীয় পরিচয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজস্ব জনপ্রিয়তা যাচাই করতে পারে। এর আরেকটি ভালো দিক হলো যে, দলসমূহ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে নিজস্ব অভিমত ও অবস্থান তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরতে পারে এবং জনগণও সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায়। যদি কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না অর্জন করে তবে জোট গঠনের প্রক্রিয়া নির্বাচনের পর অগ্রসর হতে পারে। অর্থাৎ, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় জোট হয় নির্বাচন-পরবর্তী। প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের তুলনায় নির্বাচন-পরবর্তী জোটের ভালো দিক হলো, এসব জোট বিভিন্ন দলের পরিমাপিত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে হতে পারে, কোনো অনুমিত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নয়। ফলে এসব জোটের ভিত্তি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক হয়। বিপরীতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের একটি বাড়তি তাগিদের সৃষ্টি হয়। আমরা দেখেছি, এই নির্বাচনে ভোট অনুপাতের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্বাচনী ফলাফলের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেকারণে দলসমূহ প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠনের তাগিদ অনুভব করে। এর একটি নেতিবাচক ফল হলো দলসমূহ অনেকসময় এমনসব দলের সাথে জোট গঠন করে যাদের সাথে তাদের নীতি ও আদর্শের মিল নেই। এ ধরনের বিসদৃশ প্রাক-নির্বাচনী জোট গঠিত হলে জোটভুক্ত দলসমূহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে না। প্রাক-নির্বাচনী জোটের আরেকটি নেতিবাচক ফল হলো, এসব জোট গঠিত হয় বিভিন্ন দলের অনুমিত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে, পরিমাপিত জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নয়। সুতরাং এসব জোটের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না।

৩.৫.৭ রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি

আনুপাতিক নির্বাচনের সপ্তম সুফল হলো রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি। আমরা লক্ষ করেছি, এই নির্বাচন শুরু হয় দলীয় প্রার্থী তালিকা নির্ধারণের মাধ্যমে। সাধারণত সে উদ্দেশ্যে দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে অর্থে আনুপাতিক নির্বাচনকে দ্বিধাপ বিশিষ্ট নির্বাচন ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যার প্রথম ধাপ হলো প্রার্থী তালিকা নির্ধারণের জন্য দলের অভ্যন্তরে নির্বাচন। দ্বিতীয় ধাপ হলো স্বীয় প্রার্থী তালিকার পক্ষে ভোটারদের সমর্থন আদায়ের জন্য নির্বাচন। কাউকে সংসদের সদস্য হওয়ার জন্য আগে দলীয় প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে হয় এবং সেজন্য দলের অভ্যন্তরের

নির্বাচনে জয়ী হতে হয়। (লক্ষণীয়, অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, দলীয় তালিকার যথাসম্ভব উপরে থাকারও চেষ্টা করতে হয়।) এর জন্য একজন প্রার্থীকে দলের জন্য অনেক অবদান রাখতে হয়, যাতে তার এই অবদান গোটা দলের মধ্যে স্বীকৃত হয় এবং দলের অভ্যন্তরের নির্বাচনে প্রতিনিধিরা ব্যাপক সংখ্যায় তার পক্ষে ভোট দেয়। ফলে মনোনয়ন প্রার্থীদের অনেক আগে থেকেই দলের জন্য কাজ করতে হয় এবং এতে দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া দলের মধ্যে কেন্দ্রমুখী (সেন্ট্রিপিটাল) শক্তির উদ্ভব ঘটে, যা দলকে আরও সংহত করে।

বিপরীতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের অধীনে দলের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যও প্রার্থীদেরকে দলের মনোনয়ন পেতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এই মনোনয়নের জন্য দলের মধ্যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ গোটা দল এই মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। দলের নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে একটি মনোনয়ন বোর্ড গঠিত হয় এবং এই বোর্ড প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিয়ে একজনকে মনোনয়ন দেয়। দ্বিতীয়ত, এই বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার সময় মূল যে বিষয়ের দিকে নজর দেয় তা হলো স্বীয় এলাকায় কোন প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা কতখানি। আমরা লক্ষ করেছি, এই সম্ভাবনা নির্ভর করে এলাকায় কার কতখানি প্রতিপত্তি আছে তার উপর, যেটা আবার নির্ভর করে মূলত প্রার্থীদের অর্থ ও পেশী শক্তির উপর। এর ফলে কে দলের জন্য কতখানি কাজ করেছে তা গৌণ হয়ে যায়। এজন্য প্রায়শ দেখা যায়, দলের ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের পরিবর্তে শুধুমাত্র টাকার জোরে অনেক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী "উড়ে এসে জুড়ে বসে" এবং মনোনয়ন ছিনিয়ে নেয়। তৃতীয়ত, দলের মনোনয়ন না পেলে অনেকে তথাকথিত "বিদ্রোহী প্রার্থী" হিসেবেও নির্বাচনে নেমে পড়েন। উপর্যুক্ত তিন প্রবণতার ফলে নির্বাচনের সময় যেন দলগুলোর মধ্যে বহির্মুখী (সেন্ট্রিফুগাল) শক্তির উদ্ভব ঘটে এবং তা শুধু দলের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে না অধিকন্তু দলীয় সংহতিও দুর্বল করে দেয়। এ ছাড়া রাজনীতিতে নীতিনিষ্ঠ ধারাবাহিক কাজের মূল্য হ্রাস পায়। আনুপাতিক নির্বাচন রাজনীতির এই অবক্ষয় রোধ করতে পারে।

৩.৫.৮ স্থানীয় সরকারের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি

আনুপাতিক নির্বাচনের অষ্টম সুফল হলো স্থানীয় সরকারের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বিদ্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সংসদের মূল দায়িত্ব হলো জাতীয়

পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে আলোচনা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন। স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুর সুরাহা করার দায়িত্ব হলো স্থানীয় সরকারের। আনুপাতিক নির্বাচন দায়িত্ব এবং করণীয়ের এই বিভাজন স্পষ্ট করে এবং তা রক্ষার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই নির্বাচন স্থানীয় আসন ভিত্তিক না হয়ে জাতীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাতে নির্বাচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংসদ পদের সাথে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার বন্ধন থাকে না। প্রথম থেকেই স্পষ্ট থাকে যে, স্থানীয় ইস্যুর সুরাহা করা তাদের দায়িত্ব নয়। এর ফলে স্থানীয় সরকারসমূহ তাদের দায়িত্ব পালনের পূর্ণ সুযোগ পায় এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্রমে আরও পরিপক্ব ও শক্তিশালী হতে পারে।

বিপরীতে, আসন ভিত্তিক হওয়ার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন সাংসদের ভূমিকায় এক দ্বৈততার সৃষ্টি করে। যদিও তারা জাতীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকার (আসনের) সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তারা সেই এলাকার স্থানীয় ইস্যুতে জড়িয়ে পড়েন এবং এমনকি প্রায়শ স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সাংসদেরা স্বীয় নির্বাচনী এলাকার সকল উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পরিচালনা কমিটি গঠন, বিভিন্ন পদে নিয়োগ, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি সম্পদের বিতরণ ও ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েন এবং এসব ক্ষেত্রে তারা বস্তুত প্রভুত্ব বিস্তার করেন। জনকল্যাণ বৃদ্ধির পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এগুলো করেন নিজেদের বস্তুগত স্বার্থ চরিতার্থ করা জন্য। পরিতাপের বিষয় যে, সংসদকে ব্যবহার করে সাংসদরা স্থানীয় ইস্যুর উপর তাদের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকে আইনসিদ্ধও করে নিয়েছেন এবং এই নিয়ন্ত্রণের পরিধি ক্রমশ বাড়িয়ে নিচ্ছেন। এর ফলে স্থানীয় সরকারসমূহ বিকশিত হতে পারছে না। বাংলাদেশে এই সমস্যা বেশ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। স্থানীয় সাংসদের সাথে উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরোধ একটি প্রাত্যহিক ঘটনা। আনুপাতিক নির্বাচন এই সমস্যার অবসান ঘটাতে পারে। নির্দিষ্ট এলাকার (আসনের) সাথে সাংসদদের সম্পর্কের অবসান ঘটানোর মাধ্যমে আনুপাতিক নির্বাচন একদিকে সাংসদদের জাতীয় পর্যায়ের ভূমিকা পালনে আরও মনোযোগী হওয়ার তাগিদ সৃষ্টি করে,অন্যদিকে স্থানীয় সরকারসমূহকে স্বীয় দায়িত্ব পালন ও বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে।

৩.৫.৯ ক্ষুদ্র দল ও জনগোষ্ঠীর জন্য সংসদে স্থান পাওয়ার সমান সুযোগের সৃষ্টি

আনুপাতিক নির্বাচনের নবম সুফল হলো জাতীয় সংসদে ছোটবড় সকল রাজনৈতিক দল ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের জন্য সমান সুযোগের সৃষ্টি। এর কারণ হলো, এই নির্বাচনে কারও ভোট বৃথা যায় না। নির্বাচনী ফলাফলে সকল ভোটই সমান অনুপাতে প্রতিফলিত হয় এবং তার জন্য দলের সমর্থন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ হতে হয় না। কোনো দলের যদি সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ১ শতাংশ ভোটও থাকে তাহলেও সেই দল ৩টি আসন পাবে। ফলে এসব দল "ক্ষুদ্রতার অভিশাপ" থেকে মুক্তি পাবে এবং ক্রমান্বয়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে। সংসদে প্রতিনিধিত্ব অর্জনের জন্য তাদেরকে চিরকাল বৃহৎ দলের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হবে না। এভাবে সংসদে ছোটবড় বিভিন্ন দল ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় এবং সংসদ প্রকৃত অর্থেই গোটা জাতির প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের অন্তর্ভুক্তিসম্পন্ন সংসদ অগণতান্ত্রিক ও অসংসদীয় কার্যক্রমসহ অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা যেমন হ্রাস করতে পারে তেমনি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।

বিপরীতে, বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থায় কোনো ছোট দল সংসদে প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে দল কোনো আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়। এদিকে শুরুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকায় ভোটারেরা ছোট দলসমূহকে তাদেরকে ভোট দিতে ইচ্ছুক হয় না, কারণ তারা মনে করেন যে, তাহলে তাদের ভোটের অপচয় হবে। ফলে ছোট দলসমূহ এক উভয় সংকটের (ক্যাচ-২২) সম্মুখীন হয়: ছোট হওয়ার কারণে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না; আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়ার ফলে তারা বড় হতে পারে না! ফলে সংসদে কতিপয় বড় দলের প্রভুত্ব কায়েম হয়। ছোট দলসমূহের অনেক নেতা দীর্ঘকাল রাজনীতি করা সত্ত্বেও সংসদে প্রবেশ করতে না পেরে হতাশ হন এবং বড় রাজনৈতিক দলের সাথে নীতিবিরুদ্ধ অথবা নীতি-সাংঘর্ষিক মিতালীতে আবদ্ধ হন। এভাবে তারা সাংসদ হতে পারে ঠিকই কিন্তু এতে নীতিহীনতা ও সুবিধাবাদ বিস্তার লাভ করে এবং তা দেশের রাজনীতির মানের ক্ষতি সাধন করে।

৩.৫.১০ উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার অবসান

আনুপাতিক নির্বাচনের দশম সুফল হলো তা উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটায়। আনুপাতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় ক্রমাধিকারসম্পন্ন প্রার্থী তালিকার ভিত্তিতে। কাজেই কোনো সাংসদের পদ যদি পরবর্তী নির্বাচনের আগে কোনো কারণে শূন্য হয় তাহলে ঐ দলের পূর্ব-নির্ধারিত প্রার্থী তালিকা থেকে পরবর্তী ব্যক্তি অনায়াসে ঐ শূন্যপদে আসীন হতে পারে এবং তার জন্য কোনো উপ-নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। এর ফলে সংসদে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না এবং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সংসদ স্থিতিশীল থাকে। পক্ষান্তরে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনে কোনো আসন শূন্য হলে সে আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সমগ্র জাতির মনোযোগ এই একটি আসনের নির্বাচনের উপর নিবদ্ধ হয় এবং এতে জাতীয় প্রাণশক্তির অপচয় ঘটে। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আনুপাতিক নির্বাচন এসব অপচয় রোধ করা ছাড়াও অনভিপ্রেত উত্তেজনা থেকে দেশকে রক্ষা করে এবং এভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখে।

৩.৫.১১ শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব

আনুপাতিক নির্বাচনের একাদশ সুফল হলো দেশে একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, *নো পীস উইদাউট জাস্টিস*, অর্থাৎ "ন্যায্যতা ছাড়া শান্তি হয় না!" আমরা দেখেছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনের চেয়ে আনুপাতিক নির্বাচন অনেক বেশি ন্যায্য। প্রথমত, এই নির্বাচন ব্যবস্থায় কোনো ভোট বৃথা যায় না। সকলের ভোট নির্বাচনী ফলাফলে সমানুপাতে প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচন ছোটবড় সকল দল ও জনগোষ্ঠীর জন্য সংসদে প্রতিনিধিত্ব অর্জনের সমান সুযোগ সৃষ্টি করে। এর জন্য তাদেরকে বড় দলসমূহের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। ফলে সংসদ সমাজের সকল অংশের প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে। কারো মধ্যে বঞ্চনাবোধ থাকে না। তৃতীয়ত, এই নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয় সমস্যাবলি বিশ্লেষণ এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়নে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংসদে যোগ দেওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এভাবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্বের একটি মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভিন্নধর্মী ন্যায্যতার কারণে আনুপাতিক নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অধিকতর শান্তিপূর্ণ রাখে। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩.৬ আনুপাতিক নির্বাচনের সম্ভাব্য নেতিবাচক দিক এবং তা প্রশমনের উপায়

উপরের আলোচনার আলোকে বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচনের উপযোগিতা যথেষ্টই স্পষ্ট। তবে লক্ষ করা প্রয়োজন যে, আনুপাতিক নির্বাচনের কিছু সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকও রয়েছে এবং সেগুলি কীভাবে প্রশমিত করা যায়, সে বিষয়েও অবহিত থাকা প্রয়োজন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি দিকের কথা আলোচিত হলো।

৩.৬.১ *ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ*

আনুপাতিক নির্বাচনের একটি সম্ভাব্য নেতিবাচক দিক হলো ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের অনিশ্চয়তা। যেহেতু এই নির্বাচন আসন ভিত্তিক নয় সেহেতু এই নির্বাচন দ্বারা গঠিত সংসদে দেশের সকল ভৌগোলিক অংশের সমহারে প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা থাকে না। তবে এক্ষেত্রে নিম্নরূপ কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত, যেহেতু জাতীয় সংসদের মূল দায়িত্ব হলো জাতীয় সমস্যাবলির বিশ্লেষণ এবং আইন প্রণয়ন সেহেতু এই দায়িত্ব পালনের জন্য যেটা বেশি প্রয়োজন তা হলো সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত ও এলাকাগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই দায়িত্ব পালনের মতো সাংসদ। এ ধরনের সাংসদেরা যেকোনো ইস্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজগুণেই সকল এলাকার স্বার্থ সমভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বিপরীতে, এলাকা ভিত্তিক সাংসদেরাই এক্ষেত্রে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ হতে পারেন কারণ তাঁরা বিষয়গুলিকে নিজ নিজ এলাকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে প্রয়াসী হবেন এবং তার ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্বীয় প্রার্থী তালিকার প্রতি অধিক ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহও সচেষ্ট হবে যাতে তাদের তালিকায় বিভিন্ন এলাকার প্রার্থীদের সমাবেশ ঘটে। কাজেই নির্বাচন এলাকা ভিত্তিক না হলেও প্রার্থী তালিকায় বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তদুপরি কোনো দলের প্রার্থী তালিকায় কোনো এলাকার প্রার্থী কম হলেও অন্যদলের প্রার্থী তালিকায় হয়তো সে এলাকার প্রার্থী বেশি হবে। এভাবেই পরিসংখ্যান শাস্ত্রের "বৃহৎ সংখ্যা নিয়ম" (*ল' অব লারজ নাম্বারস*) অনুসারে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদেও একটা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তবে যেহেতু সাংসদদের সদস্যপদ এলাকার প্রতি দায়বদ্ধ হবে না সেহেতু জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা যেসব বিকৃতির জন্ম দেয় তা থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা সেসব দেশের জন্য বেশি প্রয়োজন হয় যেসব দেশের এলাকাভিত্তিক বৈচিত্র্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য পার্থক্য প্রকট। সে দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে সমধর্মী ও অত্যন্ত ঘনবদ্ধ দেশ। সেকারণে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আসনভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের কম। লক্ষণীয়, বাংলাদেশের প্রায় সকল সাংসদেরই রাজধানী ঢাকায় বাড়ি অথবা অ্যাপার্টমেন্ট (ফ্ল্যাট) আছে এবং বছরের বেশিরভাগ সময় তাঁদের অনেকে ঢাকাতেই বসবাস করেন। এটাও প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের জন্য ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার সমস্যা তীব্র নয়।[২৫]

৩.৬.২ *জোটবদ্ধ সরকার ও ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন*

আনুপাতিক নির্বাচনের আরেকটি যে সম্ভাব্য নেতিবাচক ফলাফলের কথা বলা হয় তা হলো জোটবদ্ধ সরকার গঠন ও ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন। এক্ষেত্রে যুক্তি হলো যে, আনুপাতিক নির্বাচন বহু ছোট দলকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব অর্জনের সুযোগ প্রদান করে। ফলে বড় দলসমূহের প্রভুত্ব খর্বিত হয় এবং তারা সরকার গঠনের জন্য ছোট দলসমূহের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। তদুপরি যেহেতু এসব ছোট দল প্রায়শ তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করতে পারে সেহেতু ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন ঘটে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। তবে এ প্রসঙ্গে লক্ষ করা দরকার যে, প্রথমত, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এক নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইতালিতে কিছুদিন পরপরই সরকারের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইতালি রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল, কারণ সেখানে সংসদীয়

---

[২৫] সবশেষে, লক্ষ করা যেতে পারে যে, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার অধীনেও ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অনেক উপায় আছে। তার একটি হলো এই নির্বাচনকে সমগ্র দেশের পরিধিতে প্রয়োগ না করে বরং প্রদেশের ভিত্তিতে প্রয়োগ করা। বাংলাদেশে প্রদেশ নেই, তবে বিভাগ আছে। যেমন প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের আগে যে চারটি বিভাগ ছিল -- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা -- সেগুলোর ভিত্তিতে আনুপাতিক নির্বাচন হবে। ধরা যাক, এসব বিভাগে সমান সংখ্যক জনগণের বাস। সেক্ষেত্রে প্রতি বিভাগের জন্য বরাদ্দ হবে ৭৫টি আসন। রাজনৈতিক দলসমূহ প্রতি বিভাগের জন্য ৭৫ জনের ক্রমাধিকারসম্পন্ন প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করবে এবং তার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মোট ৩০০ জনের সংসদ গঠিত হবে। এ পদ্ধতিতে নিশ্চিত করা যাবে যে, সংসদে প্রতি বিভাগ থেকে সমান সংখ্যক সাংসদ রয়েছেন। তবে এই সমাধান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন আকর্ষণীয় নয়। কেননা এর দ্বারা ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব অর্জনে যতটুকু অগ্রগতি হবে তার চেয়ে বেশি পশ্চাদপসরণ ঘটবে আনুপাতিক নির্বাচনের সুফল আহরণে। বাংলাদেশে গোটা দেশের ভিত্তিতেই আনুপাতিক নির্বাচন অনুষ্ঠান শ্রেয় হবে।

গণতন্ত্রের অধীনে নিয়মবদ্ধভাবে সরকারের পতন ঘটে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। এজন্য কোনো রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় না।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আরও প্রমাণ করে যে, জোটবদ্ধ সরকারের প্রয়োজনীয়তা এবং ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন নির্ভর করে তলবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর, নির্বাচন ব্যবস্থার উপর নয়। প্রতিবেশী ভারতের অভিজ্ঞতা তারই সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতার পর বহু দশক ধরে ভারতে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বাধীন সরকার বজায় ছিল। এ সময়কালে ভারতের রাজনীতিতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ভারতের রাজনীতিতে নিম্নবর্ণ ও দলিত সম্প্রদায়ের স্বীয় পরিচয়ে অভ্যুদয় ঘটে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও তলবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ভারতের লোকসভায় বহু ক্ষুদ্র দলের প্রবেশ ঘটে। এতে জোটবদ্ধ সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং জোটবদ্ধ সরকারের প্রয়োজনীয়তা এবং ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন নির্ভর করে মূলত তলবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর, নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর নয়। তদুপরি, বিধিবদ্ধ সংসদীয় উপায়ে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সমার্থক নয়। সংসদে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এবং জোটবদ্ধ সরকারের গঠন আপনা থেকেই কোনো খারাপ কিছু নয়। বরং তা গণতন্ত্রের সুষ্ঠু প্রতিফলন বলেও বিবেচিত হতে পারে।

৩.৬.৩ *দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার*

আনুপাতিক নির্বাচনের আরেকটি যে সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকের কথা উল্লিখিত হয় তা হলো দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকারের সুযোগ সৃষ্টি। আনুপাতিক নির্বাচন যেহেতু দলীয় প্রার্থী তালিকার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু সামগ্রিকভাবে দলের জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে একজন সাংসদ হয়ে যেতে পারেন; ভোটারদের মধ্যে তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থাকার ততটা প্রয়োজন নেই। অন্যকথায় বলা যেতে পারে যে, নির্বাচনে জেতার জন্য ব্যক্তি প্রার্থীর দায়িত্ব হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ করা যেতে পারে যে, আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় একজন প্রার্থীকে প্রথমে দলের ভেতরে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারে দলের প্রতিনিধিরা ভোটারদের মধ্যে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার বিষয়টিও বিবেচনায় নেন। ফলে পরোক্ষভাবে ভোটারদের মধ্যে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার বিষয়টি নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে না।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে মনোনয়ন বাণিজ্য বলতে যেটা বোঝানো হয় তা হলো দলের কোষাগারে মোটা অংকের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মনোনয়ন প্রাপ্তি। বাংলাদেশে এই অনভিপ্রেত প্রবণতা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আসন ভিত্তিক নির্বাচন এই প্রবণতাকে সুগম করে, কারণ অর্থ আর পেশীশক্তির ভিত্তিতে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষেও নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হয়। বিপরীতে, আনুপাতিক নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। প্রথমত, যে ধরনের জাতীয় পরিচয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা দলীয় প্রার্থী তালিকার জন্য বিবেচিত হবেন তাদের পক্ষে বাণিজ্য করে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, আনুপাতিক নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী তালিকা অনেক স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সকল প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে। তা না হলে দলের অভ্যন্তরে এই তালিকার গ্রহণযোগ্যতা অনিশ্চিত থেকে যাবে। ফলে এই তালিকার পক্ষে দলের সকল নেতা ও কর্মীদের আন্তরিক ও জোরালো প্রচারাভিযান নিশ্চিত করা কঠিন হবে। উপরন্তু, সকলের স্বচ্ছ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রার্থী তালিকা নির্ধারিত না হলে নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকা আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতার দায়ভার দলীয় নেতৃত্বের উপর বর্তাবে। এই পরিণতি এড়ানোর জন্যও দলীয় নেতৃত্ব সচেষ্ট হবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দলের সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলীয় প্রার্থী তালিকা নির্ধারণ করতে। যেহেতু এরূপ স্বচ্ছ বৈতরণি পাড় হওয়ার পরই কেবল একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী দলের প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন, সেহেতু তিনি দলের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করছেন এই অভিযোগ যৌক্তিক হবে না। বরং বিষয়টা এমন হবে যে, দল তাকে নির্বাচনে দলের পতাকা বহন করার দায়িত্ব দিয়েছে এবং এই দায়িত্ব সে পালন করছে।[২৬]

৩.৭ বাংলাদেশ আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তনের সম্ভাবনা

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে এবং গণতন্ত্রের মানোন্নয়নে আনুপাতিক নির্বাচন বহুমুখী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশ্ন হলো, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে নিম্নরূপ কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যেতে পারে।

---

[২৬] ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, সরল ধরনের আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্ত হওয়ার পর আরও বিদগ্ধ ধরনের আনুপাতিক ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা যেতে পারে যেখানে শুধু দলের প্রতিনিধিরা নন বরং ভোটাররাও তাদের দলের প্রার্থীদের মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ করে তা প্রকাশ করতে পারবেন।

প্রথমত, বাংলাদেশের বড় দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টি অনেক আগে থেকেই আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে স্বীয় অবস্থান ঘোষণা করেছে। জেনারেল এরশাদ জীবিত থাকাকালীনই জাতীয় পার্টির এই অবস্থান গৃহীত হয়েছিল এবং তা এখনও অব্যাহত আছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বেশিরভাগ বামপন্থী দল অনেক আগে থেকেই আনুপাতিক নির্বাচনের দাবি করে আসছে এবং তারা এখনও এই দাবির পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, বড় দুই দলের -- তথা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি -- মধ্যেও অধিকতর চিন্তাশীল নেতারা আনুপাতিক নির্বাচনের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আবুল মাল আব্দুল মুহিতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখকের সাথে একাধিক আলোচনায় তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি অনেক আগে থেকেই আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে। আশা করা যায় যে, আওয়ামী লীগের অন্যান্য অনেক নেতাও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন। বিএনপির জন্য একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে নাজিম কামরান চৌধুরীর কথা, যিনি আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে বেশ লেখালেখিও করেছেন। চতুর্থত, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। তাদের অনেকে প্রকাশ্যে এই নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে বলেছেন। অন্য অনেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেখকের সাথে এ বিষয়ে সহমত ব্যক্ত করেছেন। পঞ্চমত, বাংলাদেশের ২০০৭-২০১২ সময়কালে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ব্রিগেডিয়ার এম. সাখাওয়াত হোসেন জানান যে, এই কমিশন তার কার্যকাল সমাপ্তিকালে পরবর্তী নির্বাচন কমিশনের জন্য যেসব সুপারিশ রেখে যান তার মধ্যে ছিল আংশিকভাবে আনুপাতিক নির্বাচন অনুসরণ। সুতরাং সব মিলিয়ে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৮ উপসংহার

স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের বেশি বছর অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করেনি এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। নির্বাচন বিষয়ক আলোচনা এখন পর্যন্ত "দলীয় বনাম তত্ত্বাবধায়ক" সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। কিন্তু এই বৃত্তের মধ্যে সমাধান পাওয়া যায়নি। প্রয়োজন হলো এই বৃত্তের বাইরে যাওয়া এবং আনুপাতিক নির্বাচনের প্রস্তাব বিবেচনা করা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায় যে, আনুপাতিক নির্বাচনের সাথে সুশাসন ও

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশ আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে। ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দেখায় যে, বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আনুপাতিক নির্বাচন ১১টি সুফল দিতে পারে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ ক্রমে জনগণের নিকট স্পষ্ট হচ্ছে। বিশেষত, বিগত তিনটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অনেককেই এ বিষয়ে নতুন কিছু ভাবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে। বড় কথা হলো, জনগণের কাছে এই ইস্যু নিয়ে এখনও ব্যাপকভাবে যাওয়া হয়নি। তাদের অধিকাংশ আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনকেই একমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থা বলে মনে করেন। সেজন্য প্রয়োজন জনগণের নিকট আনুপাতিক নির্বাচনের সুফলগুলি তুলে ধরা। জনগণ যখন আনুপাতিক নির্বাচনের উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারবে তখন তারা রাজনৈতিক দলসমূহকে চাপ দিবে এই নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আর তখন দলগুলোর পক্ষে জনগণের এই অভিমত ও চাপ অগ্রাহ্য করা কঠিন হবে। এই প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় উত্তরণ আগামী বাংলাদেশের জন্য একটি বড় করণীয়।

৪। পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে, উন্নয়নের প্রথম পর্বের একটি অন্যতম নেতিবাচক ফলশ্রুতি হলো পরিবেশের অবক্ষয়। পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই অবক্ষয় লক্ষ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের পরিবেশ সংকটকে আরও তীব্র করছে। নদনদীসমূহ অস্থিতিশীল হচ্ছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকা ক্রমশ নিমজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি বর্ধিত লবণাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। নদনদীর প্রতি অনুসৃত বেষ্টনী পন্থা জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট এসব বিপদ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেজন্য আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করা এবং দেশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা।

৪.১ নদী-ব্যবস্থার অবক্ষয় রোধ

পরিবেশ রক্ষায় প্রথমেই দেশের নদনদীর উল্লেখ করতে হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পরিবেশের মেরুদণ্ডই হলো দেশের নদনদী এবং তার সাথে সম্পর্কিত খাল-বিল-পুকুর-দীঘি-হাওর-বাওর এবং অন্যান্য সকল জলাশয়। বস্তুত দেশের বাকী

অংশের পরিবেশও বহুলাংশে দেশের নদনদী ও পানি প্রবাহের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে, বিগত কয়েক দশকে দেশের এই নদী-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। বিভিন্ন কারণেই এটা ঘটেছে। মোটা দাগে এসব কারণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় – অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে দখল, ভরাটকরণ, প্রবাহ বাধাগ্রস্তকরণ, দূষণ ইত্যাদি। তবে এসব বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট অপকর্মের পেছনে সাধারণ সহায়ক প্রভাবক হিসেবে যে পটভূমি কাজ করছে তা হলো দেশের নদনদীর প্রতি অনুসৃত বেষ্টনী পন্থা।

৪.১.১ *নদনদীর প্রতি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পন্থা*

নদনদীর প্রতি অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এ বিষয়ে উৎসাহীরা আমার সম্প্রতি প্রকাশিত *Water Development in Bangladesh: Past Present & Future* (Islam, 2022a) এবং *বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন – বর্তমান ধারার সংকট এবং বিকল্পের প্রস্তাব* (ইসলাম, ২০২৩) শীর্ষক বই দু'টি দেখতে পারেন। মূল কথা হলো, বিশ্বের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, নদনদীর প্রতি সাধারণভাবে দুই ধরনের পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব। একটি হলো প্রকৃতিসম্মত পন্থা আর অন্যটি হলো *বাণিজ্যিক* পন্থা। প্রকৃতিসম্মত পন্থার মূল কথা হলো, প্রকৃতি যেভাবে নদনদীকে সৃষ্টি করেছে, তাকে যতটা পারা যায় সেভাবেই থাকতে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ নদনদীর প্রবাহের পরিমাণ, গতিমুখ, এবং ঋতুভেদে বড় ধরনের পরিবর্তন না করে নদনদী দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মানব সমাজ নদনদীর প্রতি প্রকৃতসম্মত পন্থাই অনুসরণ করেছে। নদনদীকে সম্ভ্রমের সাথে দেখেছে। অনেক সংস্কৃতিতে এবং ধর্মে নদনদীকে দেবতা বলে পূজা করা হয়েছে। যেমন দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ ব্রহ্মপুত্র নদীকে দেবতা ব্রহ্মের পুত্র বলে নাম দিয়েছে এবং অনেকে গঙ্গা নদীকে এখনো পূজা করেন। বলা দরকার যে, এই প্রকৃতিসম্মত পন্থার তলবর্তী কারণ ছিল প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা। সেসময় বড় নদনদীতে হস্তক্ষেপ করার (তথা আঁড়িবাঁধ, ব্যারেজ, কিংবা তীরবর্তী বাঁধ নির্মাণের) মতো প্রযুক্তি প্রাক-শিল্প সমাজের ছিল না। সে কারণে তখনকার প্রকৃতিসম্মত পন্থাকে "প্রাক-শিল্প প্রকৃতিসম্মত পন্থা" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

শিল্প বিপ্লব এক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই বিপ্লব মানব সমাজের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এমন এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যায় যার ফলে বড় নদনদীতেও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়। এভাবেই উদ্ভব ঘটে নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থার। এই পন্থার মূল বাণী হলো "নদীর প্রবাহকে সমুদ্রে চলে যেতে দেওয়াটা অপচয়"। অর্থাৎ নদনদীর সবটুকু পানি বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটানোর (যেমন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ সম্প্রসারণ, শিল্প স্থাপন, নগর প্রসারণ, ইত্যাদি) জন্য বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শুষে নিতে হবে। এসব হস্তক্ষেপ দুই ধরনের হতে পারে। একটি হলো "আঁড়াআড়ি (*ফ্রন্টাল*)" এবং অন্যটি হলো "পার্শবর্তী (*ল্যাটারাল*)"। আঁড়াআড়ি হস্তক্ষেপের উদাহরণ হলো বাঁধ (*ড্যাম*), ব্যারেজ (কপাটসম্পন্ন বাঁধ), আংশিক বাঁধ (*উইয়ার*) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্তী হস্তক্ষেপের উদাহরণ হলো নদী তীরবর্তী বাঁধ (*এমব্যাঙ্কমেন্ট*), বন্যা দেয়াল (*ফ্লাড ওয়াল*), নদীখাতের সরলীকরণ (*চ্যানেলাইজেশন*), এবং নদীখাতের বাধাইকরণ (*ক্যানালাইজেশন*)। নদীর উপর হস্তক্ষেপের এই দুই ধরনের আলোকে নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থার মধ্যে দুটি রূপ চিহ্নিত করা যায়। একটি হলো "আঁড়াআড়ি বাণিজ্যিক পন্থা" আর অন্যটি হলো "পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যিক পন্থা।" শেষোক্ত পন্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো নদীতীরে বাঁধ দিয়ে প্লাবনভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। সেজন্য এটাকে সংক্ষেপে "বেষ্টনী পন্থা" (*কর্ডন আপ্রোচ*) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৪.১.২ *বাংলাদেশে নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগ*

পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থার সূচনা হয়। এর আগে এদেশে মূলত (শিল্পায়ন-পূর্ব) প্রকৃতিসম্মত পন্থা চালু ছিল। ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বন্যা সমস্যা প্রতিকারের দাবি জোরালোভাবে সামনে আসে এবং হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকায় তা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারেরও মনোযোগ পায়। সেইসূত্রে ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের ক্রুগ মিশন বাংলাদেশে আসে এবং তার প্রতিবেদনের (Krug et al., 1957) ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালে "পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড" গঠিত হয় এবং ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান (IECO, 1964a, 1964b) প্রণীত হয়। পঞ্চাশের দশকে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রকল্প দ্বারা বেষ্টনী পন্থার সূচনা হলেও মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে এই পন্থা একটি সামগ্রিক চরিত্র পায় এবং তারপর থেকে বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন প্রয়াস মূলগতভাবে মাস্টার প্ল্যান ধরেই অগ্রসর হয়। সারা দেশে ব্যাপকভাবে

বেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে থাকে। প্রতি বছর উন্নয়ন বাজেটের প্রায় বিশ শতাংশ এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত হয়েছে। এই বিপুল তৎপরতার ফলে বাংলাদেশে অগণিত বেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের হেন কোনো জেলা-উপজেলা নেই যেখানে বেষ্টনী প্রকল্প নির্মিত হয়নি। বাংলাদেশের হেন কোনো গণ্য করার মতো নদী নেই যার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো নির্মিত হয়নি (চিত্র ৪.১)। এক কথায়, বাংলাদেশ বেষ্টনী প্রকল্প দ্বারা পরিপূর্ণ। পৃথিবীর আর কোনো দেশে বেষ্টনী পন্থার এত সার্বিক প্রয়োগ সাধিত হয়নি।

চিত্র ৪.১: বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগ

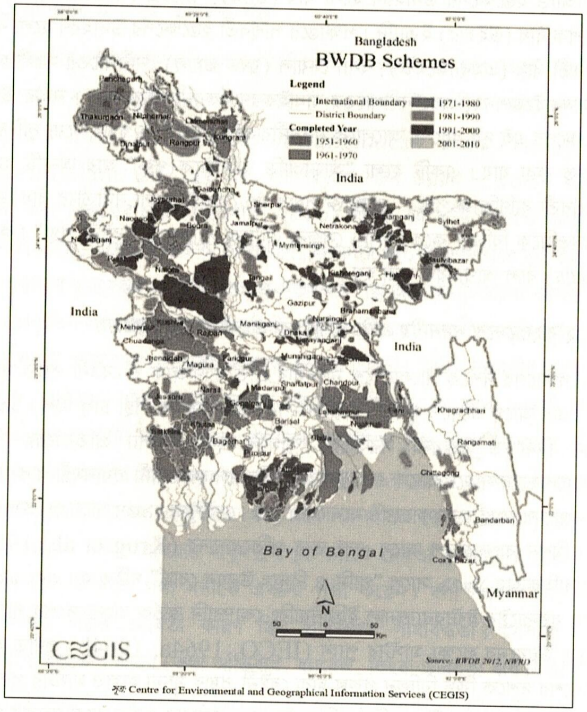

সূত্র: Centre for Environmental and Geographical Information Services (CEGIS)

এসব বেষ্টনীকে শ্রেণিভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন নির্ণায়ক ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ভূমি ব্যবহার, অবরুদ্ধতার মাত্রা এবং ভৌগোলিক অবস্থান। সারণি ৪.১-এ এসব নির্ণায়কের আলোকে বাংলাদেশের বেষ্টনীসমূহের প্রকারভেদ দেখানো হলো। এই প্রকারভেদ বেষ্টনীসমূহের মূল চরিত্র চিহ্নিত করে। পূর্ণ বেষ্টনীর বাঁধসমূহে কোনো ছেদ থাকে না। ফলে পাম্পের মাধ্যমে বাঁধের উপর দিয়ে নদীর পানি (সেচের জন্য) ভেতরে আনতে হয় এবং একই পদ্ধতিতে ভেতরের পানি বাইরে নদীতে নিষ্কাশিত করতে হয়। পক্ষান্তরে আংশিক বেষ্টনীর বাঁধে ছেদ থাকে যা দিয়ে পানি ভেতরে-বাইরে চলাচল করতে পারে। এসব ছেদ নিয়ন্ত্রিত কিংবা অনিয়ন্ত্রিত উভয় ধরনের হতে পারে।

সারণি ৪.১: বেষ্টনী প্রকল্পের শ্রেণিভুক্তিকরণ

শ্রেণিভুক্তির নির্ণায়ক	শ্রেণি	বিপরীত শ্রেণি
ভূমি-ব্যবহার	গ্রামীণ	শহুরে
অবরুদ্ধতার মাত্রা	পূর্ণ	আংশিক
ভৌগোলিক অবস্থান	উপকূলীয়	অভ্যন্তরীণ

সূত্র: লেখক।

লক্ষণীয়, নদনদীর প্রতি বেষ্টনী পন্থার অনুসারীদের নিকট বন্যা "নিয়ন্ত্রণ" আর বন্যা "অপসারণ" সমার্থক। চিন্তাগতভাবেই তারা এটা সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশনা থেকে আহরিত নিচের উদ্ধৃতিটি তার একটি উদাহরণ:

> একটি প্রকল্প খাল, স্বল্প-উত্তোলনকারী পাম্প (এলএলপি), অথবা উভয়ের ব্যবহারসম্পন্ন -- যেটাই হোক না কেন, বন্যা *নিয়ন্ত্রণ* তার একটি অংশ হবে। কিন্তু সহসা বন্যার *দূরীকরণ* খুব দ্রুত একটি পরিবর্তন বলে প্রতিভাত হবে। সেজন্য এই টীম প্রস্তাব করছে যে, বন্যাকে ধীরগতিতে *দূরীভূত* করা হোক, যাতে কৃষকেরা উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে বেশি সময় পায় এবং ফলে খাপ খাওয়ানোটা সহজ হয়। বন্যা *নিয়ন্ত্রণের* জন্য যেসব মূল জিনিসের প্রয়োজন তা হলো নদী তীরবর্তী বাঁধ এবং দুই ধরনের কাঠামো, যার এক ধরনের মধ্যে রয়েছে প্লাবনভূমিতে (নদীর পানির প্রবেশমুখে নিয়ন্ত্রক, নৌ-চলাচলের জন্য তালার বন্দোবস্ত এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য দু'টি পাম্প। আর অন্য ধরনের মধ্যে রয়েছে পানি নির্গমনের উপর নিয়ন্ত্রক এবং নৌচলাচলের জন্য তালা। যেহেতু বর্তমানে প্রকল্পটিকে ধীরগতিতে বন্যা *দূরীকরণের* লক্ষ্যে সংশোধিত করা হচ্ছে, সেহেতু উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধরনের কাঠামোর কোনটা কতটা প্রয়োজন তা নতুন পরামর্শক দ্বারা পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পর্যালোচনা প্রয়োজন (IRDB/World Bank 1968, pp. 38-39, লেখক কর্তৃক অনুদিত এবং গুরুত্ব আরোপিত)।

এই উদ্ধৃতিতে আমরা দেখি কীরকম অনায়াসে বন্যা নিয়ন্ত্রণকে বন্যা দূরীকরণ বলে আখ্যায়িত করার পাশাপাশি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তদুপরি বেষ্টনী পন্থার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষেত্রবিশেষে চিন্তাগতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর বন্যা দূরীকরণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করলেও কার্যত এবং প্রয়োগে এই পার্থক্য উবে যায়। একাধিকভাবে এটা ঘটে। প্রথমত, নদীর পানি প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করার জন্য তীরবর্তী বাঁধে যত সংখ্যক, যে আকৃতির এবং যে স্থানে ছেদ রাখা দরকার, তা প্রকল্পের ডিজাইনে রাখা হয় না। দ্বিতীয়ত, ডিজাইনে থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তা রাখা হয় না (দুর্নীতি তার একটি কারণ)। তৃতীয়ত, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেসব ছেদ রাখা হয়, সেগুলোও প্রয়োজনীয় মনোযোগ, যত্ন ও সংস্কারের অভাবে দ্রুতই অকার্যকর হয়ে যায়; ফলে ছেদসম্পন্ন বাঁধ দ্রুতই ছেদহীন বাঁধে রূপান্তরিত হয় এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প বন্যা দূরীকরণের প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়। আংশিক বেষ্টনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ বেষ্টনীতে পরিণত হয়। বেষ্টনী পন্থার যে সামগ্রিক দর্শন তার অধীনে এই পরিণতি ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

৪১.৩ বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থার বিভিন্ন প্রতিফল

বাংলাদেশে বেষ্টনী পন্থা প্রয়োগের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা থেকে এর যেসব মূল প্রতিফল বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ।

৪১.৩.১ প্লাবন এবং জোয়ার ভূমির প্রকৃতির অবক্ষয়

বেষ্টনী দ্বারা নদনদীর পানিকে প্লাবন ও জোয়ার ভূমিতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার ফলে পলিমাটিভরণের মাধ্যমে ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং ভূমি অবনমনের সূচনা ঘটে। প্লাবনভূমিতে অবস্থিত জলাশয়সমূহ এবং সবুজ প্রকৃতি অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। পলিমাটি দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায় এবং জমিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ধাতব উপাদানের অভাব ঘটে। এই ঘাটতি পূরণ ও উর্বরতা রক্ষার জন্য রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদানের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

৪১.৩.২ স্বাভাবিক বন্যার পরিবর্তে প্রলয়ঙ্করী বন্যা

বেষ্টনী পন্থা একদিকে প্লাবন ভূমিতে বন্যাসীমার নিচে বসতি স্থাপনকে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে নদনদী খাতে বেশি পলিপতনের ফলে নদীতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাঁধ উপচে কিংবা বাঁধ ভেঙ্গে পানি ভেতরে ঢোকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বাস্তবে

যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন বন্যা "কেয়ামত"-এর রূপ ধারণ করে এবং তাতে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। এভাবে বন্যা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বেষ্টনী পন্থা বন্যা সমস্যাকে আরও ঘোরতর করে।

৪১.৩.৩ অদক্ষ সেচ

বেষ্টনী পন্থা নদনদীর প্রবাহ দ্বারা সাধিত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। ফলে পাম্প দ্বারা বাঁধের বাইরে থেকে নদীর পানি ভেতরে এনে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। সেজন্য নতুন করে একটি খালের নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হয়। এই পাম্প এবং কৃত্রিম খাল নির্ভর সেচ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ বলে প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি, ভূগর্ভস্থ পানিভিত্তিক অগভীর নলকূপ দ্বারা সাধিত সেচের সর্বব্যাপী বিস্তারের ফলে বেষ্টনী প্রকল্পের পাম্প-নির্ভর সেচের উপযোগীতা এখন বাংলাদেশে আর নেই বললেই চলে। পাশাপাশি বর্ষাকালের আমন ধানের পরিবর্তে শুষ্ক মৌসুমে চাষকৃত বোরো ধান এখন বাংলাদেশের প্রধান শস্যে পরিণত হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বন্যা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তারও এখন বহুলাংশ অবসান ঘটেছে। সুতরাং বন্যা প্রতিরোধ এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি — এ উভয় লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই বেষ্টনী প্রকল্পসমূহের যৌক্তিকতা অসার বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪১.৩.৪ জলাবদ্ধতার নতুন সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তৃতি

বেষ্টনী পন্থার অনুপযোগিতার সবচেয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ হলো জলাবদ্ধতার উদ্ভব এবং এর ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি। বেষ্টনী পন্থা প্লাবন ভূমি থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ করে দেয়। জমির ঢাল ভিত্তিক স্বাভাবিক নিষ্কাশনের পরিবর্তে এই পন্থা পাম্প দ্বারা বাঁধের উপর দিয়ে ভেতরের পানি বাইরে নদীতে নিক্ষেপে সচেষ্ট হয়। সে লক্ষ্যে নিষ্কাশনের জন্য একটা পৃথক খাল নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হয়। কিন্তু নিষ্কাশনের এই ব্যয়বহুল কৃত্রিম পদ্ধতি সঠিকভাবে কাজ করে না। পাম্পের ক্যাপাসিটি পর্যাপ্ত হয় না এবং যেটুকুবা ক্যাপাসিটি থাকে তা প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, বিদ্যুতের অভাব ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় কাজ করে না। স্লুইস গেটের মাধ্যমে নিষ্কাশনের যে সুযোগ আংশিক বেষ্টনী প্রকল্পসমূহে রাখা হয়, সেটাও প্রায়শ কাজ করে না, কারণ নদীখাতে পলিভরণের কারণে এসব স্লুইস ও ফ্ল্যাপ গেট বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি প্লাবনভূমিতে সঞ্চিত পানি পাম্প হাউসের

নিকটে নিয়ে আসার জন্য নির্মিত নিষ্কাশন খাল-নেটওয়ার্ক দ্রুতই বেদখল ও ভরাটকৃত হয়ে পড়ে; ফলে তা কাজ করে না। সবমিলিয়ে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং তা ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে। শহুরে এবং গ্রামীণ বেষ্টনী - উভয় ক্ষেত্রেই এই পরিণতি দিনদিন সকলের নিকট স্পষ্ট হচ্ছে।

৪.১.৩.৫ নদীতীর ভাঙ্গন এবং নদীখাতগঠনের বিকৃতি

বেষ্টনী পন্থা অধিক হারে পলিভরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র নদনদীর তলদেশ উঁচু করছে তাই নয়, এই পন্থা এবং উজানের দেশসমূহ কর্তৃক অনুসৃত বাণিজ্যিক পন্থার সহযোগে তা নদনদী কর্তৃক তীর ভাঙ্গন এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধির একটি কারণ হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন বাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের নদনদীসমূহে শীতকালীন প্রবাহের পরিমাণ প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনছে। ফলে শীতকালে বাংলাদেশের নদীতল এত বেশি শুষ্ক ও কঠিন হয়ে যাচ্ছে যে, বর্ষাকালে যখন ভারত ব্যারাজের সকল ফটক উন্মুক্ত করে নদনদীর বিপুল প্রবাহ বাংলাদেশের জন্য ছেড়ে দেয় তখন তলদেশ আরও গভীর করার মাধ্যমে এই অতিরিক্ত জলরাশি ধারণ করার সক্ষমতা নদনদীর থাকে না এবং তীর ভাঙ্গনের মাধ্যমে তা ধারণের চেষ্টা করে। সে কারণেই অধুনাকালে বাংলাদেশে নদীতীর ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নদনদীসমূহ একদিকে অগভীর আর অন্যদিকে প্রশস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের নদীখাতগঠনের এই পরিবর্তন ও বিকৃতি অনভিপ্রেত। নদীতীরের বহু স্থাপনা ও জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এবং সর্বস্ব হারিয়ে বহু মানুষ নিঃস্বে পরিণত হচ্ছে।

৪.১.৩.৬ স্থানান্তরিত বন্যা

ইংরেজিতে *ফ্যালাসি অব কম্পোজিশন* বলে একটি কথা আছে। যার অর্থ হলো কোনো জিনিসের অথবা বিষয়ের একটি অংশের জন্য যা সঠিক, তা সমগ্রের জন্য সঠিক হবে বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা। বেষ্টনী পন্থার জন্য এই ভ্রান্তি প্রযোজ্য। বেষ্টনী কোনো একটি এলাকাকে বন্যামুক্ত করলেও তা বাকী এলাকার জন্য বন্যা সমস্যাকে আরও প্রকট করে। এর কারণ, বাংলাদেশে প্রতি বছর নদনদী প্রায় এক হাজার কোটি কিউবিক মিটার পানি নিয়ে আসে। এই মোট পরিমাণের উপর আমাদের উপর তেমন হাত নেই। যত বিস্তৃত এলাকার উপর এই পানি ছড়িয়ে পড়তে পারবে ততই প্লাবনের উচ্চতা কম ও সহনসীমার মধ্যে থাকবে। পক্ষান্তরে, যত বেশি বেষ্টনী প্রকল্প নির্মিত হবে ততই পানি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে এবং প্লাবনের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। সংক্ষেপে, বেষ্টনী পন্থা স্থানান্তরিত বন্যা সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে বেষ্টনীর অভ্যন্তরের মানুষের সাথে বেষ্টনীর বাইরের মানুষের স্বার্থের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। যেখানে বন্যার সাথে মোকাবেলার জন্য দেশের মানুষের মধ্যে আরও বেশি সংহতি প্রয়োজন, সেখানে বেষ্টনী পন্থা দেশের মানুষকে আরও বিভক্ত করে এবং বন্যা সমস্যা মোকাবেলাকে আরও কঠিন করে তোলে। ফলে বেষ্টনী পন্থা একটি আত্ম-পরাজয়মূলক পন্থায় পর্যবসিত হয়।

৪.১.৩.৭ ভূমির অবনমন ও নিমজ্জন

পলিভরণ থেকে বঞ্চিত করে বেষ্টনী পন্থা সর্বত্রই বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ভূমির অবনমন ডেকে এনেছে। উপকূলীয় এলাকায় এই প্রক্রিয়া বেষ্টনীর (পোল্ডারের) অভ্যন্তরের এলাকাসমূহকে সমুদ্র সীমার নিচে ঠেলে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনিতেই বাংলাদেশের উপকূলে সমুদ্রের উচ্চতা বছরে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিমজ্জনের বিপদ ডেকে আনছে। বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, এখনও প্রতি বছর নদনদী বাংলাদেশে প্রায় ১০০ কোটি টন পলিবালি বহন করে আনে এবং নদীর প্রবাহ এবং জোয়ারের বিপরীত প্রবাহের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই পলিবালির বিতরণ ও পুনর্বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলের উচ্চতাকে বছরে প্রায় ২০ মিলিমিটার বৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ নদীবাহিত পলিবালি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে টিকে থাকার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি প্রকৃতি প্রদত্ত বর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ যে, বেষ্টনী পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই বর্ম ব্যবহার না করে বরং একটি আত্মঘাতী পথে অগ্রসর হচ্ছে।

৪.১.৪ বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে স্পষ্ট যে, আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো উন্মুক্ত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে দেশের নদী ব্যবস্থাকে বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করা। কী কী সুনির্দিষ্ট ধারায় এই প্রয়াস অগ্রসর হতে পারে তার মূল দিকগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো। বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থা বাস্তবায়নের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে। এগুলো হলো: (ক) পথ নির্ভরতা, (খ) প্রকল্প-সুনির্দিষ্টতা, (গ) ক্রমানুবর্তীতা, (ঘ) দেশজ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং (ঙ) দেশজ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে জনগণের সম্পৃক্তি।

৪.১.৪.১ *পথ নির্ভরতা*

গত সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশ এখন অসংখ্য বেষ্টনী প্রকল্প দ্বারা আকীর্ণ। বহু দশক ধরে বেষ্টনীর অধীনে থাকার ফলে এসব এলাকায় এক নতুন বাস্তবতার উদ্ভব ঘটেছে। বার্ষিক প্লাবন দূরীভূত কিংবা হ্রাস পেয়েছে। বেষ্টনী বাঁধসমূহ সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেষ্টনীর অভ্যন্তরে কৃত্রিম শুষ্ক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নতুন ধরনের কৃষি, অর্থনীতি ও জীবন ধারা গড়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় সমগ্র বেষ্টনীর অপসারণ এসব এলাকার জনগণের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরাজমান বেষ্টনীসমূহের সম্পূর্ণ অপসারণের পরিবর্তে সংশোধনের রূপ গ্রহণ করবে। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য হবে বেষ্টনীসমূহের ইতিবাচক ফলাফলসমূহকে সংরক্ষণ করে এগুলির নেতিবাচক ফলাফলসমূহ প্রশমন ও দূরীকরণ। উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগকে প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য উভয় দিক থেকে উপকারী (*উইন-উইন সমাধান*) হতে হবে। অন্যভাষায়, বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগকে একটি "খালি পটে"র (ক্লিন স্লেইট) পরিবর্তে একটি বেষ্টনী-আকীর্ণ পটে অগ্রসর হতে হবে। সুতরাং "পথ নির্ভরতা"কে (*পাথ ডিপেন্ডেন্স*) অস্বীকার করা যাবে না। যেপথে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তার ফলাফলকে বিবেচনায় নিয়েই উন্মুক্ত পথে উত্তরণ ঘটাতে হবে।

৪.১.৪.২ *পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন*

দীর্ঘকাল ধরে বেষ্টনীর ভেতরে জীবনধারণে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে উত্তরণ হঠাৎ করে ঘটানোর প্রয়াস বাঞ্ছনীয় হবে না। বরং এই উত্তরণকে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে যাতে জনগণ ক্রমশ নতুন, উন্মুক্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। লক্ষণীয়, কোনো একটি পর্যায়ে এই পরিবর্তন এলাকাবাসীর বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ কিছু অংশের জন্য বেশি উপকারী হতে পারে; আবার কিছু অংশের জন্য কম উপকারী এমনকি ক্ষতিকরও হতে পারে। এমতাবস্থায় দেখতে হবে, সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন এলাকাবাসীদের জন্য উপকারী হচ্ছে কিনা এবং যারা বেশি উপকার পাচ্ছে তারা কম উপকার কিংবা অপকারের সম্মুখীন জনগোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম ও রাজী কিনা। সংক্ষেপে, উত্তরণটি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে হতে হবে যাতে তা প্রতিটি পর্যায়ে সামগ্রিক বিচারে এলাকাবাসীর জন্য উপকারী হয়।

৪.১.৪.৩ *প্রকল্প ভিত্তিক সুনির্দিষ্টকরণ*

প্রতিটি বেষ্টনী স্বকীয়। যেমন উপকূলে নির্মিত প্রায় ১৩০টি প্রকল্পকে সাধারণভাবে পোল্ডার বলে আখ্যায়িত করা হলেও এগুলোর একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন। লক্ষণীয়, প্রকল্প এলাকাসমূহ শুধু ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক নয়। জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, জনমিতি গঠন, সচেতনতা, সংগঠন ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকেও ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং প্রতিটি প্রকল্পের উত্তরণ প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট রূপ, পর্যায়ক্রমতা ইত্যাদি ঐ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে নির্ধারিত হতে হবে।

৪.১.৪.৪ *দেশজ প্রযুক্তির ব্যবহার*

উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগে দেশজ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অষ্টমাসীসহ অন্যান্য অস্থায়ী ও যতিপূর্ণ বাঁধ এবং কাটা খাল। বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত এবং নদী প্রবাহ মূলত বছরের চার মাসে সীমাবদ্ধ থাকে। এই বাস্তবতার কারণেই এ দেশের মানুষ অষ্টমাসী বাঁধের উদ্ভাবন করেছিলেন। নদীর পানি প্লাবনভূমিতে ধরে রাখার জন্য তারা আটমাস বাঁধ দিয়ে রাখতেন। বর্ষার চারমাস (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন) তারা এসব বাঁধ অপসারণ করতেন (বা খুলে দিতেন) যাতে নদীর পানি ভেতরে আসতে পারে। একইভাবে উপকূলের জনগণ আটমাস বাঁধ দিয়ে রাখতেন যাতে জোয়ারের লবণাক্ত পানি ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে এবং বর্ষার চার মাস এসব বাঁধ খুলে দিতেন যাতে নদীর পলিময় পানি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। নদীর তীর ভাঙ্গন প্রশমিত করার জন্য এদেশের মানুষ কাটা খালের উদ্ভাবন এবং এর ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন যাতে একদিকে পাড়ের উপর নদীর পানির চাপ কমে অন্যদিকে নদীর পানি প্লাবনভূমির ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। বলাবাহুল্য, কাটা খালের অন্যান্য উপকারও ছিল। নদী ভাঙ্গন রোধে ব্যান্ডেল, বিটিবার এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের ব্যবহারও দেশজ প্রযুক্তির অন্তর্গত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথে অপরিচিত বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এবং বিদেশী প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা এসব দেশজ প্রযুক্তির মূল্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয় এবং অনুপযোগী বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর বেষ্টনী পন্থা আরোপ করে। সেজন্য আশ্চর্য্যের নয় যে, উন্মুক্ত পন্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দেশজ প্রযুক্তিতে প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন হবে। অষ্টমাসী বাঁধ এবং কাটা খালের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগ কেবল প্রাক-শিল্প পর্যায়ের প্রযুক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। শিল্প বিপ্লব ভিত্তিক যেসব প্রযুক্তি বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য উপযোগী তা ব্যবহারেও

সচেষ্ট হতে হবে। যেমন, আধুনিক রাবার ড্যাম এক অর্থে বাংলাদেশের অষ্টমাসী বাঁধেরই আধুনিক সংস্করণ। কাজেই কারিগরি এবং ব্যয়সাপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপযোগী হলে উন্মুক্ত পন্থায় রাবার ড্যাম প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। একইভাবে আধুনিক জিও-ব্যাগ প্রযুক্তিও বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হতে পারে এবং উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.১.৪.৫ দেশজ প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন ও জনগণের সম্পৃক্তি

উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগের জন্য দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরও পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। উপরের আলোচনা দেখায় যে, এই পন্থা প্রয়োগের জন্য গ্রামবাসীদের বহু যৌথ তৎপরতার প্রয়োজন হবে (নিচের আলোচনা থেকে তা আরও স্পষ্ট হবে)। সেজন্য দরকার হবে গ্রাম পর্যায়ে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। অতীতে বাংলাদেশের গ্রামের স্বশাসন কাঠামো ছিল। কিন্তু বর্তমানে একটি শূন্যতা বিরাজ করছে। নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে এই শূন্যতা দূর করা প্রয়োজন। (পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।) এই গ্রাম পরিষদ উন্মুক্ত পন্থা বাস্তবায়নে গ্রামের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ উন্মোচিত করবে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, বেষ্টনী পন্থা হলো একটি "উপর- থেকে-নিচে" চাপানো প্রক্রিয়া (এবং এখনও তাই আছে)।[২৭] বিপরীতে, উন্মুক্ত পন্থা হবে "নিচ-থেকে-উপর" অভিমুখী একটি প্রক্রিয়া।[২৮]

৪.১.৫ উন্মুক্ত পন্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভৌত কর্ম

বাংলাদেশে উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োগে যেসব ভৌত কর্মের প্রয়োজন হবে নিচে তার কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লিখিত হলো।

[২৭] বিদেশী ঋণ দাতা সংস্থা, দেশীয় পানি উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র চক্র উপর থেকে বিভিন্ন বেষ্টনী প্রকল্প বিভিন্ন এলাকার উপর চাপিয়ে দেয়। এসব প্রকল্পের প্রস্তাবনা, নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদনে স্থানীয় জনগণের কোনো ভূমিকা থাকে না।

[২৮] কোন এলাকায় কোন প্রকল্প গৃহীত হবে, কীভাবে তা বাস্তিবায়িত হবে, তা সে এলাকার জনগণের উদ্যোগ ও সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে।

৪.১.৫.১ বেষ্টনী বাঁধ সমূহকে ক্রমান্বয়ে যতিপূর্ণ এবং অস্থায়ী (অষ্টমাসী) বাঁধে রূপান্তর

উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে বেষ্টনী বাঁধসমূহকে ক্রমান্বয়ে যতিপূর্ণ এবং অস্থায়ী (অষ্টমাসী) বাঁধে রূপান্তর করা। প্রথমে এসব বাঁধে যতি বা ছেদ সৃষ্টি করতে হবে যা দিয়ে নদীর পানি প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে পারে এবং ভেতরের পানি বাইরে নিষ্কাশিত হতে পারে। এসব যতির সৃষ্টি করা হলে এসব বাঁধকে কার্যত অস্থায়ী বাঁধে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নিঃসন্দেহে, পূর্ণ বেষ্টনীর তুলনায় আংশিক বেষ্টনীর বাঁধসমূহকে যতিপূর্ণ এবং অস্থায়ী বাঁধে রূপান্তর তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

৪.১.৫.২ প্লাবন ভূমিতে আবাসন ধারার সংশোধন ও সংহতকরণ

উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োগে প্লাবন সীমার নিচে বসতি স্থাপন বন্ধ করা এবং যেসব বসতি ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে পাটাতন উঁচু করে প্লাবন সীমার উপরে নিয়ে আসতে হবে। উপকূলের পোল্ডারসমূহের জন্য এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংহতকরণের ফলে জমির সাশ্রয় হবে; প্লাবন ভূমিতে পানি চলাচলে বাধা হ্রাস পাবে; কম দৈর্ঘ্যের রাস্তা দিয়ে বেশি মানুষের যাতায়াত চাহিদা পূরণ করা যাবে; এলাকাবাসীদের নিকট বিদ্যুৎসহ অন্যান্য উপযোগ সরবরাহ করা সহজ হবে।

৪.১.৫.৩ প্লাবন ভূমিতে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সংশোধন

প্লাবন ভূমিতে পানি চলাচল বিঘ্নকারী অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ এবং যেসব অবকাঠামো ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। প্লাবন ভূমিতে পিলারের উপর সড়ক নির্মাণ ও সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে উত্তমায়ন (*অপটিমাইজেশন*)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণ করে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষকে যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধা প্রদান করা যায়।

৪.১.৫.৪ খাল-বিল-নদী-নালা-পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের পুনর্খনন ও সংস্কার

দেশের নদী-নালা-খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পুনর্খনন ও সংস্কার করতে হবে। নদী এবং খাল খননের এযাবৎ কর্মকাণ্ড (প্রকল্প) উপর থেকে চাপানো "রাজনীতিবিদ-আমলা-ইঞ্জিনিয়ার-ঠিকাদার" মডেল অনুসরণ করেছে এবং তাতে স্থানীয় জনগণের তেমন ভূমিকা ছিল না। এসব প্রকল্পের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো খননকৃত মাটি কোথায় কিভাবে নিক্ষেপিত হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত সমাধানের

অভাব। প্রায়শ এই মাটি নদীতীরেই স্তূপীকৃত হয়েছে এবং বৃষ্টির পানিতে তা পুনরায় নদীগর্ভে নিপতিত হয়েছে। উন্মুক্ত পন্থার অধীনে নদ-নদী-খাল-বিল সমূহের খনন ও সংস্কার কাজকে গ্রামের ভৌত পরিস্থিতি উন্নয়নের সামগ্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে চিন্তা করতে হবে। বিশেষত খননকৃত মাটি গ্রামসমূহের পাটাতন উঁচু করার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৪.১.৫.৫ নদনদী পাড়ের স্থিতিশীলকরণ এবং নদীখাতগঠনের উন্নতি সাধন

উন্মুক্ত পন্থা বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে নদীর পাড় স্থিতিশীলকরণ। বেষ্টনী বাঁধসমূহকে যতিপূর্ণ করা এবং কাটা খাল প্রযুক্তির ব্যবহার পাড় ভাঙ্গনকে প্রশমিত করবে। তদুপরি নদীতীর স্থিতিশীলকরণে জিও-ব্যাগ প্রযুক্তি যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু উন্মুক্ত পন্থার অধীনে এই প্রযুক্তি অভিজ্ঞতা বাঁধ রক্ষার পরিবর্তে তীর স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে সেহেতু এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। পাড় ভাঙ্গণ রোধে অন্যান্য দেশীয় প্রযুক্তি, যেমন বিটি বার, ব্যান্ডেল ইত্যাদির কার্যকর ব্যবহার করতে হবে।

৪.১.৫.৬ কৃষিজমির উত্তম বিন্যাস অর্জন

প্লাবন ভূমিতে কৃষি জমি বিন্যাসের উন্নতি সাধন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থিত কৃষিজমি একই উচ্চতায় নিয়ে আসা গেলে প্লাবন নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের পানি বিতরণ সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, গ্রামের কৃষি জমির কোন কোন অংশ নদী ও খাল খননকৃত মাটি দ্বারা উপকৃত হতে পারে তা নির্ণয় করে সে উদ্দেশ্যে এই মাটি ব্যবহার করতে হবে।

৪.১.৫.৭ নৌপথের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ

নদ-নদী-খাল-বিলের সংস্কার, প্লাবনভূমিতে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস, নদীখাতগঠনের উন্নতি ইত্যাদি নৌপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করবে। প্লাবনভূমিতে বর্ষাকালের পানির সঞ্চয়ন এবং শুষ্ক মৌসুমে তা নদীখাতে ফেরত যেতে দেওয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত পন্থা শুষ্ক মৌসুমে নদীপথের দৈর্ঘ্যের ব্যাপক হ্রাস রোধ করতে সহায়ক হবে। ফলে উন্মুক্ত পন্থার অধীনে নৌপথের পুনরুদ্ধার ও বিকাশের যে সুযোগের সৃষ্টি হবে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৪.১.৫.৮ উন্মুক্ত মৎস্য সম্পদের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ

নদ-নদী-খাল-বিলের সংস্কার, নদীখাতগঠনের উন্নতি ইত্যাদি উন্মুক্ত মৎস্য সম্পদের পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য যে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে তার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। বিগত বছরগুলোতে বদ্ধ-পদ্ধতিতে মাছের চাষের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটলেও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (তথা উন্মুক্ত নদী-নালা-খাল-বিলে প্রাকৃতিকভাবে লভ্য মাছ ধরার মাধ্যমে) উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ২০০১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৬.৯ লাখ টন থেকে ১.৭ লাখ টনে হ্রাস পায়। একইভাবে মাছের প্রজাতি-বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উন্মুক্ত পন্থা এই প্রবণতা প্রতিহত করায় সহায়ক হবে। অন্যান্যভাবেও উন্মুক্ত পন্থা বাংলাদেশের উন্মুক্ত মৎস্য সম্পদের পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে।

৪.১.৫.৯ কৃষি গবেষণার প্রাগাধিকারের সংশোধন

দীর্ঘকাল বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা, বিশেষত শস্য বিষয়ক গবেষণা, বহুলাংশে বোরো ধানের উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির উদ্ভাবনে নিয়োজিত থেকেছে। উন্মুক্ত পন্থার অধীনে কৃষি গবেষণাকে কম নিয়ন্ত্রণসম্পন্ন আউস ও আমন ধানের উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি উদ্ভাবনের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কৃষি গবেষণাকে বাংলাদেশের শস্য প্রজাতি-বৈচিত্র্য বজায় এবং আরও বিকশিত করার দিকে সচেষ্ট হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকার মতো শস্য এবং কৃষি উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এক্ষেত্রে আরেকটি করণীয় হবে।

৪.১.৬ নদীব্যবস্থা অবক্ষয় রোধে আঞ্চলিক পর্যায়ে করণীয়

বাংলাদেশের নদনদী ও জলাধারের দুরাবস্থার জন্য আঞ্চলিক হুমকি বিশেষভাবে দায়ী। নদীব্যবস্থার সুস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই হুমকি মোকাবেলা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

৪.১.৬.১ বাংলাদেশের নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকি

বাংলাদেশের নদনদীর দুরাবস্থার অন্যতম কারণ হলো উজানের দেশসমূহ, বিশেষত ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নদনদীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন এবং তা ব্যবহার করে প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস এবং সময়ের পরিবর্তন। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গা এবং গাজলডোবা বাঁধ দিয়ে তিস্তার পানি অপসারণের পর এখন ভারত গঙ্গা এবং বিশেষত

ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পানি সে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়ার জন্য "নদী সংযোগ প্রকল্প" গ্রহণ করেছে এবং ক্রমশ তা বাস্তবায়িত করছে। ফারাক্কা বাঁধ দ্বারা গঙ্গার পানি অপসারণের পর এখন ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশের নদনদীর শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহের প্রায় ৭০ শতাংশের উৎস। সুতরাং নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে এই নদের পানি অপসারিত হলে বাংলাদেশের নদনদীর পরিস্থিতি যে আরও সঙ্গীন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের নদনদীর উপর ভারতের এসব হস্তক্ষেপের ফলে শুধু যে প্রবাহের পরিমাণ কমেছে তাই নয়, এই প্রবাহের সময় সম্পর্কে অনিশ্চয়তাও দেখা দিয়েছে। তার ফলে হড়কা বন্যার প্রকোপ এবং নদী প্রবাহের তারতম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের নদনদী একদিকে অগভীর এবং অন্যদিকে পাড় ভেঙ্গে প্রশস্ত হচ্ছে। মূল্যবান স্থাবর সম্পদ নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এবং বহু মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, চীনের কিছু পদক্ষেপও এখন বাংলাদেশের নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকি বৃদ্ধি করেছে। হিমালয়ের উত্তর পাদদেশ ধরে তিব্বত দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের উজান অংশে (যেটাকে সেখানে ইয়ারলুং জাংবো বলে ডাকা হয়) চীন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একাধিক বাঁধ ইতিমধ্যে নির্মাণ করছে এবং আরও বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এছাড়া চীনের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মপুত্রসহ হিমালয়ের উত্তর থেকে প্রবাহিত অন্যান্য নদনদী (যেমন মেকং এবং ইরাবতী) থেকে পানি উত্তরমুখে ইয়াংশি এবং হোয়াং হে নদীর দিকে প্রবাহিত করার প্রস্তাব করেছে।

৪.১.৬.২ আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলায় নৈরাশ্যজনক ফলাফল

বাংলাদেশ এ যাবৎ ভারতের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নদনদীর প্রতি হুমকি মোকাবেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে কোনো সুফল অর্জিত হয়নি। অনেক আলাপ-আলোচনার পর গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাংলাদেশে এই নদীর শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহের কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। অন্যদিকে তিস্তা নদী সম্পর্কে ভারত কেবলই একটি চুক্তি স্বাক্ষরের আশা জাগিয়ে রাখছে এবং বাংলাদেশ সরকারও সেই আশা দিয়ে জনগণকে প্রবোধ দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে ভারত তিস্তা নদীর উজানে ও এর বিভিন্ন উপনদীতে আরও ১৫টি বাঁধ নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে কোনো অর্থবহ তিস্তাচুক্তি এখন একটি মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত জনগণকে এই মরীচিকার পেছনে দৌড়িয়ে হয়রান এবং অবশেষে নিরাশ না করে কার্যকর পদক্ষেপ

গ্রহণ। সন্দেহ নেই যে, ভারতের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বাংলাদেশকে নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলা করতে হবে। তবে এই আলোচনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য বাংলাদেশ যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

৪.১.৬.৩ আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর

আন্তর্জাতিক নদনদীর ব্যবহারে বিবাদ-বিসংবাদ হ্রাসের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ একটি সনদ গ্রহণ করেছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে এই সনদ এখন কার্যকর মর্যাদা পেয়েছে। এই সনদ ভাটির দেশের বহু অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন, এই সনদের ৭ নং ধারা অনুযায়ী ভাটির দেশের সম্মতি ছাড়া উজানের দেশ নদীতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ দ্বারা ভাটির দেশের যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করতে হবে। অতীত থেকে ভাটির দেশে নদনদীর যেসব ব্যবহার চলে আসছে সেগুলো বজায় রাখার অধিকার ভাটির দেশের থাকবে। এই সনদের ২০ নং ধারা উল্লেখ করে যে, আন্তর্জাতিক নদনদীর অংশীদার দেশসমূহ নদনদীর বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা করবে এবং যত্ন নেবে। ২৩ নং ধারা ব্যাখ্যা করে যে, নদনদীর বাস্তুতন্ত্র বলতে নদনদীর মোহনা এবং সমুদ্র-উপকূলকে অন্তর্ভুক্ত করে বিবেচনা করতে হবে। এ তিনটি ধারাসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য ধারা ও বিধানের আলোকে পরিষ্কার যে, ফারাক্কা এবং গাজলডোবাসহ অন্য যেসব বাঁধ ভারত বাংলাদেশে প্রবাহিত নদনদীর উপর নির্মাণ করেছে সেগুলো এই সনদের বিরোধী। সুবিদিত যে, ইউনেস্কো ফারাক্কা বাঁধের কারণে সুন্দরবনে মিঠাপানির সরবরাহ কমে যাওয়ার বিষয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি অপসারণমূলক চীনের চিন্তাভাবনাও এই কনভেনশনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক নদনদীর উপর ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষাকারী জাতিসংঘের এই সনদে স্বাক্ষর করা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটা ঠিক যে, ভারত স্বাক্ষর না করা পর্যন্ত এই সনদের বিভিন্ন ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণে ভারতকে বাংলাদেশ বাধ্য করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এই সনদে প্রদত্ত সুরক্ষাসমূহকে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেও স্বীয় পক্ষে ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশ দেখাতে পারে যে, নদনদী বিষয়ক তার দাবিসমূহ কোনো অযৌক্তিক অভিলাষ নয় বরং তা আন্তর্জাতিক সনদ দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত। তদুপরি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বীয়

অবস্থানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এই সনদে প্রদত্ত অধিকারসমূহকে ব্যবহার করতে পারে। নিজে স্বাক্ষর করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারতসহ উপমহাদেশের অন্যান্য দেশকেও এই সনদে স্বাক্ষর করার আহ্বান জানাতে পারে যাতে এ অঞ্চলের নদনদী বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সর্বসম্মত ভিত্তি সৃষ্টি হয় এবং নদনদী বিষয়ে এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.১.৬.৪ "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট" ফর্মূলা

নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ আরেকটি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা হলো ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট" ফর্মূলা তুলে ধরা। এই ফর্মূলা অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বীয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ভারতকে তার উত্তরপূর্বের ৭টি রাজ্যে যাতায়াত এবং পরিবহনের জন্য ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিবে এবং বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদনদী এবং তাদের উপনদীসমূহের উপর নির্মিত হস্তক্ষেপকারী সকল কাঠামো অপসারণ করে এসব নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। লক্ষণীয়, বাংলাদেশের নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার সমস্যা এবং ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যসমূহে পৌঁছানোর সমস্যার উৎস একই আর তা হলো ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় সিরিল র‍্যাডক্লিফ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা। এর ফলে একদিকে নদনদীর অববাহিকাসমূহ বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ তার নদনদীর প্রবাহের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভারতের উত্তরপূর্বের সাতটি রাজ্য দেশের বাকি অংশ থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এসব রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার ২২ মাইল প্রশস্তের করিডোর একমাত্র পথ হিসেবে অবশিষ্ট থাকে। এই করিডোর ব্যবহার করে এসব রাজ্যে পৌঁছানোর পথ শুধু যে অনেক দীর্ঘ তাই নয়,তাদের উন্নয়ন চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকেও অপ্রতুল। ফলে এই রাজ্যসমূহ প্রবেশগম্যতার অভাবে ভুগছে এবং তা এসব রাজ্যের উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে এসব রাজ্যে অনেক সহজে ও দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব এবং সে সুযোগ পেলে এসব রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে। সুতরাং "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট" ফর্মূলা ব্যবহার করে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়ই উপকৃত হতে পারে। অধুনাকালে বাংলাদেশ সরকার একপক্ষীয়ভাবেই

ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের পাশাপাশি বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে; কিন্তু বিনিময়ে নদনদী ইস্যুতে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কোনো ছাড় পায়নি। এ ধরনের একপেশে লেনদেন নিয়ে বাংলাদেশের অনেকের মনে ক্ষোভ রয়েছে এবং তা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কোন্নয়নের জন্য অনুকূল নয়। সুতরাং ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েরই "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট" ফর্মূলা গ্রহণ করা দরকার। এতে দুই দেশই উপকৃত হবে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও গভীর ও বিস্তৃত হবে।

৪.১.৬.৫ ফারাক্কা বাঁধ অপসারণ দাবির প্রতি সমর্থন

বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করার পাশাপাশি ফারাক্কা বাঁধ ভারতের জন্যও একটা বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাঁধের উজানে প্রতি বছর প্রায় ৩০ কোটি টন পলিবালি আটকা পড়ছে বিধায় নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতে বিহার রাজ্যে প্রবল বন্যা এবং পাড় ভাঙ্গন সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ফারাক্কা বাঁধ কলকাতা বন্দরের নাব্যতাও পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।[২৯] ফারাক্কা বাঁধ সৃষ্ট উপর্যুক্ত সমস্যাবলীর কারণে ভারতে বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমারের নেতৃত্বে এই বাঁধ অপসারণের দাবিতে এক জোরালো আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে জুলাই মাসে নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল মন্ত্রীসহ সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ভারতের আন্তরাজ্য পরিষদ (*ইন্টারস্টেট কাউন্সিল*)-এর ১১তম সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, "ফারাক্কা বাঁধ উপকারের তুলনায় বরং বেশি অপকার করেছে" এবং সে কারণে তিনি এই বাঁধ অপসারণ করে সমগ্র গঙ্গা নদী জুড়ে বাধাহীন প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবি জানান। একই বছরের আগস্ট মাসে বন্যা উপদ্রুত বিহারের রাজধানী পাটনায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে, বিহারের বন্যার কারণ হলো ফারাক্কা বাঁধ সৃষ্ট উজানে নদীতলে পলিপতন। এই পলি অপসারণ করে নদীর গভীরতা পুনরুদ্ধার এবং বন্যা প্রশমনের একমাত্র উপায় হলো ফারাক্কা বাঁধের অপসারণ। ভারতের জন্য

[২৯] লক্ষণীয়, ফারাক্কা বাঁধের এই পরিণতি সম্পর্কে অনেকে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কপিল ভট্টাচার্য্য। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে, কলকাতা বন্দরের নাব্যতার সমস্যার মূল কারণ হলো দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বিভিন্ন বাঁধ। ফলে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার পানি ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত করলেও কলকাতা বন্দর তার নাব্যতা ফেরত পাবে না; বরং এই বাঁধ বিহারে বন্যা এবং পাড় ভাঙ্গন ডেকে আনবে। এই ভিন্নমত প্রকাশের জন্য কপিল ভট্টাচার্য্য তিরস্কৃত এবং চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন। তবে ইতিহাস আজ কপিল ভট্টাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

ফারাক্কা বাঁধের কুফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিতিশ কুমার ২০১৭ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি দুদিন ব্যাপী "অবিরাম গঙ্গা" শীর্ষক এক সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৩০] পাটনায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ভিত্তিতে একটি ১১-দফা বিশিষ্ট পাটনা ঘোষণা গৃহীত হয়, যার মূল দাবি হয় ফারাক্কা এবং অন্যান্য বাঁধ অপসারণ করে গঙ্গার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রবাহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পাটনা সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের মে মাসে রাজধানী দিল্লীতেও অনুরূপ আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতেও পাটনা ঘোষণা'র অনুবর্তী আরেকটি ঘোষণা গৃহীত হয়। বাংলাদেশের যেটা করণীয় তা হলো ১৯৯৬ সালের চুক্তির মতো আরেকটি ন্যূনতম প্রবাহের নিশ্চিতিমূলক ধারা বিহীন চুক্তির ফাঁদে আটকা না পড়ে ফারাক্কা বাঁধ অপসারণের যে দাবি ভারতে উঠেছে তার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা এবং গঙ্গা নদীর স্বাভাবিক পূর্ণপ্রবাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় সচেষ্ট হওয়া।

৪.১.৬.৬ *ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চীনের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ভারতীয় অবস্থানের স্ববিরোধীতা*

ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চীনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের জন্য ভারত বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের এই আহ্বানের মধ্যে স্ববিরোধীতা স্পষ্ট। উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে চীন যা করছে, ভারত নিজেই তা প্রায় সত্তর বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতি করে আসছে। কাজেই চীনের আচরণের বিরোধিতার আগে ভারতের প্রয়োজন নিজের আচরণ পরিবর্তন করা এবং আন্তর্জাতিক নদনদীর উপর ভারতে নির্মিত সকল স্থাপনা অপসারণ করে নদনদীর প্রবাহ উন্মুক্ত করা। তাহলেই কেবল অভিন্ন নীতিগত অবস্থান থেকে বাংলাদেশ এবং ভারত যৌথভাবে আন্তর্জাতিক নদনদীতে চীনের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করতে পারে।

[৩০] ভারতের বহু স্বনামধন্য নদী গবেষক ও নদী কর্মী এই সম্মেলনে যোগ দেয় এবং ফারাক্কাসহ অন্যান্য বাঁধ দ্বারা নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে পলিপতন ডেকে আনাকে গঙ্গা নদীর মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। "ভারতের জলমানব" (*ওয়াটারম্যান অফ ইন্ডিয়া*) বলে খ্যাত রাজেন্দ্র সিং এই সম্মেলনে ফারাক্কা বাঁধকে বিহারের জন্য "অশুভ" এবং "অভিশাপ" বলে অভিহিত করে এই বাঁধ অপসারণের দাবি জানান এবং এ মত প্রকাশ করেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সামনে এগুতে পারছি না"। *সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর রিভার্স অ্যান্ড পিপল* (*স্যান্ডারপ*)-এর কর্ণধার ও ভারতের বিশিষ্ট নদী গবেষক হিমাংশু থাক্কার এ সম্মেলনে লক্ষ করেন যে, ফারাক্কা বাঁধের প্রায় ৫০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী ২০ বছর পূর্ণ হলেই এ ধরনের বাঁধের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফারাক্কা বাঁধের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের দাবি জানান।

৪.১.৭ *নদীব্যবস্থার অবক্ষয় রোধে বৈশ্বিক পর্যায়ে করণীয়*

বৈশ্বিক হুমকিও বাংলাদেশের নদনদী ও জলসম্পদের দুরাবস্থার জন্য দায়ী। এই হুমকির সুনির্দিষ্ট রূপ হলো জলবায়ু পরিবর্তন। নদনদীর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন অভিঘাতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে নদনদী এসব অভিঘাত দ্বারা আক্রান্ত হয়, অন্যদিকে নদনদী এসব অভিঘাতের বাহন হিসেবে কাজ করে। সেজন্য নদনদীর প্রতি গৃহীত সঠিক নীতি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.১.৭.১ *জলবায়ু পরিবর্তনের পাঁচ অভিঘাত*

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ বিভিন্নভাবেই আক্রান্ত হবে। তবে তার মধ্যে নিম্নের পাঁচটি অভিঘাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১.৭.১.১ *নিমজ্জন*

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলেও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণভাবে উপকূলের পূর্বভাগে (মেঘনা মোহনা এবং চট্টগ্রাম উপকূলে) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৭ মিলিমিটারের কাছাকাছি। পক্ষান্তরে পশ্চিম উপকূলে, যেমন সুন্দরবনের দক্ষিণে এই হার ৩ থেকে ৫.৫ মিলিমিটার। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূল ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে। গবেষকদের মতে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৫ এবং ১.৫ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের যথাক্রমে ১১.৫ ও ১৪.৯ শতাংশ এলাকা নিমজ্জিত হবে এবং কয়েক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত ও জীবিকাহীন হয়ে পড়বে।

৪.১.৭.১.২ *লবণাক্ততার প্রসার*

উপকূলের লবণাক্ততা তিন ধরনের: ভূপৃষ্ঠস্থ পানির লবণাক্ততা জমির লবণাক্ততা এবং ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সব ধরনের লবণাক্ততাই বৃদ্ধি করছে।[৩১]

[৩১] প্রথম দুই ধরনের লবণাক্ততার জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য। ২০১২ থেক ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৫২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে বরিশাল বিভাগে ২ পিপিটি লবণাক্ততা রেখা ২০১২ সালের

৪.১.৭.১.৩ নদ-নদীর অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি

ঋতুভেদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের নদনদী এমনিতেই চরমভাবাপন্ন। দুর্ভাগ্যবশত, জলবায়ু পরিবর্তন তা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। গবেষণা দেখায় যে, বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ২.০৫ মিলিমিটার করে বাড়ছে; পক্ষান্তরে শীতকালে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ০.২০ মিলিমিটার। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের নদনদীসমূহকে আরও অস্থিতিশীল করে দিচ্ছে।

৪.১.৭.১.৪ চরম ও অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলী

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ফলাফল হলো চরম ও অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলীর সংখ্যা ও প্রকোপ বৃদ্ধি। বাংলাদেশের জন্যও তা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি। গবেষণা দেখায় যে, প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের গড় বার্ষিক সংখ্যা ১৯৭৮-৮৭ থেকে ১৯৯৮-২০০৭ সময়কালে ১ থেকে ৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩২]

৪.১.৭.১.৫ রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি

কর্কট (উষ্ণ) এলাকায় অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে এমনিতেই রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ বেশি। দুর্ভাগ্যজনক যে, জলবায়ু পরিবর্তন তা আরও বাড়িয়ে তুলছে কারণ তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতি এবং বায়ুতে বাষ্পের বৃদ্ধি এমনিতেই রোগ জীবাণুর বেঁচে থাকা এবং ছড়িয়ে পড়াকে সহায়তা করে। তদুপরি, ক্রমপ্রসারমাণ জলাবদ্ধতা পানিবাহিত রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

৪.১.৭.২ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থার প্রয়োজনীয়তা

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন অভিঘাত দ্বারা নদনদী আক্রান্ত হয়, অন্যদিকে নদনদী এসব অভিঘাতের বাহন হিসেবেও কাজ

ভিত্তি সীমা থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। কিছুটা কম হারে হলেও উপকূলের অন্যান্য অংশেও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির লবণাক্ততা দেশের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হবে। জমির লবণাক্ততাও বিস্তৃত হচ্ছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ জমির লবণাক্ততা নড়াইল ও মাদারীপুর পর্যন্ত পৌঁছাবে। ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পরিস্থিতি বহুলাংশে নির্ভর করে এই পানির গভীরতার উপর। স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প গভীরতার পানি স্তর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত লবণাক্ততা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। সংক্ষেপে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সব ধরনের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[৩২] অনুমিত হয় যে, ২০৪১-৬০ সময়কালে বর্ষাকালের আগে (মার্চ থেকে মে মাসে) সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৩৬.৪ শতাংশ আর বর্ষাকালের পরে (অক্টোবর- নভেম্বর মাসে) সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৪৬.৬ শতাংশ।

করে। সেজন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সাফল্যের সাথে নদনদীর প্রতি গৃহীত পন্থার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহকে আরও প্রকট করে; পক্ষান্তরে প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা এসব অভিঘাত প্রশমনে সহায়তা করে। কীভাবে তা সম্ভব হয় সে সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৪.১.৭.২.১ নিমজ্জন প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা

বাঁধ নির্মাণ নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে নদনদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত পন্থা উপকূলে পলিবালির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করবে এবং নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা প্লাবন ও জোয়ারভূমিতে পলিমাটির বিচ্ছুরণের মাধ্যমে ভূমি গঠনের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখবে। এই উভয় কারণেই নদনদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নিমজ্জন সমস্যার হুমকি প্রশমনে সহায়ক হবে।

৪.১.৭.২.২ লবণাক্ততা প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা

প্রকৃতিসম্মত পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে যদি ফারাক্কা, গাজলডোবাসহ বাংলাদেশের নদনদীর উজানে নির্মিত বাঁধসমূহ অপসারণ করে এগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তা জোয়ারের লবণাক্ত পানির উত্তরমুখী প্রবেশ প্রশমিত করবে। একইভাবে যদি উন্মুক্ত পন্থা অনুসরণ করে জোয়ারের পানি জোয়ারভূমিতে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা যায় তবে নদীতে জোয়ারের সময় পানির উচ্চতা হ্রাস ছাড়াও উপকূলে সমুদ্র পৃষ্ঠের কার্যকর আপেক্ষিক উচ্চতা বৃদ্ধিও হ্রাস পাবে, তার ফলে লবণাক্ততার প্রসার প্রশমিত হবে।

৪.১.৭.২.৩ নদ-নদীর অস্থিতিশীলতা প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা

প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নদনদীর ঋতুভেদ বৃদ্ধির সমস্যাকে প্রশমিত করে। উন্মুক্ত পন্থার কারণে বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানি প্লাবন ও জোয়ারভূমিতে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায় এবং শুষ্ক মৌসুমে এই সঞ্চিত পানি নদনদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করে। এই উভয় কারণেই ঋতুভেদ হ্রাস পায়।

৪.১.৭.২.৪ চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলী প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা

নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা আকস্মিক প্রবল বৃষ্টিপাত-সৃষ্ট পানির দ্রুত নিষ্কাশন নিশ্চিত করে। একইভাবে তা উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের বর্ধিত প্রকোপ মোকাবেলায় সহায়তা করে। প্রথমত, কোনো কৃত্রিম নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি না করে উন্মুক্ত পন্থা জনগণকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য উপযোগী ঘরবাড়িসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং সুপেয় পানির সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করার দিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার প্রতি উৎসাহী করে। দ্বিতীয়ত, জোয়ারভূমি উন্মুক্ত থাকার কারণে কোনো জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় না।

৪.১.৭.২.৫ রোগ-বালাই প্রশমনে উন্মুক্ত পন্থা

উন্মুক্ত পন্থার অধীনে জোয়ারভূমিসমূহ উন্মুক্ত থাকার কারণে ঘূর্ণিঝড়ের বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসের পানি দ্বারা জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় না। তদুপরি উন্মুক্ত পন্থা উপকূলীয় এলাকার জনগণকে সুপেয় পানির সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করায় উৎসাহী করে যাতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় এ বিষয়ে কোনো সংকট দেখা না দেয়। উভয় কারণেই পানিবাহিত রোগজীবাণুর বিস্তৃতি এবং রোগ-বালাই প্রশমিত হয়।

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যান্য করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নদনদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থার অবলম্বন একটি বড় করণীয়। পাশাপাশি এ বিষয়ে আগামী বাংলাদেশের অন্যান্য করণীয়ও আছে। সুবিদিত যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয়র সাধারণভাবে দুটি ধারা: প্রশমন (*মিটিগেশন*) এবং অভিযোজন (*এডাপটেশন*)। এই উভয় ধারাতেই বাংলাদেশের করণীয় আছে।

৪.২.১ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংক্রান্ত করণীয়

২০২১ সালে বাংলাদেশ UNFCCC-র নিকট উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস হ্রাসে যে "জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানের সদিচ্ছা" (*ইন্টেন্ডেড ন্যাশনালী ডিটারমিন্ড কনট্রিবিউশন্স, সংক্ষেপে, এনইডিসি*) দাখিল করে তাতে "বিদ্যমান ধারার" (*বিজনেস এজ ইউজুয়াল*) দৃশ্যপট অনুযায়ী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মোট উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস উদগীরণের পরিমাণ অনুমিত হয় ৪০৯ মিলিয়ন টন (কার্বনডাইঅক্সাইডের সমতুল্য হিসাবে)। বাংলাদেশ এই মর্মে সদিচ্ছা (*এনআইডিসি*) দাখিল করে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ শর্তহীন এবং শর্তাধীন উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস হ্রাসের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ মোট উদগীরিত উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের পরিমাণ হবে ৩২০ মিলিয়ন টন (সারণি ৪.২)। অর্থাৎ বিদ্যমান ধারার তুলনায় শর্তহীনভাবে হ্রাস পাবে ৬.৭ শতাংশ, শর্তাধীনভাবে হ্রাস পাবে ১৫.১ শতাংশ এবং মোট হ্রাস পাবে ২১.৮ শতাংশ। স্মর্তব্য, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ যে সদিচ্ছা দাখিল করেছিল তাতে এসব অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫ ও ১০শতাংশ। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২১ সালে বাংলাদেশ প্রশমনের বিষয়ে আরও অগ্রসর অবস্থান গ্রহণ করেছে, যদিও শর্তহীন হ্রাসের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি যৎসামান্য — ৫ শতাংশের তুলনায় ৬.৭ শতাংশ। সারণি ৪.৩ আরও দেখায় যে, উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস হ্রাসের মূল ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে জ্বালানি খাতকে, যেখানে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস ২৭.৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। শিল্প খাতে কোনো হ্রাস পরিকল্পিত হয়নি; কৃষি এবং বনের ক্ষেত্রেও তা যৎসামান্য (মাত্র ১.৮ শতাংশ) এবং বর্জ্য খাতে হ্রাসের পরিমাণ ৭.৮ শতাংশ।

সারণি ৪.২: ২০২১ সালে বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘের নিকট দাখিলকৃত উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস (উবগ) হ্রাসে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানের সদিচ্ছা

UNFCCC সংজ্ঞায়িত খাত	২০৩০ সনে বিদ্যমান ধারায় অনুমিত উবগ পরিমাণ (মিলিয়ন টন) (%)	২০৩০ সন নাগাদ শর্তহীন উবগ হ্রাসের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	২০৩০ সন নাগাদ শর্তাধীন উবগ হ্রাসের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	২০৩০ সন নাগাদ মোট উবগ হ্রাসের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	২০৩০ সন নাগাদ শর্তহীন ও শর্তাধীন হ্রাসের পর উবগের পরিমাণ (মিলিয়ন টন) (%)	বিদ্যমান ধারার তুলনায় হ্রাসের মাত্রা (%)
জ্বালানি	৩১২.৫ (৭৬.৩)	২৬.৩	৫৯.৭	৮৬.০	২২৬.৬ (৭০.৮)	২৭.৫
শিল্প	১১.০ (২.৭)	০	০	০	১১.০ (৩.৪)	০
কৃষি ও বন	৫৫.০ (১৩.৪)		০.৪	১.০	৫৪.০ (১৬.৯)	১.৮
বর্জ্য	৩০.৯ (৭.৬)	০.৬	১.৮	২.৪	২৮.৫ (৮.৯)	৭.৮
মোট	৪০৯.৪ (১০০.০)	০.৬	৬১.৯	৮৯.৪	৩২০.০ (১০০.০)	২১.৮

সূত্র: GoB (2021)।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, বিশ্বের নিরিখে বাংলাদেশের উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ এখনো খুবই সীমিত। IPCC'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উদগীরণের পরিমাণ হবে ৩৮.৫ বিলিয়ন টন (IPCC, 2023)। বাংলাদেশের ৩২০ মিলিয়ন হবে তার ০.৮ শতাংশ। কাজেই উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস হ্রাসে বাংলাদেশ কতটা অগ্রসর হলো তাতে বিশ্ব পরিস্থিতির তেমন হেরফের হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি অগ্রসর অবস্থান বাংলাদেশের নিজেরই প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, প্রশমন বিষয়ে বাংলাদেশের এ যাবৎ সম্পাদন (পারফরমেন্স) সন্তোষজনক নয়। সারণি ৪.৩ দেখায় যে, ২০৩০ সাল নাগাদ, বিদ্যমান ধারার দৃশ্যপট অনুযায়ী, বাংলাদেশের উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের মূল উৎস হবে ৩টি: জ্বালানি, কৃষি ও বন এবং বর্জ্য। এই তিনটি খাতের দিকে একটু তাকালেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্বালানি খাতের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে, এই খাতের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকার প্রশমনের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল! জাপানি অর্থ সহায়তায় ২০১০ সালে "টোকিও ইলেকট্রিক কোম্পানি"র মাধ্যমে সরকার যে "পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান" (পিএসএমপি) প্রণয়ন করে তাতে হঠাৎ করেই বাংলাদেশের জ্বালানি খাতকে সবচেয়ে বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস উদগীরণ এবং দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি তথা কয়লা নির্ভর করার পরিকল্পনা করা হয়। মোট জ্বালানিতে কয়লার অংশকে প্রায় শূন্য থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয় (TEC & BPDB, 2010)। বহু সমালোচনার পর সরকার ২০১৬ সালে একটি সংশোধিত পিএসএমপি প্রকাশ করে। কিন্তু তাতেও দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে কয়লার ভূমিকা প্রায় শূন্য থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশ করা হয় (সারণি ৪.৩ এবং TEC & BPDB, 2016)। কয়লার উপর এরূপ অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপের কারণে সরকার একটার পর একটা বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করে এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়।

সারণি ৪.৩: জ্বালানি মিশ্রণ সংক্রান্ত বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনা (%)

বৎসর	২০১৬	২০২০	২০২১	২০২৫	২০৩০	২০৩৫	২০৪১
কয়লা	১	১১	১৭	৩১	৪০	৩৯	৩২
গ্যাস/এলএনজি	৬২	৪৯	৪৬	৪২	৩৭	৩৯	৪৩
তরল জ্বালানি	৩০	৩৪	৩১	১৭	১০	৩	২
আমদানি	৫	৬	৫	৭	১০	১২	১৫
আণবিক	০	০	০	৩	৪	৬	৭
জলবিদ্যুৎ	২	১	১	১	১	০.৪	০.৪
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

সূত্র: TEC & BPDB (2016, p. 45)।

কয়লা নির্ভর এই জ্বালানি পরিকল্পনা বাংলাদেশের জন্য শুভ হয়নি। প্রথমত, সারা পৃথিবী যখন কয়লা থেকে সরে আসছে তখন বাংলাদেশের এই উল্টোযাত্রা বিস্ময়ের ছিল। এই উল্টোযাত্রা ২০১৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘের "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" (United Nations, 2015) এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত "প্যারিস চুক্তি"র (UNFCCC, 2015) স্পৃহা বিরোধী ছিল। ফলে পরবর্তীতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক "সর্বাধিক হুমকিসম্পন্ন দেশসমূহের গ্রুপে"র সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশ কয়লার গুরুত্ব বৃদ্ধির নীতি থেকে কিছুটা সরে আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। সেই সূত্রে সরকার কপ-২৬ (COP-26) সম্মেলনের প্রাক্কালে ২০২১ সালের জুন মাসে দশটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তার মধ্যে ৫টি প্রকল্প সম্পূর্ণ বাতিল এবং বাকি ৫টি কয়লার পরিবর্তে গ্যাসে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (দৈনিক সমকাল, ২৭ জুন, ২০২১)। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সঠিক। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এই ১০টি প্রকল্পের উপর যথেষ্ট অর্থ ও সময় ব্যয় করেছে যা এখন অপচয় বলে পরিগণিত হলো। দ্বিতীয়ত, কয়লার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে প্রচেষ্টা শৈথিল্য দেখা দেয়, যার একটি প্রমাণ হলো যে গত ২০ বছরে মাত্র ১৯টি কূপ খনন করা হয়।

তৃতীয়ত, সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিষয়ে মৌখিকভাবে সরব হলেও বাস্তবে এ বিষয়ে প্রত্যাশিত গুরুত্ব দেয়নি। "বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০০৮" অনুযায়ী দেশের মোট জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ২০১৫

সালের মধ্যে ৫ শতাংশে এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশে উন্নীত করার কথা ছিল। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ২০৪১ সালের মধ্যে এই অংশ আরও বৃদ্ধি করা হবে। সেখানে প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০২০ সাল নাগাদ ২,৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৯,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে (TEC & BPDB, 2016, p. 57)। পরিতাপের বিষয় এ যে, ২০২০ সালের লক্ষ্য মোটেও অর্জিত হয়নি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত সংস্থা, SREDA প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে মাত্র ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যা কিনা ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১.২ শতাংশ (সারণি ৪.৪)।

সারণি ৪.৪: বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভূমিকা

প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড (মেগাওয়াট)	অন-গ্রিড (মেগাওয়াট)	মোট (মেগাওয়াট)
সৌর	২৮৬.৭২	৩৯.১০	৩২৫.৮২
বায়ু	২.০০	০.৯০	২.৯০
জৈব-গ্যাস	০.৬৮	০.০০	০.৬৮
জৈব-পদার্থ	০.৪০	০.০০	০.৪০
মোট	২৮৯.৮০	৪০.০০	৩২৯.৮০

সূত্র: SREDA (2018)।

জ্বালানি বিষয়ক উপর্যুক্ত ভ্রান্ত নীতি একাধিকভাবে বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হয়। প্রথমত, এর ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস বৃদ্ধি হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশ যে ভূমিকা রাখতে পারতো তা থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ গ্যাসের অনুসন্ধান ও উত্তোলন প্রয়াসের ঘাটতির ফলে দেশে গ্যাসের অপ্রতুলতা দেখা দেয় এবং সরকারকে ক্রমবর্ধমান হারে গ্যাস আমদানি করতে হয়। কয়লা আমদানি ব্যয়ের সাথে গ্যাস আমদানি ব্যয় যোগ হয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতি অবহেলা এই আমদানির প্রয়োজন আরও বাড়িয়ে তোলে। দেশে "ডলার সংকট"-এর সৃষ্টি হয় এবং ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারকে ঋণের জন্য অবশেষে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শরণাপন্ন হতে হয়।

আরও লক্ষণীয়, সৌর এবং বায়ু শক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্জ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্রমবর্ধমান বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ একাধিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। প্রথমত, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন। দ্বিতীয়ত, জৈব সার উৎপাদন। তৃতীয়ত, বর্জ্যের নিষ্কাশন। ক্রমবর্ধমান বর্জ্যের ভারে বাংলাদেশের ভূমি, বিশেষত জলাধারসমূহ যেভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে তার আলোকে বর্জ্য যথাযথ নিষ্কাশনের গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষণীয়, প্রচুর জমিসম্পন্ন উন্নত দেশসমূহের মতো ল্যান্ড-ফিল করার মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্কাশনের সুযোগ বাংলাদেশের নেই। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য ত্রাতার ভূমিকা পালন করতে পারে। আরও লক্ষণীয়, বাংলাদেশ যে ধরনের শিল্প-সক্ষমতা অর্জন করেছে তাতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সৌর প্যানেল এখন বাংলাদেশেই উৎপাদিত হতে পারে। এভাবে সৌর প্যানেল এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও মেরামত নির্ভর বাংলাদেশে আরেকটি নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। সময়ে এই শিল্প বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানিও করতে পারে।

উপর্যুক্ত অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সঠিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একাধারে জলবায়ু প্রশমনে সহায়তা করতে পারে, দেশের ভেতর দূষণ হ্রাস করতে পারে এবং অর্থনীতির উপর আমদানির চাপ কমাতে পারে। বিশ্ব পরিধিতে বাংলাদেশের উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাস সামান্য বলে প্রশমনের বিষয়ে বাংলাদেশের হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। বরং এ বিষয়ে বাংলাদেশকে স্বউদ্যোগী (*প্রো-একটিভ*) হতে হবে এবং সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মাধ্যমে প্রশমন অভিমুখী বিভিন্ন সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যাতে প্রশমনের পাশাপাশি দূষণও কমে এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হয়।

৪.২.২ অভিযোজন সংক্রান্ত করণীয়

অভিযোজনের বিষয়েও বাংলাদেশকে উদ্যোগী হতে হবে। বাংলাদেশের জন্য অভিযোজনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহল সচেতন। বাংলাদেশের ভেতরেও এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে। উপকূলের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই অভিযোজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মাচায় কৃষি উৎপাদন তার একটি উদাহরণ। বিভিন্ন ধরনের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের আবাদ এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ। সরকারকে এসব উদ্যোগকে সমর্থন করতে হবে এবং কীভাবে এধরনের উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

তবে, উপরে আমরা লক্ষ করেছি, অভিযোজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো নদনদীর প্রতি বর্তমান বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ। তাহলে উপকূলীয় এলাকাকে নিমজ্জন ও লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। পোল্ডারসমূহের বাঁধকে অষ্টমাসী বাঁধে রূপান্তরিত করতে হবে। ভেতরে পলিময় পানি পৌঁছাতে দিতে হবে। সে অবস্থায় মাচায় কৃষি, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের আবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ একটি সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারবে। নদনদী সংক্রান্ত এই মৌলিক নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তন ছাড়া অভিযোজনের বাকি পদক্ষেপসমূহ ততটা কার্যকর হতে পারে না।

৪.৩ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০– সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা

আপাতদৃষ্টিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশের অভিযোজন প্রক্রিয়াকে সুগম করার জন্য সরকার ২০১৭ সালে "বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" নামক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে আমি এই পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি (Islam, 2018; 2022, 2022b, 2023)। সুতরাং এখানে বিষয়টি সংক্ষেপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" প্রণয়নের উদ্যোগ কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। প্রথম দৃষ্টিতে এই উদ্যোগের মধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। প্রথমত, এতে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের বদ্বীপ চরিত্রটি বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায়। দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনার জন্য গৃহীত ১০০ বছরের সময় পরিধি উপযোগী মনে হয়, কারণ বদ্বীপ গঠন এবং পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদি ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে হলে পরিকল্পনাকেও দীর্ঘ সময় প্রেক্ষিতের হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়ত, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এই পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণও উপযোগী মনে হয়, কারণ এর ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এই পরিকল্পনা দূরে থাকার এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যে ধরনের "বহু-বিষয়ক পারদর্শীতা" (*মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি এক্সপারটিজ*) প্রয়োজন তার সমাবেশ ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

তবে এসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি ঈশান কোণে কিছু মেঘও দেখা যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটি হলো ওলন্দাজদের আর্থিক সহায়তায় ও কারিগরি নেতৃত্বে

এই প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। যে দশটি পরামর্শক সংস্থা নিয়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কনসর্টিয়াম গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে আটটি ছিল ওলন্দাজ। স্বাধীনতা লাভের পঞ্চাশ বছর পরও দেশের পানি বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে এই বৈদেশিক নির্ভরতা অবাঞ্ছনীয় ও হতাশাকর। এতদিনে বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জ্ঞান ও পারদর্শীতার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তারপরও কেন পানি উন্নয়নের মতো একটি মৌলিক বিষয়ে বাংলাদেশ নিজের আর্থিক সামর্থ্য এবং কারিগরি পারদর্শীতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নে সমর্থ নয়, সে প্রশ্নটি মনে জাগে। তদুপরি, পানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদেশী আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নৈরাশ্যজনক পূর্ব-অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের আছে। এই অভিজ্ঞতার পটভূমিতে পুনরায় বিদেশী অর্থ এবং পরামর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়াস উদ্বেগের সঞ্চার না করে পারে না।

কাজেই একদিকে প্রতিশ্রুতি এবং অন্যদিকে উদ্বেগ, এই উভয় নিয়েই বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি অগ্রসর হয়। ২০১১ সালে এই পরিকল্পনা প্রণয়নের চিন্তাটির সূত্রপাত ঘটে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ এবং ওলন্দাজ সরকারের সাথে পরামর্শক কনসর্টিয়ামের–*বাংলাদেশ-ডাচ ডেল্টা এডভাইজরি সার্ভিসেস* (সংক্ষেপে, *বানডুডেল্টাস*)-এর আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৭ সালে বানডুডেল্টাস এই পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ করে এবং ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী কমিটি তা অনুমোদন করে। পরিতাপের বিষয় এ যে, বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ যে আশার সঞ্চার করছিল তা বহুলাংশে অপূরিতই থেকে গেছে। বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা অনুসরণের কারণে বদ্বীপ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও নদনদী ব্যবস্থার যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে তা দূরীভূত করে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশকে উপযোগী করার কোনো কার্যকর কর্মসূচি এই পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে আসেনি।

একাধিক কারণ এই হতাশাকর পরিণতির পেছনে কাজ করেছে। প্রথমত, বদ্বীপ পরিকল্পনার প্রণেতারা এই প্রয়াসের মূল লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণেই ভ্রান্তির শিকার হন। তারা এই প্রকল্পের ব্যাপ্তি অনেক বাড়িয়ে দেখেন এবং গোটা বাংলাদেশকে তপ্ত-বিন্দু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যদিও তারা স্বীকার করেন যে, জমি এবং পানি হবে এই

পরিকল্পনার বিশেষ মনোযোগের বিষয়, কিন্তু এ সংক্রান্ত মূল প্রশ্নগুলি কী তা সুনির্দিষ্ট করেন না এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ নেন না।[৩৩]

দ্বিতীয়ত, ওলন্দাজ অর্থায়ন ও পরামর্শকদের নেতৃত্বে প্রণীত হওয়ার কারণে বদ্বীপ পরিকল্পনায় যে ওলন্দাজ অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রভাব পড়বে সেটা বিচিত্র নয়। বস্তুত এই পরিকল্পনায় নেদারল্যান্ডের পঞ্চাশের দশকে সূচিত "*ডেল্টা ওয়ার্কস*"-এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণেতারা মোটেও লক্ষ করেন না যে, ভূপ্রকৃতি এবং নদনদী সংক্রান্ত পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গীয় বদ্বীপ এবং ডাচ বদ্বীপের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং সে কারণে বদ্বীপ ব্যবস্থাপনার বেষ্টনী পন্থা ভিত্তিক ওলন্দাজ পদ্ধতিসমূহ আগেও যেমন বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তদুপরি বদ্বীপ পরিকল্পনার প্রণেতারা লক্ষ করেন না যে, একবিংশ শতাব্দীতে এসে খোদ নেদারল্যান্ডেই বেষ্টনী পন্থার ত্রুটিসমূহ স্বীকৃত হয়েছে এবং সে উপলব্ধির ভিত্তিতে "নদীর জন্য পরিসর বৃদ্ধি" শীর্ষক কর্মসূচি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা করা হচ্ছে। ওলন্দাজ অর্থে ও পরামর্শে প্রণীত বদ্বীপ পরিকল্পনায় বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওলন্দাজ চিন্তার এই মৌলিক পরিবর্তনের সবিশেষ উল্লেখ ও প্রয়োগের অনুপস্থিতি বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। একইভাবে শহরগুলোকে খালের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নদীর সাথে সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডের যে সাফল্য সেটিরও তেমন কোনো প্রতিফলন বদ্বীপ পরিকল্পনায় পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, বদ্বীপ পরিকল্পনার প্রণেতারা পানি উন্নয়ন সংক্রান্ত বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতার দিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়নি। বদ্বীপ পরিকল্পনার একটি ভিত্তিমূলক সমীক্ষা অতীত অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে রচিত হয় বটে, কিন্তু তা মূলত বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন প্রয়াসের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবর্তনের দিকে মনোযোগী হয়; অতীতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে এই সমীক্ষা বিরত থাকে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের আত্মপ্রচারমূলক মূল্যায়নে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন প্রয়াসের সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে বদ্বীপ পরিকল্পনা উপকৃত হতে পারে না।

[৩৩] তারা ২৬টি ভিত্তিমূলক সমীক্ষার সংকলন করে ঠিকই; তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব সমীক্ষা বিভিন্ন গবেষকের পূর্ব-সম্পাদিত গবেষণার (অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিএইচডি থিসিসের) পুনরায় পরিবেশন এবং পরিকল্পনা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর উপর নিবদ্ধ নয়, কারণ এই প্রশ্নগুলিই সুনির্দিষ্ট করা হয় না।

চতুর্থত, বদ্বীপ পরিকল্পনা স্বীকার করে যে, বাংলাদেশের নদনদীর উপর উজানের দেশসমূহের হস্তক্ষেপের কারণে পানিলভ্যতা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজকে দুরূহ করে। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা কীভাবে দূর করা সম্ভব সে বিষয়ে বদ্বীপ পরিকল্পনা কোনো সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর কৌশল প্রস্তাব করতে পারে না। এসব হস্তক্ষেপের বড় বড় যেসব উদাহরণ – যেমন ফারাক্কা বাঁধ ও গাজলডোবা বাঁধ – সেগুলোর অভিজ্ঞতার কোনো বিস্তারিত পর্যালোচনা এই পরিকল্পনায় পরিবেশিত হয় না। অথচ বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রস্তাবিত বিনিয়োগ কর্মসূচির সবচেয়ে বড় প্রকল্প হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্মিতব্য গঙ্গা ব্যারেজ, যার বাজেট কমপক্ষে ৫০,০০০ কোটি টাকা এবং বদ্বীপ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ কর্মসূচির ১৪ শতাংশের দাবিদার। কিভাবে ফারাক্কা বাঁধের অভিজ্ঞতার নিবিড় পর্যালোচনা ভিন্ন এরূপ গঙ্গা বাঁধের প্রস্তাব করা যায়, তা মোটেও বোধগম্য নয়।

পঞ্চমত, বদ্বীপ পরিকল্পনা স্বীকার করে যে পানি উন্নয়ন প্রয়াস বিভিন্ন দর্শন দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে "সর্বোত্তম পানি নিয়ন্ত্রণ" (*অপটিমাম ওয়াটার কন্ট্রোল*) এবং "ডিজাইন অনুযায়ী অভিযোজন" (*এডাপটেশন বাই ডিজাইন*) শীর্ষক দু'টি দর্শন কিংবা পন্থা তুলে ধরে। এই দুই পন্থা মোটা দাগে উপরে আলোচিত বেষ্টনী ও উন্মুক্ত পন্থার অনুযোগী। কিন্তু এই দুই দর্শনের কোনটি বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য উপযোগী তা নির্ধারণ এবং একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ না করে বদ্বীপ পরিকল্পনা উভয় দর্শনের এক ভ্রান্তিকর মিশ্রণের প্রস্তাব করে যা গোটা পরিকল্পনাকে দিকশূন্য করে দেয়। ফলে এই পরিকল্পনা বদ্বীপ বাংলাদেশের সফল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সঙ্গতিপূর্ণ ও সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়নে অপারগ হয়।

এসব বিভিন্ন কারণে বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণেতাদের শূন্য হাতে এই পরিকল্পনা শেষ করতে হয় এবং বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দ্বারস্থ হতে হয়। তারা এসব সংস্থাকে আহ্বান জানায় তাদের নিকট ইতিমধ্যে যেসব প্রকল্প প্রস্তাবনা আছে সেগুলো পেশ করার জন্য। বলাবাহুল্য, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ আনন্দের সাথেই এরূপ ১২৩টি প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে এবং বদ্বীপ পরিকল্পনার সাথে বহুলাংশে প্রাকসংযুক্তিবিহীন বিশ্বব্যাংকের স্থানীয় অফিসের অর্থনীতিবদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি তাদেরকে প্রদত্ত কিছু নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের

মধ্য থেকে ৮০টি বাছাই করে। এসব প্রকল্প নিয়েই বদ্বীপ পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মসূচি গঠিত হয়। সুতরাং এ থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার। প্রথমত, বদ্বীপ পরিকল্পনা নিজে থেকে কোনো ভৌত কর্মসূচির জন্ম দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মসূচিতে যেসব প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের হাতে আগে থেকেই ছিল। ফলে বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন ধারার ক্ষেত্রে বদ্বীপ পরিকল্পনা কোনো পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয় না। বিরাজমান প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের সংকলনকেই একটি নতুন নাম দিয়ে সরকার ও দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করা হয়।

বদ্বীপ পরিকল্পনার এই নৈরাশ্যজনক পরিণতির মানে এই নয় যে, বদ্বীপ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল না এবং নেই। গত সত্তর বছরে বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগের ফলে বদ্বীপ বাংলাদেশের নদনদী ও ভূপ্রাকৃতিক পরিস্থিতির যে বিকৃতি ও অবনতি সাধিত হয়েছে তা থেকে পুনরুদ্ধার এবং দেশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মতো উপযোগী করার জন্য একটি সামগ্রিক চরিত্রের এবং দীর্ঘমেয়াদি বদ্বীপ পরিকল্পনার আবশ্যকতা আছে। সুতরাং এখন যেটা প্রয়োজন তা হলো "নকশা টেবিলে" (ড্রইং বোর্ডে) ফেরত যাওয়া এবং বর্তমান বদ্বীপ পরিকল্পনাকে সংশোধন করে একটি নতুন বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্রথমত, এরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নকে হতে হবে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়ন ও পারদর্শীতার ভিত্তিতে গৃহীত একটি উদ্যোগ। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি এবং নদনদীগত পরিস্থিতি বিদেশীদের চেয়ে বাংলাদেশের মানুষ বেশি বোঝে, এই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। বিশেষ কোনো কারিগরি বিষয়ে জ্ঞানের কোনো অভাব থাকলে সেটা মেটানোর জন্য অবশ্যই উপযোগী বিদেশী বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা হলো সীমাবদ্ধ চরিত্রের সহায়তা গ্রহণ। বাংলাদেশের জল-জমি সম্পর্কে বাংলাদেশীদেরই পরিকল্পনা করতে হবে, নতুবা সেটা যথার্থ পরিকল্পনা হবে না।

দ্বিতীয়ত, বদ্বীপ বাংলাদেশের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সব বদ্বীপ এক নয়। বঙ্গীয় বদ্বীপ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সক্রিয় বদ্বীপ। এর মোহনায় প্রতি বছর ১৯ বর্গ কিলোমিটার জমি সমুদ্র গর্ভ থেকে জেগে উঠছে। এত বিপুল পরিমাণের পানি ও পলিবালির যুগপৎ প্রবাহ এবং এত চরম ঋতুভেদ পৃথিবীর আর কোনো বদ্বীপে নেই। কাজেই বাংলাদেশের বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর অন্যান্য বদ্বীপ ব্যবস্থাপনার অনুরূপ হবে না। যেসব পন্থা ও প্রযুক্তি অন্যান্য বদ্বীপ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী

হয়েছে তা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী না হওয়াটাই প্রত্যাশিত। কাজেই ওলন্দাজ এবং অন্যান্য দেশের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা দ্বারা বিমোহিত হয়ে অন্ধ অনুকরণে প্রয়াসী হওয়া বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। কেবল বিদেশী বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা থেকে শেখা নয়; বরং যাতে বিদেশীরা বাংলাদেশের বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা থেকে শিখতে পারে সেদিকে মনোযোগী হতে হবে এবং সে ধরনের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, বঙ্গীয় বদ্বীপের স্বকীয় চরিত্রের কারণে এই বদ্বীপের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান হলো এই বদ্বীপের নিজের অতীত ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা। উপরে আমরা এই অভিজ্ঞতা এবং তার মূল শিক্ষণীয় সংক্ষেপে লক্ষ করেছি। ভবিষ্যতের জন্য বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে প্রথমেই বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাংলাদেশের এই সমৃদ্ধ অতীত নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। বিশেষত, প্রাক-শিল্প পর্যায়ের উন্মুক্ত পন্থার সাথে পঞ্চাশের দশক পরবর্তী বেষ্টনী পন্থার অভিজ্ঞতা তুলনা করতে হবে। এরূপ নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ তুলনার ভিত্তিতে অর্জিত অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

চতুর্থত, বঙ্গীয় বদ্বীপের প্রতি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক হুমকিসমূহের প্রতি যথাযথ নজর দিতে হবে। নদনদীর প্রতি আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। উপরে আমরা লক্ষ করেছি যে, এ যাবৎ অনুসৃত পথ ফলদায়ক হয়নি। যেসব নতুন চিন্তার প্রস্তাব সেখানে করা হয়েছে, তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। একইভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক হুমকিসমূহ মোকাবেলার জন্যও কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে কীভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারসমূহের অভ্যন্তরে পলিমাটিভরণের প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এই এলাকাকে নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

পঞ্চমত, বর্তমান বদ্বীপ পরিকল্পনায় পানি উন্নয়ন সংক্রান্ত দুই বিপরীত দর্শনের মিশ্রণের কথা বলে এই পরিকল্পনা যে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয় তা পরিহার করতে হবে। বঙ্গীয় বদ্বীপ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং বদ্বীপ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট হতে হবে যে, নদনদীর প্রতি প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থাই একমাত্র উপযোগী পন্থা। সেজন্য কোনো মিশ্রণ নয়, এই পন্থা অনুসরণ করেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বদ্বীপ পরিকল্পনা প্রণীত হতে হবে। তবেই এই পরিকল্পনা থেকে একটি সামগ্রিক ও সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচি বেরিয়ে আসবে যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বদ্বীপ বাংলাদেশ পুনরায় তার ভূপ্রাকৃতিক সুস্বাস্থ্য ফিরে পাবে; নদনদীসমূহ প্রাণ ফিরে পাবে; নিমজ্জনের হার থেকে বাংলাদেশের উপকূল রক্ষা পাবে; একটা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি নিশ্চিত হবে।

৪.৪ বন এবং পাহাড়ের অবক্ষয় ও প্রতিকার

পরিবেশ রক্ষার অন্য যেসব বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হলো দেশের বন ও পাহাড়ের সুরক্ষা। বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রথম পর্বে সংঘটিত পরিবেশ অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফল হলো বনের পরিধি ও মান হ্রাস। আগে বাংলাদেশের প্রায় ২০ শতাংশ বনের অধীনে ছিল। বর্তমানে তা কমে মাত্র প্রায় ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গাজীপুরের শালবনের বিরাট অংশ হারিয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, এই শালবন এলাকায় চার শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অবৈধভাবেও আরও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। মধুপুরের বনের অবস্থাও শোচনীয়। পাহাড়ি অঞ্চলের বনও অবক্ষয়ের সম্মুখীন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক সমতলের জনগণের অভিবাসন এবং পাহাড়ি এলাকার জন্য অনুপযোগী আবাসন ও কৃষির প্রসারের ফলে বন হ্রাস পেয়েছে; উদ্ভিদ আস্তরণ অপসারিত হয়েছে; ফলে পাহাড়ের গায়ের মাটি বৃষ্টি দ্বারা বাহিত হয়ে নিকটবর্তী ছড়া এবং নদী ভরাট করে ফেলেছে এবং পাহাড় ধসকে সুগম করেছে। পাহাড়ের সুরক্ষা ছাড়াই বাণিজ্যিক বাগান-কৃষি (*প্ল্যান্টেশন*) বিস্তৃত হচ্ছে এবং তা পাহাড়ের মাটি ক্ষয় ও ধসের সমস্যা আরও প্রকট করছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগে রিজার্ভ বন থেকে অবৈধ গাছ কাটা অব্যাহত আছে এবং তা বনের পরিধি ও মান হ্রাস করছে। আবাসন সম্প্রসারণের জন্য পাহাড় কাটা হচ্ছে। সিলেটের খাসি অধ্যুষিত এলাকা ছাড়াও ময়মনসিংহ বিভাগের উত্তরের গারো অধ্যুষিত এলাকার বনেরও অবক্ষয় সাধিত হচ্ছে। দক্ষিণের সুন্দরবনও হুমকির সম্মুখীন। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশে গঙ্গা নদীর শাখাসমূহের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় এমনিতেই এই বন বিপদগ্রস্ত। তদুপরি এই বনের উত্তর সীমায় কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রসার এই বনের জন্য নতুন হুমকি সৃষ্টি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেও এই বন হুমকির সম্মুখীন।

পরিবেশ রক্ষায় আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে বনের পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ। গাজীপুরের শালবনে অবৈধ শিল্প স্থাপন বন্ধ করে এই বনের পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। "ইকো পার্ক" স্থাপনের নামে মধুপুর বনের খণ্ডিকরণের মাধ্যমে এই বনের যে ধ্বংস সাধন করা হয়েছে তা রোধ করে এই বনের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বনকে বনের মতো থাকতে দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের গায়ে বন নিধন এবং উদ্ভিদ আবরণ অপসারণ করে

আবাসন ও কৃষিকাজের প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ের গায়ে বন বিধ্বংসী বাগান কৃষির প্রসারের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে হবে। সাধারণভাবে বাগান কৃষির স্বল্পমেয়াদি লাভের সাথে পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সঠিক তুলনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। খাসি অধ্যুষিত এলাকার বনের গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। সিলেটের রাতারগুল জলজ-বন (*ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট*) রক্ষা করতে হবে। এই বনের ভেতরে ধ্বংসাত্মক ইকো পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা প্রতিরোধ করতে হবে। সুন্দরবন রক্ষার জন্য সর্বাত্মক আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কয়লার পরিবর্তে গ্যাসভিত্তিক করতে হবে। সুন্দরবনের উত্তর এবং পূর্ব সীমায় দূষণকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নিষিদ্ধ করতে হবে। মোংলা বন্দরের বিকাশ ও ব্যবহার যাতে পশুর নদী এবং সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকর মাত্রায় না পৌঁছায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পটুয়াখালীতে নবনির্মিত পায়রা বন্দরের সুযোগ নিতে হবে। মোংলা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা ও তা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খননকাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে এই খননসৃষ্ট বালু পার্শ্ববর্তী ফসলি জমি ও জলাভূমিতে নিক্ষিপ্ত না হয়। বনের হ্রাস প্রতিরোধের জন্য সরকার সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে, কিন্তু সামাজিক বন আর প্রকৃত বন এক কথা নয়। তদুপরি সামাজিক নবায়ন প্রকল্পের অধীনে ইউক্যালিপটাস, একাসিয়া ইত্যাদি বিদেশী প্রজাতির গাছ রোপণকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাবের সৃষ্টি করেছে। বিদেশী গাছের পরিবর্তে দেশীয় গাছ রোপণকে উৎসাহিত করতে হবে। সারা দেশে সিলিভারভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রান্নার জন্য গাছ কাটার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হবে। একইভাবে ইট ভাটায় গ্যাস অথবা উন্নত মানের কয়লা ব্যবহারের মাধ্যমে গাছ কাটার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হবে। পোড়ানো ইটের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হবে। বনের অধীনে দেশের এলাকাকে পুনরায় ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

৪.৫ জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং প্রতিকার

একদিকে নদী ও জলাশয়ের অবক্ষয় আর অন্যদিকে বন ও পাহাড়ের সংকোচন ও অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে বদ্বীপ বাংলাদেশ মিঠাপানির মাছের আধার হিসেবে পরিচিত ছিল। পরিতাপের বিষয় যে, নদনদী ও জলাশয়ের সংকোচন এবং শিল্পের তরল বর্জ্য এবং

কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ সংমিশ্রিত পানি এসব জলাধারে পৌঁছানোর কারণে মিঠা পানির মাছের বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। বেষ্টনী পন্থার প্রয়োগের মাধ্যমে প্লাবন এবং জোয়ারভূমির অনেক অংশ বিচ্ছিন্ন করার ফলেও মিঠা পানির মাছের বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। নব উদ্ভাবিত বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল শস্যের প্রসারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে; কিন্তু পাশাপাশি দেশীয় বহু ধরনের বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন যেসব শস্য এ দেশের কৃষকেরা হাজার বছরের কৃষিচর্চার মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছে, তা সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এভাবে বাংলাদেশ তার সমৃদ্ধ জিন-ব্যাংক হারিয়ে ফেলছে।

সুতরাং জীববৈচিত্র্য হ্রাস রোধ এবং পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। নদনদী, জলাশয় এবং বনের অবক্ষয় রোধ ও পুনরুদ্ধারে উপরিলিখিত প্রচেষ্টার একটি শুভ ফল হবে জীববৈচিত্র্য হ্রাসের উপশম। বাংলাদেশের শস্য এবং মাছের যে ঈর্ষণীয় প্রজাতি বৈচিত্র্য তা ধরে রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দেশীয় উন্নত মানের শস্যের পরিবর্তে নব্য উদ্ভাবিত শস্য চাষের পেছনে একটি বড় প্রণোদনা হলো এগুলোর উচ্চ ফলন। কৃষি গবেষণার অভিমুখীনতার পরিবর্তন করতে হবে যাতে দেশীয় শস্য সমূহ তাদের বিশেষ গুণাগুণ রক্ষা করেও বেশি বেশি ফলন দিতে পারে। বর্তমানে বনের সঙ্কোচনের ফলে হাতীসহ অনেক বন্য প্রাণী খাদ্যের প্রয়োজনে লোকালয়ে প্রবেশ করছে এবং মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করার ঘটনা ঘটছে। বনের পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বন্য প্রাণীদের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান করতে হবে।

৪.৬ বায়ু দূষণ ও প্রতিকার

বায়ু দূষণ বাংলাদেশে এক চরম আকার ধারণ করেছে। নব্বই দশকে হাজার হাজার কালো ধোঁয়া উদগীরণকারী দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট যানের (স্কুটার) কারণে বড় শহরগুলো গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছিল। ২০০২ সালে এগুলোর অপসারণের পর শহরগুলোর বায়ুর মানের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। ইতিমধ্যে শহরে যানবাহনের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক কালো ধোঁয়া উদগীরণকারী রয়েছে। এসব যানবাহন, শহরে নির্মাণকাজে বায়ু দূষণের প্রতি অমনোযোগ, সড়কে উপচে পড়া বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য, শহরে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধোঁয়া, শহরের চতুষ্পার্শে অবস্থিত ইটভাটার কালো ধোঁয়া ইত্যাদি কারণে শহরের বায়ু ক্রমাগতভাবে দূষিত হচ্ছে। বায়ু দূষণের বিচারে পৃথিবীর সকল

বড় শহরের মধ্যে রাজধানী ঢাকার অবস্থান সর্বনিম্নের দিকে। বায়ু দূষণ এখন গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। সিমেন্ট শিল্পের ধুলো এবং ধোঁয়ার কারণে ধলেশ্বরী নদী ও তার দুই তীরের জনপদের বায়ু দূষণ সেখানকার জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়ু দূষণের হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করা এখন একটি বড় জনস্বাস্থ্যমূলক করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বায়ু দূষণ হ্রাস ও রোধের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। শহরে দূষণকারী যানবাহনের চলাচল বন্ধ করতে হবে। নির্মাণকাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে যাতে বায়ু দূষণ হ্রাস পায়। শহরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দূষিত গ্যাস উদগীরণ বন্ধ করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে হবে যাতে বর্জ্যজনিত বায়ু দূষণ হ্রাস পায়। শহরে এবং সারা দেশে বায়ু দূষণের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ব্যক্তিগত গাড়ীর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে কম দূষণকারী গণপরিবহন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ। ঢাকা শহরে মেট্রো রেল স্থাপন সেদিক থেকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে এই মেট্রো রেল বিভিন্ন স্থানের শহরের সৌন্দর্য্যের ক্ষতি করেছে। লক্ষণীয়, শহরের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য উন্নত দেশসমূহে এখন আর শহরের অভ্যন্তরে মাথার উপর দিয়ে যাওয়া সড়ক বা মেট্রো রেল নির্মাণ করা হয় না। এমনকি আগে যেসব নির্মিত হয়েছিলো সেগুলো অপসারণ করা হচ্ছে। সরকার এখন ঢাকা শহরের জন্য পাতাল রেল নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। ভালো হতো যদি সরকার প্রথমেই এই পথে অগ্রসর হতো। প্রতিবেশী কলকাতা শহর আশির দশকে পাতাল রেল নির্মাণ করেছে। গত চল্লিশ বছরে পাতাল রেল নির্মাণের প্রযুক্তি অনেক বিকশিত হয়েছে। এখন এর জন্য "ওপেন কাট" পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। বরং সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে উপরিভাগে অল্প অভিঘাতের মাধ্যমে পাতাল রেল নির্মাণ করা যায়। সুতরাং এই বিকল্প শ্রেয় হতো এবং মেট্রো রেলের প্রয়োজন হতো না। ফলে ব্যয়েরও সাশ্রয় হতো। সারা দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগের উন্নতি এবং রেলের অধিক ব্যবহারও বায়ু দূষণ হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বায়ু দূষণের বিস্তৃতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইট ভাটায় গ্যাস অথবা উন্নত মানের কয়লা ব্যবহার করতে হবে। ব্লক পদ্ধতির ইটসহ অন্যান্য ধরনের ইট ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে জ্বালানি এবং মাটির সাশ্রয় হয়। শিল্প প্রসারের ফলে গ্রামাঞ্চলে বায়ু দূষণের যে বিস্তৃতি ঘটছে, তা হ্রাস করতে হবে।

৪.৭ শিল্প দূষণ ও প্রতিকার

এ যাবৎ বাংলাদেশে শিল্পায়ন বহুলাংশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হয়েছে। যদিও সরকার শিল্প স্থাপনের জন্য সারা দেশে ১০০টি "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তেমন অগ্রগতি হয়নি। ফলে উদ্যোক্তারা যেখানে তাদের জন্য লাভজনক মনে হয়েছে মূলত সেখানেই শিল্প স্থাপন করেছেন। এর ফলে শিল্প দূষণ সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছে। কঠিন, জলজ ও বায়বীয় – এই তিন রূপেই শিল্প দূষণ নিঃসরিত হচ্ছে এবং তা নিকটবর্তী জমি, জল, ও বায়ু বিষাক্ত করছে। সারা দেশে শিল্পের তরল বর্জ্য বাংলাদেশের নদনদীসহ জলাধারের দূষণের অন্যতম কারণ। নিয়ন্ত্রণহীন শিল্প দূষণের একটি উদাহরণ হলো হবিগঞ্জের সুতাং নদী। হবিগঞ্জে স্থাপিত বিভিন্ন কলকারখানার তরল বর্জ্যের কারণে এই নদীর পানি আলকাতরার মতো কালো রং ধারণ করেছে এবং তার দুর্গন্ধ কয়েক মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়। এই নদীর দুই তীরের বাসিন্দাদের জন্য এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকার ত্রিমোহিনী এলাকাতেও একই ধরনের পরিস্থিতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কঠিন বর্জ্যও যত্রতত্র জমিতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উদগীরিত ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। যদি বর্তমানের মতো অরাজক ধারায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ধারা অব্যাহত থাকে তবে তা সমগ্র দেশের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। যেসব নদনদী ও জলাধার অবশিষ্ট আছে সেগুলোর অধিকাংশ দূষণের শিকার। ঢাকা শহরের চারপাশের নদনদীসমূহ এত দূষিত যে এই শহরে পানি সরবরাহের জন্য দূরের পদ্মা ও মেঘনা নদী থেকে পানি আনতে হচ্ছে। দেশের প্রায় সর্বত্র নদনদী ও জলাশয়কে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে শিল্প ও অন্যান্য দূষণের ফলে বাংলাদেশের জমি, বায়ু, নদনদী ও জলাশয় এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন।

শিল্প দূষণ রোধে অন্যতম করণীয় হলো যত্রতত্র শিল্প স্থাপন বন্ধ করা এবং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন নির্দিষ্ট স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। সরকার যেসব "রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন" সৃষ্টি করছে সেগুলোতে যাতে শিল্প বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সারা দেশে যেসব "বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেগুলোর জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। লক্ষণীয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন বিশেষ শিল্প এলাকা স্থাপনে সরকারের এ যাবৎ প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। তার একটি উদাহরণ হলো ঢাকার হাজারীবাগ থেকে ট্যানারিসমূহকে "কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার" (*সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট*, সংক্ষেপে *সিইটিপি*) সম্পন্ন সাভারে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ এলাকায় স্থানান্তরের প্রয়াস। বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ নীতি এবং অদক্ষ বাস্তবায়নের কারণে এই প্রকল্পের ফলাফল হতাশাকর। একদিকে সকল ট্যানারি স্থানান্তরিত হয়নি, অন্যদিকে সকল স্থানান্তরিত ট্যানারীর তরল বর্জ্য সিইটিপি দ্বারা শোধিত না হয়ে অশোধিত রূপেই নিকটবর্তী বংশী নদীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ফলে আগে যে দূষণ বুড়িগঙ্গা নদীতে হতো তা এখন বংশী নদীতে হচ্ছে। অর্থাৎ, দূষণ হ্রাসের পরিবর্তে কেবল দূষণের স্থানান্তর ঘটেছে। সুতরাং শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ যাতে অনুরূপ বিফলতার পরিচয় না দেয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৮ গৃহস্থালি, চিকিৎসা, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের বিস্তৃতি ও প্রতিকার

উন্নয়নের প্রথম পর্বে মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমতালে বৃদ্ধি পেয়েছে বর্জ্য। কিন্তু সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে বর্জ্য এখন সর্বত্র উপচে পড়ছে। আগে বাংলাদেশের গৃহস্থালি বর্জ্যে জৈব উপাদানের পরিমাণ বেশি ছিল। পচনশীল হওয়ার কারণে জৈব বর্জ্য দ্রুতই মাটির সাথে মিশে যেত বলে বর্জ্য দূষণ স্থায়ী হতো না। কিন্তু সময়ে গৃহস্থালি বর্জ্যে অজৈব উপাদানের পরিমাণ বেড়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো প্লাস্টিক বর্জ্য যা পচনশীল নয় এবং বহু শতাব্দী ধরে বিরাজ করবে। তদুপরি প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে মাইক্রো প্লাস্টিকের সৃষ্টি হয় এবং তা বায়ুতে ছড়ায়। এই মাইক্রো প্লাস্টিক শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের ফুসফুস ও রক্তে পৌঁছায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। মাইক্রো প্লাস্টিক বিভিন্ন উদ্ভিদে প্রবেশ করে এবং তার মাধ্যমেও মানুষের শরীরে পৌঁছে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বহুলাংশে "একবার ব্যবহার যোগ্য" বস্তু ও সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল। ফলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে চিকিৎসা বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুতহারে বাড়ছে। একইভাবে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র প্রতি বছর ফেলে দেওয়া অব্যবহৃত মোবাইল ফোন এবং তার ব্যাটারির সংখ্যা দিয়েই ইলেকট্রনিক বর্জ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ইংগিত পাওয়া সম্ভব। চিকিৎসা বর্জ্যের মতো ইলেকট্রনিক বর্জ্যেও অনেক বিপজ্জনক পদার্থ থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবের ফলে এসব বর্জ্য পরিবেশের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে।

সামগ্রিকভাবে, বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে "হ্রাসকরণ-পুনর্ব্যবহার-চক্রায়ন" (*রিডিউস-রিইউজ-রিসাইকেল*) নীতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথমত, বর্জ্য যাতে কম উৎপাদিত হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য সমাজে বল্গাহীন ভোগবাদীতা প্রশমন করতে হবে। শুধুমাত্র বস্তুগত ভোগই যাতে জীবনের মোক্ষ না হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। সে ধরনের মূল্যবোধ নাগরিকদের মধ্যে বিস্তৃত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচিতে এজন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে শৈশব থেকেই দেশের নাগরিকেরা এ বিষয়ে সচতন হয়ে গড়ে ওঠে। সমাজে অনুকরণীয় রোল মডেলদের এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিনিসপত্রের পুনর্ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষত বর্তমানের "একবার ব্যবহারের" যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তা প্রতিহত করতে হবে। তৃতীয়ত, বস্তুগত সম্পদের চক্রায়িত ব্যবহারে ব্রতী হতে হবে। উপরে উল্লিখিত হয়েছে, চক্রায়িত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্যকেও সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন বর্জ্যের জৈব অংশ দ্বারা সার উৎপাদন করা যায়, যা কৃষির জন্য উপকারী। তেমনিভাবে বর্জ্য দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বস্তুত বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্রায়তন ও ঘন জনবসতির দেশে পশ্চিমের জমির প্রাচুর্য্য সম্পন্ন দেশসমূহের মতো "ল্যান্ড ফিল" বানিয়ে বর্জ্য নিক্ষেপের সুযোগ কম। এজন্য বাংলাদেশকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার ধারাতেই সবচেয়ে জোরালো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। বর্জ্যের ভারে যদি দেশকে না ডুবতে হয় তবে এ ধারাতে আগামীতে ব্যাপক প্রয়াসের প্রয়োজন হবে।

৪.৯ পরিবেশ ও জনসংখ্যা

পরিবেশ দূষণের আরও বহু দিক রয়েছে। শব্দ দূষণ, আলো দূষণ, খাদ্য দূষণ ইত্যাদি তার উদাহরণ। আগামীতে এসব দূষণ প্রতিকারের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে লক্ষণীয়, বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পিত জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি মানুষের ভোগ প্রবণতা প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর অভিঘাত ফেলে। প্রথমত, যেসব দ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়, তা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত, যেসব দ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়, সেসব উৎপাদনের প্রক্রিয়া বহু দূষণ সৃষ্টি করে; ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, ভোগের প্রক্রিয়া আবার বহু দূষণের সৃষ্টি করে; এর ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। এসব কারণে বর্তমানের যে উৎপাদন ও ভোগের প্রক্রিয়া বলবৎ হয়েছে, তাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অবধারিতভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা সৃষ্টির পাশাপাশি দূষণের পরিমাণ ও মাত্রা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর্যুক্ত তিনটি অভিঘাতই প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রতিটি মানুষ তার উৎপাদনমূলক কার্যক্রম ও ভোগের দ্বারা ধরিত্রীর উপর চাপের সৃষ্টি করে; গবেষকেরা এটার নাম দিয়েছেন "বাস্তুতাত্ত্বিক পদভার" (*ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট*)। বিরাট জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশের মোট বাস্তুতাত্ত্বিক পদভার বহু আগেই এদেশের "জৈব-প্রাকৃতিক সক্ষমতা" (*বায়ো-ক্যাপাসিটি*) ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং আগামী বাংলাদেশের জন্য জনসংখ্যার পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তান আমল থেকেই পরিবার পরিকল্পনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে সে প্রচেষ্টা আরও জোরদারও হয়েছিল এবং তা বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল। জনসংখ্যা বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৫ শতাংশ থেকে ১.৪ শতাংশে হ্রাস পায়। ফলে শাসক মহলে এ বিষয়ে সম্ভবত এক ধরনের সন্তুষ্টিচিত্ততা প্রসার লাভ করে এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২২ সালে সম্পাদিত "বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ"-শীর্ষক প্রতিবেদন (NIPORT and ICF, 2023) থেকে তারই পক্ষে আরও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই জরিপ দেখায় যে, এর আগে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেলেও "নারী-প্রতি শিশু জন্ম হার" (*টোটাল ফার্টিলিটি রেট*) ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২.৩-এ স্থির রয়েছে অর্থাৎ আর হ্রাস পাচ্ছে না (চিত্র ৪.২)। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

চিত্র ৪.২: বাংলাদেশে মহিলা-প্রতি শিশু জন্মের হারের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি

TFR for the 3 years preceding each survey

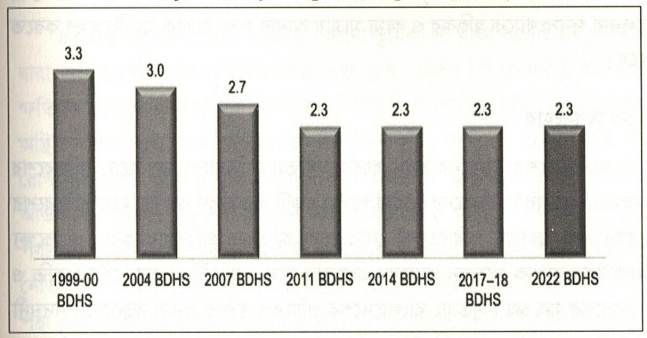

সূত্র: NIPORT & ICF (2023, p. 22).
টীকা: BDHS (Bangladesh Demographic and Health Survey)

লক্ষণীয় যে, যদিও বিগত সময়কালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির *হার* হ্রাস পেয়েছে, ইতিমধ্যে মোট জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বার্ষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনপেক্ষ পরিমাণ হ্রাস পায়নি। যেমন, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১১ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫৯ শতাংশ। সুতরাং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৮ লাখ ৪১ হাজার। পক্ষান্তরে ২০২২ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩০ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.০৯ শতাংশ; ফলে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৮ লাখ ৮২ হাজার। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের হ্রাস সত্ত্বেও মোট হিসেবে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি বরং বেড়েছে। লক্ষণীয়, বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সংকটের দৃষ্টিকোণ থেকে মোট জনসংখ্যাই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের জন্য পরিবার পরিকল্পনা লক্ষ্যাভিমুখী প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্ব হ্রাসের কোনো সুযোগ নেই। বরং তা আরও জোরদার করতে হবে যাতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়।

নিঃসন্দেহে, জনসংখ্যা উত্তরণের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বিশেষত নারী শিক্ষার প্রসার এবং গৃহ-বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং তা পরোক্ষভাবে পরিবার পরিকল্পনা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এই পরোক্ষ প্রভাবের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ প্রয়াস আরও জোরালো করা প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা এবং ইতিমধ্যে সৃষ্ট কাঠামো কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যাকে স্বস্তিকর ও কাম্য মাত্রায় আনার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৪.১০ উপসংহার

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রথম পর্বের অন্যতম নেতিবাচক ফল হচ্ছে পরিবেশের অবক্ষয়। সেকারণে উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে পরিবেশের সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত প্রতিরোধ করা। এ লক্ষ্যে আগামীতে ব্যাপক সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। নদনদী বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের মূল স্তম্ভ। সুতরাং বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার প্রয়াস বহুলাংশে নদনদী ও জলাশয় রক্ষাভিমুখে পরিচালিত হতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নদনদীর প্রতি বর্তমানের বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা পরিত্যাগ করে প্রকৃতিসম্মত ও

উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ। এর ফলে নদনদীসমূহ সুস্থ থাকবে, বন্যা সমস্যা প্রশমিত হবে, ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের নবায়নের হার বাড়বে, শুষ্ক মৌসুমে নদনদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, প্লাবনভূমির জলাধারসমূহ সুস্থ থাকবে, পলিপতনের ফলে জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ন থাকবে, জোয়ারভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, এবং বাংলাদেশের উপকূল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

তবে নদনদী ও জলাশয়ে সুরক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তনই যথেষ্ট হবে না। বাংলাদেশের নদনদীর বর্তমান দুরাবস্থার পেছনে উজানের দেশসমূহের হস্তক্ষেপের বড় ভূমিকা রয়েছে। বাঁধ, ব্যারেজ এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের নদনদী থেকে পানি অপসারণ করছে এবং প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করছে। এর ফলে বাংলাদেশের নদনদীর শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহ মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে এবং নদনদী খাতগঠনের অনভিপ্রেত বিকৃতি ঘটছে। ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা দ্বারা এসব সমস্যার নিরসন হয়নি। এই আলোচনাকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য বাংলাদেশকে ভারতের সাথে "নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট" ফর্মূলার ভিত্তিতে আলোচনায় নিয়োজিত হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক নদনদীর ব্যবহার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর করতে হবে। ভাটির দেশের যেসব স্বার্থ এই সনদ রক্ষা করে তা ভারতের নিকট তুলে ধরতে হবে। ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে ভারতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের জনগণকে তার প্রতি সংহতি ঘোষণা করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ডেকে আনাতে কোনো ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং হবে। যেসব বিভিন্ন ধারায় বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিমজ্জন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদনদীসমূহের অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনাবলীর সংখ্যা ও প্রকোপ বৃদ্ধি এবং রোগ-বালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি। নদনদীসমূহ একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন অভিঘাতের শিকার, অন্যদিকে এসব অভিঘাতের বাহক হিসেবে কাজ করে। নিবিড় পর্যালোচনা দেখায় যে, নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক ও বেষ্টনী পন্থা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাতসমূহকে আরও প্রকট করে। পক্ষান্তরে প্রকৃতিসম্মত ও উন্মুক্ত পন্থা এসব অভিঘাত প্রশমনে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং বেষ্টনী পন্থা থেকে উন্মুক্ত পন্থায় উত্তরণ নদনদী রক্ষায় বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে পারে।

নদনদী রক্ষার পাশাপাশি দেশের পরিবেশ রক্ষায় আরও যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে তা হলো বন ও পাহাড়ের অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস প্রতিরোধ, বায়ু দূষণ রোধ, শিল্প দূষণ রোধ এবং গৃহস্থালি, চিকিৎসা, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিকসহ বিপজ্জনক বর্জ্যের বিস্তৃতি বন্ধ করা।

সবশেষে বলা দরকার যে, জনসংখ্যাকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতান্ত্রিক সীমার মধ্যে রাখাও উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। স্বাধীনতার পর প্রথম দশকগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে এক ধরনের সন্তুষ্টিচিত্ততা ও অবহেলা লক্ষ করা যায়। অথচ ইতিমধ্যে মোট জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও বাৎসরিক বৃদ্ধির মোট পরিমাণ হ্রাস পায়নি বরং আরও বেড়েছে। ফলে এ বিষয়ে আত্মসন্তুষ্টির সুযোগ নেই। বিরাট জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশের মোট বাস্তুতান্ত্রিক পদভার বহু আগেই এদেশের "জৈব-প্রাকৃতিক সক্ষমতা" (*বায়ো-ক্যাপাসিটি*) ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং আগামী বাংলাদেশের জন্য জনসংখ্যাকে দেশের "জৈব-প্রাকৃতিক সক্ষমতার" মধ্যে নিয়ে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। সেলক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নের পরোক্ষ পন্থার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ পন্থাসমূহের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। গ্রাম পরিষদ

আগামী বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠন। বর্তমানে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদ (*ইউপি*) পর্যন্ত প্রসারিত। এর অধীনে গ্রামগুলোকে ওয়ার্ড হিসেবে গণ্য করা হয় এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হন। গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ তৎপরতার জন্য এটা পর্যাপ্ত নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ঐতিহাসিকভাবে গ্রামই বাংলাদেশের সমাজের মূল একক হিসেবে কাজ করেছে এবং গ্রামের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামের স্বশাসনমূলক কাঠামো বিরাজ করেছে। নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে এই অতীত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন এবং বর্তমানের চাহিদা মেটাতে হবে। বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ইতিহাস, প্রয়োজনীয়তা এবং তার সম্ভাব্য রূপরেখা সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে

আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য: ইসলাম, ১৯৮৪, ১৯৮৭, ২০১১ক, ২০১২, ২০১৭)। সেজন্য এ বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখা হবে। যারা এসব বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তাঁরা উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন।

৫.১ গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সুবিদিত যে, আর্য আগমনের পর এই উপমহাদেশে লৌহযুগের সূচনা ঘটে এবং সময় পরিক্রমায় কৃষিজীবী ও কারুশিল্পীদের সহযোগে বর্ণপ্রথারূপী শ্রমবিভক্তিসম্পন্ন স্বশাসিত এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের উদ্ভব ঘটে। বহুকাল ধরে মূলগতভাবে এ ধরনের গ্রামই বিরাজমান ছিল এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির বিভিন্ন শুনানিতে আমরা তার অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাই। গুপ্তযুগে এ ধরনের গ্রামই বঙ্গীয় বদ্বীপে বিস্তৃতি লাভ করে। তবে ভৌগোলিক স্বকীয়তা এবং অন্যান্য স্থানিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দেয়। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা জানি যে, বগুড়া কক্ষ রেখার উত্তর এবং পশ্চিমে অবস্থিত এলাকাসমূহে পলিস্তরায়নের গভীরতা কম। পক্ষান্তরে এই রেখার পূর্ব এবং দক্ষিণে পলিস্তরায়নের গভীরতা অনেক বেশি। অন্যকথায়, বাংলাদেশের উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলের ভূমিগঠনে নদনদীর প্লাবন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সে কারণে প্রথমোক্ত অঞ্চলে গ্রামসমূহ যতখানি সুগঠিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, শেষোক্ত অঞ্চলে তেমনটা হতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ছড়ানো-ছিটানো রূপ গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে গ্রামসমূহের একটি স্বশাসন কাঠামো বিরাজ করতো এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির শুনানিতে বিধৃত বিরাট সংখ্যক "কর্মকর্তা" সমবায়ে গঠিত গ্রাম সরকার না থাকলেও একজন "গ্রাম প্রধান" এবং ন্যূনতম কয়েকজন সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকতেন যারা গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি তদারকি করতেন। গ্রাম প্রধানের আরও দায়িত্ব ছিল সকল বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানাদির, বিশেষত শাসক শ্রেণির প্রতিভূর সাথে গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি এবং সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করা। যেমন, গ্রামের সদস্যদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য শাসকেরা বহুলাংশে গ্রাম প্রধানের উপর নির্ভর করতো।

সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা দ্বিবিধ। একটি হলো গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা। অন্যটি হলো উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করা। গ্রাম্য পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন বা প্রাথমিক ধাপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য উপরিস্থ ধাপের তুলনায় এই ধাপটি গ্রামবাসীদের এত নিকটস্থ যে, এর পক্ষে এমন অনেক কিছু করা সম্ভব যা উপরিস্থ ধাপসমূহের পক্ষে– দূরত্ব এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে– করা কঠিন। এসব করণীয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো গ্রামবাসীদের যৌথ তৎপরতা সংগঠিত করা। বিভিন্ন মুখেই এসব তৎপরতা ধাবিত হতে পারে।

গ্রামের মূল সম্পদ হলো জন-জমি-জল। কিন্তু এসব সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন। যেমন, নিয়মিতভাবে খাল-বিল-নদী-নালা সংস্কার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব খাল-বিল-নদী-নালার উপর মালিকানা রাষ্ট্রীয় তথা যৌথ। এজন্য গ্রামের কারো পক্ষে একা এসব সংস্কারের আইনগত এখতিয়ার থাকে না। তদুপরি প্রায়শ গ্রামের কারো পক্ষে একা এধরনের সংস্কার সাধনের সামর্থ্যও থাকে না। তা সত্ত্বেও গ্রামের জল-জমি সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের ভূমি এবং আবাসন বিন্যাসেরও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। এসব পরিবর্তনের জন্যও সমষ্টিগত প্রয়াস প্রয়োজন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তাকে আরও প্রবল করছে। উপকূলীয় এলাকায় নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামসমূহের পুরো পাটাতনকে ক্রমাগতভাবে উঁচু করার প্রয়োজন হবে। এমনকি দেশের অভ্যন্তরেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ও নদী প্রবাহ মোকাবেলা করার জন্য গ্রামসমূহের পাটাতনের উচ্চতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি, নদনদীর প্রতি অনুসৃত বাংলাদেশের বর্তমান ভ্রান্ত বেষ্টনী পন্থার কারণে দেশের বহু স্থান ইতিমধ্যে জলাবদ্ধতা দ্বারা আক্রান্ত এবং অন্যান্য স্থানেও তা বিস্তৃত হচ্ছে। এই জলাবদ্ধতা দূর করার জন্যও গ্রামবাসীদের যৌথ পদক্ষেপ প্রয়োজন। গ্রামের অন্যান্য বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো যেমন সড়ক, সেতু, সেচ ব্যবস্থা, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার খেলাধুলার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায়ও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াস কার্যকর হতে পারে। গ্রামের ভেতরেই যথেষ্ট জনসম্পদ আছে যাকে মবিলাইজ করে

গ্রামবাসীরা এসব সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে। বিভিন্ন উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনমূলক তৎপরতার জন্যও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রথম অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, বিভিন্ন ধরনের সমবায়ী তৎপরতা পুঁজি আয়ের বিচ্ছুরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য প্রশমনে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের তৎপরতা সংঘটনের জন্য গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন হবে। গ্রামবাসীদের বিভিন্ন আধুনিক উপযোগ সরবরাহ -- যেমন সৌর কিংবা বায়ু বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি –নিশ্চিত করার জন্যও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানে গ্রাম পর্যায়ে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকাতে গ্রামবাসীদের পক্ষে এসব যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামের নিজস্ব যৌথশক্তি যেন অবশ হয়ে আছে। বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামোতে এখন গ্রামসমূহ অনেকটা এতিমের মতো। তারা উপরের দিকে চেয়ে থাকে কবে সরকারি কর্মকর্তারা ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা দূর করে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। গ্রামের স্বশাসনের ঐতিহাসিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই স্বশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের পথ উন্মুক্ত করা গেলে বর্তমানের সরকার-নির্ভর উন্নয়নের পরিবর্তে একটি স্বাবলম্বী উন্নয়ন ধারার সূচনা হতে পারে। উন্নয়নের ধারা "উপর-থেকে-নিচে"র পরিবর্তে "নিচ-থেকে-উপরে" ধাবিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যা গ্রাম পর্যায়েই নিরসিত কিংবা প্রশমিত হতে পারে। গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে বহু বিবাদ-বিসংবাদ গ্রাম পর্যায়েই নিরসন করা সম্ভব হবে। গ্রামবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটানোর জন্য গ্রামবাসীরা নিজেরাই যৌথ পদক্ষেপ নিতে পারবে। সুতরাং গ্রাম পরিষদের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত হতে পারে। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা গেলে তা স্বেচ্ছামূলক, বাজার-ভিত্তিক ভূমি সংস্কারের জন্যও সহায়ক হতে পারে। সুতরাং স্পষ্ট যে, আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে গ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা।

৫.২ স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিভিন্ন প্রয়াস

৫.২.১ বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিভিন্ন উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত তালিকা

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সারণি ৫.১ এসব উদ্যোগের একটি তালিকা উপস্থিত করে। নিচে এসব উদ্যোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হলো।

সারণি ৫.১: স্বাধীনতার পর গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিভিন্ন উদ্যোগ

সন	উদ্যোগ গ্রহণকারী সরকার	উদ্যোগ
১৯৭৫	বঙ্গবন্ধু	সমবায়ী গ্রাম
১৯৮০	জিয়াউর রহমান	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার
১৯৮৯	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	পল্লী পরিষদ আইন
১৯৯১	খালেদা জিয়া	গ্রাম সভা গঠনের সুপারিশ
১৯৯৭	শেখ হাসিনা	গ্রাম পরিষদ আইন
২০০৩	খালেদা জিয়া	গ্রাম সরকার আইন

সূত্রঃ ইসলাম, নজরুল (২০১৭)।

৫.২.২ সমবায়ী গ্রাম গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ

পাকিস্তান আমলের ২২ পরিবার ভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজিবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের ধারায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্য ঘোষিত হয়। সে লক্ষ্যে শিল্প জাতীয়করণের পাশপাশি বঙ্গবন্ধু ভূমি সংস্কারেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে জমি মালিকানার উপর ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। কিন্তু মূলত স্বীয় দলের অভ্যন্তর থেকে বিরোধিতার কারণে বঙ্গবন্ধু ভূমি সংস্কার সম্পাদনে সফল হন না। কিন্তু কৃষিপ্রধান ও গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক রূপান্তরের জন্য বেশি প্রয়োজন ছিল গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর। সেজন্য বঙ্গবন্ধু এরূপ রূপান্তরের লক্ষ্যে হাল ছাড়েন না; বরং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষণীয়, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে স্থানীয় সরকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদ (৫৯ নং এবং ৬০ নং) এ বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এতে বলা হয় যে, স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ নির্বাচিত হবে এবং সংবিধান মোতাবেক পরিচালিত হবে। সংবিধান স্থানীয় সরকারের জন্য যেসব করণীয় চিহ্নিত করে তার

মধ্যে রয়েছে (স্থানীয় পর্যায়ের) প্রশাসন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, গণসেবা সরবরাহ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন। বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকারের বিকাশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। ১৯৭২ সালের "রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭" দ্বারা তিনি "ইউনিয়ন পরিষদ"-এর নাম পরিবর্তন করে "ইউনিয়ন পঞ্চায়েত" করেন এবং সার্কেল অফিসারদের (উন্নয়ন) তা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন। একই বছরে জারীকৃত "রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২" দ্বারা তিনি ইউনিয়ন পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করেন।[৩৪]

১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালের আইনসমূহ ইউনিয়ন পরিষদ বিষয়ে হলেও বঙ্গবন্ধু গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন যে, গ্রামই হলো বাংলাদেশের সমাজের মৌল একক। তিনি সচেতন ছিলেন যে, "ইউনিয়ন" একটি বৃটিশ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভৌগোলিক একক। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে ইউনিয়ন বলে কিছু ছিল না। সেজন্য এগুলোর কোনো ঐতিহাসিক শেকড় নেই। ইউনিয়ন পরিষদকে ইউনিয়ন "পঞ্চায়েত" বলে নামকরণের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রাক-ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনরুদ্ধার এবং গ্রামীণ জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ও অঙ্গীকারের স্বাক্ষর অবশেষে পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় গ্রামকে বহুমুখী সমবায় হিসেবে রূপান্তরের কর্মসূচি ঘোষণার মধ্যে। এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল অর্থনৈতিক কর্মসূচি। এই কর্মসূচি অনুযায়ী গ্রামসমূহ শুধু সামাজিক একক নয় বরং অর্থনৈতিক একক হিসেবে গড়ে ওঠার কথা। এই কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল: প্রথমত, গ্রামের সকলে এই সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত হবেন; অর্থাৎ এটা গ্রামের অংশবিশেষের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সমবায়ে জমি মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকবে, কিন্তু গ্রামের সকলের জমি একত্রিত করে যৌথভাবে চাষ করা হবে। তৃতীয়ত, উৎপাদিত ফসল তিন ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ বিতরিত হবে শ্রমের ভিত্তিতে; একভাগ বিতরিত হবে জমি মালিকানার ভিত্তিতে। তৃতীয় ভাগ যাবে "গ্রাম তহবিলে," যার দ্বারা গ্রামের যৌথ কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হবে। গ্রামের নিজস্বসূত্রে সংগৃহীত সম্পদ ছাড়া ঊর্ধ্বতন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটের উপযোগী অংশও গ্রাম তহবিলে যোগ হবে।

[৩৪] ১৯৭৩ সালে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সমূহকে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ বলে নামায়িত করেন।

বলাবাহুল্য, সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবটি ছিল খুবই সূচনা পর্যায়ের। এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হলে এ নিয়ে আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন হতো এবং অনেক ইস্যুর নিরসন করতে হতো। বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট ভূমি ব্যবস্থায় যৌথচাষের সম্ভাব্যতা নিয়েও যেমন প্রশ্ন উঠতো তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষারও প্রয়োজন হতো। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, প্রস্তাবিত সমবায়ী গ্রামের ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামবাসীদের কর্তৃক একটি নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন হতো এবং সেটাই গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো হিসেবে কাজ করতো। স্পষ্টতই, প্রচলিত ধরনের স্থানীয় সরকার সংস্থার তুলনায় সমবায়ী গ্রামের পরিচালন-সংস্থার কর্মপরিধি ও দায়িত্ব বহুগুণ বেশি হতো, কারণ এই সংস্থাকে গ্রাম পর্যায়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হতো, যা প্রচলিত ধরনের স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে পালন করতে হয় না। সুতরাং আমরা দেখি যে, সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শুধু গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে প্রসারিত করার প্রস্তাবই করেননি, তিনি বহুগুণ দায়িত্বপূর্ণ এবং অগ্রসর চরিত্রের এক নতুন সংস্থার প্রস্তাব করেন। সুবিদিত যে, সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কয়েক মাস পরই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ফলে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায়ী গ্রামের কর্মসূচি নিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেননি। ফলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা অব্যাহত থাকে।

৫.২.৩ "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" গঠনে জিয়াউর রহমানের উদ্যোগ

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর কিছু ধাপ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন।[৩৫] গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে জিয়ার আমলে বেশ তৎপরতা পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি "স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ" জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকেই স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন ধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন সভাপতি এবং নয় জন সদস্য থাকার বিধান হয়। তার সাথে দুজন মহিলা এবং দুজন কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯৮০ সালে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালা জারি করেন। এই বিধিমালা অনুযায়ী একজন গ্রাম প্রধান হবেন। বাকি ১২ জন সদস্য হবেন, তার মধ্যে কমপক্ষে দু'জন মহিলা থাকবেন। গ্রাম সরকারের করণীয় হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লিখিত হয়: (ক) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) গণ-সাক্ষরতা অর্জন, (গ) পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা

[৩৫] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (2016, Chapter 2)।

নিয়ন্ত্রণ, এবং (ঘ) আইনশৃংখলা রক্ষা, সালিশ করা এবং স্থানীয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তি। এ সংক্রান্ত গেজেটের টীকায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, গ্রাম সমবায় এবং সমবায় ব্যাংক উৎসাহিত করাও গ্রাম সরকারের কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। গ্রাম সরকারকে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ চার সদস্য বিশিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠনের এখতিয়ার দেওয়া হয়। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার আইন অনুযায়ী "স্বনির্ভর গ্রাম তহবিল" গড়ার বিধান হয়। বলা হয় যে, এই তহবিলের আয়ের সূত্র হবে: (ক) ব্যক্তির অনুদান, (খ) গ্রাম সমবায় সমিতি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্তৃপক্ষ সূত্রে আয় অথবা অনুদান, এবং (গ) অন্য কোনো বৈধসূত্রের আয়। ১৯৮০ সালে গ্রাম সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং নির্বাচিত সদস্যদের একটি মহাসমাবেশ রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে গ্রাম সরকার সংক্রান্ত তাঁর প্রচেষ্টা আর অগ্রসর হতে পারেনি।

৫.২.৪ এরশাদ সরকার কর্তৃক "পল্লী পরিষদ" গঠনের উদ্যোগ

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতাসীন হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই জেনারেল এরশাদ গ্রাম সরকার বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি বরং থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি থানাসমূহকে "উপজেলা" নামকরণ করেন (এবং পূর্বতন মহকুমাসমূহকে জেলায় পরিণত করেন)। আগে যেখানে থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো মূলত রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত সিও (সার্কেল অফিসার) রাজস্ব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ওসি (অফিসার-ইন-চার্জ) এবং উন্নয়নের সকল দিকের জন্য একজন সিও ডেভেলপমেন্ট (উন্নয়ন)-এ সীমাবদ্ধ ছিল, সে স্থলে তিনি জাতীয় সরকারের প্রায় সকল মূল বিভাগের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সকল বিভাগের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রশাসনিক এই কাঠামোর পাশাপাশি নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় এবং এই পরিষদের চেয়ারম্যান (উপজেলা চেয়ারম্যান) আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। প্রশাসনিক ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা পর্যায়ের এই সরকার কাঠামোকে শক্ত ভিত্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা চেয়ারম্যানের অধীন করা হয়; কিন্তু প্রশাসনিক ক্যাডারের সদস্যরা এই ব্যবস্থাকে সুনজরে দেখেনি। উপজেলা চেয়ারম্যান আর ইউএনওর মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কোনো চূড়ান্ত সমাধান আজও হয়েছে কিনা বলা কঠিন। উপজেলা পর্যায়ে সরকার কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি এরশাদ নিজেকে "পল্লীবন্ধু" হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ১৯৮৯ সালে "পল্লী পরিষদ আইন"

প্রণয়ন করেন। তবে শেষোক্ত আইনটি সেভাবে কার্যকর হওয়ার আগেই ১৯৯০ সালে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যান।

৫.২.৫ খালেদা জিয়া সরকারের (১৯৯১-১৯৯৬) "গ্রাম সভা" গঠনের উদ্যোগ

সামরিক শাসন পর্বের অবসানের পর ১৯৯১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার গঠিত হয়। এ সময় "স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন" (লোকাল গভর্নমেন্ট স্ট্রাকচার রিভিউ কমিশন) গঠিত হয়। এই কমিশন "গ্রাম সভা" গঠনের সুপারিশ করে। এই প্রস্তাবমতে "গ্রাম সভা"র দশজন সদস্য হবেন – তারমধ্যে দু'জন মহিলা, দু'জন কৃষক এবং দু'জন কৃষি-শ্রমিক থাকবেন। কিন্তু এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ইউনিয়ন পরিষদই সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে থেকে যায়। এই সরকার উপজেলা পরিষদের ব্যাপারে নিঃস্পৃহ থাকে।

৫.২.৬ শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) "গ্রাম পরিষদ" গঠনের উদ্যোগ

১৯৯৬ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এই সরকার স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন ১৯৯৭" প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড ভিত্তিতে "গ্রাম পরিষদ" গঠিত হওয়ার কথা। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন বলে সাব্যস্ত হয়। গ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দু'জন মহিলা থাকবেন। সরকারি কর্মকর্তাদেরও গ্রাম পরিষদের সদস্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে এই আইন প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং এই সরকার ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করে।

৫.২.৭ খালেদা জিয়া সরকারের (২০০১-২০০৬) "গ্রাম সরকার" গঠনের উদ্যোগ

২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠিত হয়। এই সরকার পূর্বতন সরকার প্রণীত "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭" বাতিল করে এবং তার স্থলে "গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩" প্রণয়ন করে। পূর্বেকার মতো শেষোক্ত আইনেও ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়। তবে এবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পরিবর্তে নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারকে নিজ নিজ গ্রাম সরকারের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে যদিও আইনটির ভূমিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়, কিন্তু গ্রাম সরকার গঠনে নির্বাচনের পরিবর্তে "মনোনয়নের" বিধান রাখা হয়েছিল। সে কারণে বিভিন্ন

মানবাধিকার এবং আইনগত অধিকার বিষয়ক সংস্থা "গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩"-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশের উচ্চ আদালতে মামলা করে, কেননা সংবিধানে স্থানীয় সরকারসমূহ "নির্বাচিত" হওয়ার বিধান আছে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্ট ২০০৩ সালের গ্রাম সরকার আইনকে সংবিধান পরিপন্থী বলে রায় দেয়।

৫.২.৮ এক-এগারো (১/১১) সরকার (২০০৭-২০০৮)

২০০৭ সালে বাংলাদেশে পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনের আওতায় গঠিত এই সরকারের মূল করণীয় ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রথমাবস্থায় এই সরকার দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সূত্রে এই সরকার স্থানীয় সরকার কাঠামো বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং উপজেলা পরিষদসমূহ বাতিল করে। তবে দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিই এই সরকারের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। সে অনুযায়ী ২০০৯ সালের শুরুতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সরকারের অবসান ঘটে। সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত সরকারের আমলে গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

৫.২.৯ শেখ হাসিনা সরকার (২০০৯-বর্তমান)

২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আছে। এ সময়ে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত অনেকগুলো আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে যেমন, "স্থানীয় সরকার (নগর কর্পোরেশন) আইন ২০০৯," "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯" এবং "ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯।" ১৯৯৮ সালের "উপজেলা পরিষদ আইন"ও পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার যে উদ্যোগ ১৯৯৭ সালে "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন"-এর মাধ্যমে শেখ হাসিনার প্রথম সরকার গ্রহণ করেছিল, তার পুনরুজ্জীবন এবং বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ এখনও নেওয়া হয়নি।

৫.৩ আগামী বাংলাদেশের গ্রাম পরিষদ

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি সরকারই এ ব্যাপারে কোনো-না-কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু শেষাবধি কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত অথবা কার্যকর হয় না। ফলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এখনও অনুপস্থিত। তবে বর্তমানে অনুপস্থিত হলেও আগামীতে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের বিষয়ে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। যদিও সংবিধানে এই সরকারের কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা হয়নি; কিন্তু এই সরকারের বিষয়ে কতগুলো স্পষ্ট নির্দেশনা তাতে দেওয়া আছে। যেমন, এগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে হবে এবং এগুলোর এখতিয়ার বেশ সম্প্রসারিত চরিত্রের হবে। সংবিধান সংসদকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের এখতিয়ার দিয়েছে। সংবিধানের এই সমর্থনকে ভিত্তি করে গ্রাম পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর প্রায় সব সরকারই গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার কোনো-না-কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশে একটি সাধারণ ঐকমত্য আছে। এটাও একটি ইতিবাচক দিক।

৫.৩.১ গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক পূর্ববর্তী আইনসমূহের তুলনা

গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ ঐকমত্য থাকলেও সমস্যা দেখা দেয় যখন সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্টতে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। দেখা যায় যে, মোটা দাগের প্রস্তাবে নয়, প্রস্তাবের বিস্তারিতকরণেই সমস্যা লুক্কায়িত থাকে।[৩৬] বলা নিষ্প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায়ী গ্রামের বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়নের সুযোগ পাননি। তিনি মোটা দাগে কতগুলো ধারণা দিয়েছিলেন যা থেকে গ্রাম বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সে সময়ের চিন্তাধারা সম্পর্কে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। পরবর্তী উদ্যোগগুলোর মধ্যে তিনটির ক্ষেত্রে বিস্তারিত আইন, আদেশ বা নীতিমালা প্রস্তাবিত বা প্রণীত হয়েছিল। এগুলো হলো জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিষয়ক বিধিমালা (রুলস), শেখ হাসিনা সরকার প্রণীত ১৯৯৭ সালের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" এবং খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০০৩ সালের "গ্রাম সরকার আইন"। গ্রাম সম্পর্কে এই চারটি প্রস্তাবের একটা তুলনা সারণি ৫.২-এ উপস্থাপন করা হলো।

[৩৬] ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয়, *ডেভিল লাইস ইন ডিটেইলস!*

সারণি ৫.২: গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাবের তুলনা

বিষয়	সমবায়ী গ্রাম ১৯৭৫	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, ১৯৮০	গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭	গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩
প্রতিষ্ঠানের নাম	সমবায়ী গ্রাম	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার	গ্রাম পরিষদ	গ্রাম সরকার (স্থানীয় সরকারের পৃথক ধাপ নয়, বরং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন)
গ্রামের সীমানা	আত্ম-পরিচয় ভিত্তিক (অনুমান)	আত্ম-পরিচয় ভিত্তিক (সার্কেল অফিসারের অনুমোদনক্রমে)	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক
ভিত্তি প্রতিষ্ঠান	গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে গঠিত সভা (অনুমান)	গ্রাম সভা (স্থানীয় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে গঠিত)		সাধারণ সভা (ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে)
গঠন	বিধৃত হয়নি	একজন "গ্রাম প্রধান" এবং এগারো জন সদস্য, যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই জন নারী, এবং গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশা ও গ্রুপের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিসম্পন্ন		একজন গ্রাম সরকার প্রধান, একজন উপদেষ্টা, এবং তেরজন সদস্য, যাদের মধ্যে থাকবেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ তিনজন মহিলা, একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুরুষ সদস্য; দুইজন ভূমিহীন কৃষক, এবং একজন করে কৃষক, সমবায় সমিতির সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক বা পেশাজীবী

বিষয়	সমবায়ী গ্রাম ১৯৭৫	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, ১৯৮০	গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭	গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩
গঠনের পদ্ধতি	গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের সিদ্ধান্তক্রমে (অনুমান)	গ্রাম সভা দ্বারা, সর্বসম্মতিক্রমে		ওয়ার্ডের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গ্রাম প্রধান হবেন; ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য তাঁর আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাধীন সকল গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হবেন; বাকিরা সাধারণ সভায় "সমঝোতার ভিত্তিতে, পরিচালনা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে, মনোনীত"
স্থায়ীত্বকাল	বিধৃত হয়নি	প্রথমে তিন বছর, পরে পাঁচ বছর		পাঁচ বছর
কার্যাবলী	সমবায়ী গ্রামের যৌথচাষ পরিচালনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল কাজ সম্পাদন	(ক) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি; (খ) গণসাক্ষরতা অর্জন; (গ) পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি; (ঙ) গ্রাম সমবায় ও সমবায় ব্যাংক উৎসাহকরণ		(ক) অবকাঠামো উন্নয়ন; (খ) অপরাধ দমন; (গ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ; (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা; (ঙ) পুষ্টি ও টীকা; (চ) পরিবার পরিকল্পনা; (ছ) পানীয় জল ও পয়নিষ্কাশন; (জ) জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশন; (ঝ) কৃষি উন্নয়ন; (ঞ) আইন শৃঙ্খলা; (ট) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি; (ঠ) সমবায় সমিতি; (ড) বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ; (ঢ) মহিলা ও শিশু কল্যাণ (ণ) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বিষয়	সমবায়ী গ্রাম ১৯৭৫	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, ১৯৮০	গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭	গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩
গ্রাম কর্তৃপক্ষের সভা	বিধৃত হয় নি	পাক্ষিক		অন্ততপক্ষে দুই মাস অন্তর
গ্রামের সভা	বিধৃত হয় নি	প্রতি তিন মাস অন্তর		অন্ততপক্ষে ছয় মাস অন্তর
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি	সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অনুমান)	সংখ্যাগরিষ্ঠতা		সংখ্যাগরিষ্ঠতা
আয়ের উৎস	(ক) যৌথচাষ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ (খ) জাতীয় সরকার এবং উপরিস্থ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থ ও সম্পদ	(ক) ব্যক্তিগত অনুদান/চাঁদা, গ্রাম সমবায় সমিতি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; (খ) অন্য কোনো আইনসংগত উৎস		(ক) ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ, এবং (খ) অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ
তদারকি কর্তৃপক্ষ	বিধৃত হয়নি	সরকারি প্রশাসন		ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ

সূত্র: ইসলাম, নজরুল (২০১৭)।

সারণি ৫.২-এর তুলনা থেকে দেখা যায়, প্রস্তাবগুলোর মধ্যে মিল-অমিল দুই-ই আছে। আগামী বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে এসব প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক সহায়ক হতে পারে। যেসব বিষয়ে মতৈক্য অথবা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে তার কয়েকটি নিচে উল্লিখিত হলো।

৫.৩.২ গ্রামের নাম এবং সীমানা

গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম নিয়ে ভিন্নতা আছে। এ যাবৎ বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেসব নামে প্রস্তাবিত এবং আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে "গ্রাম পঞ্চায়েত," "গ্রাম সরকার" এবং "গ্রাম পরিষদ।" বাংলাদেশের গ্রামের ভবিষ্যৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম হিসেবে তিনটির যেকোনোটিই গ্রহণ করা যেতে পারে, কেননা নামের চেয়ে ভেতরের সারবত্তাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমরা "গ্রাম পরিষদ" নামটি ব্যবহার করেছি মূলত স্থানীয় সরকারের অন্যান্য ধাপের নামের সাথে সাযুজ্য রাখার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে "জেলা পরিষদ," "উপজেলা পরিষদ" এবং "ইউনিয়ন পরিষদ" বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর মোটামুটিভাবে স্বীকৃত উপাদানে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে "গ্রাম পরিষদ" বলা শ্রেয় হতে পারে।

গ্রামের সীমানার বিষয়ে উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসে। প্রথমত, গ্রামকে তার স্ব-পরিচয়ে আবির্ভূত হতে দিতে হবে, ওয়ার্ড হিসেবে নয়। দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ভূপ্রকৃতির কারণেই বদ্বীপ বাংলাদেশের গ্রামসমূহ উত্তর ভারতের মতো ভৌগোলিকভাবে সংবদ্ধ (*কনসোলিডেটেড*) নয়।[৩৭] বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে শহরের সাথে এবং পরস্পরের সাথে সংযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্রামের সীমার তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কে কোন গ্রামের সে সম্পর্কে গ্রামবাসীরা নিজেরা সচেতন। ফলে গ্রামের সীমা-পরিসীমা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে তা স্ব-পরিচয়ের ভিত্তিতেই নিরসিত হতে পারে। লক্ষণীয়, ভিন্নতা সত্ত্বেও গ্রামের আকারের মধ্যে ন্যূনতম সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যদি প্রথাগত গ্রাম ভৌগোলিকভাবে কিংবা জনসংখ্যাগতভাবে বিসদৃশ হয়, তবে কিছু সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হতে পারে। সে বিষয়ে এলাকাবাসীদের মতামত ও সম্মতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

৫.৩.৩ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পর্ক

গ্রাম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকারের মৌলিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইউনিয়ন পরিষদের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে কিনা। লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চের ভাষণে সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে গিয়ে "ইউনিয়ন পরিষদের টাউটদের বিদায়" করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে টাউটদের বিদায় করেও ইউনিয়ন পরিষদ রাখা যেতে পারে এবং গ্রাম পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। বস্তুত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এমন বহু ভৌত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক করণীয় আছে যা একক গ্রামের পরিধিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং পাশাপাশি

[৩৭] বস্তুত পিটার বার্তোচি বাংলাদেশের গ্রামকে elusive বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (Bertocci, 1970)।

অবস্থিত একাধিক গ্রামের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। টাউট-বিতাড়িত ইউনিয়ন পরিষদ এরূপ আন্ত-গ্রাম সহযোগিতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর "সমবায়ী গ্রাম" এবং জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম" প্রস্তাবে গ্রামকে একটি "অর্থনৈতিক একক" হিসেবে দেখার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। বিপরীতে, স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গ্রামের ভূমিকাটি তাঁদের প্রস্তাবে ততটা গুরুত্ব পায়নি, অথবা বলা যেতে পারে স্পষ্ট করা হয়নি। সে কারণে তাঁদের প্রস্তাবে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম কর্তৃপক্ষের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি ততটা স্থান পায়নি। জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালায় "ইউনিয়ন পরিষদের" বিশেষ উল্লেখ নেই।

পক্ষান্তরে, ১৯৯৭ সালের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" এবং ২০০৩ সালের "গ্রাম সরকার আইনে" অর্থনৈতিক একক হিসেবে গ্রামের ভূমিকা ততটা প্রাধান্য পায়নি। বরং স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গ্রাম কর্তৃপক্ষের স্থান ও ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেজন্যেই দেখা যায়, এই দুই আইনে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রাম কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক বিধৃত করার ওপরই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত গ্রামগুলোকে তাদের স্ব-পরিচয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে ইউনিয়নের ওয়ার্ড হিসেবে আত্মস্থ করা হয়েছিল এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারকেই গ্রাম কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, গ্রামের এরূপ গুরুত্বহানি সঠিক নয়। বরং গ্রাম পরিষদকেই স্থানীয় সরকার কাঠামোর মৌল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন গ্রাম পরিষদের কাজের সমন্বয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫.৩.৪ গ্রাম পরিষদের গঠন ও পরিচালনা

গ্রাম পরিষদের গঠন এবং কার্য সম্পাদনের ধারা অবশ্যই গণতান্ত্রিক হতে হবে। নিঃসন্দেহে, এই গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ও বাধার উদ্রেক ঘটবে। গ্রাম পরিষদসমূহ স্থানীয় প্রভাবশালীদের তথা সম্পদশালীদের করায়ত্ত (*এলিট-ক্যাপচার*) হতে পারে। তবে এই যুক্তিতে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বাদ দিতে হয় তাহলে বাংলাদেশের সংসদের ব্যাপারেও এই প্রশ্ন উঠতে পারে, কারণ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি কীভাবে এই সংসদ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা কার্যত অধিকৃত

হয়ে গেছে। কাজেই সম্পদশালীদের দ্বারা করায়ত্ত হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও গ্রাম পরিষদ গঠন করা এবং গ্রামবাসীদের নিজেদের গ্রামের পরিধিতে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ দেওয়া শ্রেয় হবে। লক্ষণীয়, সম্পদশালীদের মূল শক্তি তাদের বস্তুগত সম্পদের মধ্যে, কিন্তু সংখ্যায় তারা স্বল্প। পক্ষান্তরে সাধারণ জনগণের বস্তুগত সম্পদ কম কিন্তু সংখ্যায় তারা বিপুল। তবে জনগণের এই সংখ্যাশক্তি মবিলাইজ করা একটি চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, পরিধি যত বড় হয় এই চ্যালেঞ্জ তত কঠিন হয়। গ্রামের পরিধি ক্ষুদ্র হওয়ায় সেখানে শ্রমজীবী স্বল্প আয়ের মানুষদের নিজেদের সংখ্যাশক্তি প্রদর্শনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা। এ সুযোগ ব্যবহার করতে যেয়ে অনেক ভুল ভ্রান্তি হবে; কিন্তু তার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র চর্চা ধীরে ধীরে আরও পরিণত রূপ পাবে বলে আশা করা যায়। গ্রাম পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চায় সাফল্য অন্যান্য বৃহত্তর পর্যায়ে গণতন্ত্র বিস্তারেও সহায়ক হতে পারে। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে এবং এই বিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হওয়ার কারণে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ২০০৩ সালের গ্রাম সরকার আইন অবৈধ ঘোষণা করেছিল। সুতরাং নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম পরিষদ গঠনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাও রয়েছে।

৫.৩.৫ গ্রাম পরিষদের এখতিয়ার ও করণীয়

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছি, গ্রাম পরিষদ দুই ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি হলো প্রশাসনিক ভূমিকা আর অন্যটি হলো অর্থনৈতিক একক হিসেবে ভূমিকা। বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম বিষয়ক প্রস্তাবনায় গ্রাম পরিষদকে গ্রামের সকল জমির যৌথ চাষ ও উৎপাদনের বিতরণের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, নিম্নমানের উৎপাদিকা শক্তি তথা শিল্প-পূর্ব প্রযুক্তিসম্পন্ন কৃষিতে যৌথচাষ সহজ নয়। এমনকি শিল্পায়িত প্রযুক্তি লভ্য হলেও কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে দক্ষ যৌথচাষের পথে বহু জটিল প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সে কারণে যেসব সমাজতান্ত্রিক দেশে একসময় যৌথচাষ প্রবর্তিত হয়েছিল, সেগুলোর অধিকাংশেই যৌথচাষ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং পারিবারিক চাষ পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে যৌথচাষের প্রস্তাবটি এখন আর আকর্ষণীয় নয়।[৩৮] তবে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করা

[৩৮] এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য ইসলাম (২০১৭) দ্রষ্টব্য।

হলেও গ্রাম পর্যায়ে বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সুযোগ ও প্রয়োজন গ্রাম পরিষদের থাকবে। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে গ্রাম পরিষদ সংক্রান্ত যেসব আইনের কথা উপরে উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিতেই প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল বিষয় হলো, বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে যা গ্রামের কোনো সদস্যের একার অথবা কয়েকজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়, বরং গ্রামবাসী সকলের সম্মতি ও অংশগ্রহণ তথা যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সম্পাদনে গ্রাম পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রাম পরিষদ কী কী কাজ করতে পারে সে বিষয়ে উপরে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, ২০১১ক, ২০১২, ২০১৭)।

৫.৩.৬ গ্রাম তহবিল

বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব করেছিলেন যে, সমবায়ী গ্রামের জমি যৌথতার ভিত্তিতে জমি চাষ হবে এবং উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ "গ্রাম তহবিলে" জমা হবে।[৩৯] বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন যে, গ্রামের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ গ্রাম তহবিলে যোগ হবে। নিঃসন্দেহে গ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তার একটি তহবিল থাকতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্মরণে তার নাম "বঙ্গবন্ধু গ্রাম তহবিল" হওয়াই সঠিক হবে। এই তহবিল বহুলাংশে গ্রামের অভ্যন্তর থেকেই সৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেহেতু গ্রামের জমির যৌথভাবে চাষ হবে না সেহেতু ফসলের এক-তৃতীয়াংশ এই তহবিলে জমা হওয়ার সুযোগ থাকছে না। তবে গ্রামের অভ্যন্তরের অন্যান্য বহুসূত্র থেকে এই তহবিলের জন্য অর্থ সংগৃহীত হওয়ার সুযোগ হবে। এসব সুযোগ কীভাবে এবং কতখানি ব্যবহার করতে পারবে তা বহুলাংশে নির্ভর করবে এ বিষয়ক যে আইনের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত গ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তার উপর। সেজন্য গ্রাম পরিষদ বিষয়ক আইনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নজর দিতে হবে এবং সৃষ্টিশীল হতে হবে। অভ্যন্তরীণ সূত্রে তহবিল সংগ্রহ আয়াসসাধ্য হলেও সাধারণভাবে পরনির্ভরতার দর্শনের পরিবর্তে স্বনির্ভরতার দর্শন গ্রহণ করা শ্রেয় হবে। গ্রাম তহবিলের জন্য যদি উপর থেকে সরকার প্রদত্ত অর্থের উপর বেশি নির্ভর করা হয়

[৩৯] বাকি এক-তৃতীয়াংশ জমি মালিকানার ভিত্তিতে বিতরিত হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্রমের ভিত্তিতে বিতরিত হবে।

তাহলে গ্রাম পরিষদও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত নিঃসরণ মডেলের শিকার হতে পারে। সেক্ষেত্রে গ্রাম পরিষদের সদস্যদের মূল আগ্রহ সরকার প্রদত্ত অর্থের অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে হস্তগত করার দিকে ধাবিত হতে পারে এবং তা হলে গ্রাম পরিষদ গঠনের মূল স্পৃহাটিই হারিয়ে যেতে পারে।

৫.৩.৭ প্রতিটি গ্রামের স্বকীয়তা

সবশেষে লক্ষণীয়, প্রতিটি গ্রাম স্বকীয়। এই স্বকীয়তা শুধুমাত্র ভৌত সম্পদের ক্ষেত্রে নয়, এই স্বকীয়তা মানব সম্পদের ক্ষেত্রে এবং গ্রামবাসীদের সচেতনতা ও সাংগঠনিক সক্ষমতার ক্ষেত্রেও। সুতরাং গ্রামের যেসব সম্ভাব্য করণীয় উপরে উল্লিখিত হলো তার কোনটা কোন গ্রাম কতখানি সম্পাদনের জন্য গ্রহণ করতে পারবে তা ভিন্ন হবে। তদুপরি সময়ে একই গ্রামের সম্ভাবনা ও সক্ষমতা পরিবর্তিত হবে। সেজন্য গ্রাম পরিষদ আইনকে যথেষ্ট পরিসরসম্পন্ন হতে হবে যাতে বিভিন্ন ধরনের গ্রামের বিভিন্ন সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য তা উপযোগী হয়। একইসাথে তাতে প্রয়োজনীয় পরিসীমা নির্দিষ্ট হতে হবে যাতে কোনো বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ না থাকে।

৫.৪ বাংলাদেশের গ্রাম পরিষদের জন্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টিতে অতীত ঐতিহ্য থেকে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি অধুনাকালের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকেও উপকৃত হওয়া সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চালু আছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় আছে। তবে এদের মধ্যে কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তার মধ্যে রয়েছে ভারত ও চীন। ভারতের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক কারণ বাংলাদেশ ও ভারত দীর্ঘকাল একই ইতিহাসের ভাগীদার ছিল। বৃটিশ আমলে যে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার উত্তরাধিকার বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই বহন করছে। সে কারণে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে ভারতের অভিজ্ঞতাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যদিকে চীনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ চীনে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে একই সাথে উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হতো এবং অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও সে ভূমিকার কিছু রেশ এখনও বিরাজমান।

৫.৪.১ ভারতের অভিজ্ঞতা

ভারতের অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধী "গ্রাম স্বরাজ"-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের ৪০তম ধারায় উল্লিখিত হয় যে, "রাজ্যসমূহ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে এবং তাদেরকে স্বশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করবে।" "গ্রাম সভা"-কে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রাণ বলে গণ্য করা হয়। ১৯৫৯ সালে নেহেরু রাজস্থান রাজ্যে তিন ধাপ সম্পন্ন (গ্রাম--অঞ্চল/ব্লক -- জেলা) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। তিন ধাপ বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে "পঞ্চায়েত রাজ" বলে অভিহিত করা হয়।

এই উদ্যোগ সত্তেও সে পর্যায়ে পঞ্চায়েতসমূহ তেমন ক্ষমতা বা অর্থ কোনোটাই পায়নি। ফলে পরবর্তীতে এই ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটে। ১৯৭৮ সালের অশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েত রাজকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে। রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখান এবং একে তাঁর "জনগণের নিকট ক্ষমতা" প্রদানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেন। ১৯৮৯ সালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সরকারের পতন ঘটার কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে নরসীমা রাও সরকারের আমলে ১৯৯৩ সালে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী (১৯৯২) গৃহীত হয়। এই সংশোধনী মোতাবেক সংবিধানে "পঞ্চায়েত" শিরোনামে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। সাংবিধানিক এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও পঞ্চায়েত রাজ্য সরকারের বিষয় থেকে যায়। ফলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের উপর এ বিষয়ক অগ্রগতি নির্ভর করে।

২০০৪ সালে পঞ্চায়েত রাজ বিষয়ক একটি পৃথক কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় গঠিত হয়, এবং পঞ্চায়েত এজেন্ডা বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই এজেন্ডার তিনটি মূল দিক হলো: ক্ষমতায়ন, সক্ষমায়ন এবং জবাবদিহি। আর এর রয়েছে তিন এফ -- তথা ফান্ড (তহবিল), ফাংশন (কার্যাবলি) এবং ফাংশনারিজ (কর্মী) -- এবং নিচ থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ। বিগত বছরগুলোর প্রচেষ্টার ফলে ভারতে এখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বেশ সুসংহত হয়েছে। পঞ্চায়েতের মোট সংখ্যা ২.৪ লাখ। মোট প্রতিনিধি সংখ্যা ২৮ লাখ, যার ৩০ শতাংশের বেশি মহিলা, ১৯ শতাংশ শিডিউল কাস্ট, ১২ শতাংশ শিডিউল ট্রাইব ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ কাস্ট (বেশিরভাগ রাজ্যে)। ২০০৯ সালে পঞ্চায়েত রাজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালিত হয়। ইতিমধ্যে ই-পঞ্চায়েত প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। প্রায় ৫০,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব

এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। ২০১১ সালের জুনের মধ্যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই তা প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল। *ওমবাডসম্যান*, সামাজিক হিসাব-পরীক্ষা, আদর্শ হিসাব ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রবর্তন পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে ইন্টারনেটে প্রচার যেমন ভালো কাজকে উৎসাহিত করছে তেমনি মন্দ কাজকে নিরুৎসাহিত করছে।

ভারতের ত্রয়োদশ অর্থ (*ফিন্যান্স*) কমিশন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনেছে। এর আগ পর্যন্ত পঞ্চায়েতগুলো কেবল থোক-বরাদ্দ পেতো। এ কমিশন পঞ্চায়েতসমূহকে আদায়কৃত করের অংশীদারী করে দিয়েছে। এছাড়া ভালো কাজের জন্য "সম্পাদনা" (*পারফরমেন্স*) বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছে। তদুপরি কিছু রাজ্য পঞ্চায়েতসমূহকে পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের ফান্ড, ফাংশনস এবং ফাংশনারীর অংশীদারী করে দিয়েছে। এগুলো হলো কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু। "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ নিয়োজন নিশ্চিত আইন" এবং "পশ্চাৎপদ এলাকার অনুদান তহবিল" বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সহায়ক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। লক্ষণীয়, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজ্যসমূহে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও অধিকতর শক্তিশালী।

উপরে উল্লিখিত হয়েছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে রাজ্য সরকারের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে রাজ্য ভেদে এ বিষয়ে অগ্রগতির তারতম্য দেখা দেয়। পঞ্চায়েতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এর সম্ভাবনা বাস্তবায়নের প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ আগে থেকেই এগিয়ে ছিল। ১৯৭৩ সালের "পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন" পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। পঞ্চায়েতের তিন ধাপের প্রতিটিতে নিয়মিত সময়ে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়। কর এবং কর-বহির্ভূত আয়ের উৎস এবং পঞ্চায়েতের কর্মপরিধি পরিষ্কার করা হয়। এই আইন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ১৯৭৭ সালে বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর অপারেশন বর্গা ও খাস জমি বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, গ্রাম ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠিত হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন শুভ উদ্যোগের সূচনা হতে পারে। সে দেশের স্বনামখ্যাত সমাজকর্মী আন্না হাজারে দেখিয়েছেন, উপযুক্ত নেতৃত্বে গ্রাম ভিত্তিক

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। আন্না হাজারে মহারাষ্ট্র রাজ্যের "রালেগান সিদ্ধি" নামক তাঁর গ্রামে ফিরে যেয়ে "অর্থদান" ও "শ্রমদান" প্রথার সূচনা করেছেন; গ্রামের তরুণদের নিয়োজিত করার জন্য "তরুন-মন্ডল" গঠন করেছেন। এসব প্রথা ও সংগঠন ব্যবহার করে গ্রামে একের পর এক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। গ্রামে শস্য ব্যাংক স্থাপন করেছেন; গ্রামের পানিসম্পদের উন্নয়ন ও সাশ্রয়ের মাধ্যমে পানি সংকট দূর করেছেন; দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন; সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন; প্রাক-বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন; অস্পৃশ্যতা দূর করেছেন; বিবাহের ব্যয়ভার কমানোর উদ্দেশ্যে অনেক দম্পতির একসাথে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন; সর্বোপরি মহারাষ্ট্র রাজ্য কর্তৃক "গ্রাম সভা" আইন পাশ করিয়েছেন। শেষোক্ত আইন অনুযায়ী এখন সরকার কর্তৃক গ্রামে বাস্তবায়িত যেকোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সকল ব্যয়ের হিসাব গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়সীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত গ্রাম সভায় অনুমোদিত হতে হয়। (অর্থাৎ শুধুমাত্র নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের অনুমোদনই যথেষ্ট নয়।) এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে, গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিপুল সম্ভাবনার অধিকারী।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অতীত ঐতিহ্যকে ভারত বেশ উদ্যমের সাথে ব্যবহার করছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শুধু যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে তাই নয়, পঞ্চায়েতসমূহকে "কর"-সূত্রের আয়েরও অধিকারী করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তিন ধাপের হলেও গ্রাম পঞ্চায়েতই মূল। আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যপ্রণালিতে গ্রাম সভা মূল ভূমিকা পালন করে। গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প ব্যয়ের নিরীক্ষণে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় ব্যয় এবং কার্যাবলির সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসবে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিজ্ঞতা দ্রুত বিস্তৃত হতে পারছে। সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রাজ্য, অঞ্চল এমনকি ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাখছে। ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তা সত্ত্বেও আন্না হাজারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সে ভূমিকা গ্রহণ এবং সাফল্যের সাথে পালনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

৫.৪.২ চীনের অভিজ্ঞতা

ভারতের সাথে চীনে গ্রাম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল পার্থক্য হলো চীনে এসব কাঠামোর উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালনের বাধ্যবাধকতা ছিল। সুবিদিত, চীনে বিপ্লবের পর পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার সাধিত হয় এবং ক্ষুদে কৃষক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম হয়। সে অবস্থায় গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হয় না। কিন্তু ১৯৫৭ সালে মাও জেদং "বৃহৎ উল্লম্ফন" কর্মসূচি গ্রহণ করেন। একাধিক গ্রামের সমবায়ে যৌথচাষ ভিত্তিক কমিউন গড়ে তোলা হয় এবং গ্রামগুলো ব্রিগেড হিসেবে এসব কমিউনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলাবাহুল্য, কমিউনের অধীনে গ্রাম তথা ব্রিগেডকে প্রত্যক্ষভাবে সকল উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু যৌথচাষ ভিত্তিক কমিউন ব্যবস্থা শেষাবধি সফল হয় না, এবং এ কারণে চীন ১৯৭৮ সাল থেকে পরিবার-ভিত্তিক কৃষিতে প্রত্যাবর্তন করেছে। ব্রিগেডের পরিবর্তে চীনে গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে এখন "গ্রাম সরকার" (ভিলেজ গভর্নমেন্ট) বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এসব গ্রাম সরকারকে এখন আর প্রত্যক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে না।

তা সত্ত্বেও চীনে গ্রাম সরকারের ভূমিকা ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ে আরও বেশি অগ্রসর চরিত্রের। এর কারণ, যৌথচাষের পরিবর্তে পরিবার-ভিত্তিক কৃষি চালু হলেও জমির উপর যৌথ মালিকানা বাতিল হয়ে যায়নি। কৃষকেরা এখনও জমির দীর্ঘমেয়াদি লিজ পেয়ে থাকে, মালিকানা নয়। কৃষক পরিবারদের মধ্যে জমির (লিজ) বিতরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখনও চীনের গ্রাম সরকারকে পালন করতে হয়। কাজেই প্রত্যক্ষ উৎপাদক ভূমিকার অবসান হলেও চীনে গ্রাম সরকারের ভূমিকা (ভারতের তুলনায়) মৌলিকভাবে আরও অগ্রসর পর্যায়ের।

সে কারণেই চীনের সরকার সে দেশের গ্রাম সরকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। গ্রাম সরকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর চীনের পার্লামেন্ট (*ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস*)-এর স্থায়ী (*স্ট্যান্ডিং*) কমিটির পঞ্চম বৈঠকে "গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গ্রাম সরকার বিষয়ক সংগ্রন্থিত আইন" গৃহীত হয় এবং একই দিনে তা এ বিষয়ে চীনের প্রেসিডেন্টের ৯ নং আদেশ হিসেবে জারি হয়। এই আইনের ৩০টি ধারা। এই আইন মোতাবেক গ্রামের আঠারো অথবা তার বেশি বয়সের সকলকে নিয়ে গ্রাম-সভা গঠিত হবে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে

গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গ্রাম সভা গ্রামের স্বশাসন সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিজেরা প্রণয়ন করতে পারবে। গ্রাম সভায় গ্রাম নির্বাচন কমিটি কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে এবং প্রকাশ্য ভোট গণনার ভিত্তিতে তিন বছর মেয়াদের জন্য গ্রাম সভার সদস্যদের মধ্য থেকে "গ্রাম কমিটি" নির্বাচিত হবে। গ্রাম-কমিটিকে স্বশাসনের মূল গণ-সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই কমিটি গ্রাম সভার নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং প্রতিবেদন পেশ করবে। গ্রাম কমিটি তিন থেকে সাত সদস্য বিশিষ্ট হবে। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান আর বাকিরা সদস্য হবেন। মহিলা এবং সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ থেকে সদস্য থাকবে। চীনের গ্রামবাসীরা শুধু গ্রাম কমিটির সদস্যদের নির্বাচনের অধিকারী নন, তারা এসব সদস্যদের প্রত্যাহার করতে পারবেন। নির্বাচকমণ্ডলীর (তথা গ্রাম সভার সদস্যের মধ্যে) এক-পঞ্চমাংশ কাউকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করলে গ্রাম সভায় সাথে সাথে এসব প্রস্তাব ভোটে দেবে। গ্রাম কমিটি বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গ্রাম গ্রুপ গঠন করতে পারবে, প্রতি গ্রাম-গ্রুপ নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে।

উপরের বিবরণ থেকে স্পষ্ট, ১৯৯৮ সালে গৃহীত চীনের গ্রাম সরকার আইন খুবই গণতান্ত্রিক। তবে বাস্তবে এই আইনের কতটুকু প্রয়োগ হয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, প্রথমাবস্থায় অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম কমিটি গঠনের বিষয়ে উৎসাহ থাকলেও পরবর্তীকালে চীনা নেতৃত্বের এই উৎসাহ হ্রাস পায়। বরং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম কমিটি গঠনের প্রবণতাই প্রাধান্য পায়। তবে অবাধ নির্বাচন অথবা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি যেভাবেই চীনের গ্রাম কমিটি গঠিত হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চীনের গ্রাম সরকারের এখতিয়ার এক ভিন্ন মাত্রার, কারণ আগেই উল্লিখিত হয়েছে– গ্রাম সদস্যদের মধ্যে লিজ হিসেবে জমি বিতরণের দায়িত্ব এখনও গ্রাম সরকারের উপর ন্যস্ত। এর মানে এই নয় যে, গ্রাম সরকারের এ সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং অধিকার অবারিত। বরং জাতীয় ভিত্তিক নীতিমালা, প্রথাগত নিয়ম এবং গ্রাম সভার সম্মতিক্রমেই গ্রাম কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

স্পষ্টতই, চীনের গ্রাম সরকারের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য বেশ প্রাসঙ্গিক। মাইক্রো পর্যায়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে না হলেও (যেহেতু যৌথচাষের প্রস্তাব করা হচ্ছে না) বাংলাদেশের গ্রাম পরিষদকে ম্যাক্রো তথা গ্রামের পরিধিতে বিভিন্ন ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, উপযোগ সরবরাহ এবং উৎপাদন কার্যক্রম সংগঠন ও পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে এখনও চীনের স্থানীয় সরকারের অংশ হিসেবে গ্রাম সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

থেকে। কীভাবে সেটা করে তা বাংলাদেশের জন্য অনেক শিক্ষণীয় উপহার দিতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে চীনের গ্রাম সরকার বিষয়ক আইন থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে।

৫.৫ গ্রাম পরিষদ গঠনের সম্ভাবনা

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে গ্রাম পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হলে তা গ্রামবাসীদের জীবন মান তথা গোটা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের গ্রাম পরিষদ গঠনের সম্ভাবনা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি গ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য একদিক থেকে অনুকূল, কারণ -- আমরা উপরে লক্ষ করেছি -- প্রায় সকল বড় রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনো সময় গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। বামপন্থী দলসমূহেরও নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠনের বিষয়ে উৎসাহিত হওয়ার কথা। এটা ঠিক যে, গ্রামে আপাতত আমূল ভূমি সংস্কার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে জমি মালিকানাগতসহ অন্যান্য বৈষম্য বজায় থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাম পরিষদ গঠিত হলে গ্রামের জমি, জল এবং অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের সাথে যেমন শ্রমজীবীদের সম্পৃক্তি বৃদ্ধি পাবে তেমনি গ্রাম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত হবে। এই দুই পরিবর্তনের ফলে গ্রামের শ্রমজীবী-স্বল্প আয়ের পরিবারসমূহের পরিস্থিতির একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, এবং তা ভবিষ্যতে আরও গভীর পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তদুপরি পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সম্বলিত বাজারভিত্তিক ভূমি সংস্কারের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। সুতরাং শ্রমজীবীদের স্বার্থের প্রতি যেসব দল বিশেষভাবে অনুরাগী তাদের গ্রাম পরিষদ গঠনের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হওয়ার কথা।[৪০]

[৪০] অনেকে আশংকা করেন, বর্তমানের অসম মালিকানার পরিস্থিতি বজায় রেখে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হলে তা গ্রামের জীবনের উপর ধনী পরিবারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি (প্রভুত্ব) বরং আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ধরনের আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। ভারতেই দেখা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে একই রূপের হলেও বিভিন্ন রাজ্যে এবং বিভিন্ন স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা বিভিন্ন ধরনের হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একই সাংগঠনিক রূপের আধেয় বিভিন্ন রকম হতে পারে। এই আধেয় নির্ভর করে সামাজিক শক্তি ভারসাম্যের উপর, এবং নেতৃত্বের উপর। কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা ও আশংকা সত্ত্বেও গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির মৌল যুক্তিকে বাতিল করে না। লক্ষণীয়, গ্রাম কর্তৃপক্ষের অবস্থান গ্রামের মানুষের অত্যন্ত নাগালের মধ্যে হওয়ায় তাতে সাধারণ

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অনায়াসে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়ে যাবে। বিগত সময়কালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কর্মসূচির গুণাগুণ (*মেরিট*)-এর চেয়ে সে কর্মসূচি কোন দলের ক্ষমতালাভের জন্য বেশি সহায়ক, সেটাই মূল বিবেচ্য হয়ে পড়ে। যেমন, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম কী হবে, সেটা নিয়েই মতদ্বৈততা দেখা দিতে পারে। সারণি ৫.২ দেখায়, এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গঠন (*কম্পোজিশন*), গঠনের পদ্ধতি, করণীয়ের পরিধি ইত্যাদি বিষয়েও প্রচুর মতভেদের সুযোগ আছে। অর্থাৎ মোটা দাগে একমত হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টির বিস্তারিত রূপের বিষয়ে নানান মতভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

অনেকে প্রস্তাবিত গ্রাম পরিষদকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিযোগী বলে মনে করতে পারেন এবং সেজন্য এর বিরোধিতা করতে পারেন। ১৯৯৭ সালের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" এবং ২০০৩ সালের "গ্রাম সরকার আইন" উভয়ের মধ্যেই উপযুক্ত বিরোধিতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস পরিদৃষ্ট হয়। গ্রামগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারকেই গ্রাম কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে মনোনীত করা ইত্যাদির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট স্বার্থের কাছে নতি স্বীকারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু, উপরে আমরা লক্ষ করেছি যে, গ্রাম পরিষদ গঠনের মানে এই নয় যে ইউনিয়ন পরিষদকে বাতিল করতে হবে। প্রতিযোগী হওয়ার পরিবর্তে এই দুই প্রতিষ্ঠান পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে।

সুতরাং বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি এবং তা ব্যবহার করে গ্রামের অন্তর্গত সম্ভাবনা বাস্তবায়নের কাজের অগ্রসর হওয়া সম্ভব। গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দাবিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই যাতে এগিয়ে আসেন সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। সেজন্য কেন এধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, তা গ্রামবাসীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি তা সঠিকভাবে করা যায়, তবে গ্রামবাসীরা ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচির পক্ষে এগিয়ে

মানুষের সংখ্যার শক্তির প্রকাশ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। সে শক্তির উপর নির্ভর করে গ্রামের সমবায়ী চরিত্রকে আরও গভীরতার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হবে। এই বিবর্তন ও অগ্রগতি যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে, এমনটা আশা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হবে উপযোগী প্রয়াস ও নেতৃত্বের, গ্রামের অভ্যন্তরে এবং গ্রামের বাইরে, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে।

আসবে বলে আশা করা যায়। তখন সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা যাবে এবং গ্রামের বহুদিনের প্রতীক্ষিত, প্রয়োজনীয় এবং ঈপ্সিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্জিত হতে পারবে।

৫.৬ উপসংহার

আবহমানকাল ধরে গ্রাম বাংলাদেশের সমাজের মোল একক হিসেবে বিরাজ করেছে। এসব গ্রামের এক ধরনের স্বশাসন কাঠামোও ছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন এই স্বশাসন কাঠামোর অবক্ষয় ডেকে আনে। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে এই অবক্ষয় প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের গ্রামসমূহকে সমবায়ী গ্রামে রূপান্তরের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে সপরিবারে হত্যা ও তাঁর সরকারের অবসানের ফলে এই কর্মসূচি অগ্রসর হতে পারেনি। তারপর বিভিন্ন সরকারের আমলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক বহু আইন প্রণীত হলেও শেষাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পর্যায়েই শেষ হয়ে আছে; এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এক শূন্যতা বিরাজ করছে।

এই শূন্যতা মোটেও কাম্য নয়। এখনও গ্রাম বাংলাদেশের সমাজের মূল ভিত্তি। যারা নগরবাসী হয়েছেন তারাও কতখানি গ্রামে রয়ে গেছেন তা ঈদের সময়কার জনশূন্য ঢাকাই দৃশ্যমান করে। গ্রামের মূল সম্পদ হলো জন-জমি-জল। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবে এসব সম্পদের পূর্ণ ও সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। এর কারণ হলো এসব সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য গ্রামবাসীদের বহু ধরনের যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ধরনের যৌথ প্রয়াস সম্ভব হয় না যদি না উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। এ ধরনের কাঠামো না থাকায় গ্রামের নিজস্ব যৌথ শক্তি যেন অবশ হয়ে আছে। নিজের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকায় গ্রামগুলো এখন যেন এতিমের মতো। যৌথ প্রয়াস দাবি করে এমন যেকোনো পদক্ষেপের জন্য তারা যেন অসহায়ের মতো সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথচ উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানপূর্বক উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে পারে। বাংলাদেশের উন্নয়ন "উপর-থেকে-নিচে" আরোপিত একটি প্রক্রিয়ার পরিবর্তে "নিচ-থেকে-উপরে" প্রসারিত একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিকশিত হতে পারে।

সেজন্য আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করা। এই গ্রাম পরিষদের ভূমিকা হবে দ্বিবিধ। একদিকে প্রশাসনিক, অন্যদিকে অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামের বস্তুগত এবং শ্রম সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য যেসব যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন তা দক্ষভাবে সংগঠিত করা হবে গ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকার জন্য গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে। কাজেই গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনটি যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে প্রণয়ন করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে, গ্রামসমূহ একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন। বস্তুগত সম্পদ, মানব সম্পদ, সচেতনতা ও সংগঠন সক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ভিন্নতা রয়েছে। ফলে যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকবে। তদুপরি এই প্রয়োজনীয়তার ধরন সময়ে পরিবর্তিত হবে। সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে এমন হতে হবে যাতে তা এই বিভিন্ন এবং পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তা পূরণের উপযোগী হয় এবং একই সাথে সীমা-পরিসীমাসমূহ স্পষ্ট থাকে। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে ইতিপূর্বে যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল এবং যেসব আইন, বিধিমালা ইত্যাদি গৃহীত হয়েছিল সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করা যেতে পারে। সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক, বিশেষত প্রতিবেশী ভারত ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকেও এ বিষয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে একটি ঐকমত্য অর্জন সম্ভব হওয়ার কথা কেননা প্রতিটি বড় দলই কোনো না কোনো সময়ে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। ছোট রাজনৈতিক দলসমূহও আদর্শিক ও অন্যান্য কারণে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার পক্ষে বলেই ধারণা করা যায়। সুতরাং যেটা প্রয়োজন তা হলো বিষয়টি পুনরায় জাতীয় আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা। বিশেষত গ্রামের মানুষদের নিকট এ প্রস্তাবনাটি উপস্থিত করা এবং এর পক্ষের যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করা। গ্রামের জনগণ নিজেরা এর পক্ষে ব্যাপকহারে সমবেত হলে এই প্রস্তাবকে আর অগ্রাহ্য অথবা স্থগিত করা সম্ভব হবে না।

অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, গ্রাম পরিষদ গঠনের ফলে বর্তমানে উপজেলা প্রশাসনে যে ধরনের দুর্নীতি দেখা যায় এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে যে ধরনের অর্থ ও পেশীশক্তির প্রয়োগ এবং সহিংসতা দেখা যায় সেটা গ্রামের আরও

ভেতরে প্রবেশ করবে এবং তাতে উপকারের পরিবর্তে অপকার বেশি হবে। এসব দুশ্চিন্তার পেছনে নিঃসন্দেহে যুক্তি রয়েছে। সেজন্য গ্রাম পরিষদ গঠনের করণীয়কে পূর্বোল্লিখিত সুশাসন অর্জন এবং রাজনীতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যাভিমুখী অন্যান্য করণীয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। প্রবৃদ্ধির বর্তমান নিঃসরণ মডেলের অবসান ঘটিয়ে পরিশাসনের মান উন্নত করতে হবে এবং আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিকে জনকল্যাণ অভিমুখী করতে হবে। এসব পরিবর্তন বর্তমান অনুচ্ছেদে আলোচিত গ্রাম পরিষদের লক্ষ্যাবলি অর্জনকে সুগম করবে। তবে, যে বিষয়টি উপরে লক্ষ করা হয়েছে, গ্রামের পরিধি ছোট হওয়ায় সেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের সংখ্যাশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালীদের শক্তি প্রতিরোধের সুযোগ বেশি হতে পারে। যদি তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে তবে দেশের রাজনীতি ও পরিশাসনের ক্ষেত্রে একটি শুভ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিচ থেকে উপরের দিকেও অগ্রসর হতে পারে। কাজেই আগে থেকেই নৈরাশ্যজনক ও নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে গ্রাম পরিষদ গঠনে প্রয়াসী হওয়া আগামী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে।

৬। আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ

আগামী বাংলাদেশের আরেক বড় করণীয় হলো আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ। উন্নয়নের প্রথম পর্বে বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নয়ন অত্যধিক মাত্রায় রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। দেশব্যাপী দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেলেও দেশের কিছু অঞ্চলে দারিদ্র্য হার বাকি অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। এদিকে উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতা এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে, তা এখন শুধু দেশের বাকি অংশের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে তাই নয়, ঢাকা শহরের নিজের জন্যও ক্ষতিকর হচ্ছে। সেজন্য আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং উন্নয়নের ঢাকা-কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নকে ভৌগোলিকভাবে সুষম করা আগামীর বাংলাদেশের একটি অন্যতম করণীয়।

৬.১ আঞ্চলিক বৈষম্যের বৃদ্ধি

উন্নয়নের প্রথম পর্বে বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয়-জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি অতিদরিদ্র

জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে নিম্নের চতুর্থাংশে (অর্থাৎ মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৬টি জেলায়) বসবাস করেন (চিত্র ৬.১) (Ahsan, 2019, p.19)। এই জেলাগুলির মধ্যে ৪টি রংপুর, ১টি রাজশাহী, ৪টি খুলনা ও বরিশাল এবং বাকি ৭টি ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। চিত্র ৬.১ দেখায় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ সেখানে বসবাস করেন, অথচ দেশের মোট অতিদরিদ্রদের ৫০ শতাংশই এসব জেলায় কেন্দ্রীভূত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাকি জেলা সমূহের তুলনায় এই ১৬টি জেলায় অতিদারিদ্র্যের হার চারগুণ বেশি। আরও দেখা যায় যে, আয়ের দিক থেকে উপরের ২৫ শতাংশ জেলায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ বসবাস করলেও সেখানে দেশের অতিদরিদ্রদের মাত্র প্রায় ৯ শতাংশ বসবাস করেন। সুতরাং উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্যের দিকটি খুবই স্পষ্ট।

চিত্র ৬.১: মাথাপিছু আয়ের বিচারে চারটি জেলা- গ্রুপে মোট জনসংখ্যা, দরিদ্র, এবং অতিদরিদ্রদের বণ্টন (শতাংশ)

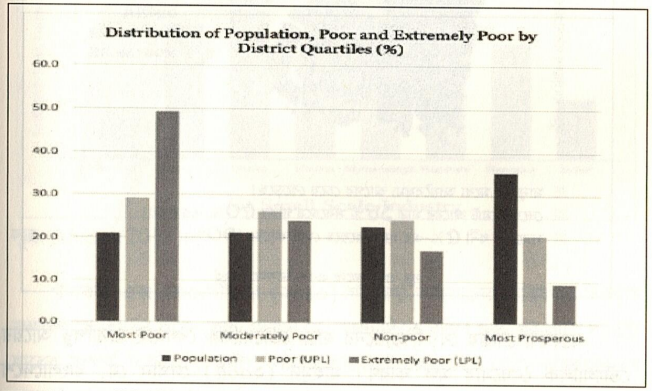

সূত্রঃ Ahsan (2019, p. 21).

সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২২ সনের খানা জরিপের তথ্য থেকেও দারিদ্রহারে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টি পুনরায় পরিস্ফুট হয়েছে। যেখানে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১৭.৯ এবং ১৫.৮ শতাংশ, সেখানে রংপুরে এই হার ২৪.৮ এবং বরিশালে ২৬.৯ শতাংশ (চিত্র ৬.২)

চিত্র ৬.২: ২০২২ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে দারিদ্র্য হারের পার্থক্য

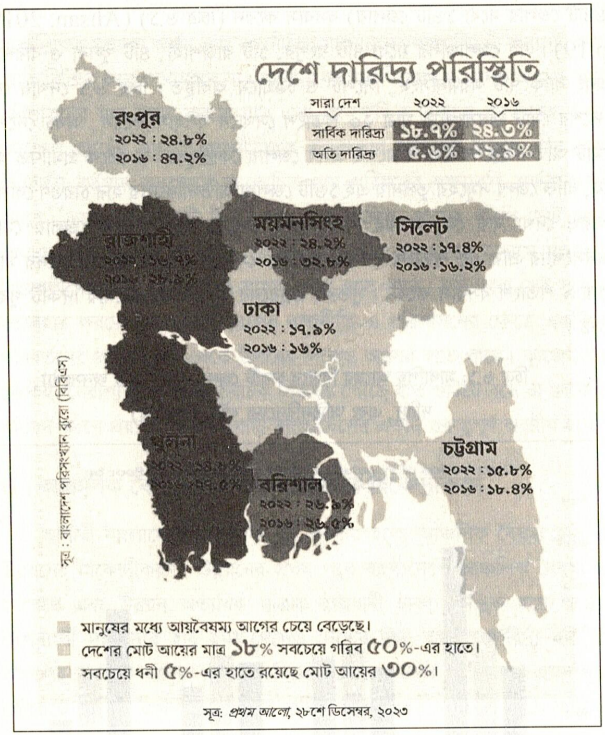

সূত্র: *প্রথম আলো*, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৩

গবেষণা দেখায় যে, শিল্পায়নের হারে ভৌগোলিক বৈষম্যই মাথাপিছু আয়ের ভৌগোলিক বৈষম্যের মূল কারণ। মাহমুদ (২০০৫) দেখান যে, বাংলাদেশে শিল্পোৎপাদনের ৫০ শতাংশ ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে কেন্দ্রীভূত; চট্টগ্রামে ১৫ শতাংশ। তিনি আরও দেখান যে, মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে নিচের ৫০টি জেলার ভূমিকা মোট শিল্পোৎপাদনে মাত্র ১৭ শতাংশ। তিনি লক্ষ করেন যে, শিল্পোৎপাদনে এই আঞ্চলিক বৈষম্যই বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার হ্রাসের তারতম্যের পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক ঘনত্ব পরিমাপের জন্য আহসান (২০১৯) প্রতি ১০ বর্গ

কিলোমিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ব্যবহার করেন। তিনি দেখান যে, এই সূচকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাগভেদে বিরাট তারতম্য রয়েছে। চিত্র ৬.২ দেখায় যে, যেখানে ঢাকা বিভাগে প্রতি ১০ বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ২৫টি বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে, সেখানে বরিশাল বিভাগে এর সংখ্যা পাঁচেরও কম। তিনি আরও দেখান যে, সাধারণভাবে অধিক বিদ্যুৎ সংযোগ অধিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঘনত্বসম্পন্ন জেলাসমূহে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণও বেশি, যার ফলে সেসব জেলায় দারিদ্র্যের হার কম।

চিত্র ৬.৩: বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঘনত্ব

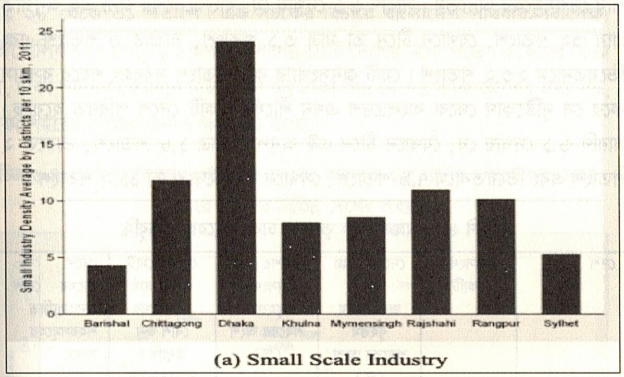

সূত্র: Ahsan (2019).

খন্দকার এবং সহযোগীদের (২০১০) গবেষণা আহসানের গবেষণার উপর্যুক্ত ফলাফলকে সমর্থন করে। তারা দেখান যে, অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বের সাথে দারিদ্র্য হারের সম্পর্ক বিপরীত। অর্থাৎ, সাধারণভাবে যে জেলা যত বেশি কৃষিপ্রধান সে জেলায় দারিদ্র্যের হার তত বেশি। পক্ষান্তরে যেসব জেলায় নগরায়ণ, মানব সম্পদের মান, অর্থায়ন-লভ্যতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, সেসব জেলায় দারিদ্র্যের হার কম[৪১]।

[৪১] তবে তাঁরা লক্ষও স্বীকার করেন এটা একটা সহ-সম্পর্ক (*কোরিলেশান*), এটা কার্যকারণ সম্পর্ক নাও হতে পারে, অর্থাৎ এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক বিপরীতমুখীও হতে পারে।

৬.২ উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতা

বাংলাদেশে বিগত সময়কালের উন্নয়নের ঢাকা-কেন্দ্রিকতার বিষয়টি আরও বেশি প্রকট। যেখানে ১৯৭৪-২০১৭ সময়কালে গোটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক আনুমানিক ১.২ শতাংশ, সেখানে ঢাকা শহরে তা ছিল ৫.৪ শতাংশ। অর্থাৎ, সারা দেশ থেকে মানুষ ঢাকা শহরে এসে জড়ো হয়েছেন। আহসান (২০১৯) জানান যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা শহরে। আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা যায় যে, দেশের মোট শহুরে জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ শহরের অংশের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশসমূহের অন্যতম। সারণি ৬.১ দেখায় যে, বাংলাদেশের জন্য এই অনুপাত প্রায় ৩২ শতাংশ, যেখানে চীনে তা মাত্র ৩.১ শতাংশ, ভারতে ৬ শতাংশ এবং ভিয়েতনামে ২৩.২ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ সর্ববৃহৎ শহরে বসবাস করে সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষের একটি দেশে পরিণত হয়েছে। সারণি ৬.১ দেখায় যে, যেখানে চীনে এই অনুপাত মাত্র ১.৮ শতাংশ, ভারতে ২ শতাংশ এবং ভিয়েতনামে ৭.৯ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশে তা ১১.২ শতাংশ।

সারণি ৬.১: আন্তর্জাতিক তুলনায় ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি

দেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	দেশের সমগ্র শহুরে জনসংখ্যায় বৃহত্তম শহরের অংশ (%)	দেশের মোট জনসংখ্যায় বৃহত্তম শহরের অংশ (%)	দেশের মোট জনসংখ্যায় ১০ লাখের বেশি জন অধ্যুষিত শহরসমূহের অংশ (%)	দেশে ১০ লাখের বেশি জনঅধ্যুষিত শহরসমূহের সংখ্যা
বাংলাদেশ	১৬.৩	৩১.৯	১১.২	৩.৫	৩-৫
চীন	১৩৭.৯	৩.১	১.৮	২৩.৪	১০২
ভারত	১৩২.৪	৬.০	২.০	১২.৯	৫৪
ইন্দোনেশিয়া	২৬.১	৭.৪	৪.০	৬.৬	১৪
পাকিস্তান	১৯.৩	২২.৬	৮.৯	১৩.২	১০
ভিয়েতনাম	৯.৫	২৩.২	৭.৯	৬.৬	৬

সূত্র: Ahsan (2019, p.27).

আন্তর্জাতিক তুলনায় বাংলাদেশের রাজধানীর বেমানান বৃদ্ধি অন্যান্য কিছু বিচারেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন চিত্র ৬.৪ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নগরায়ণ হার (অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যায় শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত)-এর সাথে সে দেশের শহুরে জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ শহরের অংশের সম্পর্কের একটি তুলনা দেখায়। আমরা দেখি যে, যদিও নগরায়ণের হারের বিচারে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন দেশসমূহের মধ্যে একটি, কিন্তু শহুরে জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ শহরের অনুপাতের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। চিত্র ৬.৫ ও একই ধরনের পরিস্থিতি তুলে ধরে। এতে আমরা দেখি যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলেও শহুরে জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ শহরের অনুপাতের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অন্য প্রায় সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। আহসান (২০১৯) তার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখান যে, বাংলাদেশের জিডিপিতে ঢাকা শহরের অংশ প্রায় ২৮ থেকে ৩১ শতাংশ। এই সূচকের বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভৌগোলিকভাবে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতিসম্পন্ন ১০টি দেশের মধ্যে পড়ে। উদ্বেগের বিষয় যে, ঢাকা শহরের বেমানান বৃদ্ধি এখন শুধু ঢাকা ভিন্ন দেশের বাকি অংশের জন্য নয়, ঢাকা শহরের নিজের জন্যও ক্ষতিকর হচ্ছে।

চিত্র ৬.৪: মোট শহুরে জনসংখ্যায় মূল শহরের অনুপাত এবং সার্বিক নগরায়ণের হারের বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান

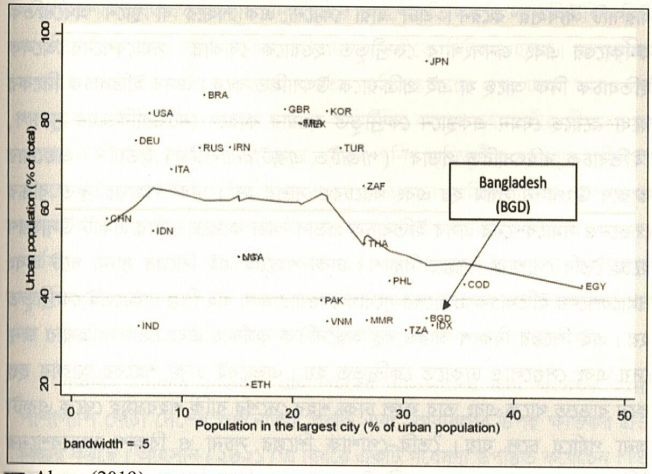

সূত্র: Ahsan (2019).

চিত্র ৬.৫: মোট শহুরে জনসংখ্যায় মূল শহরের অনুপাত এবং মাথাপিছু আয়ের বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান

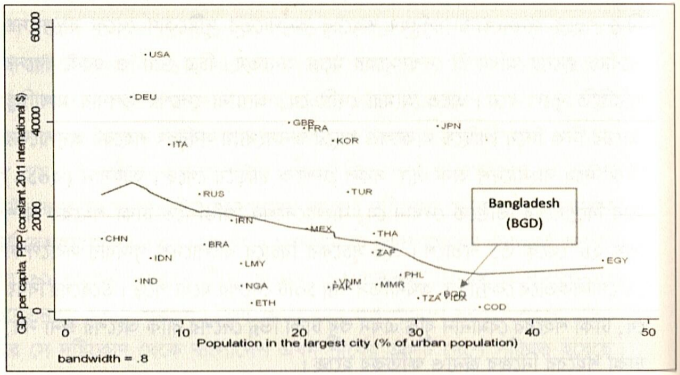

সূত্র: Ahsan (2019).

গবেষকেরা শহরের আকার বৃদ্ধি ব্যাখ্যার জন্য "সমাবেশন" (*এগ্লোমারেশন*) ধারণাটি ব্যবহার করেন। এটা দ্বারা কোনো এক শহরে বা স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এবং জনসংখ্যার কেন্দ্রীভূত হওয়াকে বোঝায়। সমাবেশনের অনেক ইতিবাচক দিক আছে যা এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। এসব ইতিবাচক দিকের মধ্যে রয়েছে যেমন একস্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ, "ইতিবাচক বহিৎসারিত প্রভাব" (*পজিটিভ এক্সটারনালিটিজ*) ইত্যাদি। এগুলোর কারণে উৎপাদন সুগম হয় এবং খরচেরও সাশ্রয় হয়। ঢাকা শহরের দ্রুত বৃদ্ধির পেছনেও সমাবেশনের এসব ইতিবাচক প্রভাব কাজ করেছে। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ। ঢাকা শহরেই এই শিল্পের সূচনা ঘটে এবং সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাবের সুযোগ নেওয়ার জন্য এই শিল্প ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই শিল্পের বিকাশ আরও বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ভোগ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং সেগুলোও ঢাকাতে কেন্দ্রিভূত হয়। এভাবেই ঢাকা শহরের আকার হুহু করে বাড়তে থাকে এবং তার ফলে ঢাকা শহর দেশের বাকি শহরসমূহ থেকে একটা অন্য পর্যায়ে চলে যায়। তৈরি পোশাক শিল্পের সূচনা ও বিকাশ সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাবের কেবল একটি উদাহরণ এবং নিচে আমরা দেখবো যে, ঢাকা শহরের আকার বৃদ্ধির পেছনে অন্যান্য কারণও কাজ করেছে।

কিন্তু একটা পর্যায়ের পর সমাবেশনের প্রভাব ইতিবাচকের পরিবর্তে নেতিবাচক হয়ে পড়ে। শহরের আকার উত্তমর্ণতার সীমা (*অপটিমাম সাইজ*) ছাড়িয়ে যায় এবং তা সেই শহর ছাড়াও গোটা দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। গবেষণা দেখায় যে, ঢাকা শহরের পরিস্থিতি বর্তমানে সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর কিছু অভিপ্রকাশ এমনিতেই বাহ্য। যেমন জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি এখন ঢাকা শহরে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী যানজটের কারণে ঢাকা শহরে যানবাহনের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ২১ কিলোমিটার থেকে ৬.৪ কিলোমিটারে হ্রাস পেয়েছে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ দেশের জিডিপির ২.৯ শতাংশের সমান (আহসান, ২০১৯)। বস্তুত যানজটের কারণে ঢাকা শহরে চলাফেরা এবং কাজকর্ম করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির আরেক ফলাফল হলো ভয়ংকর বায়ু দূষণ। আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী ঢাকা শহরের বায়ু এখন দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা দূষিত এবং এর ফলে ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। গবেষণা আরও দেখায় যে, ঢাকা শহরের ৬০ শতাংশ মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন যেখানে পরিষ্কার পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা নেই এবং ফলে সেখানকার অধিবাসীরা পানিবাহিত অসুখবিসুখের হুমকির সম্মুখীন (ঐ)। সাপ্তাহিক *দি ইকোনমিস্ট*-এর তথ্য অনুযায়ী, পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে প্রতিদিন ১১ লাখ কিউবিক মিটার অপরিশোধিত পয়ঃপ্রণালি ঢাকার চারপাশের নদীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। জলাভূমিতে নগরের প্রসারণের কারণে শহরের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ঢাকা আরও বেশি বন্যার ঝুঁকিতে নিপতিত হচ্ছে। নগরের অতিবৃদ্ধির কারণে শহরবাসীর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপযোগ, যেমন পানির স্থায়িত্বশীল সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ছে (ঐ)। এতদিন যাবৎ ঢাকা শহরে অভিগমন দারিদ্র্যপীড়িত জেলাসমূহের মানুষদের অবস্থা উন্নয়নের একটি উপায় হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু ঢাকা শহরের বর্তমান অবস্থা দেখায় যে, এই অভিগমন এই শহরের ইতিমধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের যেমন, তেমনি অভিগমনকারীদের জন্য আগের মতো মঙ্গলকর হচ্ছে না। বরং এই শহরের ইতিমধ্যে সংকটাপন্ন অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করছে।

লক্ষণীয়, ঢাকার অতিবৃদ্ধি এই শহরের বাসিন্দাদের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার পাশাপাশি গোটা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়ণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে। আহসান (২০২১) এ বিষয়ে একটি গবেষণা উপস্থিত করেছেন। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যায়

নগরবাসীর অনুপাত ১ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয়ের ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গবেষক হেন্ডারসন (২০০৩) দেখিয়েছেন যে, একটি দেশের মূল শহরের (*প্রাইমেট সিটি*) জনসংখ্যা যদি একটি মাত্রা অতিক্রম করে তাহলে গোটা দেশের মাথাপিছু আয়ের উপর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তার গবেষণা দেখায় যে, যেসব দেশে মূল শহরের আকার অত্যন্ত বড় সেসব দেশে সার্বিক নগরায়ণের হারও কম। অর্থাৎ, মূল শহরের আকারের অতিবৃদ্ধি দেশের সার্বিক নগরায়ণের হারকে শ্লথ করে দেয়। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে আহসান (২০২১) দেখান যে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যা উত্তমর্ণ (*অপটিমাল*) সীমার চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি এবং এই আধিক্যের কারণে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (*জিডিপি*) প্রতি বছর ৬ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে (চিত্র ৬.৬)।

চিত্র ৬.৬: ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জিডিপি'র হ্রাস

Estimates of the Indirect Costs of Dhaka's Overgrowth
- About 6 to 10 percent of GDP

		Actual 2019		
1	Urban Population	60.99	60.99	60.99
2	Share of Primate City	33.28	33.28	33.28
3	Primate City Population	20.3	20.3	20.3
		Panel	Pooled Quantile on Bangladesh Variables	Bangladesh Time Series
4	Predicted Primate City Population	13.4	13.4	13.4
5 (3-4)/4)	% Difference between Actual and Predicted Population	51.5	51.5	51.5
	Primate City Elasticity			
6	on Urban Share	-0.27	-0.21	-0.52
7 (6 x 5)	Impact on Urban Share	-13.9	-10.8	-26.8
8	Elasticity of Urban Share on Income	0.42	1.01	*1.66* (not significant)
9 ((7 x 8))	Mean Impact on Per Capita Income (or GDP)	-5.8	-10.9	-44.4

** All estimates are highly significant except Bangladesh time series estimate of Elasticity of Urban Share on Income. See Appendix Slides 21-23.

Time series estimates with 51 observations should be disregarded.

সূত্র: Ahsan (2021).

কেন ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি বাংলাদেশের জিডিপি হ্রাস করেছে, সে সম্পর্কে আহসানের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ। প্রথমত, তিনি দেখান যে, ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির ফলে দেশের অন্যান্য শহরের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে ফলে সেখানে নগরায়ণ কম হয়েছে। অথচ ঢাকা শহরের তুলনায় পুঁজিভবনের মাত্রা কম হওয়ায় সম পরিমাণ পুঁজি দিয়ে এসব শহরে আরও বেশি হারের নগরায়ণ সম্ভব ছিল। এদিকে

নগরায়ণের হারের সাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক ইতিবাচক। ফলে ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জিডিপি হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং দেশের স্বার্থে এবং এমনকি ঢাকা শহরের স্বার্থে এই শহরের জনসংখ্যা যাতে আর বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

৬.৩ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে করণীয়

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, শিল্পায়ন হারের পার্থক্য বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈষম্যের অন্যতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু শিল্পায়নের হার ভিন্ন হলো কেন, সে প্রশ্ন থেকে যায়। সেজন্য বৈষম্যের কারণ উদঘাটনের জন্য আরেকটু ভেতরে যাওয়া প্রয়োজন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা লক্ষ করতে পারি যে, আঞ্চলিক বৈষম্যের তলবর্তী কারণ দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমটি হলো সম্পদগত পার্থক্য, যেটা বিষয়গত, অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সম্পদ আবার হতে পারে দুই ধরনের, বস্তুগত সম্পদ এবং মানব সম্পদ। বৈষম্যের দ্বিতীয় কারণ হলো নীতি, আঞ্চলিক অথবা জাতীয় পর্যায়ের। নীতি একটা বিষয়ীগত প্রভাবক, যেটা ইচ্ছা করলে পরিবর্তিত করা সম্ভব। প্রায়শ এই দুই ধরনের কারণের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া ঘটে। একটি অঞ্চলের সম্পদগত পরিস্থিতি নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে আবার গৃহীত নীতিমালা বিদ্যমান সম্পদগত পার্থক্যকে বাড়িয়ে দিতে অথবা প্রশমিত করতে পারে। বলাবাহুল্য, প্রয়োজন হলো এমন নীতি গ্রহণ করা যা সম্পদগত পার্থক্যের অভিঘাতকে প্রশমিত করতে পারে।

৬.৩.১ সম্পদগত পার্থক্য হ্রাস

প্রথমে সম্পদগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে, শুরুতে ভৌত এবং তারপর মানব।

৬.৩.১.১ সমুদ্র অভিগম্যতায় অসমতা হ্রাস

বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য নিহিত সমুদ্র অভিগম্যতার মধ্যে। এখনও বাংলাদেশের একটিই মূল সমুদ্র বন্দর আর তা হলো চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। যদিও পাকিস্তান আমলেই মোংলা/চালনা বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু রূপসা নদীর উপর সেতু এবং মোংলা পর্যন্ত রেললাইন না

থাকার কারণে এই বন্দরের ব্যবহারযোগ্যতা সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সমুদ্র অভিগম্যতার জন্য উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ দেশের পূর্ব ও মধ্যমাঞ্চলের তুলনায় অসম অবস্থায় ছিল।

আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশমনে সমুদ্র অভিগম্যতার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত অসমতা হ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। কিছু অগ্রগতি ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। প্রথমত, ১৯৯৪ সালে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ এবং ২০২২ সালে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিণবঙ্গের জন্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, রূপসা নদীর উপর সেতু নির্মিত হয়েছে এবং মোংলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ শেষ হওয়ার পথে। এর ফলে মোংলা বন্দর ব্যবহার করে সমুদ্র অভিগম্যতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মোংলা বন্দরের কিছু কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একটি হলো, এই বন্দর সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে যেখানে পশুর নদী দিয়ে পৌঁছাতে হয়। পলিভরনের কারণে বড় জাহাজ চলাচলের মতো নাব্যতা (১০ মিটারের বেশি) এই নদীর থাকে না। বর্তমানে নদী খননের মাধ্যমে এরূপ নাব্যতা অর্জন ও তা বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্বশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রথমত, এটা ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, খননকৃত বালু নিক্ষেপের স্থানের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোংলা বন্দরের দ্বিতীয় কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা হলো সুন্দরবনের নিকটে (উত্তরে) এর অবস্থান। পশুর নদী সুন্দরবনের মূল নদী। বিপুল সংখ্যক বাণিজ্যিক জাহাজ এই নদী দিয়ে চলাচল করলে সুন্দরবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তদুপরি মোংলা বন্দরের কার্যক্রমের বিপুল বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে সুন্দরবনের উত্তর এবং পূর্ব সীমা ধরে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ডেকে আনবে এবং তা সুন্দরবনের প্রতি হুমকি বাড়িয়ে দিবে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার পায়রায় রামনাবাদ চ্যানেলের তীরে পায়রা সমুদ্র বন্দর নির্মিত এবং ২০১৬ সালে চালু হওয়ার ফলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র-অভিগম্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বন্দরকেও কাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পায়রা বন্দরকে গভীর সমুদ্র বন্দর হিসেবে কাজ করতে হলে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেল নিয়মিতভাবে খনন করতে হবে। ফলে এই সমুদ্র বন্দর কতখানি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে তা বলা কঠিন। অন্যদিকে মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কাজ শেষ হলে দেশের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের সমুদ্র-অভিগম্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্র অভিগম্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অসম পরিস্থিতি নিরসনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৬.৩.১.২ *জ্বালানি অভিগম্যতায় অসমতা হ্রাস*

বস্তুগত সম্পদের দিক থেকে দেশের উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ দ্বিতীয় যে অসম পরিস্থিতির সম্মুখীন তা হলো জ্বালানি অভিগম্যতার বিষয়ে। দীর্ঘকাল এবং এখনো বাংলাদেশের মূল অভ্যন্তরীণ সূত্রের আধুনিক জ্বালানি হলো গ্যাস এবং তা মূলত পূর্বাঞ্চলেই এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে গ্যাস দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহও মূলত দেশের পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলে নির্মিত হয়েছে। যমুনা ও পদ্মা সেতু নির্মাণের আগে পূর্বাঞ্চল থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে পরিবহনের সহজ উপায় ছিল না। তবে কিছু সরকারি নীতি জ্বালানি বিষয়ক এই অসম পরিস্থিতি আরও প্রকট করে। তার একটি হলো শিল্প এবং গৃহস্থালি উভয় ধরনের ব্যবহারের জন্য পাইপ ভিত্তিক গ্যাস সরবরাহের নীতি। যদি প্রথম থেকেই গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য সিলিন্ডার ভিত্তিক গ্যাস সরবরাহের নীতি গৃহীত হতো তাহলে অন্তত গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য গ্যাস লভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তা বহুলাংশে দূর হতো। সিলিন্ডার ভিত্তিক গ্যাস সরবরাহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্যও গ্যাস ব্যবহার সুগম হতো। সমুদ্র অভিগম্যতার চেয়ে জ্বালানি অভিগম্যতা বিষয়ক অসমতা দূর করা সহজ হওয়ার কথা। এর জন্য প্রয়োজন পুরো দেশব্যাপী সংগ্রন্থিত গ্যাস বিতরণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালনের গ্রিড নেটওয়ার্ক নির্মাণ সম্পন্ন করা। যমুনা ও পদ্মা সেতুর নির্মাণ এই লক্ষ্য অর্জনকে সহজ করেছে। দ্রুত ও দক্ষতার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে যাতে জ্বালানি অভিগম্যতার বিষয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীভূত হয়।

৬.৩.১.৩ *রাজধানী অভিগম্যতায় অসমতা হ্রাস*

রাজধানী থেকে দূরত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেশের সকল অঞ্চলের অবস্থা এক নয় এবং সেটাও আঞ্চলিক বৈষম্যের একটি তলবর্তী কারণ। বাংলাদেশের জন্য রাজধানী ঢাকার অত্যাধিক আকার এবং গুরুত্বের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাব এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে নিচে আমরা দেখবো যে, এই আকার বৃদ্ধির একটি কারণ হলো রাজধানীতে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ। ফলে রাজধানীর নৈকট্য অধিকতর অর্থনৈতিক বরাদ্দসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়াকে সহজ করে তোলে। এটা কাকতালীয় নয় যে, দেশের যেসব জেলায় অতিদারিদ্র্য হার বেশি সেগুলোর বেশিরভাগই রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত।

আঞ্চলিক বৈষম্যের এই তলবর্তী কারণ দূরীকরণের লক্ষ্যে রাজধানীর সাথে সকল এলাকার গণযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। বৃটিশ আমলে নির্মিত রেললাইন এজন্য একটি ভালো ভিত্তি যুগিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয় আমলেই রেল যোগাযোগ অবহেলিত হয়েছে। অন্যদিকে সড়ক নির্মাণেও সুষম অগ্রগতি হয়নি। অধুনাকালে বাংলাদেশে আন্তঃজেলা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সড়ক বিনির্মাণেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে রাজধানীর সাথে দেশের দূরবর্তীসহ বিভিন্ন জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়া হয়নি। প্রথমত, যেটা আমরা চতুর্থ অনুচ্ছেদে লক্ষ করেছি, বহু ক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণ পরিবেশ বিধ্বংসী ধারায় অগ্রসর হয়েছে। যেমন প্লাবনভূমি এবং হাওর অঞ্চলে মাটি উঁচু করে সড়ক নির্মাণ দেশের বন্যা ও জলাবদ্ধতার সমস্যাকে আরও প্রকট করেছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সড়ক নির্মাণে কোনো উত্তমায়নের (*অপটিমাইজেশনের*) চেষ্টা করা হয়নি। যার ফলে কম দৈর্ঘ্যের সড়ক দিয়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটানোর যেসব সুযোগ ছিল তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি। ফলে জমির অপচয় ঘটেছে এবং প্লাবনভূমিতে পানি প্রবাহের বিরুদ্ধে আরও বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত, নির্মাণকাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে নিম্নমানের সড়ক নির্মিত হয়েছে এবং দ্রুতই তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। চতুর্থত, শুধু গ্রামাঞ্চলের সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে নয়, আন্তঃজেলা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রেও যেমন অনেক সময় অযাচিত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তেমনি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি প্রশস্ততার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ ছাড়া বাইপাস ও ওভারপাসের বিষয়ে যৌক্তিকীকরণ করা হয়নি। এসবের ফলে বিনিয়োগ ও জমি উভয়ের অপচয় ঘটেছে।

সুতরাং দেশের সকল অঞ্চলের জন্য রাজধানী অভিগম্যতার ক্ষেত্রে সমতা আনার জন্য একদিকে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। অন্যদিকে যেসব জেলা এখন রেল নেটওয়ার্কের বাইরে আছে, সেগুলিতে রেল যোগাযোগকে প্রসারিত করতে হবে। দেশের ভেতরে রেল ইঞ্জিন, বগিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণ বা মেরামতের যেসব সক্ষমতা ছিল সেগুলিকে পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি আরও বিকশিত করতে হবে। দেশীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে রেল যাতায়াত বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। রেল স্টেশনসমূহকে আধুনিক করতে হবে এবং জাপান ও ইউরোপের দেশসমূহের মতো রেলস্টেশনকে শহরের মূল কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। পদ্মা সেতুতে

রেললাইন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাজধানীর সাথে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির সুযোগ নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং এই সুযোগ ব্যবহার করতে হবে। এটা পরিতাপের বিষয় যে, যমুনা সেতুতে পর্যাপ্ত শক্তিমত্তার রেলসংযোগ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছে তার সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হতে হবে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তার সদ্ব্যবহারেও উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য বাস পরিবহন ব্যবস্থাকে সিন্ডিকেটমুক্ত করতে হবে যাতে সুলভে যাতায়াত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস চলাচল করে।

৬.৩.১.৪ অন্যান্য ভৌত কাঠামোগত পার্থক্য হ্রাস

বস্তুগত সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আরেকটি যে পার্থক্য বৈষম্যের পেছনে কাজ করতে পারে তা হলো ভৌত কাঠামোগত। সমুদ্র, জ্বালানি এবং রাজধানী অভিগম্যতা বিষয়ক উপরের আলোচনায় ভৌত কাঠামোর বিষয়টি ইতিমধ্যে চলে এসেছে। তবে সড়ক, বন্দর, রেলপথ ছাড়াও ভৌত কাঠামোর আরও উপাদানও রয়েছে যা বৈষম্যের পেছনে কাজ করতে পারে। তার একটি উদাহরণ হলো ভূমি উন্নয়ন।

ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো কোনো অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের মতো ভূমিগত পরিস্থিতি নাও থাকতে পারে। মাহমুদ (২০০৫) জানান যে, শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর এলাকাসমূহে ভৌতকাঠামোগত সম্পদের পরিমাণ সর্বনিম্নের ৫০টি জেলার পর্যায়ে তিনগুণ বেশি ছিল। জহির (২০১১) লক্ষ করেন যে, উচ্চ প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন এলাকায় জমির মালিকেরা বিশেষভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, ভূমি প্রকৃতির কারণে এই লাভ অর্জন সম্ভবপর হয় তবে তা আয় বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেয়। সেকারণে তিনি এই লাভের উপর কর আরোপ এবং এ থেকে সংগৃহীত অর্থ দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় বিনিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাবটি বিবেচনাযোগ্য।

বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে উপর্যুক্ত অসমতার অভিঘাত দূর করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে লক্ষ করা দরকার যে, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের "আপেক্ষিক সুবিধা" থাকতে পারে। সেজন্য সব অঞ্চলের অর্থনীতির যে একই কাঠামো থাকতে হবে এমন

কোনো কথা নেই। তদুপরি একটি দেশের ভেতর যদি শ্রম ও পুঁজির চলাচলের মধ্যে কোনো বিঘ্ন না থাকে তবে উপকরণ (*ফ্যাক্টর*) আয়ের হারের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কাজেই আঞ্চলিক বৈষম্য প্রশমনের লক্ষ্যে এ দিকটির প্রতিও নজর দেওয়া প্রয়োজন[৪২]।

৬.৩.১.৫ *মানব সম্পদগত পার্থক্য হ্রাস*

বস্তুগত সম্পদ সংক্রান্ত পার্থক্যের পাশাপাশি মানব সম্পদগত পার্থক্যও আঞ্চলিক বৈষম্যের পেছনে কাজ করে। অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ও মাত্রাকে প্রভাবিত করে। তবে এক্ষেত্রে বিপরীত সম্পর্কও কাজ করে। একটি অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে তা মানব সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকেও পিছিয়ে যায়। লক্ষণীয়, বৈষম্য হ্রাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুগত সম্পদের তুলনায় মানব সম্পদের পার্থক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। তা হলো এ যে, উপযোগী সরকারি নীতির মাধ্যমে বস্তুগত সম্পদের পার্থক্য যতটা প্রশমিত করা যায় মানব সম্পদগত পার্থক্য দূর করা যায় তার চেয়েও বেশি। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সম্পূরক নীতি। নিচের উপ-অনুচ্ছেদে আমরা নীতি সংক্রান্ত বৈষম্য হ্রাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

৬.৩.২ *নীতিগত বৈষম্য হ্রাস*

এ প্রসঙ্গে দুই ধরনের নীতির কথা আমরা আলোচনা করবো: বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ।

[৪২] মাহমুদ (২০০৫) দেখান যে, "আপেক্ষিক সুবিধা"র তারতম্য বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। অন্য যেসব বিষয় এক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেন তা হলো ভৌত অবকাঠামো, সেবা এবং বাজারে অভিগম্যতা এবং রাজধানী ঢাকাতে সকল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি। তিনি দেখান যে, Zohir (2011) ভৌগোলিক বৈষম্যে বৃদ্ধির পেছনে যেসব প্রাকৃতিক এবং ভৌত প্রভাবকের উল্লেখ করেন তা হলো প্রাকৃতিক গ্যাসের লভ্যতা, পরিচ্ছন্ন পানির সরবরাহ, সড়ক যোগাযোগ, নগরের সাথে সংগ্রন্থন।

৬.৩.২.১ *সরকারি বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস*

সম্পদগত পার্থক্য প্রশমনের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। সেজন্য সরকারি নীতির বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাজস্ব আয়-ব্যয়ের কথা। বাংলাদেশের সরকারি বাজেট বরাদ্দ করা হয় মন্ত্রণালয়ের ভিত্তিতে। ফলে এই বরাদ্দের আঞ্চলিক বিতরণ নিরূপণ করা কঠিন। যেসব প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হয় সেগুলোর স্থানের ভিত্তিতে বাজেটের আঞ্চলিক বিতরণ সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। যেমন, সাম্প্রতিককালে পাবনার ঈশ্বরদীতে ব্যয়বহুল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ অগ্রসর হওয়ায় উত্তরবঙ্গের জন্য সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহের বেশিরভাগই উপকূলীয় এলাকায় এবং পূর্বাঞ্চলে। ফলে সরকারি বরাদ্দে উত্তরবঙ্গের অংশ এখনো তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং সঠিক এবং পুরো তথ্য না পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে ধারণা করা যায় যে, সরকারি বরাদ্দে অসমতা আঞ্চলিক বৈষম্যের একটি অন্যতম কারণ। প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই অসমতা হ্রাস করা যায়। লক্ষ করা যেতে পারে, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি হলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আয় ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতা বজায় রেখেই এমন নীতি গ্রহণ যাতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহ বেশি বরাদ্দ পায়, আর এর ফলে সেখানে প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হয়, দারিদ্র্য হ্রাস পায় এবং জীবনমানের উন্নতি ঘটে। দ্বিতীয়টি হলো, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে আঞ্চলিক বা স্থানীয় সরকারসমূহকে অধিক ক্ষমতা প্রদান তথা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

লক্ষণীয়, যদিও বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার সংস্থার সংখ্যা বিরাট কিন্তু তাদের হাতে আয়-ব্যয়ের এখতিয়ার অত্যন্ত সীমিত। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের অধীনে বর্তমানে ৩টি পার্বত্য জেলাসহ মোট ৬৪টি জেলা পরিষদ, ১২টি নগর কর্পোরেশন, ৩২৯টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ এবং ৪,৫৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং কাজ করছে। সংবিধানের ৬০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এসব স্থানীয় পর্যায়ের সরকারের কর আরোপের মাধ্যমে আয় সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ণের মাধ্যমে তার ব্যয়, এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন। বস্তুত সরকারি আয়-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ

পৃথিবীর সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত একটি দেশ (আহসান ২০২২)।[৪৩] চিত্র ৬.৭ দেখায় যে, সাধারণভাবে যেসব দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সেসব দেশে সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকারের তত ভূমিকা বেশি। উচ্চ আয়ের দেশসমূহে মোট সরকারি ব্যয়ে স্থানীয় সরকারের অংশ প্রায় ৩০ শতাংশ। এমনকি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের ক্ষেত্রেও এই অংশ ২০ শতাংশের একটু বেশি। বাংলাদেশ সম্প্রতি নিম্ন মধ্য আয়ের ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় বাংলাদেশের জন্য এই অনুপাত মাত্র প্রায় ৭ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকারি আয়-ব্যয় অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত।

চিত্র ৬.৭ আন্তর্জাতিক তুলনায় বাংলাদেশে মোট সরকারি ব্যয়ে স্থানীয় সরকারের অংশ

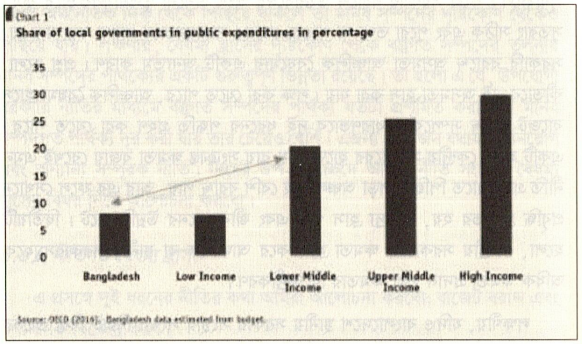

সূত্রঃ Ahsan (2022).

নিকটবর্তী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সাথে তুলনা করলেও সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অতি-কেন্দ্রীভূত পরিস্থিতি চোখে পড়ে। চিত্র ৬.৮ দেখায় যে, মোট সরকারি ব্যয়ে স্থানীয় সরকারের অংশ চীনে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং জাপানে ৬০ শতাংশ। বাংলাদেশের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশি তুলনাযোগ্য দেশ

[৪৩] বাস্তবে বাংলাদেশে সকল সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার করে থাকে। বিপরীতে, উপরিল্লিখিত নগর কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, এবং উপজেলা পরিষদসহ প্রায় ৯০০টি স্থানীয় সরকার সংস্থা মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয়ের অধিকারী।

ভিয়েতনামে এই অনুপাত প্রায় ৪৫ শতাংশ। চিত্র ৬.৮ আরও দেখায় যে, অধিকাংশ দেশে ব্যয়ের চেয়ে আয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অনেক বেশি। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার কর, শুল্ক ইত্যাদি দ্বারা আয় সংগ্রহ করলেও তা বহুলাংশে ব্যয় করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে[৪৪]। ফলে দেশের আয়ের আঞ্চলিক পুনর্বিতরণ সাধিত হয় এবং তার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পায়। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে আয়ের আঞ্চলিক পুনর্বিতরণের সুযোগ একরকম নেই বললেই চলে। সুতরাং আগামীতে বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে দুই ধরনের প্রয়াসই প্রয়োজন হবে। একদিকে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। অন্যদিকে সরকারের আয়-ব্যয়ে স্থানীয় সরকারসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার মাধ্যমে আঞ্চলিক সমতা-অভিমুখী আয়ের পুনর্বিতরণ সাধন করতে হবে।

চিত্র ৬.৮: সরকারি আয়-ব্যয়ে স্থানীয় সরকারের অংশ:
পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় কিছু দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

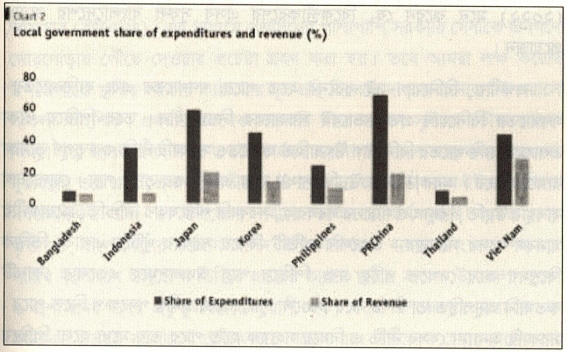

সূত্রঃ Ahsan (2022).

[৪৪] তবে এক্ষেত্রে চীন, জাপান, কোরিয়া, এবং ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় ভিয়েতনামের পরিস্থিতি অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ। সেদেশে ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেমন, আয়ের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আহসান (২০২২) দেখান যে, বিকেন্দ্রীকরণ শুধু আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস নয়, সামগ্রিকভাবে এসব দেশের প্রবৃদ্ধি হার দ্রুততর করেছিল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমত, স্থানীয় সরকারের পক্ষে স্বীয় এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রণোদনা ছিল এবং স্থানীয় পরিস্থিতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের আরও বিশদ জ্ঞান ছিল। দ্বিতীয়ত, উপর্যুক্ত প্রণোদনা স্থানীয় সরকারসমূহকে একে অপরের সাথে দ্রুত উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রবুদ্ধ করেছে। তৃতীয়ত, দ্রুত উন্নয়নের এই তাগিদে স্থানীয় সরকারসমূহ নীতি বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক সময় গোপনে উদ্যোগী হয়েছে এবং যেসব উদ্যোগ সফল প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার পরে সারা দেশের জন্য গ্রহণ করেছে। চতুর্থত, স্থানীয় সরকারসমূহের এসব কর্মোদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে। পঞ্চমত, এই প্রক্রিয়া উঁচুমানের নগরায়ণকে সুগম করেছে এবং তা অর্থনীতির প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়ক হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আহসান (২০২২) মনে করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণের এসব সুফল বাংলাদেশের জন্যও প্রয়োজন।

লক্ষণীয়, বিনিয়োগ দুই ধরনের হতে পারেঃ গণখাতের এবং ব্যক্তিখাতের। গণখাতের বিনিয়োগ প্রত্যক্ষভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করাতেও সরকারি নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অবকাঠামোর উন্নতি সাধন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ, সরকারি পরিষেবার নিশ্চিতি, প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের সরবরাহ– এগুলোর প্রতিটি বিষয়ে সরকার খুঁটিয়ে এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহে এগুলোর কোনটি কতখানি অনুপস্থিত তা নির্ণয় করে সেগুলো পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। সরকারি অন্যান্য যেসব নীতি এ বিষয়ে সহায়ক হতে পারে তার মধ্যে হলো পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, সেসব অঞ্চলে কলকারখানা নির্মাণের প্রয়োজনীয় আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণের শুল্ক হ্রাস, অর্জিত মুনাফার উপর প্রথম কিছু বছর কর হ্রাস ইত্যাদি। তবে লক্ষ করা দরকার, এ ধরনের বাছাইনির্ভর (*ডিস্ক্রিমিনেটরী*) নীতি প্রয়োগের অপব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য এসব নীতির সাফল্যের জন্য প্রশাসনের সততা আবশ্যক।

৬.৩.২.২ *প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ*

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো আয় ব্যয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এর জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। সুবিদিত, বঙ্গবন্ধু জেলা প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি জেলা গভর্নর পদের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এসব জেলা গভর্নর নির্বাচিত হবেন এবং তাদের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী "জেলা সরকার" প্রতিষ্ঠিত হবে, যার হাতে অনেক আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ক্যু'র ফলে বঙ্গবন্ধু তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। পঞ্চম অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, এরশাদ জেলা ও মহকুমাকে টপকে থানার উপর মনোযোগী হন। তিনি এগুলোকে উপজেলা নাম দেন। উপজেলা পর্যায়ে তিনি একটি নির্বাচিত স্থানীয় সরকার গড়ে তোলেন, যার প্রধান হন নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান। প্রত্যেক উপজেলায় মূল প্রশাসন যন্ত্র এবং বিভিন্ন অধিদপ্তরের অফিস খোলা হয়। প্রশাসনের মূল কর্মকর্তার পদবি দেওয়া হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (*ইউএনও*)। এর মাধ্যমে প্রশাসনের পাশাপাশি সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। তবে আমরা লক্ষ করেছি, উপজেলাকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি হিসেবে দাড় করানোর এই প্রয়াসের সাফল্য আংশিক। প্রথমত, অনেক সরকারি দপ্তর ও পদ সৃষ্টিসহ ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা হলেও এসব দপ্তর ততটা কার্যকর হয়নি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর দুরাবস্থাই তার একটি প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, উপজেলা চেয়ারম্যান বনাম ইউএনও বিরোধ সর্বজনবিদিত এবং তা উপজেলা পর্যায়ে সরকারের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের বর্তমান আসন ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং এসব আসনের পরিধি বহুলাংশে উপজেলা ভিত্তিক হওয়ার কারণে স্থানীয় সাংসদ উপজেলা সরকার ও প্রশাসনের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী হন। ফলে উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও উভয়ই বহুলাংশে প্রান্তিক হয়ে পড়েন এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে স্থানীয় সাংসদের বিরোধ দেখা দেয়।

এসব বিভিন্ন সমস্যার কারণে আহসান (২০২২) উপজেলার পরিবর্তে বর্তমানের জেলা (যেগুলো আগে মহকুমা ছিল) সমূহকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি

হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন[৪৫]। এর জন্য তিনি একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, আঞ্চলিক এবং প্রশাসনিক একক হিসেবে উপজেলা বেশি ক্ষুদ্র। ফলে এগুলোর "আকারজনিত সাশ্রয়" (*ইকোনমিজ অব স্কেল*) কম, সম্ভাব্য রাজস্ব ভিত্তি সংকীর্ণ, কারিগরি সক্ষমতা অপর্যাপ্ত, এবং তা খণ্ডিকরণ ও সমন্বয়ের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। এই ক্ষুদ্রতার সমস্যা অতিক্রম করা গেলে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারদেরসহ) সরকারি কর্মকর্তাদের পক্ষে নিজেদের কর্মস্থলকে নিজেদের বাসস্থান হিসেবে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করা সহজ হবে এবং তার ফলে স্থানীয় পর্যায়ের সরকার প্রাণ খুঁজে পাবে। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি উপরে উল্লিখিত হয়েছে, বর্তমানে উপজেলাগুলো বহুলাংশে সংসদের নির্বাচনী এলাকার সাথে মিলে যায়: যার ফলে একেক উপজেলায় একজন সাংসদ থাকেন এবং তার সাথে উপজেলা চেয়ারম্যানের সংঘাত অনেকটা ব্যক্তিগত সংঘাতের রূপ গ্রহণ করে। জেলা পর্যায়ে যেহেতু বেশ কয়েকজন সাংসদ হবেন সেহেতু জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে সাংসদদের বিরোধ ব্যক্তিগত বিরোধের রূপ নিবে না।

তবে আহসান (২০২২) স্বীকার করেন যে, জেলাগুলোকে মূল গ্রন্থি হিসেবে গ্রহণ স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বাংলাদেশের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির বড় ধরনের পরিবর্তন দাবি করবে, কারণ বর্তমানে সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের মধ্যে জেলা পর্যায়ের সরকার সবচেয়ে দুর্বল। জেলা পরিষদ থাকলেও তার এখতিয়ার ও দায়িত্ব পরিষ্কার নয় এবং মূলত "অবশিষ্ট" (*রেসিডুয়াল*) চরিত্রের—অর্থাৎ যেসব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং উপজেলা সরকারকে দেওয়া হয়নি কেবল সেটাই জেলা পরিষদ দাবি করতে পারে। ফলে বর্তমানে জেলা সরকারের প্রতি সম্পদের সরবরাহ ক্ষীণ। এটা আশ্চর্যের নয় যে, জেলা সরকারের নির্বাচন কেবলই স্থগিত থাকছে।

সুতরাং জেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি হতে হলে সংবিধানের অধীনে নতুন আইনি কাঠামো প্রণয়নের প্রয়োজন হবে যা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বণ্টন পুনর্নির্ধারণ ও স্পষ্ট করবে। বিশেষত এই আইন দ্বারা রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিষয়ে স্থানীয় সরকারসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে। আহসানের মতে এই বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করে

[৪৫] এ প্রসঙ্গে তিনি লক্ষ করেন যে, এটা করা হলে ভিয়েতনামের সাথে বাংলাদেশের মিল হবে, কারণে ভিয়েতনামে ৬৩টি প্রদেশ রয়েছে এবং সেগুলিকেই স্থানীয় সরকারের মূল পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি "অর্থায়ন কমিশন" গঠন করা প্রয়োজন হবে। বলাবাহুল্য, এই বর্ধিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করতে হলে জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আহসান মনে করেন যে, সে উদ্দেশ্যে একটি পৃথক "স্থানীয় সরকার প্রশাসন সার্ভিস" গড়ে তোলা যেতে পারে এবং প্রণোদনার জন্য এই সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্যদের বিদ্যমান কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ রাখা যেতে পারে। এসব বিষয়ে সবদিক বিবেচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আহসান একটি "প্রশাসনিক কমিশন" গঠনের আহ্বান জানান (আহসান, ২০২২)।

নিঃসন্দেহে, বিকেন্দ্রীকরণের এসব প্রস্তাব সম্পর্কে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। প্রশাসন ও রাজনীতির সাধারণ মান উন্নত না করে এবং প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেলের অবসান না ঘটিয়ে সরকারি আয়-ব্যয়ের বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে তাতে কেবল অশুভ আচরণের আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সম্প্রতিকালে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে যে ধরনের বিপুল অর্থ ব্যয় এবং সহিংসতার নজির দেখা যাচ্ছে তাতে পরিষ্কার যে, জনসেবা করার সুযোগ পাওয়াই এসব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মূল লক্ষ্য নয়। বরং উপজেলা পরিষদের পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন বৈধ ও অবৈধ উপায়ে বিত্ত অর্জন এখানে সম্ভবত মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন না করে বাজেট ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ থেকে সুফল পাওয়া কঠিন হবে। গ্রাম পরিষদ এমনকি অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা পরিষদ গঠন করেও পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন কঠিন হতে পারে। তবে, নিঃসন্দেহে, সঠিকভাবে করা গেলে, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস গোটা দেশের উন্নয়নকে দ্রুততর করবে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহে পুঁজির প্রকৃত উৎপাদনশীলতা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার পথের বাধাসমূহ অপসারণ করা গেলে "পিছিয়ে থাকার সুবিধা" (*এডভান্টেজ অব ব্যাকওয়ার্ডনেস*) (Gerschenkron, 1953) অথবা অগ্রসর এলাকার সাথে "ব্যবধান দূর করা"র ইতিবাচক প্রভাব (ক্যাচ-আপ এফেক্ট) দ্বারা দেশ উপকৃত হবে।[৪৬]

[৪৬] Sen, Ahmed, Ali, and Yunus (2014) দেখান যে, ২০০০-২০১০ সময়কালে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম ব্যবধান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে তাঁরা যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেন তার মধ্যে হলো "পিছিয়ে থাকার ব্যবধানের সুবিধা" অথবা "ক্যাচ-আপ প্রভাবসঞ্জাত কারণে পশ্চিমাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে মানব সম্পদ বৃদ্ধি; ক্ষুদ্র ঋণের অধিক সম্প্রসারণ; দ্রুততর নগরায়ন; যোগাযোগ – বিশেষত সড়ক ব্যবস্থার – উন্নয়ন এবং তার ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র ও মাঝারি

৬.৪ উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতা হ্রাসের লক্ষ্যে করণীয়

স্বাধীনতার পর সত্তর দশক পর্যন্ত রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে বিভিন্ন জেলা শহরসমূহের জীবন মানের ব্যবধান তত বেশি ছিল না। আশির দশক থেকেই এই ব্যবধান দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর একটি কারণ অবশ্যই ছিল ঢাকার একটি স্বাধীন দেশের রাজধানীতে রূপান্তরিত হওয়া। এর ফলে এই শহর বিপুল পরিমাণ আয়-ব্যয়ের ক্ষমতার অধিকার হয় এবং যেটা আমরা উপরে লক্ষ করেছি, স্থানীয় সরকারসমূহের এক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা না থাকায় স্বাধীনতার এই ফলাফল বাকি শহরসমূহে তেমন পৌঁছায়নি।

এর সাথে উপরিল্লিখিত দ্বিতীয় যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো, অনেকটা অকস্মাৎ তৈরি পোশাকশিল্পের বিকাশ। বিশ্বায়ন, মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের (এমএফএ) অধীনে শুল্কবিহীন রপ্তানির সুযোগ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্ভব ঘটে। আশ্চর্য্যের নয় যে, ঢাকা শহরেই এই শিল্পের সূচনা ঘটে এবং সমাবেশনের (*এগ্লোমারেশন*) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা দ্রুত বিকশিত হয়। এর ফলে একদিকে নিয়োজনের সুযোগের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে এবং সারা দেশ থেকে বিরাট সংখ্যায় শ্রমজীবীদের ঢাকায় আগমন ঘটে। অন্যদিকে পুঁজি আয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে এবং তা বহুলাংশে ঢাকাতেই বিনিয়োজিত হয়। ব্যক্তিখাতের এই বিনিয়োগের পাশাপাশি গণখাতে বিনিয়োগের বৃদ্ধি এই ব্যবধানকে বাড়িয়ে তোলে। এভাবেই ঢাকা শহরের আকার বৃদ্ধির একটি ঊর্ধ্বচক্রের উদ্ভব ঘটে এবং দ্রুত ঢাকা শহর বাকি সব জেলা ও বিভাগীয় শহর থেকে গুণগতভাবে এক পৃথক রূপ ধারণ করে। একটি উচ্চতর অবস্থানে চলে যাওয়ার কারণে ঢাকা শহর দেশের অন্যান্য স্থানের বিনিয়োজিতব্য সম্পদকেও আকর্ষণ করতে থাকে। ফলে ঢাকা শহর ফুলে-ফেঁপে ওঠে অথচ বাকি শহরসমূহ বহুলাংশে আগের মতোই থেকে যায়। আরও কতগুলো কারণ ঢাকা শহরের আকার বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও তজ্জনিতকারণে দেশের উপকূলীয় এলাকার ক্রমনিমজ্জন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি ইত্যাদি। ফলে সে এলাকার বহু মানুষ অধিকতর নিরাপদ জীবনের সন্ধানে ঢাকা অভিমুখী হয়েছেন। একইভাবে বিগত সময়কালে নদী ভাঙ্গনের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলেও বহু মানুষ নতুন জীবনের সন্ধানে ঢাকায় ঠাঁই নিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের দ্রুততর বৃদ্ধি। তাদের গবেষণা আরও দেখায় যে, ২০০০-২০১০ সময়কালে অধিক নগরায়ন পূর্বাংশে অধিকতর সমৃদ্ধির পেছনে বড় কারণ হিসেবে কাজ করলেও এসময়কালের শেষের দিকে পূর্বাংশের সমৃদ্ধিতে নগরায়নের অবদান বহুলাংশে হ্রাস পায়।

উপ-অনুচ্ছেদ ৬.২-এর আলোচনায় আমরা দেখেছি, ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি এখন একদিকে নগরবাসীদের জীবনমানের অবনতি ডেকে আনছে। অন্যদিকে সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাবের সর্বোচ্চ মাত্রা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ঢাকা শহরের বৃদ্ধি এখন দেশের জিডিপির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সুতরাং আগামীতে বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো ঢাকা শহরের বৃদ্ধির উপর রাশ টেনে ধরা এবং ক্রমান্বয়ে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা কমিয়ে নিয়ে আসা। যেহেতু ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির কারণ বহুমাত্রিক সেহেতু এই অতিবৃদ্ধি রোধসহ এই শহরের আকার হ্রাস করার প্রচেষ্টাকেও বহুমাত্রিক হতে হবে। নিচে তার কয়েকটির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

প্রথমত, দেশব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও হ্রাস করতে হবে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, যদিও সময়ে এই হার হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তি আকার বহু গুণ বেড়ে যাওয়ায় বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ তেমন হ্রাস পায়নি। সুতরাং আত্মসন্তুষ্টি পরিত্যাগ করে পরিকল্পিত জনসংখ্যার লক্ষ্যে আরও সক্রিয় হতে হবে। সেক্ষেত্রে ঢাকায় অভিবাসনের চাপ যেমন কমবে তেমনি এই শহরের আকার বৃদ্ধির হ্রাস সুগম হবে।

দ্বিতীয়ত, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। অনেক শিল্প এখন শৈশাবস্থা অতিক্রম করেছে; ফলে এগুলোর বিকাশের জন্য ঢাকায় সমাবেশনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানেই এখন এসব শিল্পের প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং বিকাশ ঘটা সম্ভব। সরকার শিল্প বিকাশের জন্য দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। তবে এই কর্মসূচি তেমন অগ্রসর হয়নি। ফলে এখনও দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুলাংশে স্বতঃস্ফূর্ত এবং বিশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠছে। গবেষক সৈয়দ আখতার মাহমুদের (Mahmood, 2022) মতে, একসাথে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও সেগুলোকে সফল ও কার্যকর করার সক্ষমতা সরকারের নেই। বরং প্রথমাবস্থায় অল্প কয়েকটি বাছাই করে সেগুলোকে সফল করার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা যেতে পারে। সুবিদিত, বাংলাদেশে সরকার নির্ধারিত স্থানে শিল্প বিকাশের প্রয়াসের এযাবৎ অভিজ্ঞতা উৎসাহজনক নয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিল্প নগরীর দিকে তাকালেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সাভারে প্রতিষ্ঠিত চামড়া শিল্প নগরীর অভিজ্ঞতাও আশাপ্রদ নয়। তবে যমুনা সেতু, পদ্মা সেতু

ও পায়রা বন্দর নির্মাণ এবং মোংলা বন্দরের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত পূরিত হয়েছে। এখন যেটা প্রয়োজন তা হলো, সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মাধ্যমে এসব সুযোগকে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যেতে পারে যে, সরকার বেশ সাফল্যের সাথেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন জোন করে দিচ্ছে। এমনকি আলাদা করে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য-- যেমন, জাপান, কোরিয়া, ভারত --- জোন করে দিচ্ছে। সেজন্য সরকার প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করছে এবং ভূমি উন্নয়নসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো ও উপযোগ সরবরাহের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করছে। অভিযোগ আছে যে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তুলনায় দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান-অভিমুখী করার বিষয়ে সরকার ততটা সচেষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। লক্ষণীয়, পরিকল্পিত ও যথাযথভাবে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা গেলে ঢাকা শহরের আকার বৃদ্ধি হ্রাসের পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈষম্য এবং শিল্প দূষণ হ্রাসও সুগম হতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, সাংস্কৃতিক সুবিধাদি, বিভিন্ন ভৌত উপযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের সাথে বিভাগীয় ও জেলা শহরসমূহের পার্থক্য কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে, যাতে এই পার্থক্যের কারণে দেশের সকল স্থানের মানুষ ঢাকায় অভিগমনের প্রয়োজন অনুভব না করেন। আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রসঙ্গে উপরে এ বিষয়টি ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থত, "স্বস্থানে নগরায়ণ"কে উৎসাহিত করতে হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় তার একটি মৌল বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম থেকে শ্রমজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় শহরে অভিগমন এবং অভিবাসন। এভাবেই শিল্পায়ন, উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের সাথে নগরায়ণের প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমাগতভাবে কমবে এবং শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাবে। অর্থনীতি শাস্ত্রে "লুইস প্রবৃদ্ধি মডেল" এই ধারণাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে (Lewis, 1954)। বাংলাদেশের এযাবৎ শিল্পায়ন এবং আধুনিকায়নের অভিজ্ঞতাও বহুলাংশে এই ধারণার অনুবর্তী হয়েছে। কিন্তু বিশ্বে এ বিষয়ে কিছু ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাও দেখা গিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে স্বস্থানে নগরায়ণ শীর্ষক প্রস্তাবনার উদ্ভব ঘটেছে। এই ধারণা

অনুযায়ী শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নের জন্য অভিবাসন ভিত্তিক নগরায়ণ অপরিহার্য নয়। জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে গ্রামে রেখেই একটি দেশ উন্নত, আধুনিক ও শিল্পায়িত হতে পারে। এটা হতে পারে দুইভাবে (দ্রষ্টব্য: United Nations, 2021)। প্রথমটি হলো গ্রামে থেকেই নিকটবর্তী শহরের উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্প এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ। স্বস্থানে নগরায়ণের এই মডেলের একটি উদাহরণ হলো শ্রীলংকা। সেদেশের সরকার গ্রামের জনগণকে নিকটবর্তী শহরে সহজে যাতায়াতের সুযোগ করে দেয়। সেজন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করে এবং সস্তা ও পর্যাপ্ত বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করে। গ্রামবাসীরা সকাল বেলা শহরে গিয়ে কলকারখানা, আধুনিক সেবাপ্রদান সংস্থা এবং অন্যান্য উচ্চ উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে কাজ করে বিকালে গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরতে পারেন। ফলে শহরের এবং গ্রামের অধিবাসীদের গড় আয়ের ব্যবধান কমে যায় এবং জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে শহর-গ্রামের তেমন প্রভেদ থাকে না। উন্নয়নের এই মডেল অনুসরণ করেই শ্রীলংকা মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের বেশিকে গ্রামে রেখেই উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়। স্বস্থানে নগরায়ণের এই মডেলকে অনেকসময় "হাব-অ্যান্ড-স্পোক" মডেল বলেও আখ্যায়িত করা হয়, যার অধীনে ছোট শহরগুলো "হাব" হিসেবে কাজ করে এবং চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহ "স্পোক"-এর (উন্নত সড়ক যোগাযোগ এবং সুলভ বাস যাতায়াত ব্যবস্থার) মাধ্যমে এই শহরের সাথে সংযুক্ত থাকে।

স্বস্থানে নগরায়ণের দ্বিতীয় মডেলের অধীনে গ্রামাঞ্চলে শিল্প এবং আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। এই মডেলের বড় উদাহরণ হলো চীন। চীনের নেতা মাও জেদং ১৯৫৭ সালে যে "মহা-উল্লম্ফন" কর্মসূচির সূচনা করেন তার একটি মৌল উপাদান ছিল গ্রামে শিল্পের বিস্তার। সেসময় একাধিক গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে কমিউন গঠিত হয় এবং এসব কমিউনকে স্বীয় এলাকায় যৌথ কৃষি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি শিল্প উৎপাদন সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে যখন কমিউন ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন কমিউনের ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসনকে "শহর-গ্রাম সরকার" বলে পুনর্গঠিত করা হয়। ১৯৭৮ সালে চীনে কৃষি সংস্কার এবং পরে ১৯৮৪ সালে শিল্প সংস্কার কর্মসূচি অগ্রসর হলে শহর-গ্রাম সরকারসমূহ ব্যাপকহারে নিজ নিজ এলাকায় (অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে) বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে তোলে, যেগুলো "শহর-গ্রাম উৎপাদন প্রতিষ্ঠান" (*টাউনশিপ-ভিলেজ এন্টারপ্রাইজ*, সংক্ষেপে *টিভিই*) বলে

আখ্যায়িত হয়। এই প্রক্রিয়া এত ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, একটা পর্যায়ে চীনের মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি টিভিই সমূহে উৎপাদিত হয় এবং প্রায় ১২ কোটি শ্রমিক এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন লাভ করেছিল বলে অনুমিত হয়। চীনের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে টিভিই বিস্ফোরণ এবং তার ফলস্বরূপ "স্বস্থানে নগরায়ণও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

এসব অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নে স্বস্থানে নগরায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভৌগোলিক ক্ষুদ্রতা এবং জনসংখ্যার অত্যধিক ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য শ্রীলংকা মডেলই বেশি প্রাসঙ্গিক। যদি জেলা শহর সমূহ স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি হিসেবে গৃহীত হয়, তাহলে এগুলো স্বস্থানে নগরায়ণের "হাব-অ্যান্ড-স্পোক" মডেলের হাব হিসেবে কাজ করতে পারে। এসব শহরকে শিল্প ও আধুনিক সেবা উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে যাতে চতুর্পার্শ্বের গ্রাম থেকে জনগণ এসব শহরে প্রতিদিন কাজ করার জন্য আসতে পারে এবং কাজ শেষে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে স্বস্থানে নগরায়ণের জন্য সম্পূর্ণতই "হাব-অ্যান্ড-স্পোক" মডেলে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে তা নয়। অবস্থা বিশেষে গ্রামাঞ্চলে শিল্প বিস্তারের চৈনিক মডেলেরও উপযোগী ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজেই উভয় মডেলের যথাযথ সংমিশ্রণের মাধ্যমেই বাংলাদেশে স্বস্থানে নগরায়ণ মডেল অগ্রসর হতে পারে।

সম্প্রতিকালে সরকার "গ্রাম হবে শহর" স্লোগান উত্থাপন করেছে। এই স্লোগান যে স্বস্থানে নগরায়ণ প্রস্তাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সরকারের এই স্লোগান কতখানি সুচিন্তিত ও সংগ্রন্থিত কর্মসূচি দ্বারা সমর্থিত তা বলা কঠিন। আগামীতে এই স্লোগানকে স্বস্থানে নগরায়ণের একটি অর্থবহ কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করতে হবে। সেটা করা গেলে শুধু যে ঢাকা নগরী অভিমুখী জনস্রোত হ্রাস পাবে তাই নয়, সারা দেশের অন্যান্য শহরের বৃদ্ধিকেও পরিকল্পিত করা সম্ভব হবে।

পঞ্চমত, ঢাকা শহরের আকার স্থিতিশীল করার জন্য এই শহরের স্বল্প আয়ের শ্রমজীবীদের কল্যাণের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। সারা দেশের মতো ঢাকা শহরের অধিবাসীদের মধ্যেও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট। বস্তুত রাজধানীতেই এই বৈষম্য সবচেয়ে বেশি এবং অত্যন্ত চাক্ষুষভাবে প্রতিফলিত হয়। এখানে একদিকে

রয়েছে সুরম্য অট্টালিকা, অন্যদিকে আছে দুর্দশাকর বস্তি। গবেষকদের মতে, ঢাকা শহরে প্রায় ৫,০০০ বস্তি রয়েছে এবং তাতে শহরের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের মতো মানুষ বসবাস করেন। বস্তিতে অবস্থানরত পরিবারদের তিন-চতুর্থাংশ মাত্র একটি কক্ষে বসবাস করেন এবং তাঁরা অন্যান্য পরিবারদের সাথে গোসলখানা, পায়খানা, গ্যাস এবং খাবার পানির উৎস ভাগাভাগি করেন। তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ অপর্যাপ্ত। তাদের চিকিৎসার সুযোগ সীমিত এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ অপর্যাপ্ত এবং নিচু মানের। কিন্তু নিজেদের শ্রম বিক্রি করে তারাই মূলত শহরকে সচল রাখেন। দেশের এবং রাজধানী ঢাকার বৃহত্তর স্বার্থে স্বল্প আয়ের শ্রমজীবীদের জীবনমানের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। লক্ষণীয়, ঢাকা শহরের বস্তিবাসী শ্রমজীবীদের জীবনের মানোন্নয়ন এই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসেও সহায়ক হবে। অভিবাসন ছাড়া ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় যে উৎস তা হলো অভ্যন্তরীণ। জনসংখ্যা উত্তরণের যেসব শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন তা বস্তিবাসীদের পক্ষে অর্জন করা কঠিন। একদিকে রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সচেতনতার ঘাটতি। অন্যদিকে অপুষ্টি ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সুযোগের কারণে শিশুমৃত্যুর হার স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী পরিবারদের মধ্যে এখনো উঁচু। ফলে তাদের মধ্যে অধিক সন্তান ধারণের অর্থনৈতিক তাগিদ থাকে। সুতরাং শ্রমজীবীদের জীবনের মানোন্নয়ন যেমন উন্নয়নের অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে তেমনি ঢাকা শহরের আকারের বৃদ্ধি প্রশমনেও সহায়ক হবে।

৬.৫ উপসংহার

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রথম পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রতিফল হলো আঞ্চলিক বৈষম্যের বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ঢাকা শহর-কেন্দ্রিকতা। সামগ্রিকভাবে দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেলেও সব অঞ্চলে তা সমভাবে হয়নি। দেশের অতি দরিদ্রদের অর্ধেকের বেশি দেশের (মোট ৬৪ জেলার মধ্যে) ১৬টি জেলায় সীমাবদ্ধ। শিল্পায়নের হারের তারতম্য এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে। যেখানে ঢাকা জেলায় প্রতি ১০ বর্গ কিলোমিটারে ২৫টি বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে বরিশালে এর সংখ্যা মাত্র পাঁচটি।

এদিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এত বেশি ঢাকাকেন্দ্রিক হয়েছে যে তা এখন ঢাকা শহর এবং গোটা দেশ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের মোট শহুরে

জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত। মূল শহরে জনসংখ্যার কেন্দ্রিভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখন গুটি কয়েক ছাড়া বিশ্বের বাকি সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু ঢাকা শহরের এই অপরিকল্পিত ক্রমবৃদ্ধি এখন এই শহরের জীবনমানের অবনতি ঘটাচ্ছে। যানজট, বায়ু দূষণ, বর্জ্যের ভার ইত্যাদির অব্যাহত বৃদ্ধি এবং জলজ, সবুজ ও উন্মুক্ত ভূমির ক্রমবর্ধমান স্বল্পতার কারণে ঢাকার নগর জীবন আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। জীবনমানের দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাকা শহর এখন পৃথিবীর নিকৃষ্ট শহরসমূহের একটি বলে বিবেচিত হচ্ছে। আগে সমাবেশনের ইতিবাচক প্রভাবের কারণে ঢাকা শহরের বৃদ্ধির একটা ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল। কিন্তু, গবেষকদের মতে, বর্তমানে এই প্রভাব নেতিবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং আগামী বাংলাদেশের জন্য একটি বড় করণীয় হলো আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ। গবেষণা দেখায় যে, আঞ্চলিক বৈষম্যের পেছনে দুই ধরনের তলবর্তী কারণ কাজ করে। একটি হলো সম্পদগত পার্থক্য আর অন্যটি হলো সরকারি নীতি, যা সম্পদগত পার্থক্যকে লাঘব করতে পারে অথবা বাড়িয়ে দিতে পারে। সম্পদ আবার দুই ধরনের হতে পারে–বস্তুগত সম্পদ এবং মানব সম্পদ। যেসব বস্তুগত সম্পদের পার্থক্য বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈষম্যের পেছনে বিশেষভাবে কাজ করেছে তার মধ্যে হলো সমুদ্র, জ্বালানি ও রাজধানীর প্রতি অভিগম্যতার ক্ষেত্রে অসমতা, সাধারণভাবে ভৌত অবকাঠামোর লভ্যতার অসমতা এবং ভূপ্রকৃতিগত পার্থক্য। মানব সম্পদের ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সূচকের পার্থক্যও বৈষম্যের পেছনে ভূমিকা রেখেছে। এসবের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপরীত সম্পর্কও কাজ করে। একদিকে সম্পদগত ঘাটতি উন্নয়নের বিরুদ্ধে কাজ করে, অন্যদিকে উন্নয়নের অভাব এসব ঘাটতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সরকারি নীতি উন্নয়নে সম্পদগত পার্থক্যের প্রভাব প্রশমিত অথবা বাড়িয়ে তোলায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। সম্পদগত পার্থক্য প্রশমনের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ-গণখাতের এবং ব্যক্তিখাতের। গণখাতের বিনিয়োগ পুরোপুরিই সরকারের নিয়ন্ত্রণে। অনুন্নত অঞ্চলে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণেও সরকারি নীতি–যেমন, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, শুল্ক হ্রাস, কর রেয়াত ইত্যাদি–গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রত্যক্ষ সরকারি বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ উভয় ধারার তৎপরতা শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় সরকারের আয়-ব্যয় তথা বাজেটের মধ্যে।

সরকারি আয়-ব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার উপায় দুটি। একটি হলো আয়-ব্যয়ের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রেখেই পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের জন্য আরও বেশি বরাদ্দ নিশ্চিত করা। অন্যটি হলো আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব করে আঞ্চলিক/স্থানীয় সরকারসমূহের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথা সাধারণভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বোচ্চ কেন্দ্রীভূত দেশসমূহের অন্যতম। সমগ্র বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশের মতো স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে ব্যয়িত হয়। উন্নয়নের ভৌগোলিক সুষমতা নিশ্চিত করার জন্য আগামীর বাংলাদেশের জন্য প্রশাসনিকসহ আয়-ব্যয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে। গবেষকদের মতে উপজেলার পরিবর্তে বর্তমান জেলাসমূহকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল গ্রন্থি হিসেবে গ্রহণ করা শ্রেয় হবে, কারণ অর্থনীতির আকারের দৃষ্টিকোণ থেকে উপজেলাসমূহ পর্যাপ্ত নয় আর সেকারণেই এরশাদ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত উপজেলা সরকার ব্যবস্থা ততটা সফল হতে পারেনি। জেলা পর্যায়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠন করা গেলে সেগুলোকে সরকারি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া যাবে এবং তার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে। এই ধারায় অগ্রসর হতে হলে একটি অর্থায়ন সংস্কার কমিশন এবং একটি প্রশাসন সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে যাদের কাজ হবে সকল দিক বিবেচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করা যা গণ-আলোচনার জন্য পেশ করা যেতে পারে। তবে গ্রাম পরিষদের ক্ষেত্রে যেমন, জেলা পরিষদেও ক্ষেত্রেও তেমন–প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন নির্ভর করে দেশের রাজনীতির মানোন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধির বর্তমান নিঃসরণ মডেলের অবসানের উপর।

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপর্যুক্ত পদক্ষেপসমূহ ঢাকা শহরের আকার বৃদ্ধি প্রশমনের জন্য সহায়ক হবে। এর সাথে আরও যেসব পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে দেশব্যাপী জনসংখ্যা পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, স্বস্থানে নগরায়ণের পরিকৌশল গ্রহণ এবং ঢাকা শহরের স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী অধিবাসীদের জীবনের মানোন্নয়ন।

৭। সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি

আগামী দিনের বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি। মুক্তিযুদ্ধের শুভ ফলাফলের মধ্যে একটি ছিল সামাজিক সংহতি। ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, বাঙালি-পাহাড়ি, শহুরে-গ্রামীণ—সকল শ্রেণি-স্তর ও পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল। শহরের মানুষ গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল; মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল; শরণার্থী শিবিরে সকলেই এক কাতারে ছিল। প্রয়োজন ছিল এই অভূতপূর্ব সংহতিকে ধরে রাখা, আরও বিকশিত করা, এবং দেশের উন্নয়ন ও জাতি গঠনে যথাযথভাবে ব্যবহার করা। কিন্তু, বিভিন্ন কারণে সেটা কাঙ্খিত মাত্রায় করা সম্ভব হয়নি।

সামাজিক সংহতিতে দুই ধরনের ফাটল লক্ষ করা যায়। একটি হলো অনুভূমিক (*হরাইজন্টাল*) এবং অন্যটি হলো উল্লম্বিক (*ভার্টিক্যাল*)। অনুভূমিক বিভক্তির মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য, যেটা প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও যে কিছু প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে তা অর্থনৈতিক বিভক্তিকে সামাজিক বিভক্তিতে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ হলো ধনী এবং দরিদ্রদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিভক্তি বিরাজ করছে। অথচ উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে একীভূত শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাই নিয়ম।

উল্লম্বিক ফাটলসমূহের মূল কারণ রাজনৈতিক, যদিও এগুলোর পেছনে অর্থনৈতিক কারণও আছে। উলম্বিক বিভক্তির একটি উদাহরণ হলো সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি। উল্লম্বিক ফাটলের আরেক দৃষ্টান্ত হলো সমতলের জনগণের সাথে পাহাড়ি জনগণের বিরোধ। পাহাড়ি জনগণের বেশিরভাগ মুক্তিযুদ্ধে সমতলের বাঙালিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর এই ঐক্যও ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বহুক্ষেত্রে সমতলের সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক জনগণও অবিচারের সম্মুখীন হচ্ছে। সম্প্রতিকালে গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের জমি দখলের প্রয়াসের ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়। দক্ষিণের রাখাইন সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যেও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন অনুভূমিক এবং উল্লম্বিক বিভক্তি প্রশমণ করে মুক্তিযুদ্ধ-সৃষ্ট সামাজিক সংহতির পুনরুদ্ধার আগামী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। অধিকতর সামাজিক সংহতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সুশাসন অর্জনের জন্যও সহায়ক হবে।

৭.১ একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা

৭.১.১ শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং খণ্ডিকরণ

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সেজন্য আশা করা গিয়েছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করে সরকারি খাতে একটি সার্বজনীন উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা যথাযথভাবে পূরণ হয়নি। বরং, বিগত সময়কালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থা এখন অন্তত তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে উদ্ভব ঘটেছে ধনীদের সন্তানদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থা। অন্যদিকে রয়েছে স্বল্প ও মাঝারি আয়ের পরিবারদের জন্য বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজ। তৃতীয় ভাগে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এই দুই ধারার পরিবর্তনের মধ্যে কিছু পরস্পর সম্পর্কও রয়েছে। অর্থনীতির ভাষায় শিক্ষাখাতের এই ত্রিখণ্ডীকরণকে "পৃথকীকৃত ভারসাম্য" (*সেপারেটিং ইকুইলিব্রিয়া*) বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

৭.১.১.১ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা

বিবিএসের পরিসংখ্যান থেকে সরকারি-বেসরকারি খাতের ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্রটি বেরিয়ে আসে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণি ৭.১ তুলে ধরে। এই সারণি থেকে আমরা দেখি যে, এ বিষয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চিত্রটি খুবই ভিন্ন। যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি খাতের ভূমিকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৫৫ শতাংশ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকে ৬৭.১ শতাংশ, সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অনুপাত যথাক্রমে ৬.২, ৪.৪ ও ৭.৩ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে গিয়ে চিত্রটি আবার বদলে যায়। সেখানে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি খাতের ভূমিকা যথাক্রমে ২৯.৬ ও ৩৫.৬ শতাংশ হলেও শিক্ষার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে তা ৬৪.৫ শতাংশ, যেটা অনেকটা প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের অনুপাতে কাছাকাছি। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে আসে তা হলো, সরকারি খাতে অনেক কম সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে

সরকারি খাতে ৫৪.৬ শতাংশ শিক্ষক দিয়ে ৩৭.১ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪.৪ শতাংশ শিক্ষক দিয়ে ৭.৩ শতাংশ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যটি বেশি প্রকট উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি যেসব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে সরকারি খাতে মাত্র ২১.২ শতাংশ শিক্ষক দিয়ে ৫২.৬ শতাংশ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও পরিস্থিতিটি অনুরূপ, যদিও কিছুটা কম প্রকট। সেখানে সরকারি খাতে ৪৯.৮ শতাংশ শিক্ষক দিয়ে ৭৩.১ শতাংশ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

সারণি ৭.১: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ভূমিকা (%)

শিক্ষার পর্যায়	সরকারি (%)	বেসরকারি (%)
প্রাথমিক		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৫৫.২	৪৫.৮
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৬৭.১	৩২.৯
শিক্ষক সংখ্যা	৫৪.৬	৪৫.২
মাধ্যমিক		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৬.২	৯৩.৮
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৭.৩	৯২.৭
শিক্ষক সংখ্যা	৪.৪	৯৫.৬
উচ্চ (বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১৪.৬	৮৫.৪
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৫২.৬	৪৭.৪
শিক্ষক সংখ্যা	২১.২	৭৮.৮
বিশ্ববিদ্যালয়		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৩১.৩	৬৮.৭
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৭৩.১	২৬.৯
শিক্ষক সংখ্যা	৪৯.৮	৫০.২
উচ্চ (বিশ্ববিদ্যালয় সহ)		
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	২৯.৬	৭০.৪
শিক্ষার্থী সংখ্যা	৬৪.৫	৩৫.৫
শিক্ষক সংখ্যা	৩৫.৬	৬৪.৪

সূত্র: লেখকের নিজস্ব হিসাব (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩) কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে)

৭.১.১.২ শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিষ্কার চিত্র পাওয়া সহজ নয়। মোটা দাগে মাদ্রাসাসমূহ তিন ধরনের: আলিয়া মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা এবং স্বতন্ত্র মাদ্রাসা। সাধারণভাবে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকার অনুমোদিত; পক্ষান্তরে কওমি মাদ্রাসাসমূহ স্বাধীন এবং এগুলো সরকারের অনুমোদন প্রত্যাশা করে না। ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অঞ্চলে আলিয়া মাদ্রাসা ধারা এবং ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামে দারুল উলুম মঈনুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কওমি মাদ্রাসা ধারার প্রচলন ঘটে। আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে আবার দুটি ধরন আছে। একটি হলো সরকার কর্তৃক পরিচালিত, যেজন্য এগুলোকে "সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা" বলে অভিহিত করা হয়। অন্যটি হলো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত, তবে সেগুলো সরকার কর্তৃক পরিচালিত নয়। সেজন্য এগুলোকে "বেসরকারি আলিয়া মাদ্রাসা" বলে অভিহিত করা হয়।

সব ধরনের মাদ্রাসাই সংস্কার ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বিশেষত আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে বহু কমিশন গঠিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালের মুস্তফা বিন কাশিমের নেতৃত্বাধীন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসায় পাঁচটি স্তর চিহ্নিত হয়েছে। এগুলো হলো: ইবতেদায়ি (১-৫ শ্রেণি, তথা প্রাথমিক); দাখিল (৬-১০ শ্রেণি, তথা মাধ্যমিক); আলিম (১১-১২ শ্রেণি, তথা উচ্চ মাধ্যমিক); ফাজিল (ব্যাচেলর ডিগ্রীর সমতুল্য); এবং কামিল (মাস্টার ডিগ্রীর সমতুল্য)। তদুপরি আলিম ও দাখিল পর্যায়ের পাঠক্রমে মাদ্রাসা নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়াও সাধারণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে দাখিল ও আলিম পর্যায় সম্পন্নকারীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেকোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে[৪৭]। ২০০৬ সালের আগ পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সকল স্তরের আলিয়া মাদ্রাসার পরীক্ষা পরিচালনা করতো। ২০০৬ সালের পর থেকে ফাজিল এবং কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসাসমূহ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।[৪৮]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যানে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় দুই ধরনের মাদ্রাসার কথা উল্লিখিত হয়। একটি হলো

[৪৭] দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে চারটি ধারার সুযোগ থাকে। এগুলো হলো কলা, মুযাবিদ, বিজ্ঞান, এবং বাণিজ্য। ফাজিল এবং কামিল পর্যায়ে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ থাকে এবং চারটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো হলো তফসির, হাদিস, আরবি ভাষা এবং ফিকহ। ২০১০ সাল থেকে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয় যেটা অষ্টম শ্রেণির পর অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সমকক্ষ।

[৪৮] ২০০৭ সালে আলিয়া মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ছিল ৯,৪৯৩, যার মধ্যে দাখিল, আলিম, ফাজিল, এবং কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬,৭০০, ১,৪০০, ১,০৮৬, এবং ১৯৮ (সিদ্দিকী ২০১৫, বাংলাপিডিয়া)। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঐ বছর এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ১০৯ টি।

ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, যার সংখ্যা ৩,৮৩৯টি এবং শিক্ষার্থীদের ২.২ শতাংশ এ ধরনের মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে। অন্যটি হলো উচ্চতর মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়, যার সংখ্যা ৩,৫৩৪টি আর এগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের ২.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে। সুতরাং এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ৭, ৩৭৩টি এবং তাতে শিক্ষার্থীদের ৪.৭ শতাংশ শিক্ষা লাভ করে। ধারণা করা যেতে পারে যে, এগুলো আলিয়া মাদ্রাসা যদিও বিবিএস তা পরিষ্কার করে না। এসব পরিসংখ্যান ২০২১ সালের জন্য (সারণি ৭.২ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে মাদ্রাসার ভূমিকা আলাদা করে চিহ্নিত করে না। তবে অন্যত্র বিবিএস মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান পরিবেশন করে তা সারণি ৭.২-এ উপস্থাপন করা হলো। এই সারণি অনুযায়ী ২০২১ সালে মাধ্যমিক (দাখিল ও আলিম) এবং উচ্চ শিক্ষা (ফাজিল ও কামিল) পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যায় মাদ্রাসার অংশ ছিল যথাক্রমে ১৮.৩ ও ১৬.৮ শতাংশ। যদি মাধ্যমিক এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে বিবিএসের পরিসংখ্যানে আলিয়া মাদ্রাসাসমূহ অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তবে এই অনুপাত হবে যথাক্রমে ১৫.৪ ও ১৪.৪ শতাংশ।

সারণি ৭.২: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (মোট সংখ্যার %)	শিক্ষক সংখ্যা (মোট সংখ্যার %)	নারী শিক্ষিকার অনুপাত (%)	শিক্ষার্থী সংখ্যা (মোট সংখ্যার %)	নারী শিক্ষার্থী অনুপাত (%)
দাখিল					
বেসরকারি	৬,৫৪৪ (৭০.৪)	৬৪,৮০১ (৫৮.৪)	২০.২	১৪,০০,২০৪ (৫২.৭)	৫৯.৫
আলিম					
বেসরকারি	১,৩৯৮ (১৫.০)	২০,৫৮৩ (১৮.৬)	১৭.৯	৪,৬০,৭৯৩ (১৭.৩)	৫৫.৫
ফাজিল					
বেসরকারি	১,০৯০ (১১.৭)	১৯,৫৪৪ (১৭.৬)	১৭.৭	৫,২৫,৫৯৭ (১৯.৮)	৫০.১
কামিল					
বেসরকারি	২৫৬ (২.৭৫)	৫,৮৯৫ (৫.৩)	১৮.৯	২,৬৩,৭৮৩	৩৪.১
সরকারি	৩ (০.০৩)	৭৮ (০.১)	১০.২	(৯.৯)	৬.৯
মোট	২৫৯ (২.৭৮)	৫,৯৭৩ (৫.৪)	১৮.৭	৬,৮৭৫ (০.৩)	৩৩.৪
				২,৭০,৬৫৮ (১০.২)	
সব ধরনের প্রতিষ্ঠান	৯,২৮৮	১,১০,৮২৩	১৯.২	২৬,৫০,৩৭৭	৫৪.৪
সরকারি	(৯৯.৯৭)	(৯৯.৯)	১০.২	(৯৯.৭)	৬.৯
বেসরকারি	৩ (০.০৩)	৭৮ (০.১)	১৯.২	৬,৮৭৫ (০.৩)	৫৪.৩
মোট	৯,২৯১ (১০০)	১,১০,৯০১ (১০০)		২৬,৫৭,২৫২ (১০০)	

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)।

বলাবাহুল্য, বিবিএস-এর উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, কারণ কওমি মাদ্রাসা সংক্রান্ত তথ্য এসব পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মূল কারণ হলো কওমি মাদ্রাসাসমূহ কর্তৃক সরকারের প্রভাব ও আওতামুক্ত থাকার পূর্বোল্লিখিত প্রয়াস। ১৮৬৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাই বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার উৎস। আরও পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোল্লা নিযামুদ্দীন তাঁর পিতা মোল্লা কুতুবউদ্দিন শহিদ প্রবর্তিত "দরসে নিযামিয়া" মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। কওমি মাদ্রাসাসমূহ সাধারণভাবে এই মতবাদ অনুসরণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমে ২টি পর্যায়, ৬টি স্তর ও ১৬টি শ্রেণি রয়েছে, এবং সর্বোচ্চ পর্যায়কে "দাওরায়ে-হাদিস" বলে আখ্যায়িত করা হয়। কওমি মাদ্রাসাসমূহ জনগণের আর্থিক সহায়তাসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহায্য সংস্থার অনুদান দ্বারা পরিচালিত হয় (সিদ্দিকী ২০১৫, বাংলাপিডিয়া)।

কওমি মাদ্রাসা সমূহ কোনো একক কাঠামোতে সংগঠিত নয়। ১৯৭৮ সালে নিযামিয়া মতবাদের কওমি মাদ্রাসা সমূহকে পরিচালনার জন্য "বিফাকুল মাদারিস" নামে বেসরকারি কওমি মাদ্রাসা বোর্ড গঠিত হয় এবং ১৯৯৮ সাল নাগাদ ২,০৪৩টি মাদ্রাসা এই বোর্ডে নিবন্ধিত হয়। সময়ে এরূপ আরও ১১টি কওমি মাদ্রাসা বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং ধারণা করা হয় যে, ২০০৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দশ হাজারেরও বেশি কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে; তার মধ্যে স্নাতকোত্তর (দাওরায়ে হাদিস) পর্যায়ের প্রায় ২৫০টি এবং মহিলা মাদ্রাসা প্রায় ৫০টি।

স্বতন্ত্র ধারার মাদ্রাসার মধ্যে ৫টি শিক্ষা ধারা লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো (১) কিন্ডারগার্টেন ও ক্যাডেট মাদ্রাসা; (২) শর্ট কোর্স মাদ্রাসা; (৩) স্বতন্ত্র ও বিশেষ নেসাবের মাদ্রাসা; (৪) উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা, গবেষণা ও বিশেষ কোর্সের মাদ্রাসা; (৫) আহলে হাদিস মাদ্রাসা। এর মধ্যে প্রথম চার ধরনের মাদ্রাসার কোনো নির্ধারিত পাঠ্যসূচি নেই। আহলে হাদিস মাদ্রাসায় একটি নিজস্ব পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয় এবং এরূপ অন্তত ৪০টি মাদ্রাসা রয়েছে।

উপর্যুক্ত মাদ্রাসা ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশে কাজ করছে। তার মধ্যে রয়েছে মক্তব বা নুরানী বা ফুরকানিয়া মাদ্রাসা। এগুলি সাধারণত মসজিদ ভিত্তিক হয়ে থাক এবং তাতে প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনেরা এগুলো পরিচালনা করে থাকেন।

অনুমান করা হয় যে ২০০৮ সালে এ ধরনের ৭০ হাজার ফুরকানিয়া এবং মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ছিল। এছাড়া রয়েছে কুরআন মুখস্থ করার জন্য হাফেজিয়া মাদ্রাসা এবং কিরাত শিক্ষার জন্য বিশেষ মাদ্রাসা। সুতরাং আলিয়া মাদ্রাসার বাইরে রয়েছে অন্যান্য মাদ্রাসার এক বিরাট ভুবন। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসার ভূমিকা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পেতে হলে এই ভুবনকে আমলে নিতে হবে। সেজন্য এই ভুবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি কর্তব্য।

৭.১.১.৩ *শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ভূমিকা*

মাদ্রাসা শিক্ষার মতো ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কেও বিবিএসের পরিসংখ্যান পর্যাপ্ত ও স্বচ্ছ নয়। সারণি ৭.৩ দেখায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ২৮,১৯৩টি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে এবং মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৬.৫ শতাংশ তাতে শিক্ষালাভ করছে। এসব কিন্ডারগার্টেনের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইংরেজি মাধ্যমের হওয়া বিচিত্র হবে না। মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিএসের সারণি সমূহে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার মতো ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা সম্পর্কেও বিবিএস আলাদা করে কিছু তথ্য পরিবেশন করে, যা সারণি ৭.৬-এ উপস্থাপন করা হলো। এই সারণি দেখায় যে, ২০২১ সালে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ছিল ১৩৭টি। তার মধ্যে এ-লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংখ্যায় প্রধান (৬৫.৯ শতাংশ) হলেও শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক দিয়ে এগুলোর ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ (৪.১ শতাংশ)। বিপরীতে, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায় প্রভুত্ব করে জুনিয়র স্কুল, যেগুলো দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদানকারী বাংলা মাধ্যম স্কুলের সমকক্ষ। সারণি ৭.৬ দেখায় যে, ২০২১ সালে মাত্র ১৭টি জুনিয়র স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। ফলে এসব স্কুলের গড় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অন্য দুই ধরনের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের তুলনায় বেশি ছিল। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য থেকে বাংলাদেশের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে তা হলো নারী শিক্ষিকাদের প্রাধান্য। তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে হিসাব করলে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে নারী শিক্ষিকার অনুপাত দাঁড়ায় ৭২.৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ।

সারণি ৭.৩: ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা অনুপাত (%)	শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা অনুপাত (%)	শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুপাত (%)	নারী শিক্ষার্থী অনুপাত (%)	নারী শিক্ষিকা অনুপাত (%)	শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত	গড় (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি) শিক্ষার্থী সংখ্যা	গড় (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি) শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা
ও-লেভেল	৩০ (২১.৯)	৮৪৮ (১৩.১)	৭,৪০৬ (১০.৮)	৪৩.৭	৭৫.৪	৯	২৪৭	২৮
এ-লেভেল	৯০ (৬৫.৭)	২৯৭ (৪.৬)	২,৮০২ (৪.১)	৩৯.০	৮৩.২	৯	৩১	৩
জুনিয়র স্কুল	১৭ (১২.৪)	৫,৩০৮ (৮২.৩)	৫৮,৬১৭ (৮৫.১)	৪৩.৯	৭১.৩	১১	৩,৪৪৮	৩১২
সব ধরনের	১৩৭ (১০০)	৬,৪৫৩ (১০০)	৬৮,৮২৫ (১০০.০)	৪৩.৭	৭২.৪	১১	৫০২	৪৭

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)

সারণি ৭.৩ বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকা বিচিত্র নয়। লক্ষণীয়, প্রথমাবস্থায় ইংরেজি মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেন, স্কুল-কলেজ ঢাকা শহরে গড়ে উঠলেও এখন তা সকল বিভাগীয়, জেলা এমনকি উপজেলা পর্যায়েও প্রসারিত হয়েছে। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে যেমন কওমি মাদ্রাসার বিশাল ভুবন সরকারি পরিসংখ্যানের বাইরে থেকে যাচ্ছে তেমনিভাবে বহু ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সরকারি পরিসংখ্যানের বাইরে থেকে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তবে সংখ্যায় কম হলেও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যে সমাজের জন্য অসমানুপাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সে বিষয়টি আমরা নিচে লক্ষ করবো।

৭.১.১.৪ *শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণের বিভিন্ন প্রতিফল*

উপরের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ দেখায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণ ঘটেছে এবং বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম এবং মাদ্রাসা–এই তিনটি ধারার বিকাশ ঘটেছে। এই খণ্ডিকরণের কিছুটা সরকারি পরিসংখ্যানে দৃশ্যমান এবং অনেকটা দৃশ্যমান নয়। তদুপরি যেটুকু দৃশ্যমান তার তাৎপর্যও আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার চেয়ে বেশি।

মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে লক্ষণীয়, সমবয়সি শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে মাদ্রাসাগামী শিক্ষার্থীদের অনুপাতের (যেটা বিবিএসের পরিসংখ্যানে দেখা যায়) চেয়ে বহুগুণ বেশি হলো স্বল্প আয়ের পরিবারসমূহ থেকে আগত মাদ্রাসাগামী শিক্ষার্থীদের অনুপাত (যেটা বিবিএসের পরিসংখ্যান দ্বারা বোঝা যায় না)। সহজ ভাষায়, স্বল্প আয়ের পরিবারদের শিশুরা অধিক হারে মাদ্রাসায় প্রবেশ করে। তাদের অনেকে এতিম। মাদ্রাসাসমূহে প্রায়শ হোস্টেল থাকার কারণে যারা এতিম নয় তারাও আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিতে পারে। স্বল্প আয়ের পিতা-মাতারা অনেক সময় সন্তানদের আবাসিক মাদ্রাসায় পাঠান যাতে তারা শুধু সন্তানদের শিক্ষার খরচ নয় বরং ভরণপোষণের ভার থেকেও মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু বর্তমানের মাদ্রাসাসমূহের পাঠক্রমে ইহজাগতিক বিষয়সমূহের প্রতি গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম। তদুপরি এসব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি হয় শেখানো হয় না কিংবা শেখানো হলেও তার মান সাধারণ বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজের চেয়ে সাধারণভাবে নিচু। ফলে মাদ্রাসা, বিশেষত কওমি মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে উচ্চ আয়ের শ্রমবাজারে অভিগম্যতা এবং সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কম হয়। এজন্য তাদের পিতামাতার মতো তারা নিজেরাও স্বল্প আয়ের কাজ করতে বাধ্য হয়। এতে দারিদ্র্যের এক অশুভ ফাঁদ কিংবা চক্রের সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও স্বীকৃত হয় যে, বর্তমান ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা "আয় এবং সংস্কৃতি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কৃত্রিম শ্রেণি সৃষ্টি করছে এবং জায়মান রাখছে" এবং একটি "অশুভ দারিদ্র্য চক্রে'র জন্ম দিয়েছে। সেখানে আরও আশঙ্কা ব্যক্ত হয় যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি আরও প্রকট করবে (পৃ. ৬২৬, লেখকের অনুবাদ)"।

বিপরীত পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিখাতের এসব প্রতিষ্ঠানে মূলত বিত্তশালী এবং সমাজের উচ্চবর্গের পরিবারের সন্তানেরাই প্রবেশ করতে পারে। সেখানে শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত উঁচু। বিশেষত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে পারদর্শিতা বেশি হয় আর সে কারণে উচ্চতর পর্যায়ের ভালো মানের প্রতিষ্ঠানে অথবা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বেশি হয়। ফলে তারাও বিত্তশালী হয় এবং এভাবে একটি "বিত্ত চক্রে"র উদ্ভব ঘটে। মাদ্রাসা শিক্ষা সৃষ্ট দারিদ্র্য চক্র এবং ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা সৃষ্ট বিত্তচক্র সমাজের অর্থনৈতিক বিভক্তি আরও বাড়িয়ে তোলে এবং এই বিভক্তিকে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক চরিত্র দেয়।

আরও লক্ষণীয়, শিক্ষাব্যবস্থার খণ্ডিকরণের প্রভাব শুধু দেশের ভেতরে সামাজিক বিভক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। এর একটি সীমান্ত-অতিক্রমকারী প্রসারণ রয়েছে এবং তা দেশের জন্য মঙ্গলকর নয়। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শুধু মাদ্রাসা নয় এমনকি বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের তথা সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তারা এক অর্থে দেশ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় তারা দুর্বল হয়, এ কারণে বাংলা সাহিত্যের সাথে তাদের তেমন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ সাহিত্যের মধ্যেই একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মনন, অনুভূতি, মূল্যবোধ ও চেতনার মূল প্রতিফলন ঘটে। ফলে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি হলেও চৈতন্যগতভাবে বাঙালিত্ব থেকে দূরে থেকেই যায়। তারা বরং পশ্চিমের ইংরেজি ভাষার দেশসমূহের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয় এবং সেসব দেশের সাথেই মনোজাগতিক একাত্মতা অনুভব করে। তাদের অভীষ্ট হয় মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষে যুক্তরাজ্যের সিনিয়র ক্যামব্রিজ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের স্কলাস্টিক এপটিচ্যুড টেস্ট (*স্যাট*) পরীক্ষা দিয়ে সেসব দেশের কলেজে ভর্তি হওয়া এবং সেসব দেশে অভিগমন করা।

দেশের এলিট শ্রেণির সন্তানদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারের অপর পিঠ হলো বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থার মানের অবনতি।[৪৯] স্বল্পসংখ্যক নামজাদা স্কুল বাদ দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব স্কুলের শিক্ষার মান তেমন সন্তোষজনক নয়। এই পরিণতি অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ যখন সমাজের এলিট একটি ব্যবস্থা অথবা প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং তার সাথে একাত্ম বোধ করেনা, তখন সাধারণ পরিস্থিতিতে সেই ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অবনতি হওয়াই স্বাভাবিক।

সবশেষে লক্ষণীয়, শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান ত্রিখণ্ডিত অবস্থা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতি এবং প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যও মঙ্গলকর হচ্ছে না। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জানায় যে, বাংলাদেশের স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের গড় বছর সংখ্যা মাত্র ৫.১

[৪৯] এই সাধারণ অবনতির একটি দিক হলো ইংরেজি শিক্ষা মানের উৎকর্ষতা হ্রাস। ফলে একদিকে ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলায় দুর্বল থাকছে, অন্যদিকে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে দুর্বল থেকে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানের বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজিতে পারদর্শীতা ছাড়া অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া কঠিন।

বছর (যেখানে শ্রীলংকায় তা ১০.৯ বছর) (পৃ. ৬১৮)।[৫০] এর অর্থ দাঁড়ায় যে, একটি বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায় ছাড়িয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয় না। তদুপরি এই ৫ বছর যদি তারা মাদ্রাসায় কাটিয়ে থাকে তাহলে আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশের জন্য তাদের উপযুক্ত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরও জানায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার এখনও ২০ শতাংশের কাছাকাছি (পৃ. ৬২০)। আরও লক্ষণীয়, প্রাথমিক পর্যায়ে যেখানে ধনীদের জন্য মোট ভর্তির হার ৭৬ শতাংশ, সেখানে দরিদ্রদের জন্য এই হার মাত্র ২৪ শতাংশ (পৃ. ৬২৪)।[৫১] এর একটি কারণ হতে পারে যে, দরিদ্র পরিবারেরা ব্যাপক হারে তাদের সন্তানদের কওমি মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন অথবা ঘরে রাখছেন, যেটা আরও বেশি উদ্বেগজনক।

যেসব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তারাও যে শিক্ষায় খুব একটা অগ্রগতি অর্জন করছে তাও নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জানায় যে, ২০১৯ সালের বার্ষিক সেক্টর সম্পাদন প্রতিবেদন অনুযায়ী তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বছরে "স্কুল সংযোগ ঘণ্টার" পরিমাণ ছিল ৭৯১ ঘণ্টা, যা অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়েও কম (পৃ. ৬২১)। ২০১৮ সালে সম্পাদিত "জাতীয় মূল্যায়ন সমীক্ষা"র ভিত্তিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জানায় যে, সময়ে তৃতীয় শ্রেণির তুলনায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সম্পাদনের মানের বহুল অবনতি ঘটেছে, বিশেষত বাংলা এবং গণিত বিষয়ে (পৃ. ৬২১)। মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ও নিট ভর্তির হার এখনও মাত্র যথাক্রমে ৬১ ও ৫৩ শতাংশ (পৃ. ৬২২)।[৫২] তদুপরি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেখানে ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক (এসএসসি) পর্যায়ে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেখানে ২০১৯ সালে তা ২৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। একই সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এই অনুপাত ছিল ২১ শতাংশ (পৃ. ৬২৪)। এর বিপরীতে, বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের অনুপাত বেড়েছে। মাধ্যমিক (এসএসসি) পর্যায়ে এই অনুপাত ১৯৯৮ সালের ৭ শতাংশের তুলনায় ২০১৯ সালে ১৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

[৫০] এটি একটি বিস্ময়কর পরিসংখ্যান এবং বিগত সময়কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রভূত অগ্রগতি সংক্রান্ত যে প্রচার সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে।

[৫১] এই তথ্য সঠিক হলে বাংলাদেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির হার ১০০ শতাংশ হওয়ার প্রায়শ প্রকাশিত দাবি সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

[৫২] এসব পরিসংখ্যানও বাংলাদেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির হার ১০০ শতাংশ হওয়ার সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের উদ্রেক ঘটে।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের উপর্যুক্ত অসন্তোষজনক পরিস্থিতি উচ্চ শিক্ষার উপরও নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে পারে না। জরিপ এবং আপতিক পর্যবেক্ষণ দেখায় যে, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার মানও উৎসাহজনক নয়। সারণি ৭.৩ দেখায় যে, বিগত সময়ে ব্যক্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা শূন্য থেকে ১১০ হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৫ থেকে ৫০ হয়েছে। এই সারণি দেখায় যে, ২০২১ সাল নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।[৫৩] পরিসংখ্যান দেখায় যে, উচ্চ শিক্ষার পর্যায়েও মাত্র ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-গণিত (স্টেম) বিষয়ে ভর্তি হচ্ছে। পক্ষান্তরে এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী বাণিজ্য অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হচ্ছে (পৃ. ৬২৮)। কিন্তু অনুষদ-নির্বিশেষে তাদের শিক্ষার মান তেমন সন্তোষজনক নয়। এটা আশ্চর্যের নয়, কারণ একদিকে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহ থেকে দেশের তরুণ-তরুণীদের যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাশ করে বেরোচ্ছে সাধারণভাবে তাদের শিক্ষার মান নিচু থেকে যাচ্ছে এবং এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও তার তেমন উন্নতি ঘটছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা একদিকে বেকার থেকে যাচ্ছে আর অন্যদিকে নিয়োজনকারীরা উপযুক্ত প্রার্থী পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের জরিপ দেখায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের মাত্র ৩৪ শতাংশ পাশ করার ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে চাকুরি পাচ্ছে এবং ৩৮.৬ শতাংশ বেকার থেকে যাচ্ছে (পৃ. ৬২৮)। অন্যদিকে পোশাকশিল্পসহ দেশের ব্যক্তিখাতের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্তির জন্য ব্যবসা-প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষিত যোগ্য প্রার্থী পাচ্ছে না আর এজন্য উচ্চহারের বেতন দিয়ে ভারত, শ্রীলংকাসহ অন্যান্য দেশের নাগরিকদের নিযুক্ত করছে। তার ফলে প্রতি বছর বিপরীতমুখী-রেমিট্যান্স হিসেবে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ ও অবৈধ পথে বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।[৫৪] অথচ উপরে আমরা লক্ষ করেছি, বিজ্ঞান বিভাগের পরিবর্তে বাণিজ্য বিভাগের প্রতিই বেশি শিক্ষার্থী আকৃষ্ট হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও ব্যবসা প্রশাসন সংক্রান্ত অনুষদ খোলাতেই বেশি আগ্রহী হয়েছে।

[৫৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০০৯ সালের ৪ লক্ষ থেকে ২০১৮ সালে ১০ লক্ষে পৌঁছেছে (পৃ. ৬২৭)। তবে এখনো বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশকারীদের অনুপাত ১২.১ শতাংশ (পৃ. ৬২৭)। মেয়েদের জন্য তা ১৫.৫ শতাংশ। মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৬ শতাংশ।

[৫৪] এ বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের জন্য দ্রষ্টব্য Rahman, Fazrul Md. (2022) "Remittance outflow crosses $100m -- thru legal channel," *The Daily Star*, December 26

সব মিলিয়ে পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের বর্তমান খণ্ডিত এবং বহুলাংশে ব্যক্তিখাত নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা মেটাতে পারছে না। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং স্বীকার করে যে, "শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক ধারা বা স্রোতের উপস্থিতি সমাজের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে (পৃ. ৬২৪)"।[৫৫] সেখানে আরও লক্ষ করা হয় যে, বিগত সময়কালে বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে বহুলাংশে স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে। এ ধরনের শ্রমের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাদের বেতনও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নয়নের এই প্রথম ধাপ অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে প্রবেশের পাশাপাশি সফল হতে হলে অর্থনীতিকে বেশি হারে দক্ষতা ও জ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দিকে যেতে হবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন হবে দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তথা মানব সম্পদ।[৫৬]

সুতরাং একদিকে দেশের ভেতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভক্তি প্রশমন আর অন্যদিকে দেশের জনমিতিক লভ্যাংশ ব্যবহার করে মানব সম্পদ নির্ভর উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে প্রবেশ ও সফল হওয়া এই উভয় প্রয়োজনেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জানায় যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার লক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সে লক্ষ্যে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি (পৃ. ৬২৬)। সুতরাং আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে বর্তমান খণ্ডিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরণ। পাশাপাশি প্রয়োজন হলো শিক্ষাখাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকার বর্তমান যে সংমিশ্রণ বিরাজ করছে তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ভিত্তিতে আরও উপযোগী মিশ্রণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের জন্য একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপ এবং শিক্ষাখাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সঠিক মিশ্রণ কী হতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশে পৌঁছানোর আগে উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে লক্ষ করে নেওয়া প্রয়োজন।

[৫৫] লক্ষণীয়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও স্বীকার করে যে, "শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক ধারা বা স্রোতের উপস্থিতি সমাজের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে (পৃ. ৬২৪)"।

[৫৬] অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মতে, দেশের মানবসম্পদ সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারছে না। অথচ অর্থনৈতিক গবেষণা দেখায় যে, অনেক বিচারে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ভৌত পুঁজির চেয়ে মানব পুঁজি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১.২ উন্নত দেশসমূহের একীভূত এবং গণখাত ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা

পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত দেশে একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশে এই একীভূতকরণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় সকল পর্যায়ের জন্য অর্থাৎ, প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রযোজ্য। এসব দেশে একীভূতকরণ বৈশিষ্ট্যের সহযোগী বৈশিষ্ট্য হলো গণখাতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি। তদপুরি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক, যার ফলে এসব দেশের জনগণকে তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ভার বহন করতে হয় না। সম্প্রতিকালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় (বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে) ব্যয়ভার বহনে অংশীদারিত্ব এবং ব্যক্তিখাতের উপস্থিতির সুযোগের সৃষ্টি করা হয়েছে (যেমন, যুক্তরাজ্যে)। তবে সাধারণভাবে এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একীভূত, অবৈতনিক এবং মূলত গণখাতের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রেও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা একীভূত, অবৈতনিক এবং মূলত গণখাতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিখাতের উপস্থিতি কিছু রয়েছে, কিন্তু শিক্ষা পাঠক্রম (কারিকুলাম)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তা গণখাতের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মূলত একীভূত। যুক্তরাষ্ট্রের এই একীভূত, গণখাতের এবং অবৈতনিক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক) স্কুল ব্যবস্থা সে দেশের সমাজ ও জাতিগঠনে ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় অধিকতর মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এর কারণ হলো, ইউরোপীয় দেশসমূহ ঐতিহাসিকভাবেই জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। আর এ কারণে সেখানে নতুন করে জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা কম। বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্র মূলত অভিবাসীদের দ্বারা গঠিত একটি দেশ। ফলে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে আগত অভিবাসীদের এক "জাতি"তে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা সাধিত হয় মূলত এ দেশের গণখাতের সার্বজনীন স্কুল ব্যবস্থার মাধ্যমে। অন্যান্য উন্নত দেশের মতো অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং জাপানেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা মূলগতভাবে একীভূত, অবৈতনিক এবং গণখাতের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের (ডিগ্রী) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শক্তিশালী গণখাতের অবস্থান রয়েছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে রাষ্ট্রীয় কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে অনেক কম বেতনে শিক্ষা লাভ করা যায়। এছাড়া রয়েছে কমিউনিটি কলেজ ব্যবস্থা যেখানে আরও কম বেতনে শিক্ষা লাভ করা যায়। তবে ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের (ডিগ্রী) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ব্যক্তিখাতের

উপস্থিতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিখাতে প্রতিষ্ঠিত এসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত মুনাফামুখী না হয়ে অ-মুনাফা ভিত্তিক (নন-প্রফিট) প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। তদুপরি যেহেতু উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত একীভূত, গণখাতের, অবৈতনিক স্কুল ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিগঠনের মূলভিত্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু (ডিগ্রী) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধারার উপস্থিতি জাতি বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে না। নিউজিল্যান্ড এবং জাপানে ডিগ্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে ইউরোপীয় ব্যবস্থার অনুগামী, অর্থাৎ ব্যক্তিখাতের কিছু উপস্থিতিসহ মূলগতভাবে গণখাতের অন্তর্ভুক্ত। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় তা কিছুটা ইউরোপীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝামাঝি।

সুতরাং মোটা দাগে বলা যেতে পারে, উন্নত দেশসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মূলগতভাবে একীভূত, অবৈতনিক এবং গণখাতের অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশে এবং জাপান ও নিউজিল্যান্ডে এসব বৈশিষ্ট্য উচ্চ শিক্ষার (ডিগ্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়) পর্যায়েও বহুলাংশে অক্ষুণ্ন থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে অ-মুনাফাধর্মী ব্যক্তিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে অন্য কিছু উন্নত দেশেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অ-মুনাফাধর্মী ব্যক্তিখাতের ভূমিকা রয়েছে এবং তা সম্প্রতি বেড়েছে।

উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের অর্থ এই নয় যে, উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন এবং তাতে উন্নতি সাধনের কোনো সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ও সমস্যা রয়েছে এবং তা দূরীকরণ ও সমাধানের প্রচেষ্টাও রয়েছে। তবে এসব প্রচেষ্টা মূলগতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর্যুক্ত মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখেই পরিচালিত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে এখন আমরা বাংলাদেশের আলোচনায় ফিরে যেতে পারি।

৭.১.৩ *বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার একীভূতকরণের উপায়*

যদিও উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হবে শিক্ষার একীভূতকরণ, কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, বিগত সময়কালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণ বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর এবং প্রোথিত হয়ে গেছে। সুতরাং, এই একীভূতকরণের ক্ষেত্রে অনেক আপস ও নমনীয়তার আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ, এটা শূন্যপটে মনের মতো ছবি আঁকার মতো হবে না, কারণ বহু ছবি ইতিমধ্যেই এই পটে আঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং, এখন চেষ্টা করতে হবে এগুলোকে আমলে নিয়েই একীভূতকরণের মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার।

উদাহরণস্বরূপ, বিগত সময়কালে যে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করা যাবে না। বরং, এগুলোকে দেশের মূল শিক্ষা ধারার সাথে সংগ্রথিত করায় প্রয়াসী হতে হবে। প্রথমত, মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাক্রমে দেশের সরকারি, বাংলা মাধ্যম স্কুলের শিক্ষাক্রমকে আরও পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আলিয়া মাদ্রাসাসমূহে এটা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে যার ফলে এসব মাদ্রাসার গ্র্যাজুয়েটরা দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়ার জন্য অন্যান্যদের মতো (অর্থাৎ, সরকারি, বাংলা মাধ্যম স্কুলের গ্র্যাজুয়েটদের মতো) ভর্তি হওয়ায় সমভাবে প্রয়াসী হতে পারে। এতৎসত্ত্বেও সরকারি সম্পদ লভ্যতা ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে এসব মাদ্রাসার সাথে বাংলা স্কুলসমূহের বহু পার্থক্য রয়ে গেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসব পার্থক্য হ্রাসের লক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল, যদিও তা অর্জনে তেমন সাফল্য অর্জন করা যায়নি (GoB 2022, p. 626)। আগামীতে এ বিষয়ে আরও সচেষ্ট হতে হবে। তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং আরও বড় চ্যালেঞ্জ হলো কওমি ও স্বতন্ত্র মাদ্রাসা এবং মক্তব সমূহকে মূল ধারার সাথে সংগ্রথিত করা। সেই প্রয়াসের অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে সরকার কওমি মাদ্রাসার "দাওরা-এ-হাদিস" ডিগ্রীকে ইসলামী এবং আরবি শিক্ষার মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু, অনেকের মতে, এখন পর্যন্ত এটা সরকার কর্তৃক বহুলাংশে একপক্ষীয়ভাবে কওমি মাদ্রাসার দাবি মেনে নেওয়ার একটি উদাহরণ হিসেবে থেকে গিয়েছে। কওমি মাদাসার শিক্ষাক্রমকে জাতীয় মূল ধারার শিক্ষাক্রমের নিকটবর্তী করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা যায়নি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা আগামী দিনে শিক্ষাক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে[৫৭]।

একইভাবে দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমকেও দেশের মূল ধারার স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমের কাছাকাছি নিয়ে আসায় সচেষ্ট হতে হবে। এসব স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ক একটি ন্যূনতম শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

[৫৭] লক্ষণীয়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বেশ তথ্য ও আলোচনা সংযোজন করে। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী গোটা এক দশক ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের মাদ্রাসার সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যাও মোটামুটি একরকম আছে। শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, নারীপুরুষ অনুপাত, প্রায় একই রকম আছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একীভূতকরণের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্য দ্বারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো একটি বিশেষ দ্বারা পুষ্ট করার যথার্থতার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যবস্থার স্বরূপ কী হবে তা জাতীয় পরিধিতে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিদেশী মহল কর্তৃক অর্থ দ্বারা বাংলাদেশের জাতীয় প্রাধিকারকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আগামীতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একীভূতকরণের জন্য সহায়ক হবে। মাদ্রাসা এবং ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে মূল ধারার নিকটবর্তী করার উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রয়াসের পাশাপাশি মূল মনোযোগ দিতে হবে বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজের মানোন্নয়নের প্রতি। এসব প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে এসব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়ন। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজির জ্ঞান শ্রম বাজারে যে সুবিধা দেয় সেটা শুধু ধনীদের একচেটিয়া অধিকার (*মনোপলি*) হতে পারে না। সমাজের ধনী-নির্ধন সকলের জন্য তা লভ্য হতে হবে। অর্থাৎ, সমাজের সকল স্তরের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইংরেজির জ্ঞান প্রসারিত করতে হবে যাতে তারা সম অবস্থানে থেকে শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্য চক্র ভাঙ্গার জন্য তা উপকারী হবে।

লক্ষণীয়, যতই বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজে ইংরেজির মান উন্নত হবে ততই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজের আকর্ষণ হ্রাস পাবে। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজের তুলনায় ভালো ইংরেজি শিক্ষা প্রদানকারী বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজের শিক্ষা বেশি ভারসাম্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হবে। ফলে সমাজের এলিটরাও তখন বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজ অভিমুখী হবে। অপেক্ষাকৃত কম আয় ও বিত্তের অধিকারী হয়েও যেসব পরিবার এখন নিজেদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজে পাঠাচ্ছেন তারা যখন দেখবেন যে, বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজেই ভালো ইংরেজি শিক্ষালাভ করা সম্ভব তখন তারা এলিটদের অপেক্ষা না করেই বাংলা স্কুল-কলেজ অভিমুখী হবেন। এভাবেই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজের সংখ্যাগত আধিপত্যের পাশাপাশি গুণগত উৎকর্ষতাও প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলা মাধ্যমের স্কুলে ধর্ম শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা যার যার ধর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে। এটা সুষ্ঠুভাবে করা গেলে ধর্ম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাতে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে এবং তা জাতীয়

জীবনে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। যেসব পরিবার নিছক অর্থনৈতিক তাগিদে (ভরণপোষণে অপারগ হয়ে) সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন তাদের সেই তাগিদ প্রশমনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। তবে শিক্ষা ভাতা প্রদান, স্কুল- কলেজে বিনামূল্যে সকলের জন্য আহারের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে এই অর্থনৈতিক তাগিদ আরও লাঘব করা সম্ভব।

নিঃসন্দেহে, বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজের মানোন্নয়নের জন্য আরও বহু করণীয় আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো যোগ্য ও উদ্বুদ্ধ শিক্ষক নিয়োগ, তাদের উপযুক্ত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত পূর্বশর্তাদি পূরণ, প্রাইভেট কোচিং এবং নোট ও গাইড বুকের প্রয়োজনীয়তা দূর করা ইত্যাদি। বিগত সময়কালে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোর (ভবন নির্মাণ ইত্যাদি) দিকে যতটুকু নজর দেয়া হয়েছে সে তুলনায় "মানুষ গড়ার কারিগর" তথা উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি ও সরবরাহ করার প্রতি ততটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি। স্কুল-কলেজের শিক্ষকতার পেশাকে আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে অপেক্ষাকৃত ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই পেশায় যোগ দিতে আগ্রহী হয়। তারা যাতে প্রাইভেট কোচিংয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে তাও নিশ্চিত করতে হবে। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, কওমি মাদ্রাসাসমূহকে বাইরে রেখে হিসাব করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ৬৭.১ শতাংশ শিশু সরকারি স্কুলে অধ্যয়ন করে। ইবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং উচ্চ মাদ্রাসার প্রাইমারি অংশ সমূহ (যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এগুলো আলিয়া মাদ্রাসার অন্তর্গত) যোগ করা হলে এই অনুপাত ৭১.৯ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। বাকি ২৮.১ শতাংশকেও সরকারি স্কুলের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন কিনা তা একটি প্রশ্নের বিষয়। লক্ষণীয়, একীভূতকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা বেশি প্রয়োজন তা হলো একটি অভিন্ন ন্যূনতম জাতীয় পাঠক্রমের অনুসরণ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুলের সরকারীকরণ অপরিহার্য নয়। ব্যক্তি, এনজিও এবং অন্যান্য ধরনের মালিকানা কিংবা ব্যবস্থাপনার অধীনেও উপযুক্ত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। আরও লক্ষণীয়, অনেক স্কুল-কলেজ অন্য ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হলেও অর্থসংস্থানের জন্য বহুলাংশে সরকারের উপর নির্ভর করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন আংশিক কিংবা পূর্ণভাবে সরকারি তহবিল থেকে "মাসিক বেতন

আদেশ" (মাছুলি পে অর্ডার, সংক্ষেপে এমপিও) কর্মসূচির অধীনে প্রদান করা হয়। ফলে সরাসরিভাবে সরকারীকরণ না করেও এসব স্কুল কর্তৃক সরকারি নীতির অনুসরণ নিশ্চিত করা সম্ভব। সর্বোপরি, সরকার বহির্ভূত কোনো ধরনের স্কুলকে সরকারিকরণ করার আগে সেসব স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে যে বিকল্প ব্যবস্থাধীনে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে তার শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এবং সরকারিকরণ করা হলে নিট ফলাফল যে ভালো হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন, বিবিএসের পরিসংখ্যান দেখায় যে, ১৬.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী "কিন্ডারগার্টেনে" অধ্যয়নরত। কিন্তু বিস্তারিত গবেষণা ছাড়া এগুলো কী ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোর সরকারীকরণ প্রয়োজন আছে কিনা তা বোঝা কঠিন।

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাত্র ৭.৩ শতাংশ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এবং শিক্ষকদের মাত্র ৪.৪ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।। তবে এই পরিসংখ্যান সম্ভবত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে সরকারের ভূমিকার পূর্ণ পরিচয় দেয় না, কারণ বেসরকারি স্কুলের বহু শিক্ষক সরকারের এমপিও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। তবে এই পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় বলেই প্রতিভাত হয়। বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলসমূহের শিক্ষকেরা অনেকদিন যাবৎ মাধ্যমিক শিক্ষার জাতীয়করণের দাবি করছেন। তাদের এই দাবি মূলত নিজেদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং চাকুরির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও এই আন্দোলন গণখাত নির্ভর একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সঙ্গঁতিপূর্ন। সুতরাং এই দাবীকে ইতিবাচকভাবে দেখে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঙ্খিত রূপান্তর সাধন আগামী দিনের এক বড় করণীয়।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিগত সময়কালে ব্যক্তিখাতের ব্যাপক প্রসারের ফলে এটা স্পষ্ট যে, সম্পূর্ণ গণখাত নির্ভর উচ্চশিক্ষার যে মডেল বহু উন্নত দেশে দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্য তা আর প্রযোজ্য হবে না। বরং উচ্চ শিক্ষায় ব্যক্তিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেই অগ্রসর হতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেসব সম্ভাব্য করণীয় আছে তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।

প্রথমত, গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান ও দক্ষতা উন্নত করতে হবে। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত না করে সামগ্রিকভাবে দেশের

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। কীভাবে তা করা যায় তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয়। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বহুলাংশে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। উপাচার্যরা প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতেন। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থায় পরিণত হয়। একইভাবে শিক্ষক ও প্রাক্তন গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ও সরকার মনোনীত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্লামেন্টের ভূমিকা গ্রহণ করে। সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত তিন-সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলের মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে আচার্য (রাষ্ট্রপতি) বাধ্য হন। ডীনসমূহও শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিভাগ পর্যায়ে সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল এবং জ্যেষ্ঠ এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (*সিএন্ডডি*) গঠিত হয়। প্রথমটি বিভাগ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম আর দ্বিতীয়টি পদ ও পদোন্নতি বিষয়ে সুপারিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আশা করা হয়েছিল যে, ১৯৭৩ সালের আইনের ফলে বাংলাদেশের গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান সাধনার জন্য আরও উন্নত পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই আশা সেভাবে পূরিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কাঠামো নির্বাচন-ভিত্তিক হওয়ার কারণে শিক্ষক-তুষ্টিমূলক আচরণের প্রসার ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তি এই আচরণকে যেমন আরও জোরালো করে তেমনি ঘোরালোও করে। শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময় জ্ঞানের উৎকর্ষতার চেয়ে দলীয় আনুগত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিক্ষক বরাবরই বাইরে পরামর্শক হিসেবে ও অন্যান্য কাজে অনেক সময় ব্যয় করতেন। ব্যক্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও প্রসার এক্ষেত্রে আরেক সংকট সৃষ্টি করেছে। গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নিয়মসিদ্ধ কিংবা নিয়ম-বহির্ভূত উপায়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করছেন। অনেক ক্ষেত্রে শেষোক্ত কাজেই তাঁদের মনোযোগ বেশি। সব মিলিয়ে গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা ও গবেষণার

মানের উন্নতির পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। আন্তর্জাতিক তুলনায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের র‍্যাংকিং থেকেই তা স্পষ্ট। সুতরাং গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মানোন্নয়ন আগামীর বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিখাতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ইতিবাচক দিকসমূহকে ব্যবহার করতে হবে এবং নেতিবাচক দিকসমূহকে প্রশমিত করতে হবে। ব্যক্তিখাতের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিত করা যায়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নানা উপায়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার তাড়না এর পেছনে কাজ করেছে। সেজন্য, আশ্চর্যের নয় যে, ব্যক্তিখাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রায়শই বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনাচারের অভিযোগের খবর প্রকাশিত হয়।[৫৮] এ ধরনের ঘটনা ব্যক্তিখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের উদ্দেশ্য এবং সংস্কৃতির দীনতার পরিচয় দেয়। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, এসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অসংখ্য বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রীধারী তৈরি করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যক্তিখাতের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক হাজার হাজার বিদেশী ব্যবসা-প্রশাসকের নিয়োগও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিম্নমানের ইঙ্গিত বহন করে। তবে ব্যক্তিখাতের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বেশ প্রতিশ্রুতিরও স্বাক্ষর রেখেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করায় পারঙ্গমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি সিদ্ধান্তগ্রহণে নমনীয়তা ও দ্রুততার পরিচয় দিয়েছে। সংক্ষেপে, ব্যক্তিখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নৈরাশ্যজনক সম্পাদনার পাশাপাশি শক্তির দিকও প্রদর্শন করেছে। এসব শক্তি ব্যবহার করে দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ব্যাপ্তির সম্প্রসারণে ব্যক্তিখাতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করাও আগামী দিনের একটি করণীয় হবে।

তৃতীয়ত, উচ্চশিক্ষার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো শিক্ষার মাধ্যম। মাতৃভাষাই শিক্ষার সকল স্তরের মাধ্যম হওয়া শ্রেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে হিসেবে বাংলাদেশেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা হওয়া উচিত। তবে বর্তমান

[৫৮] যেমন, সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, ব্যক্তিখাতে দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন সদস্য জমি কেনা সংক্রান্ত কয়েক শত কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

বিশ্ব পরিস্থিতিতে ছোট দেশসমূহের জন্য নিজ নিজ ভাষায় উচ্চশিক্ষায় বিশ্বমানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা দেয়। বিশ্ব জ্ঞান ভাণ্ডার এখন এত বিস্তৃত এবং জ্ঞান বিকাশের প্রক্রিয়া এত দ্রুত যে, এসব দেশের পক্ষে এই জ্ঞান ভাণ্ডার যথাসময়ে নিজ ভাষায় রূপান্তর করাও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যার বিচারে না হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখনও ছোট। তাছাড়া জ্ঞান বিকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী যে আদান-প্রদানের প্রয়োজন তা বাংলা ভাষায় করা কঠিন। বর্তমান পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষার জ্ঞানের সবিশেষ গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বাংলাদেশের উচ্চ-শিক্ষাকে দ্বিভাষিক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেমন বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে পারদর্শী হতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীদেরও উভয় ভাষাতে ভালো দখল থাকতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতি জোর দেওয়ার পূর্বোল্লিখিত করণীয়ের সুষ্ঠু সম্পাদন দ্বিভাষিক হওয়ার লক্ষ্য অর্জনকে সুগম করবে।

ইউরোপের অনেক ছোট দেশ এই দ্বিভাষিক মডেল অনুসরণ করে সফল হয়েছে। ইউরোপের পুরোনো দেশসমূহের মধ্যে এক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপের নতুন দেশসমূহের মধ্যে এক্ষেত্রে বাল্টিক দেশসমূহের (লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া এবং লাতভিয়া) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বলতে গেলে, গোটা ইউরোপই, অন্তত এসব দেশের বুদ্ধিজীবী মহল – এখন দ্বিভাষিক।

বাংলাদেশের জন্যও এই দ্বিভাষিক-কৌশল গ্রহণ শ্রেয় হবে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে ইংরেজি ভাষার একটা অতীত এই দেশের আছে। অতীতে ইংরেজি ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ার। বর্তমানে বাংলাদেশ এই অতীতকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বিস্তারে তুলনামূলকভাবে সহজে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। সেজন্য স্কুল পর্যায় থেকেই দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া এবং ইংরেজি ভাষার জ্ঞান যাতে শুধু ধনীদের একচেটিয়া (*মনোপলি*) না হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই, সময়ে বাংলাদেশ যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হবে ততই বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চার সুযোগ ও পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ যেমন গুগল ট্রান্সলেটর ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষান্তর করার সুযোগ এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এর ফলে ভাষার ব্যবধানের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। তবে যান্ত্রিক অনুবাদ ঠিক হয়েছে কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্যও উভয় ভাষার সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সবশেষে বলা দরকার যে, আগামীতে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হলে শিক্ষাখাতের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ভিন্ন একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। স্বল্প আয়ের পর্যায় থেকে মধ্যম আয়ের পর্যায়ে উপনীত হতে পারলেও আর অগ্রসর হতে পারে না বরং "মধ্যম আয় ফাঁদে" আটকা পড়ে যায়। এই ফাঁদ এড়াতে হলে বাংলাদেশকে শিক্ষাখাতে বড় পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমান খণ্ডিকৃত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একীভূত করতে হবে। এখনো বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের তুলনায় গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্পদের পরিমাণ বেশি। জাতি এই সম্পদ তাদের কাছে ন্যস্ত করেছে। এই সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনেক উন্নত করা সম্ভব। গণখাতের উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে প্রতিযোগিতা করতে যেয়ে দেশের ব্যক্তিখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানও উন্নত হবে। এভাবে গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নেতৃত্বে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা একীভূত হতে পারবে। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য সহায়ক হবে। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার উন্নতি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সহায়ক হবে। এই দ্বিধারার অগ্রগতির ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সম্পদ তৈরির এক বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। তার ফলে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হবে অন্যদিকে তেমনি দেশ জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং মানসিক সৌকর্য ও সংস্কৃতিতে এগিয়ে যাবে।

৭.২ একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও খণ্ডিকরণ প্রসারিত হয়েছে। একদিকে অগ্রসর হয়েছে সরকারি বনাম বেসরকারি খাতের বিভাজন, অন্যদিকে রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপস্থিতি। এমতাবস্থায় শিক্ষাখাতের মতো চিকিৎসা খাতের একীভূতিকরণের ক্ষেত্রেও

আপস ও নমনীয়তার আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ, এটাও শূন্যপটে ছবি আঁকার মতো হবে না, কারণ বহু ছবি ইতিমধ্যেই এই পটে আঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং এখন চেষ্টা করতে হবে এগুলোকে যতটা পারা যায় নজরে নিয়ে ও ব্যবহার করে একীভূতকরণের মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা। কীভাবে তা করা সম্ভব তা নির্ধারণের জন্য প্রথমে চিকিৎসা ব্যবস্থার বর্তমান বিভাজিত চিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন।

৭.২.১ চিকিৎসা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণ

স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা মূলত সরকারি খাতে অবস্থিত ছিল। ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন, কিন্তু ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক তেমন ছিল না। সরকারি খাতের বাইরে কিছু দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল (কুমদিনী হাসপাতাল তার অন্যতম); কিন্তু এগুলোর সংখ্যা ছিল সীমিত। আশির দশক থেকে বাংলাদেশে দ্রুতহারে ব্যক্তিখাতে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ল্যাব ইত্যাদি গড়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব হাসপাতাল ব্যক্তিখাতে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। সে হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণের সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আপেক্ষিক ভূমিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য বিবিএস (২০২৩) প্রকাশনায় পাওয়া যায়। এই তথ্য দেখায় যে, বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূচকে বর্তমানে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, ২০২১ সালে হাসপাতাল সংখ্যার ৮৭.৭ শতাংশ এবং হাসপাতালের শয্যা সংখ্যার ৬২.৬ শতাংশ ব্যক্তিখাতে ছিল। অনুরূপভাবে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যার ৬২.৬ শতাংশ এবং মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যার ৫৭.৩ শতাংশ ব্যক্তিখাতে ছিল। দন্ত চিকিৎসা, ধাত্রী বিদ্যা, নার্সিং শিক্ষার সকল পর্যায়, এবং চিকিৎসা সহকারী ও চিকিৎসা প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের অংশ ৭৪.৩ শতাংশ থেকে ৯৫.৭ শতাংশ-এর মধ্যে বিস্তৃত।

বলাবাহুল্য, ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের পক্ষেই এসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণকে চিকিৎসার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরই নির্ভর করতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হলেও তার মান অনেকক্ষেত্রে নিচু এবং লভ্যতাও অনিশ্চিত।

গ্রামীণ জনগণকে চিকিৎসার জন্য বহুলাংশে গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরই নির্ভর করতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিবিএস (২০২৩) প্রদত্ত তথ্য দেখায় যে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত হাসপাতালের সংখ্যা ৪২৪টি। যেহেতু সরকারি হাসপাতালের মোট সংখ্যা ৭৩৯টি, সে হিসেবে বলা যায় যে, সরকারি হাসপাতালের অর্ধেকের বেশি (৫৭.৪ শতাংশ) হলো প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত।

সুবিদিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। এসব কেন্দ্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তাররা প্রায়শ স্বস্থানে অবস্থান করেন না এবং আগত রোগীদের বরং নিজেদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের দিকে ধাবিত করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সরঞ্জামাদি কেনা হলেও তা অব্যবহৃত থেকে যায়। লক্ষণীয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভিত্তিক হাসপাতালসমূহ সংখ্যার দিক থেকে সরকারি হাসপাতালের ৫৭.৪ শতাংশ হলেও শয্যা সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে তা ৩৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জনসংখ্যার অনুপাতের আলোকে গ্রামাঞ্চলের (সরকারি) হাসপাতালসমূহের শয্যা সংখ্যা এখনও অপ্রতুল। কিন্তু উপর্যুক্ত অসন্তোষজনক পরিস্থিতির ফলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হাসপাতালসমূহের শয্যার এক বিরাট অংশ অব্যবহৃত থাকে এবং সময়ে এই অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস (২০২৩) প্রদত্ত তথ্য দেখায় যে, যেখানে শহরের সরকারি হাসপাতালসমূহে রোগী উপচে পড়ে সেখানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রায় ৯২ শতাংশে শয্যা খালি থেকে যায়। এই তথ্য আরও দেখায়, যেখানে ২০০৮ সালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহের ২.৪৮ শতাংশ শয্যার ব্যবহারের হার ৪০ শতাংশের কম ছিল সেখানে ২০১৪ সালনাগাদ এই অনুপাত প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

এসব হাসপাতাল ছাড়াও উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলে বহু "বহির্বিভাগ" মূলক (আউট পেশেন্ট) সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (সুযোগ) রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ৬০টি উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস ১,৩১২টি ইউনিয়ন উপকেন্দ্র ও ৮৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মতো এগুলোর অবস্থাও সন্তোষজনক নয়।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে যে চিত্রটি বেড়িয়ে আসে তা হলো, শহরাঞ্চলে এখন ব্যক্তিখাতের হাসপাতালের সংখ্যা এবং শয্যা সংখ্যা এ দুটোই বেশি। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা ব্যয়বহুল; বলা যায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের অপ্রতুলতা, নিম্নমান এবং চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কারণে অনেক সময় স্বল্প আয়ের মানুষদেরও এসব প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও অন্যান্য সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের জন্য ভরসা। কিন্তু সেগুলোর অসন্তোষজনক অবস্থার কারণে তাদেরকেও অনেক সময় ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে মানুষকে প্রায়শ আর্থিক সংকটে নিপতিত হতে হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জানায় যে, চিকিৎসার জন্য মোট খরচে নিজের "পকেট থেকে ব্যয়িত" অর্থের অনুপাত ২০১২ সালে ছিল ৬৪ শতাংশ যা ২০১৫ সালে ৬৭ শতাংশ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমান করা হয় যে, বিগত বছরগুলোতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে "চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতি বছর ৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যাচ্ছে" (GoB 2020, p. 580)।

সরকারি-বেসরকারি বিভাজনের পাশাপাশি বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় আরেক যে ধারার বিভাজন দেখা যায় তা হলো অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বনাম অন্যান্য ধরনের চিকিৎসা, যার মধ্যে রয়েছে হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক। এ ছাড়া রয়েছে অবৈজ্ঞানিক ধরনের, বিশ্বাস-নির্ভর বিভিন্ন প্রথা। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যয়ভার মিটানোর মতো সক্ষমতা না থাকায় অথবা অন্যান্য কারণে অনেকে এসব বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ সংক্রান্ত বিবিএস (২০২৩) প্রদত্ত তথ্য দেখায় যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ২টি করে ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ আছে এবং ১টি করে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। কিন্তু ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক ডিপ্লোমা কলেজের ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমরা দেখি যে, যেখানে সরকারি খাতে এ ধরনের মাত্র ১টি কলেজ রয়েছে, সেখানে বেসরকারি খাতে এই সংখ্যা ২২। ডিপ্লোমা কলেজের এই আধিক্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্নমানের ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাই প্রদান করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি সত্য হয়ে থাকলে নিঃসন্দেহে তা দুঃখজনক। তার চেয়েও উদ্বেগজনক হলো আর্থিক অনটন এবং কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঝাড়ফুঁক, পানিপড়া ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ। বলাবাহুল্য, এসব পদ্ধতির শরণাপন্ন হওয়া আর চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রায় সমার্থক।

সুতরাং আমরা দেখি যে, শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাও এখন ত্রিখণ্ডিত। একদিকে রয়েছে ধনীদের জন্য ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল ও ক্লিনিক, অন্যদিকে রয়েছে সাধারণ জনগণের জন্য নিম্নমানের সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। তৃতীয় খন্ডে রয়েছে এলোপ্যাথিক বহির্ভূত বিভিন্ন চিকিৎসা যেগুলো অনেকক্ষেত্রে নিম্নমানের অথবা কেবলই বিশ্বাস নির্ভর।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও একটি "পৃথকীকৃত ভারসাম্য" (*সেপারেটিং ইক্যুইলিব্রিয়া*)-এর উদ্ভব ঘটেছে। এর অধীনে ধনীরা একদিকে যেমন ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উন্নতমানের চিকিৎসা গ্রহণ করছেন, অন্যদিকে তেমনি তার জন্য উচ্চ উচ্চমূল্যও প্রদান করছেন। পক্ষান্তরে স্বল্প আয়ের জনগণ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন, যার মান অপেক্ষাকৃত নিচু কিন্তু সেটা তারা কম কিংবা বিনামূল্যে পাচ্ছেন।

কিন্তু উপর্যুক্ত খণ্ডিকৃত ও "পৃথকীকৃত ভারসাম্য" সম্বলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সমাজের জন্য সর্বোত্তম নয়। সারণি ৭.৪ দেখায় যে, বিগত সময়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করলেও উন্নত বিশ্বের তুলনায় তা এখনও বহু পিছিয়ে আছে।

সারণি ৭.৪: বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকে উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ব্যবধান

বিষয়	বাংলাদেশ	উন্নত বিশ্ব (OECD)
প্রতি ১০,০০০ জন নাগরিকের জন্য ডাক্তারের সংখ্যা	৬.৭	৩৪.০
মাতৃ-মৃত্যু হার	১.৬৮	০.২২
শিশু-মৃত্যু হার (এক বছরের নিচে)	২৫	৪.১
শিশু-মৃত্যু হার (পাঁচ বছরের নিচে)	৩১	৬

সূত্রঃ বাংলাদেশের তথ্য BBS (2023) সূত্রে প্রাপ্ত। ওইসিডি'র তথ্য বিশ্বব্যাংকের সূত্রে প্রাপ্ত https://data.worldbank.org/

সুতরাং উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে হলে বাংলাদেশকে আরও বহুদূর অগ্রসর হতে হবে এবং আগামীতে একটি একীভূত ও "সার্বজনীন ভারসাম্য" সম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কীভাবে তা করা সম্ভব সে বিষয়ে একটি কার্যকর ধারণায় উপনীত হওয়া জন্য প্রথমেই উন্নত দেশসমূহের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি সংক্ষেপে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৭.২.২ *উন্নত দেশসমূহের চিকিৎসা ব্যবস্থা*

সব উন্নত দেশেই একীভূত সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা বিরাজ করে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এটা নির্ভর করে মোটা দাগে দুটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, সমগ্র চিকিৎসা সেবা সরকারি খাতে নাকি তাতে ব্যক্তিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে? দ্বিতীয় হলো, চিকিৎসার ব্যয়ভার কি সরকার বহন করে নাকি নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে হয়? যদি সরকার সকল ব্যয় বহন করে তবে তাকে সার্বজনীন বিমা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এই দুই নির্ণায়কের আলোকে একটি তুলনামূলকভাবে সহজ ব্যবস্থা হলো যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণখাত নির্ভর এবং সার্বজনীন বিমা ব্যবস্থা কাজ করে। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এবং কানাডায় সাধারণভাবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় চিকিৎসা খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করে। এতে এক ধরনের ন্যায্যতা বজায় থাকে, কারণ কর সাধারণত আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে ধার্য হয়। ফলে এই ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে ধনীরা চিকিৎসার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের চেয়ে বেশি ব্যয়ভার বহন করে। লক্ষণীয়, সার্বজনীন বিমার অধীনে ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও কাজ করতে পারে। যেমন, একজন ব্যক্তি তার বিমা ব্যবহার করে ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানকে ব্যয় পরিশোধ করতে পারে। পক্ষান্তরে কিছু উন্নত দেশে চিকিৎসা বিমা বহুলাংশে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এসব দেশে চিকিৎসা সেবা প্রদানেও ব্যক্তিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে স্বাস্থ্যবিমা সাধারণত নিয়োজনের ভিত্তিতে হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট আকারের উপরের কোম্পানিসমূহ তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিমা প্রদানে বাধ্য থাকে এবং ব্যক্তিখাতের বিমা কোম্পানির কাছ থেকে এসব বিমা কিনতে হয়। এই বিমা ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি সরকারি কিংবা ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

এসব বিভিন্ন ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি আছে। চিকিৎসা সেবায় ব্যক্তিখাতের উপস্থিতির পেছনে বড় যুক্তি হলো যে, এর ফলে প্রতিযোগিতা বজায় থাকে বিধায় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়, দক্ষতা নিশ্চিত হয় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সরকারি খাতে চিকিৎসা সেবার পক্ষে যুক্তি হলো যে, চিকিৎসা সেবা মুনাফার লক্ষবস্তু হওয়া উচিত নয় এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি খাতে রেখেও তাদের মধ্যে

প্রতিযোগিতা বজায় রাখা যায়। একইভাবে ব্যক্তিখাতে চিকিৎসা বিমা রাখার পক্ষে যুক্তি হলো যে, এর ফলে যেমন প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যায় তেমনি চিকিৎসা খাতে দক্ষতাও নিশ্চিত করা যায়। পক্ষান্তরে সরকারি খাতে সার্বজনীন বিমার পক্ষে যুক্তি হলো এর ফলে সমাজের সকলকে বিমাতে সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয় এবং অনাবশ্যক প্রতিযোগিতাহেতু অপচয় রোধ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, বেসরকারি খাতে রেখে চিকিৎসা বিমার সার্বজনীনতা অর্জন বস্তুতই কঠিন। প্রথমত, নির্ধারিত আকার সীমার নিচের কোম্পানিতে যারা কাজ করেন তাদেরকে স্বাস্থ্য বিমার জন্য বিকল্প উপায় খুঁজতে হয়। দ্বিতীয়ত, যারা স্ব-নিয়োজিত অর্থাৎ কোনো নিবন্ধিত কোম্পানির জন্য কাজ করে না তাদেরকে বিকল্প খুঁজতে হয়। সর্বোপরি, যারা বেকার তাদেরকেও বিকল্প খুঁজতে হয়। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রকেও একাধিক সরকারি স্বাস্থ্য বিমার আয়োজন করতে হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো *মেডিকেয়ার*, যার অধীনে বৃদ্ধরা চিকিৎসা সেবা পায়। আরেকটি হলো *মেডিকেইড*, যার অধীনে দারিদ্র্যসীমার নিচের নাগরিকেরা চিকিৎসা সেবা পায়। এসব সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্য বিমাহীন থেকে যায়। যেমন, ২০২১ সালে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ছিল বলে অনুমিত হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই বিরাট সংখ্যক মানুষ কোনো চিকিৎসা পায় না। যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ম আছে যে, বিমা নেই বলে হাসপাতালসমূহ কোনো চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। বরং চিকিৎসার পর তার কাছ থেকে খরচ আদায় করার চেষ্টা করবে এবং যদি শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, রোগী বস্তুত এবং সংগত কারণেই হাসপাতালের বিল পরিশোধে অপারগ, সেক্ষেত্রে হাসপাতাল এটাকে "অপরিশোধিত সেবা" হিসেবে গণ্য করবে এবং যতটা পারা যায় সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুনর্ভরণ পাওয়ার চেষ্টা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিমার সার্বজনীনতার অভাবের একটি প্রতিফল হলো যে, স্বাস্থ্যসেবার মোট খরচ বেড়ে যায়। কারণ স্বাস্থ্য বিমা না থাকার কারণে মানুষ প্রতিষেধক নেয় না এবং প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা অবহেলা করে এবং শেষে যখন অসুস্থতা গুরুতর পর্যায়ে উপনীত হয় তখন হাসপাতালে ভর্তি হয়। এতে অবশ্য হাসপাতালের লাভ, কারণ তার আয় বাড়ে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেকারণে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য জিডিপির প্রায় ১৪ শতাংশ ব্যয় হয়, যেখানে অধিকাংশ

অন্যান্য উন্নত দেশে এই অনুপাত ৬-৭ শতাংশের মতো। অথচ স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচক, বিশেষত গড় আয়ুর বিচারে শেষোক্ত দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে আছে। এই আলোচনা দেখায় যে, চিকিৎসা ব্যবস্থার একীভূতিকরণ এবং সার্বজনীনতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় আছে এবং এগুলির কোনটি গ্রহণ করা শ্রেয় হবে তা বাংলাদেশকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৭.২.৩ *বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা সার্বজনীন ও একীভূতকরণের উপায়*

এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে সার্বজনীন ও একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসকে কতগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমত, শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তেমন একীভূতকরণ শুধু গণখাতের ভিত্তিতে আর সম্ভব নয়। বাংলাদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিখাতের ভূমিকা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এটাকে অন্তর্গত করেই বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সার্বজনীন ও একীভূতকরণের কথা ভাবতে হবে। ফলে এক্ষেত্রে কর্মকৌশলও কিছুটা শিক্ষা খাতের মতোই হবে। দ্বিতীয়ত, প্রথম অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সরকারি কর্মচারীদের বাদ দিলে দেশের মাত্র ৩.৮ শতাংশ পরিবার এখন কর প্রদান করে থাকে। যেহেতু দেশের স্বল্প শতাংশ নাগরিক প্রত্যক্ষ আয় ও সম্পদ করের আওতাধীন সেহেতু "সামর্থ্য অনুযায়ী দেয়" নীতির প্রয়োগ দ্বারা ন্যায্যতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ব্যয়ের অর্থায়ন করা বাংলাদেশের জন্য নিকট ভবিষ্যতে কঠিন হবে। অন্য কথায়, এত সংকীর্ণ কর-ভিত্তির কারণে সার্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা প্রচলনকেও একটি সময়সাপেক্ষ প্রয়াস হতে হবে।

এক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো, শিক্ষার মতো চিকিৎসার সার্বজনীনতার পেছনে জোরালো নৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। নৈতিক কারণটি স্পষ্ট। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা এই পাঁচটিকে মানুষের মৌলিক অধিকার বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং যেকোনো মানবিক সমাজের দায়িত্ব তার সকল সদস্যের জন্য এসব অধিকার নিশ্চিত করা। তবে শিক্ষা ও চিকিৎসার সার্বজনীনতার পেছনের অর্থনৈতিক কারণও কম জোরালো নয়। সমাজের সদস্যরা যদি সুস্বাস্থ্য এবং সুশিক্ষার অধিকারী না হয় তবে তাঁরা উন্নত মানের উৎপাদকও হতে পারেন না। বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে উৎপাদনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা

যেতে পারে, প্রাকৃতিক ও ভৌত সম্পদের চেয়ে অর্থনীতিতে মানবসম্পদের গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। সার্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসা এই মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে সহায়ক, কারণ উভয়েরই "বহিঃসারিত উপকার" (*পজিটিভ এক্সটারনালিটি*) আছে। অর্থাৎ, একজন শিক্ষিত ও সুস্থ হলে শুধু সেই উপকৃত হয় না, তার সাথে সম্পর্কিত অন্যরাসহ গোটা সমাজ উপকৃত হয়। সেজন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা শুধু ব্যক্তির দায়িত্ব না হয়ে গোটা সমাজের দায়িত্ব হতে হবে। আর সে কারণেই পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে শিক্ষা ও চিকিৎসাকে সার্বজনীন সেবা বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশকেও শিক্ষা ও চিকিৎসাকে সার্বজনীন প্রয়োজনীয়তা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকে আপাতত সরকারকেই সমাজের স্বল্প আয়ভুক্তদের জন্য গণখাতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং করভিত্তি সম্প্রসারণের সাথে সাথে এর জন্য ব্যয়ভার ক্রমশ প্রগতিশীল হারে কর আদায়ের মাধ্যমে নির্বাহ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, বিগত সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে যেসব অর্জন, বিশেষত স্বাস্থ্য বিষয়ক "সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টমালা" অর্জনে বাংলাদেশের যে সাফল্য, তা মূলত গণখাতের কার্যক্রমের ফলেই অর্জিত হয়েছে। যেমন, রোগ প্রতিষেধক (*প্রিভেনশান*) কর্মসূচি যার অধীনে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধকারী টিকা ও ইনজেকশন দেওয়া হয়, তা এখনও বহুলাংশে সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার (*প্রাইমারি কেয়ার*) ক্ষেত্রে সরকারি খাতের বড় উপস্থিতির বিষয়টি আমরা উপরে লক্ষ করেছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন কেন্দ্রসমূহ ছাড়া এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ১৩,৯০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক যেগুলো গ্রাম পর্যায়ে অবস্থিত এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান এবং প্রসূতি মায়েদের প্রাক- প্রসব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্তুত সাম্প্রতিককালে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে বাংলাদেশের সাফল্যের পেছনে এসব কমিউনিটি ক্লিনিক বড় অবদান রেখেছে। রোগ প্রতিরোধ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর সাফল্যের উপর নির্ভর করেই আগামীতে অগ্রসর হতে হবে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসার দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত চিকিৎসার উন্নত ও পর্যাপ্ত সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে কেবল ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের মতো চিকিৎসা ক্ষেত্রেও সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে "মনুষ্য উপাদানে"র উপর, অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল (মানব সম্পদ) নিশ্চিত করার উপর। সেজন্য এমন সব নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা কাঠামো সৃষ্টি হয়। এর একটি দিক হলো ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের জন্য উপযোগী বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ডাক্তাররা যেন অকুস্থলে অবস্থান করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে "ভৌগোলিক বৈষম্য" দূর করা সংক্রান্ত ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আলোচিত করণীয়টি সহায়ক হবে। দেশের বর্তমান ঢাকামুখী উন্নয়ন ধারাকে পরিবর্তিত করে যদি ছোটবড় সকল শহর অভিমুখী করা যায় তাহলে জেলা ও উপজেলা শহরে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে ব্যবধান হ্রাস পাবে। একইভাবে এসব শহরের সাংস্কৃতিক মানও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বর্তমানে যেকোনো প্রকারে ঢাকা শহর আঁকড়ে থাকার যে প্রবণতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা কমবে। বস্তুত ভয়াবহ যানজট ও অন্যান্য কারণে ঢাকা শহরে বসবাস এখন আর তত আরামদায়ক নয়। ফলে নিকটবর্তী জেলা শহরে যদি উন্নত মানের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যায় তাহলে ভালো ডাক্তার ও শিক্ষকদের এসব শহরে বসবাসে উৎসাহ বাড়বে এবং বর্তমানের যে "অনুপস্থিতির" সমস্যা তা কমবে। তৃতীয়ত, গণখাতে কর্মরত ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বলাবাহুল্য, এই ইস্যুটি তাদের বেতন-ভাতা ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত। স্পষ্ট যে, গণখাতের ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিয়োজিত হওয়া স্বার্থ-সংঘাতের সৃষ্টি করে, যা এড়াতে পারাই ভালো। এই ইস্যুটি গণখাতের শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং করার সুযোগ দেওয়ার ইস্যুর সাথে সমান্তরাল।

গণখাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং ক্রমশ আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে সেটার সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক তদারকির জন্য উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একদিকে অ-মুনাফামুখী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে, অন্যদিকে মুনাফামুখী চিকিৎসা

প্রতিষ্ঠান যাতে রোগীদের সঠিক মানের চিকিৎসা দেয় এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাত যাতে গণখাতের যথাযথ সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের অ-মুনাফামুখী হওয়াই শ্রেয়। একটা পর্যায়ে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সেই পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন সার্বজনীন স্বাস্থ্য বিমার প্রচলন করা যাবে যার অধীনে একজন ব্যক্তি সরকারি কিংবা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই চিকিৎসা সেবা পেতে পারবে।

৭.৩ একীভূত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আগামী দিনের বাংলাদেশের করণীয় যতটা না একীভূতকরণের তার চেয়েও বেশি প্রায় শূন্য থেকে নির্মাণের। বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র সরকারি এবং আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের (বৃহত্তর অর্থে, অর্থাৎ অফিসার এবং কর্মচারী, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে) জন্য পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড (আপৎকালীন তহবিল) ব্যবস্থা চালু আছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধ বয়সের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত নয় এবং আপৎকালীন তহবিলের পরিমাণও সীমিত। সর্বোপরি, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে কর্মরত কর্মচারীরা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি অতি সামান্য অংশ। ব্যক্তিখাতে পেনশন অথবা প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; এটা বহুলাংশে কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের নিজেদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই।

সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি হলো বৃদ্ধ বয়সে -- যখন মানুষ আর কর্মক্ষম থাকে না এবং তার ফলে কাজ করে আয় অর্জনের সক্ষমতা থাকে না -- ভরণপোষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ। দ্বিতীয়ত, যখন কর্মক্ষম বয়সে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিয়োজনের সুযোগের অভাবে কাজ করা এবং আয়-উপার্জনে অপারগ তখন ভরণপোষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ। তৃতীয়ত, কর্মক্ষমকালীন যদি কেউ অসুস্থতার কারণে কাজ ও উপার্জন করতে অক্ষম হন তখন ভরণপোষণের প্রয়োজনীয়তা। উন্নত দেশসমূহে সাধারণত সার্বজনীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে যাতে নাগরিকদের এই তিন ধরনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়। এ ব্যবস্থার

অধীনে সকলে কর্মক্ষম ও নিয়োজিত থাকাকালীন তাদের আয়ের একটি অংশ সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে প্রদান করে। এই তহবিল থেকে সরকার উপযুক্ত তিনটি প্রয়োজনে অর্থ প্রদান করেন। এটাকে বলা যেতে পারে সামাজিক নিরাপত্তা বিমা। তবে দেশভেদে উন্নত বিশ্বেও এই সাধারণ ব্যবস্থার নানা সুনির্দিষ্ট রূপ আছে। উপরের উপ-অনুচ্ছেদে আমরা চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য বিমার কথা আলোচনা করেছি। অনেক উন্নত দেশে নিরাপত্তা বিমার মধ্যেই স্বাস্থ্য বিমা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য মূলত নিজেদের সঞ্চয় ও পরিবারের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। এই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমাজের সচ্ছল অংশের জন্য ভালই কাজ করতে পারে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সমাজের দরিদ্র অংশের জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের তেমন সঞ্চয় থাকে না; এর ফলে আপদকালে তাদেরকে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। লক্ষণীয়, নিরাপত্তার এই অভাব সমাজের দরিদ্র অংশের শুধু নিজেদের জন্য অনভিপ্রেত তাই নয়, এটা গোটা সমাজের জন্যই যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত তেমন ক্ষতিকর। প্রথমত, বেকার অবস্থায় অথবা অসুস্থতার কারণে যদি কারও আয়-নিরাপত্তা না থাকে তবে তাঁর এবং তার পরিবারের বিশেষত সন্তানদের ন্যূনতম খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি চাহিদা বহুলাংশে অপূরিত থাকে। ফলে গোটা সমাজের মানব সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃদ্ধদের জীবনমান অক্ষুণ্ন থাকাটাও সমাজের জন্য মঙ্গলকর।

এসব কারণেই উন্নত দেশসমূহে সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিরাজ করে। এই ব্যবস্থা দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমত, তা একজন ব্যক্তির আয়কে সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনঃবিতরিত করতে সাহায্য করে। যখন সে কর্মক্ষম থাকে এবং আয় করে তখন সেই আয়ের একটা অংশ সরকার নিয়ে যায় এবং একই ব্যক্তির বৃদ্ধ বয়সে সেই আয় ফেরত দেয়। আয়ের এই সময়াগত *(টেমপোরাল)* পুনঃবিতরণ একজন ব্যক্তি নিজেই করতে পারতেন। তবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একজন ব্যক্তির উপর এরূপ সঞ্চয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। তদুপরি এই ব্যবস্থার অধীনে নিয়োজনকারীদেরকেও (যুক্তরাষ্ট্রে) সমপরিমাণ অর্থ সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে প্রদান করতে হয়। ফলে ব্যক্তির সঞ্চয় এক অর্থে দ্বিগুণ হয়। এই বর্ধিত সঞ্চয় ব্যক্তির জন্য এবং সমাজের জন্য মঙ্গলকর ও উপকারী বলে পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু একজন ব্যক্তির আয়ের সময়গত পুনঃবিতরণ বোঝায় না। এটা আন্তঃব্যক্তি (*ইন্টার পার্সন*) পুনঃবিতরণকেও বোঝায়।

এর অধীনে সাধারণত ধনীদের কাছ থেকে বেশি অর্থ আদায় করা হয়, ফলে দরিদ্ররা এই তহবিলে যত আয় জমা দেয় তার চেয়ে বেশি ফেরত পায়। পক্ষান্তরে ধনীরা যত আয় জমা দেয় তার চেয়ে কম আয় ফেরত পায়। এভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমাজের মধ্যে আয়ের পুনঃবিরতণ সাধন করে। (এ বিষয়টি আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে "অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে"র প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি।) এই উভয়বিধ উপকারের কারণেই সকল উন্নত দেশে সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিরাজমান। উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অভিযাত্রী বাংলাদেশকেও আগামীতে সার্বজনীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে তা সম্ভব? সূচনাতেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে আনুষ্ঠানিক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিধি খুবই সীমিত ও অপর্যাপ্ত। বিগত বছরগুলোতে নিরাপত্তা বলয়কে সম্প্রসারিত করার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি। সরকারের মতে দেশের দুই কোটি মানুষ এখন নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এসব উদ্যোগ প্রশংসনীয় তবে তা অপর্যাপ্ত বলেই পর্যবেক্ষকদের অভিমত। তদুপরি এসব অনুদান বহুলাংশে সরকারের বদান্যতা বলে প্রতিভাত হয়। এটা নিজের কর্মকালীন সঞ্চয়ের ভিত্তিতে প্রাপ্য বলে যেমন পরিগণিত হয় না তেমনি সমাজের নিকট স্বীকৃতও হয় না।

অতি সম্প্রতি সরকার "সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা" প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এটা ভালো উদ্যোগ। এ ব্যবস্থার অধীনে এখন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিরাপত্তা বিমা কিনতে পারবে। তবে এসব বিমা প্রচলিত ধরনের ব্যক্তিগত বিমা থেকে তেমন পৃথক কিছু নয়। ফলে এগুলো বহুলাংশে "ব্যক্তিগত নিরাপত্তা" স্কিম, "সামাজিক নিরাপত্তা" স্কিম নয়। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের অধীনে আন্তঃব্যক্তি আয় স্থানান্তর ঘটে। প্রথমত, কর্মীদের সঞ্চয়ে নিয়োজনকারীদের নিকট থেকে প্রায় সমপরিমাণ অর্থ যোগ হয়। দ্বিতীয়ত, বিতরণের সময়ও ধনীদের নিকট থেকে অর্থ স্বল্পআয়ভুক্তদের নিকট স্থানান্তরিত হয়। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটি গভীর, ব্যাপক ও গূঢ় বিষয়। এই ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য দেশের কর ভিত্তিকেও সার্বজনীন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে যেটা প্রথমে প্রয়োজন হবে তা হলো শ্রম এবং নিয়োজনের আনুষ্ঠানিকরণ, যে বিষয়টি প্রথম অনুচ্ছেদে ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। নিয়োজন আনুষ্ঠানিক ও নিবন্ধিত না হলে একদিকে যেমন অধিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে আয় ও সম্পদ কর আদায় করা যায় না, অন্যদিকে

তেমনি স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের আয় সহায়তা প্রদান করা যায় না। কাজেই সার্বজনীন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পৌঁছানো হবে একটি বিরাট যজ্ঞ এবং তাকে ক্রমান্বয়ে একটা দীর্ঘ সময়কালব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবতে হবে। এটাকে নিছক ব্যক্তি বিমা হিসেবে ভাবা ও উপস্থিত করা সঠিক নয়। তবে ব্যক্তি বিমা সম্প্রসারণের সরকারের এই সাম্প্রতিক প্রয়াসকে সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে একটি পদক্ষেপ হিসেবে অবশ্যই বিবেচনা করা যেতে পারে। আগামীতে এসব প্রাথমিক পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে যেতে হবে। সময়সাপেক্ষ হলেও নিঃসন্দেহে সার্বজনীন ও একীভূত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমাজের সংহতি বৃদ্ধিতে প্রভূত সহায়ক হবে।

৭.৪ ধর্মীয় সম্প্রতি বৃদ্ধি

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, অনুভূমিক বিভক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের সমাজে কিছু উল্লম্বিক (ভার্টিক্যাল) বিভক্তিও বিরাজ করছে, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করার জন্য যেগুলিকেও লাঘব করতে হবে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভক্তি হলো ধর্মের ভিত্তিতে। পরিতাপের বিষয় যে, উন্নয়নের প্রথম পর্বের একটি নেতিবাচক সহগামী প্রপঞ্চ হলো সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি। যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল তার অন্যতম উপাদান ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। এই জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতা বাংলাদেশের চার মূল রাষ্ট্রীয় নীতির অন্যতম দুটি বলে স্বীকৃত হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশে আর কখনো সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা দেখা দিবে না। সেই স্পৃহা থেকেই স্বাধীনতার পর ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই নিষেধাজ্ঞাকে আইনি রূপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং বঙ্গবন্ধুর সরকারের উৎখাতের পর থেকে বাংলাদেশে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটে। তার একটি অভিপ্রকাশ ছিল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেওয়া। এই অনুমতির সুযোগ নিয়ে এমন সব দল পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে যেগুলো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার পাশাপাশি পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল।

দেশের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পাশাপাশি কিছু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বিস্তারে সহায়ক হয়। ওপেক গঠনের পর বিপুল পরিমাণ অর্থবিত্তের মালিক হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ অন্যান্য মুসলিম দেশে ওয়াহাবী ইসলাম প্রচারের জন্য সেই অর্থ-বিত্ত ব্যবহার শুরু করে এবং তার প্রভাব বাংলাদেশ এসে পড়ে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (*এনজিও*) মাধ্যমে বিদেশী টাকা পাঠানোর ব্যবস্থার উদ্ভব এক্ষেত্রে একটি বাড়তি সুযোগের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার উপস্থিতিও এর জন্য সহায়ক হয়। আমরা আগে লক্ষ করেছি, কওমি মাদ্রাসাগুলো সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ফলে তারা বেসরকারি সংস্থার (*এনজিও*) নিকট থেকে অর্থ পাওয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়। এভাবে ওয়াহাবী ইসলামের সাথে বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাসমূহের এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যার ফলে বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা, বিত্ত ও প্রতিপত্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয় যে পথে বাংলাদেশ ওয়াহাবী ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় তা হলো সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে কর্মী আমদানি। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে বিরাট সংখ্যায় কর্মীরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে অস্থায়ী অভিগমন শুরু করে। তাদের অনেকে এসব দেশের প্রভুশ্রেণির সংস্কৃতিকে নিজেদের জন্য অনুকরণীয় মনে করে। মোটা দাগে একই ধর্মের হওয়ার কারণে তাদের মনে এই অনুকরণীয়তা আরও বেশি বদ্ধমূল হয়। এ কর্মীরা দেশে ফেরার পর ওয়াহাবী ইসলামের বিভিন্ন আচার-আচরণ চালু করার চেষ্টা করে, এসব কর্মীরা সাধারণত স্বল্প আয়ের গ্রামীণ পরিবারসমূহ থেকে আগত। ফলে তাদের মাধ্যমে ওয়াহাবী ভাবধারার ইসলাম গ্রামে-গঞ্জে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

এদিকে শহুরে ধনীদের মধ্যেও ওয়াহাবী ইসলাম প্রসার লাভ করে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের একটি বিপরীত প্রতিফল কাজ করে, সেটি হলো বিশ্বজুড়ে পশ্চিমের সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার। বিশেষত, মহিলাদের স্বল্পবসন, নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব অবাধ মেলামেশা, মদ্যপান ইত্যাদি অনেক উন্নয়নশীল, বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশের জন্য স্বীয় ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির উপর একটি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব দেশে ধনী ও এলিটদের একাংশের মধ্যেও ওয়াহাবী ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এভাবেই সমাজের ধনী এবং স্বল্পআয়ী উভয় বর্গেই ওয়াহাবী ইসলাম প্রসার লাভ করে এবং শাড়ীর পরিবর্তে হিজাব ও লম্বা গাউন বাংলাদেশের নারীদের প্রায় জাতীয় পোশাকে পরিণত হয়।

সমাজের এই ওয়াহাবীকরণ দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। জিয়ার আমলেই সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতার মৌল নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এরশাদ আরও এক ধাপ এগিয়ে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করে, যেটা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাতে ইসলামী শক্তিশালী হয় এবং ২০০১-২০০৬ সময়কালে বিএনপির সাথে জোট সরকারের অংশীদার হয়। ফলে তাদের দুই নেতা, মতিউর রহমান নিজামী এবং আব্দুল্লাহ মুজাহিদী, যারা উভয়েই যুদ্ধাপরাধী বলে অভিভুক্ত - মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন "হেফাজতে ইসলাম" একটি বড় সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়, যা প্রায়শ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হয়।

দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি, বিশেষত যুদ্ধাপরাধীদের দেশের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া, দেশের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। একাত্তরে শহিদ পরিবারের সন্তানেরা সময়ে বড় হয়ে উঠলে দেশের এই পরিবর্তন তাদের কাছে নিজেদের পিতা-মাতার আত্মত্যাগ ও স্মৃতির প্রতি অবমাননা সামিল বলে বোধ হয়। এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত গণজাগরণ মঞ্চের রূপে বিস্ফোরিত হয়, যা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আরোহণকে সুগম করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে এবং তাদের অনেকের ফাঁসি হয়। এর ফলে জামাতে ইসলামীও বেশ বিপাকে পড়ে এবং এই দলের নিবন্ধন বাতিল হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীয় প্রত্যাশিত অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরুদ্ধে যেয়ে আওয়ামী লীগ সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে এরশাদের ঘোষণা বাতিল করতে অসমর্থ হয় এবং হেফাজতে ইসলামকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।

সুতরাং আমরা দেখি যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বহুলাংশে হারিয়ে গেছে। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর এক ব্যাপক আক্রমণ এবং নির্যাতন সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ণিমা নামের এক হিন্দু মেয়েকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনা ভুলে যাওয়ার নয়। এখনও প্রায়শই এবং সুযোগ পেলেই সাম্প্রদায়িক শক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করেন না এবং তাদের মধ্যে ভারতে অভিগমনের প্রবণতা এখনও বিরাজমান। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যানুপাতের ক্রমহ্রাসের (চিত্র ৭.১) পেছনে এই অভিগমনও একটি কারণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকের অসন্তুষ্টির আরেক কারণ হলো

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিস্থিতি। অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ নিষ্পত্তি এখনো অর্জিত হয়নি। বরং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় সরকারের আমলেই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন কর্তৃক ফরিদপুর শহরের দৃষ্টিনন্দন হিন্দু বাড়ি অধিগ্রহণ করার ঘটনা তারই একটি উদাহরণ।

চিত্র ৭.১: বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের সংখ্যানুপাত (শতাংশ) (১৯০১-২০১১)

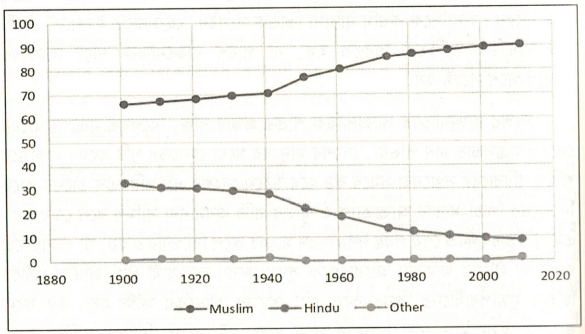

তথ্য: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২৩।

শুধু যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরাই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছেন তাই নয়, সংখ্যায় আরও স্বল্প বাংলাদেশের যে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের নাগরিকেরা আছেন তারাও প্রায়শ এর শিকার হচ্ছে। বিগত সময়কালে গোপালগঞ্জের খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কিংবা রামুতে বৌদ্ধ বিহারের উপরের আক্রমণ তারই সাক্ষ্য বহন করে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেই আহমদিয়া মতধারার নাগরিকেরাও নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এসবই ধর্মীয় অসিহষ্ণুতা প্রসারের পরিচায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মীয় সমানাধিকার, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা আগামী দিনের একটি বড় করণীয়। ১৯৭২ সালে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতা যেভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হবে। এসব লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো অসহিষ্ণু

ওয়াহাবী ইসলামের পরিবর্তে শান্তি ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতার বাণী সম্পন্ন প্রকৃত ইসলামকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। "যার যার ধর্ম তার তার কাছে" (সুরা কাফিরুন) – পবিত্র কোরানের এই বাণীকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণভাবে সমর্থিত হতে হবে।

৭.৫ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার

৭.৫.১ বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

বাঙালিদের তুলনায় সংখ্যায় স্বল্প হলেও বাংলাদেশে বেশ কিছু অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এই নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে সমস্যা মনে না করে বরং সম্পদ বলে বিবেচনা করতে হবে; তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; এবং তাদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের সম্প্রীতি জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙালি-ভিন্ন অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে কী বলে অভিহিত করা হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। তাঁদের অনেকে নিজেদেরকে "উপজাতি" কিংবা "গোষ্ঠী" বলতে রাজী নন, কিন্তু "ট্রাইবাল" বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ইংরেজি "ট্রাইব" শব্দের সঠিক বাংলা কী তা নিয়ে মতভেদ আছে, তবে অনেকে "কৌম" শব্দটি শ্রেয় মনে করেন। সেইসূত্রে নিচের আলোচনায় আমরাও "কৌম" শব্দটি ব্যবহার করবো, যদিও এটাই যে সর্বাংশে সঠিক এমন কোনো দাবি আমরা করিছ না।

বিবিএস (২০২৩) অনুসারে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী কৌম খানার মোট সংখ্যা হলো ৩,৪৫,৮২৮টি এবং তাঁরা প্রায় সারা বাংলাদেশ জুড়েই বিস্তৃত। তবে তাঁদের বড় অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা যথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনে অবস্থিত। এই তিন জেলায় বসবাসকারী কৌম খানার মোট সংখ্যা ১,৮৩,২৮৪টি (অর্থাৎ, সারা দেশের মোট কৌম খানার ৫৩.০ শতাংশ) এবং তা এসব জেলার মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৬০.৮, ৫৩.০ ও ৪৬.১ শতাংশ। অন্য যেসব জেলায় বড় সংখ্যায় কৌম জনগণের বসবাস সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দিনাজপুর (সাঁওতাল), হবিগঞ্জ (খাসিয়া), মৌলভীবাজার (খাসিয়া), নওগাঁ (সাঁওতাল) ও রাজশাহী (সাঁওতাল)। এ পাঁচটি জেলায় কৌম খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১৫,৯৯৯, ১৪,৫৩৪, ১৩২১৭, ২৮,৩৭৪ ও ১১,১৩২টি এবং তা এসব জেলার মোট খানার যথাক্রমে ৪.৫, ৪.১, ৩.৭. ৮.০ ও ৩.২ শতাংশ। আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের এই অবাঙালি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ

করা যেতে পারে: পাহাড়ি এবং সমতলী। পার্বত্য তিন জেলা, সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের খাসিয়া এবং ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ এবং নেত্রকোনার গারো পাহাড়ে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীসমূহকে একত্র করে পাহাড়ি বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কৌমখানার মধ্যে তাদের মোট অনুপাত হবে ৬৪.৯ শতাংশ (অর্থাৎ, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ)। বাকিরা সমতলী এবং তারা মোট কৌম খানা সংখ্যার ৩৪.১ শতাংশ।

জাতিগত শোষণ আর অবহেলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সাথে কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে অনেক অবাঙালি নৃগোষ্ঠীর তরুণেরাও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মং রাজা প্রু সিন-কে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সরকার বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করে। এই পটভূমিতে আশা করা গিয়েছিল যে, অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশ বিশেষভাবে যত্নবান হবে। তবে এই আশা প্রত্যাশিত মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার পরও সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহ অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্যায় ও অবহেলার শিকার হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তা সংঘাতেরও সৃষ্টি করেছে। যেসব সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তাদের মূল হলো তিন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বসবাসকারী পাহাড়ি জনগণ।

৭.৫.২ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সাথে সংঘাতের পটভূমি

৭.৫.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পটভূমি

একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রায় পুরোপুরিই নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় কৌম জনগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সারণি ৭.১৪ দেখায় যে, ১৮৭২ সালে জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ ছিল কৌম। এমনকি ১৯৫১ সালেও তাদের অনুপাত ছিল ৯১ শতাংশ (সারণি ৭.৫)। বহু আগে থেকেই এসব কৌম জনগোষ্ঠী পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব আরাকান পার্বত্য এলাকা থেকে ধীরে ধীরে এই এলাকায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। ১৯৯১ সালের জরিপ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামর সকল কৌম জনগণের মধ্যে ৪৭.৯২ শতাংশ চাকমা এবং ২৮.৪৯ শতাংশ মারমা। সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হলো ত্রিপুরা কৌম জনগোষ্ঠী এবং তাদের অনুপাত ১২.২৪ শতাংশ। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল কৌম জনগণের ৮৮.৬৫ শতাংশ এই তিন কৌমের জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত। তবে সারণি ৭.৬ দেখায় যে, সংখ্যায় স্বল্প হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও বহু কৌমের জনগণের বসবাস আছে।

সারণি ৭.৫: পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক গঠনের পরিবর্তন

শুমারিকাল	১৮৭২	১৯০১	১৯৫১	১৯৮১	১৯৯১
আদিবাসী	৬১,৯৫৭	১,১৬,০০০	২.৬১,৫৩৮	৪.৪১,৭৭৬	৫,০১,১৪৪
	(৯৮%)	(৯৩%)	(৯১%)	(৫৯%)	(৫১%)
অনাদিবাসী	১,০৯৭	৮,৭৬২	২৬,১৫০	৩,০৪,৮৭৩	৪,৭৩,৩০১
	(২%)	(৯%)	(৯%)	(৮৫%)	(৪৯%)
মোট	৬৩,০৫৪	১,২৪,৭৬২	২,৮৭,৬৮৮	৭,৪৬,৬৪৯	৯,৭৪,৪৪৫
	(১০০%)	(১০০%)	(১০০%)	(১০০%)	(১০০%)

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪, পৃ. ১০)।

সারণি ৭.৬: পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস
(১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)

জাতি/কৌম	পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সংখ্যা	পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আদিবাসীর অনুপাত (%)	পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার অনুপাত (%)
বম	৬,৪৩১	১.২৮	০.৬৫
চাক	১,৬৮১	০.৩৩	০.১৭
চাকমা	২,৩৯,৪১৭	৪৭.৯২	২৪.৬০
খিয়াং	১,৯৮০	০.৩৯	০.২০
খুমি	১,২৪১	০.২৮	০.১২
লুসাই	৬৬২	০.১৩	০.১০
মারমা	১,৪২,৩৪২	২৮.৪৯	১৪.৬০
ম্রো	২২,১৬৭	৮.৮০	২.২৭
ঈপাংখুয়া	৩,২২৭	০.৬৮	০.৩৩
তঞ্চঙ্গা	১৯,২১৭	৩.৮৪	১.৯৭
ত্রিপুরা	৬১,১৭৪	১২.২৪	৬.২৭
মোট আদিবাসী	৪,৯৯,৫৩৯		৫১.৩০
বাঙালি	৪,৭৩,২৭৫		৪৮.৬০
অন্যান্য	৫৮৪		০.১০
মোট	৯,৭৪,৪৪৫		১০০.০০

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪, পৃ. ১০)।

সূচনাতে কৌম জনগণ নিজ নিজ কৌম রাজার অধীনে সংগঠিত ছিলেন। এসব রাজারা মোটামুটি স্বাধীন ছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিধির রাজাদের নজরানা (*টিবিউট*) প্রদান করে নিজেদের অভ্যন্তরীণ এখতিয়ার বজায় রাখতেন। মুঘল আমলেও এই ধারা অব্যাহত থাকে।[৫৯] তবে উপমহাদেশে বৃটিশ

[৫৯] ষোড়শ শতাব্দীতে চাকমা এবং মারমাদের অভিগমন বাংলার মুঘল শাসকদের সম্মতিক্রমেই সংঘটিত হয়।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমাবস্থায় (মুঘল শাসকদের মতো) নজরানা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও ক্রমে বৃটিশরা কৌম রাজাদের কর্তৃত্ব খর্ব করে এই এলাকাকে নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসন ও প্রশাসনের অধীনে নিয়ে আসায় সচেষ্ট হয়। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে খোদ বৃটিশ সরকার (তথা রানী ভিক্টোরিয়া) কর্তৃক অধিগ্রহণের পর এ প্রক্রিয়া বেগবান হয় এবং ১৮৬০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এই এলাকার প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণ করে এবং এই এলাকাকে নিয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম" নামক জেলা গঠন করে[৬০]। এর মাধ্যমে কৌম রাজাদের পরিবর্তে বৃটিশ নিয়োজিত জেলা-কর্মকর্তা ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তবে কৌম রাজাদের ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। সেজন্য বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে–চাকমা, মং এবং বহমোং নামে– তিনটি "সার্কেল"-এ বিভক্ত করে এবং কৌম রাজাদের মধ্য থেকে তিনজনকে এসব সার্কেলের "চীফ" (প্রধান) বলে ঘোষণা দেয়। এরমধ্যে চাকমা সার্কেলে চীফ হন চাকমা রাজা আর মং এবং বোহমং সার্কেলের রাজা হন দুজন মারমা রাজা। প্রত্যেক সার্কেলকে বিভিন্ন মৌজায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক মৌজার অধীনে একাধিক গ্রামকে ন্যস্ত করা হয়। প্রত্যেক মৌজার জন্য একজন হেডম্যান এবং প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন "কারবারী" নিয়োগ দেওয়া হয়। সাব্যস্ত হয় যে, গ্রামবাসীদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে কারবারি হেডম্যানকে দেবে, হেডম্যান দিবে সার্কেল চীফকে এবং সার্কেল চীফ দেবে জেলা কমিশনার বাহাদুরকে। এভাবে পূর্বতন রাজাকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বৃটিশের আঞ্চলিক ধারার শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার অন্তর্গত করা হয়। বলা যেতে পারে, কার্যত এক ধরনের দ্বৈত শাসনের উদ্ভব ঘটে। ১৯০০ সালে প্রণীত "পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল" (পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি) দ্বারা এই নতুন ব্যবস্থাকে আইনে পরিণত করা হয়। ভারতবর্ষের অন্যত্র বৃটিশরা যেভাবে প্রাক-পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী ধারার এলাকাভিত্তিক (*টেরিটোরিয়াল*) শাসন ও প্রশাসন প্রবর্তন করেছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গৃহীত তাদের পদক্ষেপ তারই অনুবর্তী ছিল। তবে অন্যান্য অঞ্চলে তারা উচ্ছেদ করেছিল বিকশিত সামন্ত সমাজের শাসন ব্যবস্থা যে সমাজ বহু আগেই এলাকাভিত্তিক সমাজে পরিণত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল এই যে, এখানে সমাজ তখনও বহুলাংশে কৌম চরিত্রের থেকে গিয়েছিল।

[৬০] পরবর্তীতে এই জেলাকে একটি মহকুমা পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। তবে তাতে কৌম শাসন থেকে বৃটিশ শাসনের অধীনস্থ হওয়ার মৌলিক পরিবর্তনের কোনো হেরফের হয় না।

এরূপ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ১৯৬৪ সালে স্থানীয় স্বশাসন সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে বিডি মেম্বার প্রথা চালু করা হলে এসব সার্কেলের চীফদের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা হয় এবং তাদের অধীন স্থানীয় প্রশাসনকেও কেন্দ্রীয় সরকারে অধীনে আনা হয়। এতৎসত্ত্বেও কৌমবাসীদের নিকট তাদের রাজাদের একটি বিশেষ অবস্থান অক্ষুণ্ন থাকে, যদিও এখন তাদের ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক বা পার্বনিক (*সিরিমোনিয়াল*) এবং পরামর্শমূলক। পুরাতন কৌম রাজ্যের সীমানার সাথে সার্কেলের এবং পরবর্তীকালে সৃষ্ট তিন পার্বত্য জেলার সীমানার হুবুহু মিল নেই। তবে সাধারণভাবে পূর্বতন চাকমা সার্কেল বহুলাংশে বর্তমানের রাঙ্গামাটি জেলার, মং সার্কেল বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার এবং বোহমং সার্কেল বর্তমান বান্দরবন জেলার অনুবর্তী।

৭.৫.২.২ পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ শুধু যে রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবেই পৃথক ছিল তাই নয়, তাদের অর্থনীতিও ছিল ভিন্ন। তাদের কৃষি ছিল প্রাক-লাঙ্গল পর্যায়ের এবং এটা জুম কৃষি বলে পরিচিত। জুম চাষের জন্য কৃষকেরা বড় গাছ অক্ষুণ্ন রেখে ছোট ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলে। এতে একদিকে কৃষিকাজের জন্য জমি প্রস্তুত হয় আর অন্যদিকে পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ছাই সারের কাজ করে। অতঃপর পাথরের খুন্তি বা ধারালো বাঁশের কাঠি দিয়ে ছোট ছোট গর্ত খুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির ধান, শাকসবজি ও ফলের বীজ বপন করা হয়। বৃষ্টির পানি পেয়েই এসব ফসল ফলে; আলাদা করে কোনো সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটি না কুপিয়ে এবং লাঙ্গল ব্যবহার না করে এভাবে চাষের ফলে পাহাড়ের গায়ের জমি অনাবৃত হয় না এবং ভূমি-ক্ষয়ও ঘটে না। পরের বছর অন্য পাহাড়ের গায়ে একই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়; ফলে আগের বছরে চাষকৃত পাহাড় বিশ্রাম পায় এবং পাহাড়ের গায়ে আবার ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম ইত্যাদি জন্মাতে পারে। কয়েক বছর পর সেখানে আবার জুম চাষ করা যায়। সেকারণে জুম চাষকে "স্থানান্তর চাষ" (*ট্রান্সফার কালটিভেশন*) কিংবা "পালাক্রমিক চাষ" (সংক্ষেপে "পালা চাষ") (*রোটেশনাল কালটিভেশন*) বলেও অভিহিত করা হয়। জুম কৃষির উৎপাদনশীলতা কম, কিন্তু পাহাড়ি পরিবেশ-প্রতিবেশের জন্য এই কৃষি উপযোগী।

উপরের বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, জুম চাষকে বহুলাংশে একটি যৌথ প্রয়াস হতে হয়। কোন পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ হবে তা নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রিতভাবে পাহাড়ের গায়ের

ঝোপঝাড় লতাগুল্ম পুড়িয়ে ফেলা, পরবর্তী বছরে কোন পাহাড়ে স্থানান্তর – এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কারো একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ফলে জুম চাষের সাথে সমাজের কৌম সংগঠন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। একই সাথে স্পষ্ট যে, জুম কৃষির জন্য অবাধ অথবা যৌথ মালিকানার বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকা প্রয়োজন। আরও লক্ষণীয় যে, পাহাড়ের ঢাল বেশি খাড়া হলে সেখানে জুম চাষ সম্ভব হয় না। পাহাড়ের ঢালের সাথে সম্ভাব্য কৃষির ধরনের সম্পর্কের বিষয়ে সারণি ৭.৭ কিছু তথ্য পরিবেশন করে। এই সারণি দেখায় যে, জুম চাষের জন্য পাহাড়ের ঢাল ২০ ডিগ্রীর কম হওয়া প্রয়োজন এবং সে ধরনের জমির পরিমাণ মাত্র ৫.৮ শতাংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য জমির এই সীমাবদ্ধতা সারণি ৭.৮ থেকেও স্পষ্ট।

সারণি ৭.৭: পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির শ্রেণিবিন্যাস মোট আয়তনের ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি

শ্রেণি	ঢাল (ডিগ্রী)	মোট আয়তন (হেক্টর)	মোট আয়তনের অংশ (%)	ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি	ভূমি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা
ক	< ৫	৩০,৯৬৯	৩.১	সকল ধরনের চাষাবাদ	কিছু সীমাবদ্ধতা
খ	৫-২০	২৭,৪৮৮	২.৭	সোপান কৃষিকাজ	মাঝারি সীমাবদ্ধতা
গ	২০-৪০	১,৪৮,৪৮২	১৪.৭	মূলত উদ্যান চাষ কিছু বনায়ন	প্রকট সীমাবদ্ধতা
ঘ	> ৪০	৭,৩৫,৮৮২	৭২.৯	কেবল বনায়ন	অত্যন্ত প্রকট সীমাবদ্ধতা
গ-ঘ	৪০-৫০	১২,৯৭০	১.৩	উদ্যান চাষ ও বনায়ন	গ ও ঘ-এর মিশ্রণ
		৫৩,৫৩৫	৫.৩	বসতভিটা এবং জলাশয়	
মোট		১০,০৯,৩২৬	১০০.০		

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪)।

সারণি ৭.৮: কৃষি জমির ব্যবহার–পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমগ্র বাংলাদেশ

	পার্বত্য চট্টগ্রাম		বাংলাদেশ	
	জমির পরিমাণ	মোট জমির অনুপাত (%)	জমির পরিমাণ	মোট জমির অনুপাত (%)
মোট ভূমি (বর্গ কিলোমিটার)	১৩,২৯৫	১০০.০	১,৪৭,৫৭০	১০০.০
চাষযোগ্য ভূমি এক ফসলি (হেক্টর)	৫৭,৯০০	৪.৪	৩২,৯৪,৩০০	২২.২
চাষযোগ্য ভূমি দুই ফসলি (হেক্টর)	২২,৭০০	১.৭	৩৮,৯৮,৯০০	২৬.৩
চাষযোগ্য ভূমি তিন ফসলি (হেক্টর)	৬,১০০	০.৫	৯,৮১,০০০	৬.৬

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪)।

জুম চাষের জমির এই সীমাবদ্ধ পরিসরের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম জনগণের বেশিরভাগ উপত্যকা এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়ি অধিবাসীকে দুইভাগে ভাগ করা যায় (সারণি ৭.৯)। একভাগে রয়েছে উপত্যকায় বসবাসকারী, যাদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে বড় তিন কৌম – চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা – অন্তর্ভুক্ত এবং মোট কৌম জনগোষ্ঠীতে তাদের অনুপাত ৯৩.২১ শতাংশ।

সারণি ৭.৯: বসবাসের স্থান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমূহের শ্রেণীকরণ

বসবাসের স্থান	কৌমসমূহ	মোট কৌম জনগোষ্ঠীর অনুপাত (%)
উপত্যকায় বসবাসকারী	চাক, চাকমা, খীয়াং, মারমা, তঞ্চঙ্গয়া, ত্রিপুরা	৯৩.২১
পর্বত চূড়ায় বসবাসকারী	বম, খুমি, লুসাই, ম্রো, পাংখুয়া	৬.৭২

সূত্র: রাজা দেবাশীষ রায় (২০০৪) প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

তবে তার মানে এই নয় যে, কোনো কৌমের সকল সদস্য শুধুমাত্র এক ধরনের এলাকাতেই বসবাস করেন। যেমন, চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরাদের কিছু অংশ উঁচু পার্বত্য এলাকায় বসবাস করেন; আবার যেমন পাংখুয়াদের কিছু অংশ নদী তীরবর্তী

এলাকাতে বসবাস করেন। তবে সারণি ৭.১৮ এর আলোকে স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ উপত্যকা ও নদী তীরবর্তী এলাকাতেই বসবাস করতেন। তারই প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখি যে, চাকমাদের প্রায় ৪০ শতাংশ শুধুমাত্র কর্ণফুলি নদীর তীরে কাপ্তাই উপত্যকায় বসবাস করতেন এবং চাকমা রাজার প্রাসাদ এখানেই অবস্থিত ছিল। এখান থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।

৭.৫.৩ সংঘাতের সূত্রপাত এবং ক্রমবৃদ্ধি

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সাথে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে ষাটের দশকে যখন কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হয়। এই বাঁধের ফলে চাকমা রাজার প্রাসাদসহ চাকমা অধ্যুষিত বিরাট এলাকা নিমজ্জিত হয় (যা কাপ্তাই হ্রদে পরিণত হয়)। ফলে প্রায় এক লাখ চাকমা নাগরিক স্বীয় আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদকৃত হয় এবং তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না; ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে।[৬১] এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাদের মধ্যে কিছু আন্দোলন ও সংগঠনও গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে স্নাতক পাস যুবক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষকতায় যোগদানকারী মানবেন্দ্র প্রথমে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি" গঠন করেন এবং তার মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের অভিযোগসমূহ তুলে ধরতে থাকেন। সক্রিয়তার কারণে তিনি সরকারের রোষের সম্মুখীন হন এবং ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তারকৃত হন। সরকার তাঁকে প্রায় দুই বছর কারাগারে আটক রাখে। কিন্তু তাঁর এই সাহসী এবং ত্যাগী ভূমিকার জন্য মানবেন্দ্র "পাহাড়িদের প্রতিবাদের প্রতীকে" পরিণত হন। ছোটভাই, পাহাড়ি জনগণের বর্তমান নেতা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্ত) লারমার সহযোগে মানবেন্দ্র লারমা "পাহাড়ি ছাত্র সমিতি" নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রতিবাদ ও আন্দোলন পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে মানবেন্দ্র লারমা "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদের জন্য নির্বাচন করেন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হন। মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করলেও মানবেন্দ্র লারমা এবং মং রাজা প্রু সিন ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে

[৬১] আমেনা মোহসিন (বাংলাপিডিয়া) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে কাপ্তাই হ্রদের কারণে চাকমাদের মূল ভূখণ্ডের ৪০ শতাংশ নিমজ্জিত হয় এবং এক লাখ লোক গৃহহারা হন।

পাহাড়ি তরুণেরাও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। স্বাধীনতার পর রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে চলে যান এবং মানবেন্দ্র লারমা পাহাড়িদের একজন স্বীকৃত নেতায় পরিণত হন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পাহাড়ি জনগণ স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের ন্যায্য অধিকারের সুরক্ষা আশা করেন। এই আশা পূরণের লক্ষ্যে মানবেন্দ্র লারমা ১৯৭২ সালের শুরুর দিকেই একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে চার দফা দাবি তুলে ধরেন। এগুলো ছিল: (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন, (খ) পাহাড়ের মানুষের বিশেষ অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা, (গ) পাহাড়ির রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ এবং (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে ওই অঞ্চলের মানুষের মতামত গ্রহণ। কিন্তু ১৯৭২ সালের সংবিধানে পৃথক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি এবং অন্যান্য দাবি পূরণ না হওয়ায় ১৯৭৩ সালের মার্চে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে উপর্যুক্ত দাবিসমূহ পূরণের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা হতে থাকে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার উৎখাত এবং সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পাহাড়ি জনগণের জন্য এক বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রথমত, সামরিক সরকার পাহাড়ি জনগনের অসন্তোষকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পরিবর্তে এটাকে একটি নিরাপত্তা সমস্যা হিসেবে দেখে এবং সামরিকভাবে মোকাবেলা করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধুর সরকার উৎখাতের ফলে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্বের পরিবর্তে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহের সাথে মৈত্রী এবং পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে পরিণত হয়। ফলে ভারতের সাথে এক বৈরী সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। অভিযোগ রয়েছে যে, তার ফলে বাংলাদেশ ও ভারত একে অপরের অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দেওয়া শুরু করে।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের সরকারের সংঘাত সশস্ত্র রূপ গ্রহণ করে। একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। বেসামরিক প্রশাসনের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ২৪তম ডিভিশনের জিওসির অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি "শান্তি বাহিনী" নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে

এবং এই বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকারী বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী সমূহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। এই সশস্ত্র সংঘর্ষে উভয়পক্ষেই প্রাণহানিসহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। এই পটভূমিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি স্থাপনের এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর ফলে এই এলাকায় সমতলের বাঙালিদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেখানে ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিরা ছিল মোট জনসংখ্যার ১১.৬ শতাংশ,[৬২] সেখানে ১৯৮১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪১ শতাংশে (সারণি ৭.৫) এবং এভাবে পাহাড়ি জনগণ স্বীয় অঞ্চলেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়। এই পটভূমিতে আশির দশকে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল পাহাড়ি জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে এক "জুম্ম জাতি"র পরিচয় তুলে ধরে এবং পাহাড়ি জনগণের ঐক্যকে দৃঢ় করায় প্রয়াসী হয়। অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনীর একাংশের হাতে মানবেন্দ্র লারমা আটজন সহযোদ্ধাসহ নিহত হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে জ্যোতিরিন্দ্র (ওরফে সান্টু) জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

৭.৫.৪ শান্তি চুক্তি, ১৯৯৭

সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে। তার ফলেই ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর এরশাদ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। পাহাড়ি জনগণের অসন্তোষ প্রশমনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন সংক্রান্ত একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী এসব জেলা পরিষদের সদস্য হবেন তিরিশ জন এবং তার চেয়ারম্যান হবেন পাহাড়ি জনগণের মধ্য থেকে। পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ পাহাড়ি জনগণের মধ্য থেকে এবং এক-তৃতীয়াংশ অভিবাসী বাঙালিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। পাহাড়ি জনগণের জন্য সংরক্ষিত আসন পাহাড়ি জনগণের বিভিন্ন কৌমের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে। এসব জেলা পরিষদ গঠিত হয়; কিন্তু এই জেলা পরিষদ আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি না থাকায় জনসংহতি সমিতি তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সংকট অব্যাহত থাকে। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার পর

[৬২] আমেনা মোহসিন (বাংলাপিডিয়া)।

যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমেদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়; জনসংহতি সমিতির সাথে ১৩ বার বৈঠক হয়, কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয় না।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানও বহুলাংশে ১৯৭৫-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসে এবং ভারতের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দেশের সরকার একে অপরের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অন্যান্য সশস্ত্র সংগঠনকে সমর্থন দেওয়ার কৌশল থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ি জনগণের সাথে সামরিক সংঘাত অবসানের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার জন্য সরকার ১৯৯৬ সালের ১৪ অক্টোবর তৎকালীন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির প্রারম্ভিক অংশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি কৌম-অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। প্রারম্ভিক অংশ ব্যতিরেকে এই চুক্তি মূল তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি ১৯৮৯ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা পরিষদ আইনে কী কী সংশোধনী আনা প্রয়োজন তার তালিকা প্রদান করে। এসব সংশোধনী মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম চরিত্রের যথাযথ ও পূর্ণরূপে প্রতিফলনের দিকে নিবদ্ধ। এতে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ তালিকাভুক্ত হয়।[৬৩] একইসাথে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে যেসব বিষয়ের উপর কর, মাশুল, টোল এবং ফিস আদায়ের এখতিয়ার দেওয়া হয় তাও তালিকাভুক্ত হয়।[৬৪]

[৬৩] যেসব বিষয়কে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের এখতিয়ারভুক্ত বলে গণ্য করা হয় তা নিম্নরূপ: (ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; (খ) পুলিশ (স্থানীয়); (গ) কৌম আইন ও সামাজিক বিচার; (ঘ) যুব কল্যাণ; (ঙ) পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন; (চ) স্থানীয় পর্যটন; (ছ) উন্নয়ন ট্রাস্ট এবং পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভিন্ন অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; (জ) স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান; (ঝ) কাপ্তাই হ্রদ ছাড়া নদী, ঝর্না, খাল, বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সেচ ব্যবস্থা; (ঞ) জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ; (ট) মহাজনী কারবার; এবং (ঠ) জুম চাষ।

[৬৪] পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে যেসব বিষয়ের উপর কর, মাশুল, টোল এবং ফিস আদায়ের এখতিয়ার দেওয়া হয় তা নিম্নরূপ: (ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের নিবন্ধন ফি; (খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর; (গ) ভূমি এবং দালার-কোঠার উপর হোল্ডিং কর; (ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির দ্বিতীয় মূল অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি "আঞ্চলিক পরিষদ" গঠনের উপর নিবদ্ধ। সেখানে বলা হয় যে, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে স্টেট মন্ত্রীর পদ মর্যাদাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। বাকি ২১ জনের মধ্যে (২জন মহিলা সদস্য সমেত) ১৪ জন পাহাড়ি এবং (১জন মহিলা সমেত) ৭ জন বাঙালি সদস্য থাকার বিধান হয়। পাহাড়ি ১২ পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা এবং ১ জন করে মুরং ও তঞ্চঙ্গ্যা হবেন। মহিলা ২ জন সদস্যের মধ্যে ১ জন চাকমা এবং ১ জন অন্য পাহাড়িদের (তথা লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক এবং খিয়াং কৌম) থেকে হবে। তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবে। (সেক্ষেত্রে বস্তুত ১৪ জনের পরিবর্তে ১১ জন পাহাড়ি সদস্য নির্বাচিত হবে।) পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ উভয়ের মেয়াদকাল পাঁচ বছর বলে নির্ধারিত হয়। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের জন্য নিম্নরূপ দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারিত হয় :

(ক) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও এসব পরিষদকে প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়ের তদারকি; এসব বিষয়ে জেলা পরিষদসমূহের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন;

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন ও তদারকি;

(গ) সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা এবং উন্নয়ন বিষয়ে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (*এনজিও*) সমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

(ঙ) কৌম আইন এবং সামাজিক সালিশ ও বিচারের তদারকি;

(চ) ভারী শিল্প স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান।

(ঙ) সামাজিক বিচারের জন্য ফিস; (চ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির একটি সুনির্দিষ্ট অংশ; (ছ) সিনেমা, যাত্রা এবং সার্কাসের উপর সম্পূরক কর; (জ) খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য লাইসেন্স অথবা পাট্টা প্রদান দ্বারা সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত রয়্যালটির একটি অংশ; (ঝ) ব্যবসার উপর কর; (ঞ) লটারির উপর কর; (ট) মৎস্য ধরার উপর কর।

চুক্তিতে আরও সাব্যস্ত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নবগঠিত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের তদারকির অধীনে কাজ করবে এবং এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগে পাহাড়ি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং এ সংক্রান্ত অন্য যেসব আইন ও বিধি ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে তা আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে রদ করা হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়ার আগে সরকার অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ভবিষ্যৎ কোনো আইন আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে প্রণীত হবে। পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য ক্ষতিকারক কোনো আইনের সংশোধন অথবা প্রতিকারমূলক কোনো নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক পরিষদ সে বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশ পেশ করতে পারবে। চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদের তহবিলের জন্য নিম্নরূপ উৎস সমূহ চিহ্নিত করা হয়:

(ক) জেলা পরিষদ তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের নিকট অর্পিত এবং পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় অথবা মুনাফা;

(গ) সরকার অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত ঋণ;

(ঘ) ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) পরিষদের বিনিয়োজিত তহবিল হতে প্রাপ্ত মুনাফা

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থ; এবং

(ছ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্য কোনো সূত্র হতে প্রাপ্ত অর্থ।

১৯৯৭ সালের চুক্তির তৃতীয় মূল অংশ হলো সাধারণ ক্ষমা, পুনর্বাসন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম শরণার্থীদের দেশে ফেরার বিষয়ে কয়েক মাস আগে ৯ই মার্চ ১৯৯৭ বাংলাদেশ সরকারের সাথে কৌম নেতাদের এক সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা অনুযায়ী ২৮ মার্চ ১৯৯৭ থেকে এসব শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, প্রত্যাবর্তনের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত

থাকবে এবং সে লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া যেসব কৌম সদস্য দেশের "অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত" (*ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড*) হয়েছেন তাদেরকে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে যথাযথ শনাক্ত করার পর পুনর্বাসিত করা হবে।

চুক্তিতে আরও বলা হয় যে, শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এবং অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার নবগঠিত আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি ভূমি জরিপ শুরু করবে যাতে যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করে কৌম জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ এবং রেকর্ডভুক্ত করা যায় এবং তাদের এই মালিকানা নিশ্চিত হয়। চুক্তিতে আরও বলা হয়, যে সমস্ত কৌম পরিবারের কমপক্ষে একর জমি নেই তাদেরকে সরকার, স্থানীয় জমি লভ্যতা সাপেক্ষে, দুই একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান নিশ্চিত করবে। যদি কোনো স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে জমি না থাকে তবে সরকার এই উদ্দেশ্যে বাগান-জমি (গ্রোভ-ল্যান্ড) ব্যবহার করবে। চুক্তিতে আরও বলা হয় যে, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠিত হবে। এই কমিশন প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করার প্রতি অগ্রাধিকার দিবে। যেসব পাহাড় ও জমি অবৈধভাবে বেদখল হয়েছে এবং তার ফলে অবৈধ উচ্ছেদ সংঘটিত হয়েছে, সেসব পাহাড় ও জমির মালিকানা স্বত্ব বাতিল করার পূর্ণ এখতিয়ার এই কমিশনের থাকবে। এ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে এবং তার রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিলের সুযোগ থাকবে না। এই বিধান ফ্রিঞ্জ-ল্যান্ড (প্রান্তস্থ জমি)-র জন্যও প্রযোজ্য হবে।

ভূমি কমিশনের গঠন সম্পর্কে চুক্তিতে বলা হয় যে, নেতৃত্বদানকারী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ছাড়া আর যারা এই কমিশনের সদস্য হবেন তাঁরা হলেন সার্কেল চীফ, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা তার প্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার কিংবা অতিরিক্ত কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। কমিশনের মেয়াদ হবে তিন বছর, তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে এই মেয়াদ বাড়ানো যাবে। জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান আইন, রীতি, প্রথা ও পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি বজায় রাখবে। কৌম শরণার্থীরা সরকারি সংস্থা থেকে যেসব ঋণ নিয়েছিল কিন্তু তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেনি, তা

সুদ সহকারে মওকুফ করা হবে। রাবার চাষের ও জমি বরাদ্দ সম্পর্কে চুক্তিতে বলা হয় যে, কৌম-বহির্ভূত এবং অস্থানীয় যেসব ব্যক্তির রাবার বা অন্যান্য বাগান চাষের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু গত দশ বছরের মধ্যে কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়ন অথবা জমির সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি, তাদের সেসব জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

এই চুক্তি অনুযায়ী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ধিত সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্ধিত অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে। সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। এই অঞ্চলের পরিবেশের প্রতি নজর রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন ব্যবস্থার সুযোগ- সুবিধা উন্নয়নে সরকার উৎসাহিত করবে। চাকুরি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সমতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি চাকুরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার কৌম প্রার্থীদের জন্য কোটা ব্যবস্থা বজায় রাখবে। এই লক্ষ্যে সরকার কৌম শিক্ষার্থীদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করবে। সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কৌম রীতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হবেন। কৌম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যাতে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত হতে পারে সেজন্য সরকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে।

আরও বিধান থাকে যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতি তার সশস্ত্র সদস্যসমেত সকল সদস্যের তালিকা সরকারের নিকট প্রদান করবে এবং যেসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমিতির নিয়ন্ত্রণে আছে তার বিবরণ প্রদান করবে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে অস্ত্র জমাদানের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবে। অস্ত্র জমাদানের পর সরকার জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবার বর্গের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান করবে। নির্ধারিত তারিখে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণকারীদের প্রতি সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে রুজু করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। যারা নির্ধারিত সময়ে অস্ত্র জমাদানে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চুক্তিতে বলা হয় যে, স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের প্রতি সরকার সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করবে এবং পার্বত্য এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যারা জনসংহতি সমিতির তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের প্রতিও এই সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া আরও সাব্যস্ত হয় যে, (ক) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের জন্য পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হবে। (খ) অস্ত্র জমা দেওয়া ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর জনসংহতি সমিতির যেসব সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা, হুলিয়া জারি, অনুপস্থিতিতে সাজা প্রদান ইত্যাদি করা হয়েছিল সেগুলি প্রত্যাহার করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোনো সদস্য জেলে থাকলে তাকেও মুক্তি দেওয়া হবে। (গ) অস্ত্র জমা দেওয়া ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর শুধুমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, গ্রেফতার ও সাজা প্রদান করা হবে না। (ঘ) জনসংহতি সমিতির যেসব সদস্য সরকারি ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি, তাদের এসব ঋণ সুদসমেত মওকুফ করা হবে। (ঙ) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্যদের মধ্যে যারা আগে সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে পূর্বতন পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে চাকুরির বয়সসীমা শিথিল করা হবে। (চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে যাতে তারা কুটির শিল্প, ফলের বাগান ইত্যাদি ধরনের স্বনিয়োজনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হতে পারে। (ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হবে এবং বিদেশী শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত সনদসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আরও সাব্যস্ত হয় যে, চুক্তি স্বাক্ষর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পরপরই সেনাবাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প, আনসার ও গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনী (সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, তিন পার্বত্য জেলা সদর এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালায় অবস্থিত স্থায়ী সেনানিবাস ব্যতিরেকে) পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এ সংক্রান্ত নির্ধারিতব্য তারিখের মধ্যে স্থায়ী ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এরূপ অন্যান্য কারণে

প্রয়োজনবোধে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য স্থানে যেসব আইন ও বিধি অনুসৃত হয় তা মেনে চলা হবে। এ প্রসঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদ প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী তথ্য পাওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাতে পারবে। সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট এবং সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর ক্যাম্প অপসারণের পর পরিত্যক্ত জমি তার আদি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত সরকারি, আধাসরকারি, স্থানীয় সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ এবং সেক্ষেত্রে কৌম সদস্যদের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যেসব ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাবে না সেসব ক্ষেত্রে সরকার অন্য কাউকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করতে পারবে।

চুক্তিতে বলা হয় যে, একজন কৌম মন্ত্রীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে: (১) মন্ত্রী; (২) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; (৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; (৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; (৫) বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; (৬) সংসদ সদস্য, রাঙ্গামাটি; (৭) সংসদ সদস্য, খাগড়াছড়ি; (৮) সংসদ সদস্য, বান্দরবন; (৯) চাকমা রাজা; (১০) বোমাং রাজা; (১১) মং রাজা; (১২) তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

উপরের বিবরণ দেখায় যে, ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি একটি সামগ্রিক চুক্তি। এতে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের সমস্যাবলি সমাধানের সূত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আশু মেয়াদে বাস্তুচ্যুত (অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ) পরিবারদের পুনর্বাসনের বিধান ছিল এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের বেসামরিক জীবনে প্রত্যাবর্তন সুগম করার পন্থা নির্দেশিত ছিল। দীর্ঘমেয়াদে সকল পাহাড়ি পরিবারকে ন্যূনতম ২.৫ একর জমি নিশ্চিত করার কথা ছিল; পার্বত্য এলাকার পরিচালনায় যাতে পাহাড়ি জনগণের নেতৃত্ব বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

৭.৫.৫ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ১৯৯৭ সালের চুক্তি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনসংহতির অভিযোগ অনুযায়ী, সরকার শান্তি চুক্তির সকল বিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করেনি। এই অভিযোগ বিশেষভাবে প্রযোজ্য ভূমির প্রশ্ন নিয়ে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ১৯৯৯ সালে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করে। ২০০১ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু দুই যুগ পরও এ কমিশনের বিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। সান্টু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এই বিধিমালার একটি খসড়া তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পার্বত্য অঞ্চলে "এরিয়া সার্ভে" করার কথা বলা হচ্ছে। এই সার্ভের জন্য স্যাটেলাইট ও ড্রোন ব্যবহারের কথাও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি নিষ্পত্তি কমিশনে ২২ হাজারের বেশি বিরোধ আবেদন জমা পড়েছে। এসব আবেদনের নিষ্পত্তি না করে যদি দেশের সমতল এলাকায় প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনার নিয়ম পার্বত্য এলাকায় প্রয়োগ করতে চাওয়া হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধের মাত্রা আরও বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে একাধিক ধরনের ভূমি মালিকানা বিরাজ করে। তার মধ্যে রয়েছে: (ক) খাস/সরকারি মালিকানা,; (খ) বন বিভাগের মালিকানা; (গ) অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা; (ঘ) বাগান চাষির মালিকানা, যেটা আবার লিজকৃত হতে পারে; (ঙ) সাধারণ/যৌথ মালিকানা; (চ) কৌম মালিকানা; (ছ) ব্যক্তি মালিকানা। এর সাথে সম্পর্কিত হলো আরও কয়েকটি

সমস্যা। প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত বিভিন্ন মালিকানার সীমারেখা স্পষ্ট নয়; ফলে একই জমির উপর একাধিক মালিকানার দাবি থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌম মালিকানা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট রূপ কি হবে তা পরিষ্কার নয়। সময়ে কৌম জনগণের অর্থনীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের অর্থনীতিতেও জুম চাষের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। ফলে জুম চাষের জন্য যে ধরনের কৌম মালিকানা প্রয়োজন ছিল এখন তা আর সেভাবে প্রয়োজন আছে কিনা তা পরিষ্কার নয়। এসব জটিলতার কারনে ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত কোনো একক ধারণার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সেজন্য ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত প্রতিটি বিরোধের চরিত্র হবে সুনির্দিষ্ট এবং তা নিরসনের জন্য ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। সেজন্যই কোনো সাধারণীকৃত জরিপ দিয়ে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কৃত্রিম উপগ্রহ (*স্যাটেলাইট*) আর ড্রোন মালিকানার ধারণার সংঘাতের সমাধান দিতে পারে না। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে, কারণ এই কমিশনের সদস্যরা জানে (অন্তত জানা উচিত) কোন জমির জন্য কোন ধরনের ভূমি মালিকানা প্রযোজ্য। সেজন্য ভূমি নিষ্পত্তি কমিশনকে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা প্রয়োজন। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে এই কমিশনের নিষ্ক্রিয় থাকা বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। সরকার কর্তৃক এই কমিশনের কাজের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ যে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করেছে তা গ্রহণ করা প্রয়োজন, কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদেরই স্বীয় অঞ্চলের এবং কৌম জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মালিকানার জটিলতা বেশি বোঝার কথা। যদি এই বিধিমালা বিষয়ে সরকারের কোনো আপত্তি থাকে তবে তা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা প্রয়োজন। ভূমি কমিশনের কাজের মধ্য দিয়ে ২২ হাজার বিরোধের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ধরনের মালিকানা-ধারণার কতটুকু প্রযোজ্যতা তা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এভাবে জরিপের কাজটিও বহুলাংশে সমাধা হবে। ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি একটি প্রশংসনীয় সাফল্য। ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ জিইয়ে রেখে এই সাফল্যকে বিনষ্ট করা মোটেও কাম্য নয়।

৭.৫.৬ অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি ও সমস্যা

বাংলাদেশের অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাথেও সরকার এবং বাঙালিদের বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘাতের উদাহরণ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব সমস্যা ভূমি

এবং ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত। যেমন হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের সীমান্ত-নিকটবর্তী পাহাড়ে বসবাসকারী খাসি জনগোষ্ঠীর অন্যতম অভিযোগ হলো যে, স্থানীয় বন অথবা চা-বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের এলাকার বড় গাছগুলো কেটে ফেলছে এবং তার ফলে তাদের পান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মতো হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের পাহাড়ের অধিবাসীরাও বনাঞ্চলের উপর অবাধ কিংবা যৌথ মালিকানায় অভ্যস্ত এবং তাদের অর্থনীতি ও জীবনধারা এ ধরনের মালিকানার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। জমির উপর ব্যক্তি মালিকানার সাথে তাঁরা অভ্যস্ত নন। সে কারণে ব্যক্তি মালিকানার প্রয়োগ এবং অন্যান্য অনৈতিক ও অবৈধ পন্থায় যখন তাদের জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ (মূলত ভূমি, বৃক্ষ ও জল সম্পদ) অধিগ্রহণ করার প্রচেষ্টা হয় তখন তাঁরা একদিকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন অন্যদিকে তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েন কারণ এসব সম্পদের উপর তাদের প্রথাগত মালিকানা ও অধিকার প্রমাণের জন্য কোনো দলিলপত্র নেই। বলাবাহুল্য, স্বার্থান্বেষীরা প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজের মানুষদের এই দুর্বলতারই সুযোগ গ্রহণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে সূচিত "এনক্লোজার মুভমেন্ট" দ্বারা বিশ্বব্যাপী এই প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে। বিভিন্নরূপে আজও তা বহমান। সেজন্য ভূমি এবং জলসম্পদের উপর বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর যে প্রথাগত অধিকার তার যথাযথ আইনি রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আইনি অধিকার থাকলেও তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। গোবিন্দগঞ্জের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি তারই একটি উদাহরণ। কাজেই এইসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নিতে হবে।

৭.৬ উপসংহার

উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি সংহত সমাজের সম্ভাবনা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সময়ে বাংলাদেশের সমাজ আরও সংহত হওয়ার পরিবর্তে বিভক্ত হয়েছে। অনুভূমিক বিভক্তিসমূহ বহুলাংশে প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধিরই প্রতিফল। সুতরাং অর্থনৈতিক বৈষম্যের হ্রাস এসব বিভক্তি প্রশমনে সহায়ক হবে। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসই এজন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের যে খণ্ডিকরণ ঘটেছে তা দূর করে একীভূত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হলে আরও প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক পরিধির প্রয়াস প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে ধর্মের এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের যে উল্লম্বিক বিভক্তি, তা সরাসরি অর্থনীতিভিত্তিক না হলেও এসব বিভক্তিরও অর্থনৈতিক উৎস, পরিণতি, এবং অনুষঙ্গ রয়েছে। এসব বিভক্তি প্রশমনের জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপেরও প্রয়োজন হবে। আশা করা যায়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আগামী দিনের বাংলাদেশ এসব প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবে না।

৮। নারী, শিশু এবং যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে নারী, শিশু এবং যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। নারীরা সমাজের অর্ধেক। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, "এই পৃথিবীতে যাহা কিছু মহীয়ান, চির সুন্দর; অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান এবং ভূমিকাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের প্রথম পর্বে নারী প্রগতিতে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে কিছু বিপরীত মুখী প্রবণতাও পরিদৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং আগামীর বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে উপর্যুক্ত নেতিবাচক প্রবণতাসমূহ রোধ করে নারী প্রগতির ধারাকে আরও অগ্রসর করা। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। বিগত সময়কালে বাংলাদেশ শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে সকল শিশু সমান সুযোগ পাচ্ছে না। আগামী বাংলাদেশকে সকল শিশুর পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও তাদের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। জাতির সবচেয়ে উদ্যমী অংশ হলো তরুণ ও যুব সমাজ। কবি বলেছেন, "এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার সময় তার!" অর্থাৎ, তরুণ ও যুবসমাজের সদস্যরা এমন সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে যা সমাজের অন্যান্য অংশের জন্য নেয়া কঠিন। অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বহুখণ্ডিত ও অনুপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা যুবসমাজের প্রাণশক্তি ও প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যুবসমাজের সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার আগামীর বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

৮.১ নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

৮.১.১ নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়নের প্রথম পর্বে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে; তাদের স্বাস্থ্যসেবার মানের উন্নতি হয়েছে; প্রায় ৩০ লাখ নারী এখন দেশের পোশাকশিল্পে কাজ করছে; ফলে দেশের শিল্প-শ্রমিকদের বড় অংশ এখন তাদের দ্বারাই গঠিত। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে এখন তারা বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, ক্রীড়াসহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৯ সালে গৃহীত এবং ১৯৮১ সালে কার্যকর "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ" (*কনভেনশন অন দি এলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিস্ক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন*, সংক্ষেপে, *সিডো*) অনুস্বাক্ষর করেছে।[৬৫] দেশে "মহিলা ও শিশু বিষয়ক" পৃথক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (*ন্যাশনাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি*) গৃহীত হয়েছে। নারী কল্যাণ অভিমুখী অনেক আইন গৃহীত হয়েছে। বিধবা ভাতা চালু হয়েছে। তবে পাশাপাশি নারীরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁদের উপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপিত করার প্রয়াস চলছে। বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন অব্যাহত থাকছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে বহু মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। উচ্চ শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সীমিত থেকে যাচ্ছে এবং সে কারণে উচ্চ আয়ের শ্রম বাজারেও তাদের উপস্থিতি কম রয়ে যাচ্ছে। বহুক্ষেত্রে নারীরা এখনও বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বলা বাহুল্য, এসব প্রবণতা বজায় থাকলে নারীদের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে না। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলা, ঘরের এবং আশপাশের পরিবেশ রক্ষা, গৃহস্থালি এবং গৃহস্থ-অর্থনীতি পরিচালনা, জনসংখ্যা উত্তরণ ঘটানো, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারীদের সকল সম্ভাবনার বাস্তবায়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস প্রয়োজন। তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির দিকে নিচে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

[৬৫] বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এই সনদ কয়েকটি ধারা (২, ১৩ক, ১৬ক, এফ সংরক্ষিত) সংরক্ষিত করে সাক্ষর করে। পরে ১৯৯৬ সালে১৩ক এবং ১৬ক ধারার প্রতি সংরক্ষণ প্রত্যাহৃত হয়।

৮.১.২ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারীদের সাম্প্রতিক উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

উপরে আমরা লক্ষ করেছি, বিগত সময়ে নারীদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর একটি সূচক হলো (প্রসবকালীন) মাতৃমৃত্যু হারের হ্রাস। ২০০০-২০১৬ সময়কালে এই হার (প্রতি এক লাখ জীবিত শিশু প্রসবের ক্ষেত্রে) ৪৬০ থেকে প্রায় ১৭০-তে হ্রাস পেয়েছে। তবে এই অগ্রগতি সত্ত্বেও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও প্রায় দশগুণ বেশি। কাজেই স্পষ্ট যে, নারীদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আগামীতে বাংলাদেশের বহু করণীয় রয়েছে।

লক্ষণীয়, নারীদের স্বাস্থোন্নয়নে শিশু এবং কিশোরী অবস্থাতেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে এখনও স্বল্প আয়ের পরিবারদের মধ্যে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। চীনের মতো "এক সন্তান নীতি" না থাকার কারণে বাংলাদেশে কখনো "হারিয়ে যাওয়া কন্যা" কিংবা "লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা"র মতো প্রকট সমস্যার উদ্ভব হয়নি। তবে পুত্রের তুলনায় কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলার বিষয়টি বাংলাদেশে আগেও ছিল এবং এখনও ক্ষেত্রবিশেষে পরিদৃষ্ট হয়। সে কারণে শিশু এবং কিশোরী থাকা অবস্থাতেই নারীদের অপুষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জাতিসংঘের শিশু কল্যাণ বিষয়ক সংস্থা, ইউনিসেফ-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন (UNICEF, 2023) অনুযায়ী, গর্ভধারণে সক্ষম (অর্থাৎ, ১৫-৪৯ বছর বয়সের) নারীদের মধ্যে ১২ শতাংশ "ওজন স্বল্পতা"য় (*আন্ডার-ওয়েট*) ভুগছে। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, এই বয়সী নারীদের মধ্যে যারা গর্ভবতী নন তাদের মধ্যে উঁচু মাত্রায় মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বল্প আয়ের নারীদের মধ্যেই এসব সমস্যা বেশি প্রকট। সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, চিকিৎসা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণের ফলে সমাজের বিত্তশালীদের জন্য এক পৃথক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে; পক্ষান্তরে দরিদ্র শ্রমজীবীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। ঐ অনুচ্ছেদে আলোচিত একীভূত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহের বাস্তবায়ন নারীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক হবে। বিশেষত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর পরিস্থিতি আরও উন্নত করা গেলে এবং তার অধীনে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের মান আরও বৃদ্ধি করা গেলে গ্রামাঞ্চলে নারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সুগম হবে। দেশের জনসংখ্যা উত্তরণ প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য সমাজের ধনী-দরিদ্র সকল বর্গের নারীদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অপরিহার্য।

৮.১.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সাম্প্রতিক উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা আরও লক্ষ করেছি, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী, আশির দশকের পর থেকে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ১৯৯৮ সালের ৩৯ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৬৭ শতাংশে পৌঁছায়।[৬৬] তবে বিশ্বব্যাংকের এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, এই অগ্রগতি সত্ত্বেও কিশোরীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা বিরাজ করছে। ২০১৭ সালের এক জরিপ দেখায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষারতা কিশোরীদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার ৪২ শতাংশ এবং তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যাপ্ত হারে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায় সম্পন্ন করতে না পারার ফলে উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম থেকে যাচ্ছে। বিবিএসের পরিসংখ্যান বলছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাত প্রায় অর্ধেক হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তা প্রায় এক-তৃতীয়াংশে হ্রাস পায়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের এই পশ্চাদপদতা শ্রমবাজারেও প্রতিফলিত হয়। শ্রম বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বিগত বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেলেও তা এখনও সন্তোষজনক নয়। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে উচ্চ আয় সম্পন্ন নিয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। চিত্র ৮.১-এ এই কার্যকারণ সম্পর্ক একটি রেখাচিত্র আকারে দেখানো হলো।[৬৭] বস্তুত বাংলাদেশে শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ ৩৬ শতাংশে পৌঁছে প্রায় স্থির হয়ে আছে। অথচ দক্ষিণ কোরিয়াতে এই অনুপাত ৬৪ শতাংশ (অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ. ৬১২)।

[৬৬] দ্রষ্টব্য: Sosale, Asaduzzaman, and Ramachandran (2019).

[৬৭] তার ফলে উচ্চ আয়ের শ্রম বাজারেও তাদের অভিগম্যতা সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা এসব নেতিবাচক ফলাফলের কারণ হিসেবে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো বাল্য বিবাহ, গৃহকার্য, গর্ভধারণ, যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা, এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক সহিংসতা।

চিত্র ৮.১: নারী শিক্ষা ও শ্রমবাজারে সাফল্যের কার্যকারণ সম্পর্ক

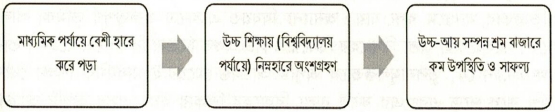

সূত্র: লেখক।

নারী শিক্ষার্থীরা যাতে মাধ্যমিক স্কুল সম্পন্ন করে সে উদ্দেশ্যে সম্প্রতিকালে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো ২০১৮-২০২২ মেয়াদের "মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"। এই কর্মসূচির একটি অংশ হলো "অপরিণত বালিকা কর্মসূচি"। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত স্কুলভিত্তিক এই কর্মসূচির মধ্যে মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাব ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশনের পৃথক ব্যবস্থা, স্কুলে আসার জন্য নগদ প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া যৌন স্বাস্থ্য, সন্তানধারণ এবং লিঙ্গ-সমতাসম্পন্ন আচরণ বিষয়ক জ্ঞান প্রদানও এই কর্মসূচিতে সংযোজিত হয়েছে। ভবিষ্যতে মেয়েদের জন্য বৃত্তির এই কর্মসূচিকে জাতীয় ভিত্তিক একটি সমধর্মী টার্গেটিং কর্মসূচির সাথে সমন্বিত করার চিন্তাও রয়েছে। তবে নারী শিক্ষা এবং শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তা কেবল এরূপ টেকনিক্যাল ধরনের প্রকল্প দ্বারা অতিক্রম করা যাবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়। কেননা এক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাও কাজ করছে এবং তা অতিক্রম করার জন্য অন্যান্য ধরনের প্রয়াস প্রয়োজন (নিচে তার কিছু উদাহরণ আলোচিত হবে)। আগামীতে এসব প্রয়াসের দিকে মনোযোগ দেওয়া একটি অন্যতম করণীয় হবে।

৮.১.৪ বাল্য বিবাহের অবসান

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার পেছনে একটি বড় কারণ হলো বাল্য বিবাহ। ইউনিসেফের পূর্বোক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী, বাল্য বিবাহের হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম। বিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে জরিপে দেখা যায় যে, ৫১ শতাংশেরই ১৮ বছর বয়স (তথা প্রাপ্তবয়স্কা) হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। আগে ধারণা করা হতো

যে, অভাবের তাড়না বাল্য বিবাহের মূল কারণ। কিন্তু বিগত সময়কালে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ বাল্য বিবাহের হার ততটা কমেনি।[৬৮] এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলা যায়, অন্যান্য বিষয়ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষকেরা বাল্য বিবাহের বিষয়ে একটি অশুভ চক্রের বিপদ দেখেছেন। তারা লক্ষ করেন যে, তুলনামূলকভাবে অপুষ্টি আক্রান্ত মেয়েরাই মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বেশি ঝরে পড়ে এবং এর ফলে বাল্য বিবাহের শিকার হয়। এসব অপুষ্টি আক্রান্ত মেয়েরা যখন অল্প বয়সে মা হয় তখন তাদের সন্তানেরাও অধিক হারে অপুষ্টি আক্রান্ত হয়। এভাবে অপুষ্টি একটি বংশানুক্রমিক চক্রে পরিণত হয়।[৬৯]

সুতরাং আগামীতে বাল্য বিবাহের অবসানের লক্ষ্যে এক ব্যাপকধর্মী প্রয়াসে অবতীর্ণ হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে যাতে জনগণ বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং নিজেদের মেয়েদের এই কুফলের দিকে ঠেলে দেওয়া থেকে নিজেরাই নিবৃত্ত হয়। এজন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। পরিবারের অভ্যন্তরে যাতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হয় সে বিষয়েও প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

৮.১.৫ সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার

পিতা-মাতা এবং স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের ন্যায্য অধিকারের প্রতিষ্ঠাও আরেকটি বড় করণীয়। এক্ষেত্রে, প্রথমত, ধর্মীয় বিধিমালা অনুযায়ী নারীর যেটুকু অধিকার তা যেন আইনগতভাবে এবং বাস্তবিক রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য নারীদেরকে শৈশব থেকেই এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ধর্মীয় বিধান অনুসারে নারীদের যে অধিকার তার সময়োপযোগী সম্প্রসারণের সম্ভাবনার বিষয়টি নজরে নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বীদেরকে আত্ম-অনুসন্ধানে নিয়োজিত হতে হবে।

৮.১.৬ মজুরির ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান

মজুরির ক্ষেত্রে নারীরা যে বৈষম্যের সম্মুখীন তার অবসান হওয়া দরকার। এটা দুঃখজনক যে, বিবিএস-এর সাম্প্রতিক (২০২২ সালের) পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থে মজুরি সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, ২০০৭ সালে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত

[৬৮] এমনও হতে পারে যে, আয়ের বৃদ্ধি বাল্য বিবাহের জন্য অনুকূল হচ্ছে কারণ অধিক আয়ের কারণে পুরুষেরাও কম বয়সে বিয়ে করতে সক্ষম হচ্ছে। এই অনুমানের সত্যটা যাচাইয়ের জন্য মেয়েদের বিয়ের বয়সের পাশাপাশি ছেলেদের বিয়ের বয়স নিয়েও গবেষণা করা প্রয়োজন।

[৬৯] দ্রষ্টব্য" Sheldon Yett, UNICEF Representative to Bangladesh।

মজুরি জরিপের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা থেকে বাংলাদেশে মজুরির ক্ষেত্রে বড় ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য বেরিয়ে এসেছিল। প্রায় ৪০ হাজার ব্যক্তির নিকট থেকে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, গড়ে শ্রম ঘণ্টাপ্রতি পুরুষদের মজুরি নারীদের চেয়ে ২১ শতাংশ বেশি। তদুপরি পুরুষেরা গড়ে সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা কাজ করে, যেখানে নারীরা কাজ করে ৪৭.৫ ঘণ্টা। ফলে পুরুষদের সাপ্তাহিক আয় (৩,৯১৩ টাকা) নারীদের (২,৭৮০ টাকা) চেয়ে ৪০.৮ শতাংশ বেশি (সারণি ৮.১)।

সারণি ৮.১: বিবিএস (২০০৭) জরিপে অন্তর্ভুক্তদের সম্পর্কে তথ্যের সারাংশ

বিষয়	পুরুষ (মোট সংখ্যা ৩৫,৭৮৯)		নারী (মোট সংখ্যা ৫,১৩৪)	
	গড়	বিচ্ছুরণ (Std. Dev.)	গড়	বিচ্ছুরণ (Std. Dev.)
ঘণ্টাপ্রতি মজুরি	১৭.২	১১.৫৮	১৪.২	১০.৯১
বয়স	৩৩.৩	১০.৩৪	৩০.৬	৮.২০
সাপ্তাহিক কর্ম ঘণ্টা	৫৬.০	১৪.৩৩	৪৭.৫	১৩.৯৬

সূত্র: BBS Occupational Wage Survey (2007)।

শ্রমজীবীদের বয়স, শিক্ষার মান, পেশা, নিয়োজনের খাত এবং এলাকার ভিন্নতা আমলে নেওয়ার পরও এই ব্যবধান ১৫.৯ শতাংশ থেকে যায়। বলা বাহুল্য, নারী এবং পুরুষ শ্রমিকেরা অর্থনীতির সকল খাতে সমভাবে বিতরিত নয়। এই অসম বিতরণকে যদি আমলে নেওয়া হয়, তাহলে ঘণ্টাপ্রতি মজুরির ব্যবধান ২৩.১ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।[৭০] এ সমীক্ষা থেকে মজুরি এবং মজুরি বিষয়ক লিঙ্গ বৈষম্যের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বেরিয়ে আসে। দেখা যায় যে, সাক্ষরতা থাকলে মজুরি গড়ে ৬ শতাংশ বেশি হয়; প্রাথমিক শিক্ষার কারণে মজুরি আরও ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, মাধ্যমিক শিক্ষা বাড়ায় আরও ২৬ শতাংশ এবং উচ্চ শিক্ষা বাড়ায় আরও ৪৩ শতাংশ। আরও দেখা যায় যে, প্রাথমিকের স্তরের চেয়ে নিচের স্তরে শিক্ষাসম্পন্ন

[৭০] সকল খাত, প্রতিষ্ঠানের আকৃতি এবং শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্যই এই লিঙ্গ বৈষম্য ধরা পড়ে। তবে সবচেয়ে বেশি বৈষম্য লক্ষ করা যায় নির্মাণ ও হোটেল- রেস্টুরেন্ট খাতে, প্রাথমিক কিংবা তার চেয়ে কম শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিকদের জন্য এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। সারণি ৮.৩ দেখায় যে, নির্মাণ শিল্পে নারীদের মজুরি পুরুষদের মজুরির মাত্র ৫৯.৬ শতাংশ এবং হোটেল-রেস্টুরেন্টে ৬৯.১ শতাংশ। পক্ষান্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেবা খাতে নারীদের মজুরি পুরুষদের মজুরির অন্তত ৮০ শতাংশ।

নারীরা পুরুষদের চেয়ে ২০ শতাংশ মজুরি কম পায়; পক্ষান্তরে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসম্পন্ন নারী শ্রমিকদের জন্য এই ব্যবধান মাত্র ৪ শতাংশ যা উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন নারীদের জন্য তা ৮ শতাংশ। সুতরাং দেখা যায় যে, শিক্ষা নারীদের শুধু যে উচ্চ আয়ের শ্রমে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় তাই নয়, তাদেরকে মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য থেকেও অনেকটা রেহাই দিতে পারে। বিবিএসের এই সমীক্ষায় কৃষি শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ সপ্তাহে ঠিক কয় ঘণ্টা কাজ করে তার সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, এটা একটা বড় অপূর্ণতা, কারণ প্রথমত কৃষিতে এখনও দেশের বড় অংশ কাজ করে; দ্বিতীয়ত, কৃষিতে নারী শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণও আছে। যাহোক, মজুরির বিষয়ে লিঙ্গ বৈষম্য সংক্রান্ত একটি চিত্র আমরা এখান থেকে পাই। আরও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া গেলে বর্তমানের চিত্র আরও ভালোভাবে পাওয়া যেত। তবে এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজ করে, কারণ শ্রমিকদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দিয়ে মজুরির ব্যবধান ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট। মজুরির ক্ষেত্রে শিক্ষা (উপরিল্লিখিত) দুইভাবে নারীদের সহায়তা করতে পারে। সুতরাং আগামীতে একদিকে মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে যেসব আইন আছে সেগুলোর প্রয়োগ জোরদার করতে হবে, অন্যদিকে সপ্তম পরিচ্ছেদে শিক্ষা বিষয়ক যেসব করণীয় আলোচিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

৮.১.৭ ক্রীড়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যের অবসান

নারীদের প্রতি বৈষম্য শুধু মজুরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এর একটি বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে। দেশের নারী ফুটবল দল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও দেশের বাফুফে তাদের প্রতি বহুলাংশে বিমাতাসুলভ আচরণ করছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।[৯১] কর্তৃপক্ষের এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের পাশাপাশি নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রক্ষণশীল আচরণেরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য সামাজিক পর্যায়েও উদ্যোগ নিতে হবে।

[৯১] এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত দেখায় যায় যখন বাফুফে এই দলকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার বিমান ভাড়া দিতে না পারায় এই দলটি এশিয়া কাপে প্রতিযোগিতা করা থেকে বঞ্চিত হয়। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যথেষ্ট বিস্তৃত।

৮.১.৮ কর্মজীবী মায়েদের জন্য সহজলভ্য শিশু-পরিচর্যা সেবা নিশ্চিতকরণ

সময়ে বাংলাদেশে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। আগের মতো সম্প্রসারিত পরিবারের পরিবর্তে নিউক্লিয়ার পরিবার এখন প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্মসংস্থানের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে কিংবা অন্যত্র অভিগমনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক কারণেই সম্প্রসারিত পরিবার বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে নারীরা কর্মজীবী হলে কর্মদিবসে তাদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে কাউকে পাওয়া কঠিন। সে কারণেই বহু নারী "নিয়োজন-শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-বহির্ভূত (নিশিপ্রব)" হয়ে যান। এটা নারী শক্তি ও প্রতিভার একটি অপচয়। কর্মজীবী মায়েদের জন্য সহজলভ্য শিশু-পরিচর্যা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। তদুপরি শিশু বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক এবং যৌথ কাঠামোতে বড় হয়ে ওঠাটা শিশুদের বিকাশের জন্যও অনুকূল এবং তাদেরকে পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে।

৮.১.৯ নারী নির্যাতন রোধ

নারী নির্যাতন রোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ একাধিক আইন প্রণয়ন করেছে। তার মধ্যে ২০০০ সালে প্রণীত "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন" এবং ২০১০ সালে প্রণীত "পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং প্রতিরক্ষা)" উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে প্রণীত "এসিড অপরাধ প্রতিরোধ আইন" এবং "এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন"। এসব আইন কিছু সুফল দিলেও তা পরিস্থিতির বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। বিশেষত যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতন এখনও বাংলাদেশে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মানবাধিকার সংক্রান্ত আরেকটি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যৌতুকের কারণে ৩,৩০০ নারী নিহত হয়েছে (HRW, 2020)।[৯২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (*বিবিএস*) এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (*ইউএফপিএ*) কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, বিবাহিত নারী ও মেয়েদের ৭০ শতাংশের বেশি তাদের স্বামী অথবা নিকটাত্মীয়দের

[৯২] HRW (2020) https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/Bangladesh1020_web.pdf

দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে এবং অর্ধেকের বেশি শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। "আইন ও সালিশ কেন্দ্রে"র তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের প্রথম ৯ মাসে কমপক্ষে ২৩৫ জন স্বামী কিংবা নিকটাত্মীয় দ্বারা হত্যার শিকার হয়েছে।

নারী নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন আইন থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন অব্যাহত থাকার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করে। প্রথমত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসহায়ত্ব এবং অন্যান্য কারণে অনেক নারী নির্যাতনের শিকার হলেও উপর্যুক্ত বিভিন্ন আইনের অধীনে প্রতিকার লাভে প্রয়াসী হন না। অনেক নারীর নিজস্ব কোনো আয় নেই। অথচ একবার অভিযোগ দায়ের করার পর স্ত্রীর পক্ষে আর স্বামীর সাথে থাকা সম্ভব হয় না অথবা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে তার পিতামাতার কাছে ফিরে যাওয়ার মতো অবস্থা থাকে না। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র অপ্রতুল। সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের আট কোটির বেশি নারী এবং সাড়ে ছয় কোটি শিশুর জন্য সরকার পরিচালিত মাত্র ২১টি এবং এনজিও পরিচালিত ১৫টি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে (পূর্বোক্ত)। তদুপরি এসব আশ্রয় কেন্দ্রে বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, এসব কেন্দ্র আশ্রয় প্রার্থীদের জীবন ও জীবিকার কোনো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, নির্যাতিত নারীরা আইনের আশ্রয় নিলেও বহুক্ষেত্রে সুবিচার পাচ্ছে না। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সরকার প্রতিষ্ঠিত নারী ও শিশুদের জন্য "একস্থানে সংকট নিরসন কেন্দ্র" (*ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার*)-এর মাধ্যমে যে ১১,০০০ নারী অভিযোগ দায়ের করেছিল তাদের মধ্যে মাত্র ১৬০ জন (অর্থাৎ, মাত্র ১ শতাংশের মতো) সাজা পেয়েছিলেন (HRW, 2020)। বলা বাহুল্য যে, এরূপ পরিণতি অন্য নারীদেরকে ভবিষ্যতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করে না।

সুতরাং শুধু আইন প্রণয়ন, কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং এনজিওদের পদক্ষেপ দ্বারা নারী নির্যাতন প্রতিহত করায় প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন কঠিন। এজন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। আগামীতে বাংলাদেশকে সে ধরনের পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

৮.১.১০ নারী পাচার রোধ

বাংলাদেশের নারীরা বর্তমানে আরেক যে সমস্যার সম্মুখীন তা হলো বিদেশে পাচার। দুই ধরনের নারীরা এই পাচারের শিকার হচ্ছেন। প্রথম হচ্ছে ঐসব যারা

নিছক অভাবের তাড়নায় পাচারকারীদের শিকার হচ্ছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে সেসব তরুণী যারা বিদেশের চলচ্চিত্র কিংবা সাধারণভাবে বিনোদন জগতে উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়ার আশায় ঘরছাড়া হয়ে পাচারকারীদের ছলনার শিকার হচ্ছেন। পাচারকৃত উভয় ধরনের নারীদেরই পরিণতি করুণ হয়। দেশের অভ্যন্তরেও পাচারের শিকার হচ্ছে অনেক নারী, যেমন, অনেক নারীকে শ্রেয় জীবন প্রদানের আশ্বাস দিয়ে বড় শহরে এনে পরে অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বিদেশে উভয় ধরনের পাচার রোধের জন্য একদিকে প্রয়োজন কঠোর আইনি ব্যবস্থা, অন্যদিকে প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। নারীদের জন্য অধিক কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ অভাবের তাড়নায় পাচারকারীদের শিকার হওয়া থেকে তাদেরকে রক্ষা পেতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আলোচিত উন্নয়নের ভৌগোলিক সুষমতা অর্জন, ঢাকা শহরের সাথে দেশের বাকি অঞ্চলের জীবন মানের পার্থক্য হ্রাস ইত্যাদি দেশের ভেতরে নারীদের প্রতারণার শিকার হওয়া প্রশমন করবে। আগামীতে এই উভয় ধারার প্রয়াসে জোর দিতে হবে।

প্রচলিত অর্থে নারী পাচার না হলেও মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিক প্রেরণও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বিয়োগান্তক পরিণতি ডেকে আনছে। অন্য ধরনের ভালো দক্ষতা না থাকায় বাংলাদেশের নারীরা মূলত গৃহকর্মী হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে অনেকে বিভিন্ন ধরনের বর্বর আচরণ এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এসব অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে অনেকে মৃত্যুবরণও করছেন। আগামীতে এক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনতে হবে। প্রথমত, দক্ষতাসম্পন্ন নারীদের প্রেরণে প্রয়াসী হতে হবে যাতে তাদেরকে কেবল গৃহকর্মী হিসেবে কাজ না করতে হয়। এক্ষেত্রে নার্সিং প্রশিক্ষণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিগত সময়কালে নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, তবে এ বিষয়ে আরও অগ্রগতি প্রয়োজন। তদুপরি নারীরা যাতে নার্সিং ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজের দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং বিদেশে গিয়ে দক্ষ শ্রমিক বা পেশাজীবী হিসেবে কাজ করতে পারে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এর ফলে শুধু যে নারীরা বিদেশে গিয়ে নিগ্রহের কম শিকার হবে তাই নয়, তাদের আয়ও বেশী হবে এবং আরও বেশি করে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবে। ফলে একদিকে এই নারীরা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হবেন, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে দেশও উপকৃত হবে।

৮.১.১১ রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি

আগামীতে রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সংসদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে এসব আসন বণ্টিত হয়। কিন্তু এরূপ সংরক্ষিত এবং পরোক্ষ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত নারী সদস্যরা বহুলাংশে পরনির্ভর বলে পরিগণিত হন এবং জনগণের চোখে পুরো মর্যাদা পান না। এর পরিবর্তে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মাধ্যমে সংসদে নারীদের প্রত্যক্ষ উপায়ে প্রবেশের পথ সুগম হবে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ ও পেশিশক্তি ছাড়া নির্বাচনে জয়ী হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি নারীদের জন্য প্রার্থী হওয়া ও জয়ী হওয়াকে আরও কঠিন করে তুলেছে। আনুপাতিক পদ্ধতি এক্ষেত্রে নারীদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে এবং তা দেশ পরিচালনায় নারীদের অংশগ্রহণকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

৮.১.১২ নারী প্রগতির পক্ষে সামাজিক প্রচারাভিযানের প্রয়োজনীয়তা

নারী প্রগতিকে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের একটি অংশ হতে হবে, নইলে তা স্থায়িত্বশীল হবে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই এই পরিবর্তনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে তার পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ওপরও জোর দিতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন ধারায় সমাজে নারী প্রগতি বিরোধী প্রচার চলছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সরকার কিংবা নারী প্রগতির পক্ষের শক্তির তেমন শক্তিশালী প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। কিন্তু এ ধরনের প্রয়াস ভিন্ন বিভিন্ন নীতি কিংবা আইন গৃহীত হলেও সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন কঠিন হবে। বাল্য বিধবা সংক্রান্ত আইন বিষয়ক পরিস্থিতি তার একটি উদাহরণ। সুতরাং, আগামীতে নারী প্রগতির পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একটি অন্যতম করণীয় হবে।

৮.২ শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

বিগত সময়কালে বাংলাদেশের শিশুদের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ তার সকল শিশুদের সম্ভাব্য প্রতিভার সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। আগামীতে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে। সে লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয়ের প্রতি নিচে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

৮.২.১ শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ

সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি, বিগত সময়কালের অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনও এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার উন্নত দেশসমূহের গড় হারের চেয়ে প্রায় ছয়গুণ বেশি এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার পাঁচগুণের বেশি। আশ্চর্যের নয় যে, পুষ্টির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের শিশুরা বহু পিছিয়ে আছে। এ বিষয়ে কিছু তথ্য নিচের সারণি ৮.২-এ পরিবেশিত হলো। এই সারণিতে প্রদত্ত বাংলাদেশের তথ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক সাম্প্রতিক। সুতরাং এই তুলনায় বাংলাদেশের ভালো করার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের *স্টান্টিং*-এর হার জাপানের তুলনায় চারগুণ বেশি এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ১৪ গুণ বেশি। প্রায় একইরকম পরিস্থিতি *ওয়েস্টিং*-এর জন্যও প্রযোজ্য। আরও উদ্বেগের বিষয় যে, ২০২২ সালে সম্পাদিত "বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য জরিপ" (*বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে*) দেখায় যে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ওজন-স্বল্পতার হার ২০১৭/১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ২২ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং একই সময়ে বাংলাদেশের ওয়েস্টিং-এর হার ৮ শতাংশ থেকে বরং ১১ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব প্রবণতা উদ্বেগজনক।[৭৩]

সারণি ৮.২: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে *স্টান্টিং*, *ওয়েস্টিং* এবং ওজন-স্বল্পতার হার

বিষয়	বাংলাদেশ (২০১৯)	জাপান (২০১০)	সিঙ্গাপুর (২০০০)	অস্ট্রেলিয়া (২০০৭)
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে *স্টান্টিং* (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা)-এর হার	২৮.০	৭.১	৪.৪	২.০
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে *ওয়েস্টিং* (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন)-এর হার	৯.৮	২.৩	৩.৬	০.০

সূত্রঃ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e92fe78b en/index.html?itemId=/content/component/e92fe78b-en এবং Bangladesh Demographic and Health Survey (June - December 2022).

[৭৩] জাতিসংঘের শিশু কল্যাণ বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই বছরের কম বয়সের যেসব শিশুদের মধ্যে স্টান্টিং দেখা দেয় তাদের প্রায় অর্ধেকের শিকার হয় মায়ের গর্ভে থাকাকালীন এবং প্রথম ছয় মাসের মধ্যে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, শিশুদের সঠিক ভবিষ্যতের স্বার্থে মায়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা কত বেশি।

উপর্যুক্ত তথ্য দেখায় যে, শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য আগামীতে বিভিন্নমুখী প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। বলা বাহুল্য যে, অপুষ্টির মূল কারণ দারিদ্র্য। স্বল্প আয়ের পরিবারদের সন্তানেরাই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভোগে। পক্ষান্তরে ধনীদের সন্তানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বরং "অতি-ওজন" (*ওবেসিটি*)-এর সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই এই সমস্যার বৃহত্তর সমাধান হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, যা প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। তবে শুধু এই পরোক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে আশু ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা হিসেবে স্কুলে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর নাস্তা ও দুপুরের খাবার সরবরাহের পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিশুদের যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় সেজন্য সকল শিশুর পূর্ণাঙ্গ টিকাদান নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থার অধীনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.২ সার্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

বিবিএস (২০২৩) প্রদত্ত পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ (২৬ শতাংশ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তদুপরি, অনুমান করা অসংগত হবে না যে, সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরাই অধিক হারে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সমাজের স্বল্প আয়ের পরিবারের সন্তানেরাও যাতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রবেশের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এসব (প্রাক-প্রাথমিক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে যাতে সকল শিশু পুষ্টিকর খাদ্য পায়। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার যতটা সম্ভব সমান সুযোগ পায়।

৮.২.৩ শিশুদের পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা

শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এজন্য প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যাতে উন্মুক্ত খেলার মাঠ থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মদিবসে শিশুদের পরিচর্যা কেন্দ্রের একটি বাড়তি উপযোগিতা দেখা দিতে পারে, কারণ এসব কেন্দ্রে খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত স্থান নিশ্চিত করা গেলে শিশুরা শৈশব থেকেই যৌথভাবে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৮.২.৪ শিশুশ্রম হ্রাস এবং রোধ

বিবিএসের সাম্প্রতিক একটি জরিপে(BBS, 2023)[৭৪] দেখা যায়, ছেলে শিশুদের ৮.৫৮ শতাংশ, অর্থাৎ, প্রতি প্রায় ১১ জনে ১ জন শিশুশ্রমে নিয়োজিত ছিল এবং তাদের মধ্যে ৬০.১৪ শতাংশ বিপজ্জনক/ঝুঁকিপূর্ণ (*হ্যাযারডাস*) শ্রমে নিয়োজিত ছিল। আরও লক্ষণীয় যে, ২০১৩ সালে শিশুশ্রমের হার ছিল ৪.৩০ শতাংশ। অর্থাৎ, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০২২ সালে শিশুশ্রমের হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা উদ্বেগের বিষয়।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার "শিশুশ্রমের নিকৃষ্ট রূপ, ১৯৯৯," "ন্যূনতম বয়স সনদ ১৯৭৩" এবং "বলপূর্বক শ্রম সনদ ১৯৩০" স্বাক্ষর করেছে।[৭৫] তদুপরি বাংলাদেশ ২০২১ সালের ডিসেম্বরে "শিশুশ্রম দূরীকরণ কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫" গ্রহণ করেছে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে শিশুশ্রম হারের উপর্যুক্ত বৃদ্ধির ফলে এটা স্পষ্ট যে, কেবল আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর কিংবা উপরিভাসা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়াসের মাধ্যমে শিশুশ্রমের প্রচলন হ্রাস করা কঠিন। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত জরিপ অনুযায়ী, ২০২২ সালের শিশুশ্রমে নিয়োজিতদের মধ্যে ১২.৭ লাখ ছিল সেবাখাতে, ১১.৯ লাখ শিল্পখাতে এবং ১০.৮ লাখ কৃষিখাতে। অর্থাৎ, কৃষির তুলনায় সেবা এবং শিল্পখাতেই শিশুশ্রমের প্রচলন ছিল বেশি। আরও লক্ষণীয়, শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্র্যের হার বেশি, সেহেতু এসব পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র অভাবের কারণেই তরুণরা প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বয়সী) হওয়ার আগেই শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে তা নয়। বরং হতে পারে যে, এ ধরনের নিয়োজন বিভিন্ন বৃত্তিতে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। তাই যদি হয়, তাহলে শিশুশ্রম হ্রাসের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতা পরিবর্তনসহ আরও গভীরাশ্রয়ী কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন হবে (নিচে যুবসমাজের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা হবে)।

---

[৭৪] এই জরিপ যুক্তরাজ্য অর্থায়িত "এশীয় আঞ্চলিক শিশু শ্রম কর্মসূচির" অধীনে সম্পাদিত হয় এবং বিবিএস ২০২৩ সালের ১৯ জুলাই এর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দ্রষ্টব্য: https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/child labour/lang--en/index.htm

[৭৫] বাংলাদেশ আইএলও'র এসব সনদ যথাক্রমে ২০০১ সালের ১২ই মার্চ, ২০২২ সালের ২২শে মার্চ, এবং ২০২২ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে স্বাক্ষর করে।

৮.২.৫ শিশু পাচার রোধ

বাংলাদেশের শিশুরা পাচারের বিপদেরও সম্মুখীন। ২০২২ সালের *ট্রাফিকিং ইন পারসন্ রিপোর্ট* (Ndebele, 2023) এ বিষয়টির উপর কিছুটা আলোকপাত করেছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, যেসব শিশু এবং তরুণ-তরুণীরা বিশেষভাবে এই বিপদের সম্মুখীন তারা হলো বাল্য বিবাহ ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের শিকার মেয়েরা, স্বল্প-শিক্ষিত ও বেকার তরুণেরা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। ঢাকা শহরের প্রায় ৫,০০০ বস্তিতে যে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ বসবাস করে তারা এই অপতৎপরতার বিশেষ লক্ষবস্তু। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতারা নিজেরাই অভাবের তাড়নায় এবং সরল বিশ্বাসে ও ভালো ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় সন্তানদেরকে বের হয়ে যেতে এবং পাচারকারীদের শিকার হতে দেন (Ndebele, 2023)। শিশু পাচার রোধে নিঃসন্দেহে জনগণের মধ্যে প্রচার, পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। তবে শিশুশ্রমের মতো শিশু পাচারও একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা। সেজন্য এই সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থ-সামাজিক সমাধান খুঁজতে হবে। কাউকে যাতে বস্তিতে বসবাস করতে না হয়, অভাবের তাড়নায় সন্তানকে ছেড়ে দেওয়ার মতো মানসিকতায় পৌঁছাতে না হয় এবং তরুণেরা যাতে দেশের ভেতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করতে হবে, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতায় পরিবর্তন আনতে হবে।[৭৬]

৮.২.৬ শিশুদের মধ্যে "ইন্টারনেট আসক্তি" (ইন্টারনেট-এডিকশান, সংক্ষেপে, আইএ) রোধ

অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুদের মধ্যে ডিজিটাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তি বাড়ছে এবং শিশুদের বিকাশের জন্য ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইন্টারনেট আসক্তির হার ৪ শতাংশ থেকে ৪৯.৭ শতাংশ এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে (Mamun & Griffiths 2019)। এই আসক্তি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণকে বিঘ্নিত করছে; বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা এবং হীনম্মন্যতা বোধের জন্ম দিচ্ছে; ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এসব ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শিশু অবস্থায় যাতে ডিজিটাল আসক্তি সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় তাঁরা সন্তানদের প্রতি সময় দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়ে ব্যস্ত রাখার পদ্ধতির আশ্রয় নেন। এই অভ্যাসের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সমবয়সীদের সাথে শিশুদেরদের মিলিত হওয়া এবং একসাথে খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মদিবসে পরিচর্যা কেন্দ্র সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮.২.৭ শিশু সাহিত্য এবং শিশু-অভিমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিতকরণ

শিশুদের মানসিক বিকাশে শিশু সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপযোগী শিশু সাহিত্য সৃষ্টিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে; শিশু একাডেমিও কাজ করছে। কিন্তু সে ধরনের শিশু সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ছোটবেলা থেকে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা শিশুদের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য সবচেয়ে অনুকূল উপাদান হতে পারে। আকর্ষণীয় শিশু সাহিত্য শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি ডিজিটাল তথা ইন্টারনেট আসক্তির প্রতিরোধ করায় গুরুত্বপূর্ণ বর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। শুধু সাহিত্য নয়, শিশু অভিমুখী ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করতে হবে এবং তা শুধু রাজধানী ঢাকা শহরের পরিবর্তে জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। শিশুরা শুধু একটি পরিবারের নয়, বরং গোটা জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের উন্নততর পরিচর্যা আগামী দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

৮.৩ যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

যুবকরা সমাজের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণত ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের ব্যক্তিদের যুবসমাজের সদস্য বলে গণ্য করা হয়। তারা দেশের শ্রমশক্তির সবচেয়ে নবীন অংশ এবং তাদের মাধ্যমেই শ্রমশক্তির গঠনের পরিবর্তন সাধিত হয়। সাধারণত আশা করা হয়, শ্রমশক্তির বাকি (প্রবীণ) অংশের তুলনায় এই নবীন অংশ অধিকতর শিক্ষিত ও দক্ষ হবে এবং তার ফলে সামগ্রিকভাবে শ্রমশক্তির মানের আরও উন্নতি হবে।

সেজন্য সকল দেশের ভবিষ্যতের জন্যই যুবসমাজের গঠন ও চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য যুবসমাজের গুরুত্ব আরও বেশি এই কারণে দেশটি "জনসংখ্যা

[৭৬] ২০১৭ সালের "বাংলাদেশ মানব পুঁজি সূচক" অনুযায়ী, বাংলাদেশের শিশুরা গড়ে ৪.৫ স্কুল-বছর হারায়। শিশুরা যাতে মাধ্যমিক স্কুল সম্পন্ন করে সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো ২০১৮-২০২২ সময়কালের "মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"

উত্তরণ (*ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশান*)" প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ার একটি ফল হলো "জনমিতিক লভ্যাংশ (*ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড*)"। এই লভ্যাংশ বলতে যেটা বোঝানো হয় তা হলো যে, মোট জনসংখ্যায় যুবদের সংখ্যানুপাত বাড়ছে। ফলে সমাজে কর্মক্ষমদের অনুপাতও বাড়ছে। সুতরাং যুবকদের যথাযথ ব্যবহারের উপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করছে। এই উভয়বিধ কারণেই উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে যুবসমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আগামী বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট করণীয় বিষয়ে আমরা এই উপ-অনুচ্ছেদে আলোচনা করবো।

৮.৩.১ বাংলাদেশে জনমিতিক লভ্যাংশের গতিপ্রকৃতি

প্রথমেই জনমিতিক লভ্যাংশ এবং যুবসমাজের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার সাথে তার সংযোগ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সাধারণত একটি সমাজে শিশু ও বৃদ্ধরা হলো "নির্ভরশীল অংশ;" বিপরীতে মাঝের অংশটি হলো "কর্মক্ষম অংশ," যাদেরকে নির্ভরশীল অংশের "ভার" বহন করতে হয়। সমাজের নির্ভরশীল জনসংখ্যার তুলনায় কর্মক্ষম অংশের এই আপেক্ষিক বৃদ্ধিকেই জনমিতিক লভ্যাংশ বলে অভিহিত করা হয়। জনমিতিক লভ্যাংশকে সহজভাবে পরিমাপ করার একটি উপায় হলো মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের তুলনা করা। যখন কর্মক্ষম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করবে তখন একটি দেশ জনমিতিক লভ্যাংশের পর্বে উপনীত হবে। বলা বাহুল্য যে, অধিক সংখ্যায় যুবকদের কর্মক্ষম জনসংখ্যায় অন্তর্গত হওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়। চিত্র ৮.২ দেখায় যে, আনুমানিক ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ জনমিতি লভ্যাংশের পর্বে প্রবেশ করেছে।[৭৭]

[৭৭] জনমিতিক লভ্যাংশের উদ্ভব এবং পরে অবসানের তলবর্তী কারণ হলো জনসংখ্যা উত্তরণ। জনসংখ্যা উত্তরণ বলতে মোটা দাগে যেটা বোঝায় তা হলো, জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের উচ্চ হার থেকে একটি দেশের ক্রমান্বয়ে এই উভয়ের নিম্ন হার অর্জন। এই প্রক্রিয়ার একটা পর্যায়ে কর্মক্ষম জনসংখ্যার তুলনায় শিশু এবং বৃদ্ধদের সংখ্যা হ্রাস পায়। শিশুদের সংখ্যা হ্রাস পায় জন্ম হার হ্রাসের কারণে। যদিও মৃত্যু হার হ্রাস পাওয়ায় বৃদ্ধদের (৬৫ কিংবা তার চেয়ে বেশী বয়সের ব্যক্তিদের) সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু (আগের পর্বের) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিস্থিতিতে প্রজন্ম (*কোহর্ট*) হিসেবে বৃদ্ধদের ভিত্তি-সংখ্যা শিশুদের প্রজন্মের ভিত্তি-সংখ্যার চেয়ে অনেক কম হয়, সেহেতু জন্মহার হ্রাসের ফলে শিশুদের সংখ্যা যে পরিমাণে হ্রাস পায়, বৃদ্ধদের মধ্যে মৃত্যুহার হ্রাসের কারণে বৃদ্ধদের

চিত্র ৮.২: বাংলাদেশে জনসংখ্যা উত্তরণ এবং জনমিতিক লভ্যাংশের পর্ব

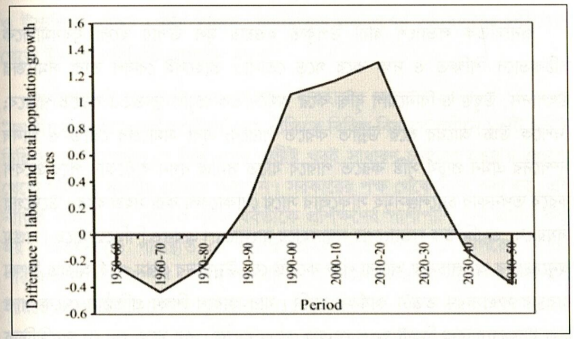

সূত্রঃ Islam, Mazharul M. (2016).

বলা বাহুল্য, জনমিতিক লভ্যাংশ একটি শুভ বিষয়, কারণ নির্ভরশীল অংশের তুলনায় কর্মক্ষম অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একটি সমাজে উদ্বৃত্ত বেশি হতে পারে, সে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করা যেতে পারে এবং তার ফলে দ্রুততর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যেতে পারে। লক্ষণীয়, জনমিতিক লভ্যাংশ চিরস্থায়ী হয় না, কারণ একসময় শিশুদের জন্ম সংখ্যা আগের মতো হ্রাস পায় না; অন্যদিকে উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার কারণে বৃদ্ধরা আরও দীর্ঘায়ু লাভ করে বিধায় কর্মক্ষম অংশের তুলনায় নির্ভরশীল অংশের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অন্য কথায়, কর্মক্ষম অংশের বৃদ্ধির হার মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের নিচে চলে যায়। তখন সমাজ "বার্ধক্যে"র পর্বে উপনীত হয় এবং নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যেটা আমরা এখন ইউরোপের অনেক দেশ এবং জাপানে দেখতে পাচ্ছি। চিত্র ৮.২ দেখায় যে, বাংলাদেশে জনমিতিক লভ্যাংশের পর্ব ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে এবং তারপর থেকে মোট জনসংখ্যা কর্মক্ষম জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং আর মাত্র এক দশক যাবৎ বাংলাদেশের জন্য জনমিতিক লভ্যাংশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা করা যেতে পারে।

সংখ্যা সে পরিমাণে (আপেক্ষিক অর্থে) বৃদ্ধি পায় না। তদুপরি, শিশুদের জন্মহার যত দ্রুত হ্রাস পায়, বৃদ্ধদের মৃত্যু হার ততো দ্রুত হ্রাস পায় না। এটাও বৃদ্ধদের সংখ্যার বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। এই উভয় কারণে কর্মক্ষম জনসংখ্যার তুলনায় শিশু ও বৃদ্ধদের মোট সংখ্যা হ্রাস পায়।

৮.৩.২ *জনমিতিক লভ্যাংশের সদ্ব্যবহারে ঘাটতি*

জনমিতিক লভ্যাংশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার মূল উপায় হলো যুবসমাজকে সঠিকভাবে শিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। তাহলেই কেবল তারা সমাজের উৎপাদন, উদ্বৃত্ত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করতে পারবে; দেশকে উচ্চ আয়ের স্তরে উন্নীত করতে পারবে; এবং সমাজের ভৌত ও মানব সম্পদের এমন প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে পারবে যাতে সমাজ যখন বার্ধক্যের পর্বে প্রবেশ করবে তখনকার চ্যালেঞ্জসমূহ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করা সহজ হবে। উদ্বেগের বিষয় যে, জনমিতিক লভ্যাংশের সদ্ব্যবহারে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে। সপ্তম অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, উন্নয়নের প্রথম পর্বে অর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ততটা কার্যকর হয়নি। যার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা যুবকদের এক বিরাট অংশ বেকার থেকে যাচ্ছে। এর ফলে শুধু যে জনমিতিক লভ্যাংশের অপচয় ঘটছে তাই নয়, অনুপযোগী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত সম্পদও বহুলাংশে অপচয় বলে পরিগণিত হচ্ছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (পৃ. ৭০০-৭০১) দেখা যায়, দেশের যুবদের সংখ্যা ১৯৭৪ সালের ১ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৪.৪ কোটি হয়, এবং ২০২৬ সাল নাগাদ তা ৪.৮ কোটিতে পৌঁছাবে। তারপর থেকে এই সংখ্যা কমতে থাকবে। এই পরিকল্পনা স্বীকার করে, এই যুবশক্তির সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, এই যুবদের মধ্যে মাত্র ২ কোটি (৪৪ শতাংশ) শ্রমবাজারে যোগ দিয়েছে এবং তার মধ্যে ১.৭৯ কোটি নিয়োজন পেয়েছে। অর্থাৎ, শ্রমবাজারে যোগদানকারীদের মধ্যে ২১ লাখ (১০.৬ শতাংশ) বেকার থেকে গেছে। যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের এই হার জাতীয় পর্যায়ের বেকারত্ব হারের (৪.২ শতাংশ) চেয়ে আড়াইগুণ বেশি। যুবসমাজের পরিস্থিতি বোঝার জন্য আরেকটি যে অভিধা (*কনসেপ্ট*) সহায়ক তা হলো নিয়োজন-শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-বহির্ভূত (নিশিপ্রব) অংশ, অর্থাৎ যারা কোনো কাজে (চাকুরিতে) নিয়োজিত নেই এবং কোনো শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেও অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মতে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ১২.৭ শতাংশ বেকার এবং ২৩ শতাংশ নিশিপ্রব। পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, সময়ে শিক্ষিত বেকারের বিস্তার ঘটেছে। বেকারদের

মধ্যে ৬৪ শতাংশ মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত এবং ৩৬ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত[৭৮]। বলা বাহুল্য, জনমিতিক লভ্যাংশের সদ্ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে উপযুক্ত পরিস্থিতি আশাপ্রদ নয়।[৭৯]

যুবসমাজের সম্ভাবনার আরও ভালো ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার ২০১৭ সালে "জাতীয় যুবনীতি" গ্রহণ করেছিল। এই নীতিতে বিভিন্ন বিষয়ের অধীনে ১৩টি অভীষ্ট চিহ্নিত করা হয়েছিল।[৮০] কিন্তু এসব অভীষ্ট খুবই সাধারণ চরিত্রের হওয়ায় এগুলো থেকে সুনির্দিষ্ট করণীয় বেরিয়ে আসেনি। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এই নীতির অধীনে বহু সংখ্যক যুবক-যবতীকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করা হয়। এতৎসত্ত্বেও পরিস্থিতি যে অসন্তোষজনক রয়ে গেছে তা উপরের বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও যুব উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। সেখানে যুব বেকারত্বের হার ২০১৬-১৭ সালের ১০.৬ শতাংশ থেকে ২০২৫ সাল নাগাদ ৫ শতাংশে এবং নিশিপ্রব-এর হার ২৯.৮ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে হ্রাস করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই পরিকল্পনা অনেকগুলি "সরবরাহ নীতি" এবং "চাহিদা নীতি"র প্রস্তাব করেছে। সরবরাহ নীতির মধ্যে রয়েছে (ক) যুবকদের দক্ষতার উন্নতি সাধন; (খ) সকলের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং (গ) নিশিপ্রব-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা। চাহিদা সংক্রান্ত নীতির মধ্যে রয়েছে (ক) যুবকদের প্রদ্যোক্তা (*এন্টারপ্রেনিউর*) হওয়ার মাধ্যমে স্বনিয়োজন উৎসাহিতকরণ; (খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (*আইসিটি*) বহির্ভূত অন্যান্য খাতে স্ব-নিয়োজন; (গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক স্ব-নিয়োজন; ৭০ম(ঘ) আন্তর্জাতিক অভিবাসন; এবং (ঙ) শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য প্রদান। প্রস্তাবিত এসব নীতি নিয়ে তর্কের কিছু নেই। তবে, ইংরেজিতে যেটাকে বলে, "বিশদতার মধ্যেই ভূত লুক্কায়িত থাকে!" (*ডেভিল লাইস ইন ডিটেইলস!*)। নিচে

---

[৭৮] এ বিষয়ে নারীদের পরিস্থিতি আরও অসন্তোষজনক। তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার আরও বেশী এবং যুব নিশিপ্রবের মধ্যে ৮৭% হলো নারী।

[৭৯] অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যায়, যদিও বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যা উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এবং তার ফলে "জনমিতিক লভ্যাংশ" (*ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড*) দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে না যদি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তরুণ-তরুণীদের প্রয়োজনীয় মাত্রায় দক্ষ ও শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে না পারে। অথচ জনমিতিক লভ্যাংশের সময়কাল সীমিত এবং তা পার হয়ে যাওয়ার পর এই লাভ থেকে উপকৃত হওয়ার আর সুযোগ থাকবে না বরং দেশ তখন "মধ্য আয়ের ফাঁদে" আটকা পড়ে যাবে

[৮০] বিষয়সমূহ হচ্ছে: (ক) স্ব-বৃদ্ধি; (খ) শিক্ষা; (গ) নিয়োজন; (ঘ) সামাজিক সুরক্ষা; এবং (ঙ) জাতি-গঠন

আমরা দেখবো যে, এসব নীতির বাস্তবায়ন বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে ধরনের আলোচনা পরিবেশন করে তা থেকে উৎসাহিত হওয়া কঠিন। তদুপরি এসব বিভিন্নমুখী করণীয়ের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান তার যথাযথ প্রতিফলন এই আলোচনায় পাওয়া যায় না।

৮.৩.৩ *শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অভিমুখীনতা*

জনমিতিক লভ্যাংশ তথা বর্ধিত সংখ্যার যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারে ঘাটতির মূল কারণ হলো বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপযোগী অভিমুখীনতা। সপ্তম অনুচ্ছেদে আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডিকৃত দশা এবং তার প্রতিফল লক্ষ করেছি। আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডিকরণ দেশের অর্থনৈতিক বিভক্তিকে সামাজিক বিভক্তিতে রূপান্তরিত করছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার অপর অনুপযোগী বৈশিষ্ট্য হলো এর সাধারণ-শিক্ষা অভিমুখীনতা, যার ফলে ব্যাপক যুব সমাজ প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। নিচে আমরা দেখবো যে, শিক্ষা ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের সাথে দেশের সামাজিক বিভক্তির একটি যোগসূত্রও আছে।

বিবিএসের পরিসংখ্যান দেখায় যে, সাধারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৬.৮ শতাংশ কলা ও মানবিক, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান এবং ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করছে। বিপরীতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মাত্র ৭.৭ শতাংশ এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে ১.৮ শতাংশ অধ্যয়নরত। এ থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে সম্প্রতিকালে উচ্চ শিক্ষার যে প্রসার ঘটেছে, তা মূলত কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসা প্রশাসনের দিকে ধাবিত হয়েছ। বিপরীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা অবহেলিত থেকে গেছে। আরও লক্ষণীয়, ডিগ্রি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাইরেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। এ সংক্রান্ত বিবিএস এর তথ্য মতে, দেশে কারিগরি শিক্ষা অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যার মাত্র ২২.৭ শতাংশ।

লক্ষণীয়, বিবিএস "কারিগরি" (*টেকনিক্যাল*) শিক্ষার পাশাপাশি পেশাগত (*প্রফেশনাল*) শিক্ষা সম্পর্কেও কিছু তথ্য প্রদান করে। কিন্তু এসব পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হলেও উপরের চিত্রটি খুব একটা পরিবর্তিত হবে না। সেক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দাঁড়াবে সাধারণ ডিগ্রি

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ২৬.৪ শতাংশ। সুতরাং বিষয়টা থেকেই যায় যে, সাধারণ উচ্চশিক্ষার প্রসারণের তুলনায় বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তেমন সম্প্রসারিত হয়নি।

৮.৩.৪ *শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা*

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশের উপর্যুক্ত "সাধারণ উচ্চশিক্ষা" অভিমুখীনতা দেশের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যেসব দেশ সাম্প্রতিককালে শিল্পায়িত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার সাথেও এর মিল নেই। সাধারণভাবে শিল্পায়নরত একটি দেশের যে ধরনের শিক্ষা পিরামিড থাকা দরকার তার সর্বনিম্নে থাকে সবচেয়ে বিস্তারসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা। তার উপর প্রায় সমবিস্তারসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা। এরপর একটি বড় অংশ থাকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার এবং তার চেয়ে কম অংশ থাকে সাধারণ উচ্চশিক্ষার। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা দেখি মাধ্যমিক পর্যায়ের পর এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম শিক্ষার্থী যাচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আর বাকি তিন-চতুর্থাংশ যাচ্ছে সাধারণ উচ্চশিক্ষায়, যেটা আবার বহুলাংশে কলা-মানবিক-সামাজিক-বাণিজ্য অভিমুখী এবং যাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ভূমিকা খুবই কম। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের এই পরিস্থিতির কারণে এটা বিস্ময়ের নয় যে, দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার বাড়ছে এবং দেশের জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ ব্যবহার অর্জিত হচ্ছে না। সুতরাং, শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতার পরিবর্তন আগামী বাংলাদেশের জন্য একটি বড় করণীয় হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অধিক বিস্তার যুবসমাজের এবং দেশের জন্য একাধিকভাবে সহায়ক হতে পারে। প্রথমত, কারিগরি শিক্ষা যুবকদের আরও বেশি নিয়োজন-উপযোগী করবে। একটি শিল্পায়নরত দেশে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তির প্রয়োজন বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, কারিগরি শিক্ষা যুবদের স্বনিয়োজিত প্রদ্যোক্তা (*এন্টারপ্রেনিউওর*) হওয়াকে সুগম করে। তৃতীয়ত, কারিগরি শিক্ষা যুবকদের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থান লাভকে সুগম করে। উপরন্তু বিদেশে তারা দক্ষতাভিত্তিক এবং অধিকতর উচ্চ বেতনের চাকুরি পেতে পারে। এই বিভিন্নমুখী সুফলের ফলে একদিকে দেশে শিল্পায়ন সুগম হবে, অন্যদিকে বেকারত্বের হার হ্রাসের পাশাপাশি অধিকতর রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় অর্জিত হবে।

৮.৩.৫ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সরকারের ভূমিকা

লক্ষণীয়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কারিগরি শিক্ষার ঘাটতির কথা স্বীকৃত হয়। সেখানে বলা হয় যে, ব্যক্তিখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মকালীন (*অন-দি-জব*) প্রশিক্ষণ দিতে বিশেষ উৎসাহী হয় না কারণ তারা নিশ্চিত হতে পারে না যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকেরা পরে অন্য কোথাও কাজ পেয়ে চলে যাবে না। ফলে এখানে সরকারের একটি বড় ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ আছে। কিন্তু উপরের পরিসংখ্যান দেখায় যে, সরকার সে ধরনের ভূমিকা পালন করছে না। বিবিএসের (২০২৩) পরিসংখ্যান দেখায়, মোট ৭,৭৬১টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭,০৮৩টি (৯১.২ শতাংশ) ছিল ব্যক্তিখাতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের অনুপাত ছিল ৭০.৮১ শতাংশ। এতে বোঝা যায়, যেটুকু কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে তার সিংহভাগ ঘটেছে ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে। তদুপরি, উপরে আমরা লক্ষ করেছি, প্রয়োজনের তুলনায় তাদের এই ভূমিকাও পর্যাপ্ত হয়নি। সুতরাং, আগামীতে এক্ষেত্রে সরকারের ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা আশ্চর্যের বিষয় যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব যেন বহুলাংশে ব্যক্তিখাত, বৈদেশিক ঋণদানকারী সংস্থা এবং এনজিওসমূহের উপর ছেড়ে দেয়। যেমন, সেখানে বলা হয় যে, *"যুবদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটানোর মতো সম্পদ সরকারের নেই। সেজন্য দাতা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের(এনজিও) সাথে অংশীদারির ভিত্তিতে কাজ করাই এ লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল পন্থা"* (পৃ. ৭০৫-৭০৬; লেখকের অনুবাদ এবং গুরুত্ব আরোপ)। এই অভিমতের পক্ষে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিভিন্ন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে। তার মধ্যে, একাধিক ঋণদাতা সংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত ব্র্যাকের "দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি" (*স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম*, সংক্ষেপে *এসডিপি*), ইউএসএইডের অর্থায়নে পরিচালিত বাংলাদেশ *ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট পাইলট (বিওয়াইইপি)*, অক্সফামের অর্থায়নে পরিচালিত বাংলাদেশ *এমপাওয়ার ইয়ুথ ফর ওয়ার্ক* এবং ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত *ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট থ্রু স্কিলস (ইয়েস)*। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব সম্পর্কে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই অবস্থান স্ববিরোধী; কেননা উপরে আমরা লক্ষ করেছি এই পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ হলো, ব্যক্তিখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মকালীন (*অন-দি-জব*) প্রশিক্ষণ দিতে বিশেষ উৎসাহী হয় না এবং এক্ষেত্রে সরকারের বড় ভূমিকা পালনের সুযোগ এবং

প্রয়োজন আছে। এটা প্রতিষ্ঠিত যে, শিক্ষার বহিঃসারিত ইতিবাচক প্রভাব (*পজিটিভ এক্সটারনিলিটি*) থাকে যা ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ আহরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে, মুনাফা তাড়িত হয়ে ব্যক্তিখাত যতটুকু শিক্ষা সরবরাহ করে তা সমাজের প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়। সে কারণে শিক্ষাখাতে সরকারের বিনিয়োগ এবং ভূমিকা বিশেষভাবে উপযোগী। এ বিষয়টি কারিগরি শিক্ষার জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

এটা ঠিক যে, তত্ত্বগতভাবে যা সঠিক তা বাস্তবে সত্য নাও হতে পারে। যেকোনো সরকারি উদ্যোগে অদক্ষতা ও অপচয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। সেদিক থেকে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা প্রদানে ব্যক্তিখাতের উপরিদৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ একটি ইতিবাচক বিষয়। ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান ব্যয়ের সাশ্রয় দিতে পারে এবং চাহিদার পরিবর্তনের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই যে সঠিক ও পর্যাপ্ত তা ভাবার কোনো কারণ নেই। তদুপরি সার্বিক কারিগরি শিক্ষার বিস্তারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ঋণদাতা সংস্থাসমূহের নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এনজিওর মাধ্যমে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের সমাহার হিসেবে দেখা সংগত নয়। বরং, এটাকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনকে যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যা এবং দেশের ও বিশ্বের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির আলোকে আগামীতে কোন ধারায় কী পরিমাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে তার প্রক্ষেপণ করতে হবে এবং হয় সরকার নিজ কর্তৃক অথবা ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান বা এনজিওর সহযোগিতায় তা মেটানোর উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী ঋণদানকারী সংস্থার ভূমিকা হবে সরকার নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা। অর্থাৎ, প্রক্রিয়াটির নেতৃত্বে থাকবে দেশের সরকার। ব্যক্তিখাত, এনজিও এবং ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা হবে সহায়কের।

সম্পদের অভাব সরকারের পক্ষে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভূমিকা না রাখার যুক্তি হতে পারে না। লক্ষণীয়, ইউনেস্কোর মতে, একটি দেশের জিডিপির কমপক্ষে ৪-৬ শতাংশ এবং সরকারি বাজেটের কমপক্ষে ১৫-২০ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত।[৮১] সে তুলনায় ২০২১ সালে বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ

[৮১] https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/WG-F-3-Education-expenditure-data.pdf (p. 3)

ছিল জিডিপির মাত্র ২.১ শতাংশ[৮২]। এটা ছিল পৃথিবীর সর্বনিম্ন অনুপাতসমূহের একটি[৮৩]। সুতরাং, এটা খুবই স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে না। অথচ বহু অনুৎপাদনশীল খাত ও প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আরও বেশি অংশ কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, সাধারণ উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সরকার প্রতি বছর যে অর্থ ব্যয় করছে তার সামান্য অংশ ব্যয় করে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কাজেই সামগ্রিকভাবে শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দের বৃদ্ধি এবং তার অধিক অংশ কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা আগামী দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে। বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সঠিক ব্যবহারের জন্য তা একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারে আরেকটি যে বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার তা হলো, এ ধরনের শিক্ষা মাধ্যমিক নাকি উচ্চ মাধ্যমিকের পরে শুরু হবে। উন্নত দেশসমূহের মাপকাঠির বিচারে সকল তরুণ-তরুণীদের বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করার পরই কেবল তাদের বিশেষায়িত এবং পেশাগত/কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা হওয়া উচিত। তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান স্তরে শেষোক্ত শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিকের আগেও শুরু করার পেছনে যুক্তি থাকতে পারে এবং তা উল্লিখিত শিশুশ্রমের প্রচলন হ্রাস ও রোধ করায় সহায়ক হতে পারে। গণ-আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার।

৮.৩.৬ যুব সমাজ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

কারিগরি শিক্ষা প্রসার প্রয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হবে বাংলাদেশের যুব সমাজকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে তোলা এবং এই বিপ্লবে তাদের অংশগ্রহণ আরও ব্যাপক করা। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশের যুব সমাজ এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। ডিজিটাল উৎপাদন রপ্তানিতে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কাসি এবং লেহদনভির্তা (২০১৮) কর্তৃক সম্পাদিত একটি

[৮২] https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=BD

[৮৩] একই বছর শিক্ষার জন্য ব্যয় ছিল সরকারের বাজেটের ১১.৬৯%। https://www.indexmundi.com /facts/bangladesh/public-spending-on-education

সমীক্ষার ভিত্তিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (পৃ. ৭০৮-৭০৯) দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক সূত্র থেকে সরবরাহকৃত অনলাইন শ্রমের ২৬ শতাংশ আসে ভারত থেকে, ২১ শতাংশ বাংলাদেশ থেকে এবং ১৪ শতাংশ পাকিস্তান থেকে। আরও জানা যায়, অনলাইন শ্রমের সবচেয়ে বেশি চাহিদা হলো সফটওয়্যার উন্নয়ন ও সার্ভিসিং-এর জন্য (মোট চাহিদার ৩৬ শতাংশ); তারপর হলো সৃষ্টিশীল ও মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরির জন্য (২৫ শতাংশ); তৃতীয় হলো ডাটা এন্ট্রি এবং বিভিন্ন রুটিন কাজের জন্য (১৩ শতাংশ)। বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত অনলাইন শ্রম এখনও বহুলাংশ স্বল্প-বিদগ্ধ পর্যায়ের। যেমন, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও সার্ভিসিং-এর জন্য বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত শ্রমের পরিমাণ স্বল্প এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারত থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তা সত্ত্বেও উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিলে যুব সমাজ যে এক্ষেত্রে আগামীতে আরও সফল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লক্ষণীয়, ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক কাজের বেশ কয়েকটি শুভ দিক আছে। একটি হলো এই কাজের ফল বাজারজাত করার জন্য অনায়াসে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করা যায় এবং সে কারণে এই কাজের চাহিদা, বলা যেতে পারে, সীমাহীন। এই চাহিদার কতটা ব্যবহার করা যাবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাংলাদেশের প্রস্তুতির উপর। দ্বিতীয়ত, এই ডিজিটাল কাজ অনেক ক্ষেত্রেই স্বনিয়োজনের ভিত্তিতে করা যেতে পারে এবং কোনো নিয়োজনকারী খোঁজার প্রয়োজন হয় না। ফলে এই কাজ সম্পাদনের পথে প্রাতিষ্ঠানিক বাধা কম। তৃতীয়ত, এই কাজ ঘরের নিরাপদ পরিবেশে করা যায় এবং তা কখন করা হবে সে বিষয়ে নমনীয়তা থাকে। ডিজিটাল কাজের এই উভয় বৈশিষ্ট্য নারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। চতুর্থত, ডিজিটাল কাজের জন্য অত বেশি ভৌত পুঁজির প্রয়োজন হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো ইন্টারনেট সংযোগ এবং একটি কম্পিউটারই যথেষ্ট। পঞ্চমত, ডিজিটাল কাজ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের উপর কম চাপ পড়ে এবং ক্ষতি কম হয়। বাংলাদেশের মতো অত্যন্ত ঘনবসতিসম্পন্ন দেশের জন্য এই বৈশিষ্ট্যও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ডিজিটাল প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যাপক সম্প্রসারণ আগামীর বাংলাদেশের একটি বড় করণীয় হবে।

৮.৩.৭ *যুব সমাজ ও কায়িক শ্রম*

লক্ষণীয়, যুবসমাজের সকলের পক্ষেই ডিজিটাল প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত হওয়া এবং তা ব্যবহারে সফল হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যুবসমাজের বড় অংশই ডিজিটাল-ভিন্ন অন্যান্য ধরনের কাজ ও পেশার জন্য বেশি উপযোগী এবং আগ্রহী হবে। অনেক ক্ষেত্রে এসব কাজ ও পেশায় কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। কাজেই যুবসমাজ যেন কায়িক শ্রমকে অসম্মানজনক না মনে করে এবং এ ধরনের শ্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহী হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের হ্রাস এবং সপ্তম অনুচ্ছেদে আলোচিত সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি এই লক্ষ্যে সহায়ক হবে। কায়িক শ্রমকে সম্মানিত করার অন্যতম পদ্ধতি হলো এই শ্রমের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা এবং একীভূত শিক্ষা, চিকিৎসাও নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কায়িক শ্রমিকদের সমাজের সম্মানজনক অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। সুতরাং বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সঠিক ব্যবহারের জন্য দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।

৮.৩.৮ *যুবসমাজের দৈহিক ও মানসিক গঠন*

বলা বাহুল্য, যুবসমাজকে তার উপরিবর্ণিত প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে হলে তার দৈহিক ও মানসিক গঠন উন্নত মানের হতে হবে। এ লক্ষ্যে সপ্তম অনুচ্ছেদে আলোচিত একীভূত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। তবে এর পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও নজর দিতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো তাদের জন্য শরীর গঠন এবং ক্রীড়ার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা। সেজন্য প্রয়োজন হবে পর্যাপ্ত পরিমাণের খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি। প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় যাতে এ ধরনের সুযোগসহ প্রতিষ্ঠান বিরাজ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি উন্নত মানসিক গঠনের জন্য সহায়ক কাঠামো ও পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে। সে জন্য প্রতি গ্রাম ও মহল্লায় ইন্টারনেট যোগাযোগসম্পন্ন পাঠাগার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে। এসব ক্ষেত্রে যাতে নারীরা বৈষম্যের শিকার না হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমানে তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে যেভাবে মাদকের ব্যবহার ও মাদকাসক্তি বিস্তৃত হচ্ছে তা প্রতিরোধ করতে হবে। যুবসমাজের দৈহিক ও মানসিক গঠনের উন্নতি সাধনে এবং

কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধিতে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা বিশেষভাবে উপযোগী হবে। সে বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তী (নবম) অনুচ্ছেদে আলোচনা করবো। তরুণ ও যুবসমাজের জন্য সমাজের মধ্য থেকে "অনুকরণীয় আদর্শ" ও (রোল মডেল) তুলে ধরতে হবে।

৮.৪ উপসংহার

নারী, শিশু ও যুবদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আগামীর বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয়ের মধ্যে আছে একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে নারীদের স্বাস্থ্যসেবার আরও উন্নতি সাধন যাতে (প্রসবকালীন) মাতৃমৃত্যু হার উন্নত দেশসমূহের মতো নীচু পর্যায়ে হ্রাস পায়; নারীশিক্ষা ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন সাধন যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পায়; বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আরও বৃদ্ধি পায়; এবং উচ্চআয়ের শ্রম বাজারের নারীরা আরও ব্যাপক হারে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং প্রাসঙ্গিক আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেয়েদের বাল্য বিবাহ বন্ধ করার মাধ্যমে অপুষ্টি ও দারিদ্র্য চক্র ভাঙ্গতে হবে। মজুরি এবং ক্রীড়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বৈষম্য রোধ করতে হবে। নারী নির্যাতন ও নারী পাচার রোধ করতে হবে এবং পিতামাতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার আইনগতভাবে এবং বাস্তবে নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে। জনসংখ্যা উত্তরণে নারীরা যাতে তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুরা শুধু পরিবারের নয়, বরং গোটা জাতিরই মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু সঠিক পরিচর্যা ছাড়া মূল্যবান সম্পদও বিনষ্ট হয়ে যায়। শিশুদের পরিচর্যার উন্নতি আগামীর বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে। প্রথমত, তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করতে হবে এবং তারা যেন অপুষ্টিতে না ভোগে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এবং কর্মদিবস পরিচর্যা সেবার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুশ্রম হ্রাস এবং শিশু পাচার রোধ করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার যাতে আসক্তিতে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে আকর্ষণীয় ও ইতিবাচক

বাণীসমেত শিশু সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সারা দেশে শিশু অভিমুখী ব্যাপক এবং সাংবাৎসরিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

যেকোনো দেশের অগ্রগতিতে যুবসমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য এই ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যা উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং তার একটি শুভ ফল হচ্ছে "জনমিতিক লভ্যাংশ," যার উদ্ভব ঘটে যখন দেশের যুব এবং কর্মক্ষমদের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায়। আগামী বাংলাদেশের অন্যতম করণীয় হলো এই জনমিতিক লভ্যাংশের সঠিক ব্যবহার। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অভিমুখীনতা সে লক্ষ্যের জন্য উপযোগী নয়। এই অভিমুখীনতার অধীনে মাধ্যমিক-পরবর্তী পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তার প্রায় চারগুণ ভর্তি হয় সাধারণ ধারার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে তাদের সিংহভাগ কলা-মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসা প্রশাসন বিভাগে অধ্যয়ন করে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী লাভকারীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি শেষাবধি বেকার থেকে যাচ্ছে। ফলে একদিকে জনমিতিক লভ্যাংশের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না, অন্যদিকে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত একটি বিরাট পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সাধারণ অভিমুখী থেকে কারিগরি অভিমুখী করা আগামীর বাংলাদেশের জন্য একটি বড় করণীয়। ব্যাপক পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিদেশী ঋণদানকারী সংস্থা দ্বারা সমর্থিত শুধুমাত্র এনজিওদের কার্যক্রম হিসেবে দেখার পরিবর্তে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখতে হবে। সেজন্য পরিকল্পনা কমিশনকে যুব প্রজন্মের ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যা এবং দেশের ও বিশ্বের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির আলোকে আগামীতে কোন ধারায় কী পরিমাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে তার প্রক্ষেপণ করতে হবে এবং হয় সরকার নিজ কর্তৃক অথবা ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান বা এনজিওদের সহযোগিতায় তা মেটানোর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রক্রিয়াটির নেতৃত্বে থাকবে দেশের সরকার। ব্যক্তিখাত, এনজিও এবং ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা হবে সহায়কের। কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং সাধারণভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই খাতের প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে যাতে বাংলাদেশের যুবসমাজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব দ্বারা পদদলিত হওয়ার পরিবর্তে এই বিপ্লবের সওয়ার হতে পারে। যুবসমাজ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রশংসনীয় পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতার পরিবর্তন করা গেলে তারা এক্ষেত্রে আরও সাফল্যের পরিচয় দিতে পারবে। ডিজিটাল কাজের বাজার বিশ্বজোড়া, যার ফলে এই কাজের চাহিদা অপরিমেয়। ডিজিটাল কাজ স্বনিয়োজনকে উৎসাহিত করে, লেনদেন খরচ (*ট্রানজাকশান কস্ট*) কম, বেশি পুঁজির প্রয়োজন হয় না; নিরাপদে ঘরে বসে নিজেদের সুবিধামতো সময়ে করা যায় বলে নারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এবং পরিবেশের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুকূল। এসব বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারে প্রয়াসী হতে হবে।

কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারভিত্তিক উন্নয়ন ধারা অগ্রসর করার জন্য যুবসমাজকে কায়িক শ্রমের প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেজন্য একীভূত শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করতে হবে এবং কায়িক শ্রমের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে হবে। যুবসমাজের দৈহিক ও মানসিক গঠনের উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নারী, শিশু ও যুবদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সমাজের অন্যান্য অংশকে অবহেলা করতে হবে। উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে সমাজের সকল অংশই গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল অংশকেই মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন বৃদ্ধদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেকারণেই সপ্তম অনুচ্ছেদে আগামী দিনের করণীয় হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধের দশটি করণীয় যুগপৎভাবে সমাজের সকল সদস্যকেই উন্নত জীবনের দিকে নিয়ে যাবে।

৯। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা

একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এক বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশের তরুণ ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বাহিনী গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ছিল যেমন টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের কাদেরিয়া বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী,

এবং আরও অনেক বাহিনী। লক্ষ করা যেতে পারে, সামরিক বাহিনীতে পূর্ব প্রশিক্ষিত সৈনিকেরা এসব বাহিনী গড়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেমন কাদেরিয়া বাহিনীর সংগঠক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পাকিস্তান আমলে সামরিক বাহিনীতে ছিলেন এবং পরে বেসামরিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। একইভাবে হেমায়ত বাহিনীর সংগঠক ও নেতা মোহাম্মদ হেমায়েতউদ্দিনও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হাবিলদার ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে তরুণদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে মানিকগঞ্জের তখনকার অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অর্থাৎ, সামরিক পূর্ব-প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিকাশে ও সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই অভিজ্ঞতা দেখায় যে, যদি আগে থেকেই বাংলাদেশের গোটা তরুণ সমাজের প্রশিক্ষণ থাকতো তাহলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রথম থেকেই আরও বেগবান হতো এবং প্রশিক্ষণ লাভের জন্য যে কালক্ষেপণ করতে হয়েছে তার প্রয়োজন হতো না।

পৃথিবীর বহু দেশে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ অন্তর্ভুক্ত করলে এরূপ দেশের সংখ্যা বর্তমানে ৮৫ অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দেশে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয় এবং অহিংসানির্ভর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ভূটানেও এক ধরনের সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। সুতরাং এটা কোনো অভিনব বা ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা নয়। তবে অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জন্য সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা বেশি। প্রথমত, এই ব্যবস্থা দেশের তরুণদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তাদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলাবোধ, কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধসহ জাতিগঠনের জন্য সহায়ক গুণাবলি বিস্তৃত করবে। দ্বিতীয়ত, নয় মাসব্যাপী এ ধরনের সামরিক প্রশিক্ষণ দেশের তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভাগীদার হওয়াতে সহায়ক হবে এবং তা পরম্পরা ধরে তরুণদের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রাখতে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত, সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা দেশের সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিতে প্রভূতভাবে সহায়ক হবে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন ধনী-দরিদ্র এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল তরুণকে একত্রিত করেছিল তেমনি সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ সমাজের সকল অংশের তরুণদের একই ছাউনিতে সমবেত করবে, সম-অবস্থানে থেকে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত করবে

এবং জাতীয় লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মনোভাব গড়ে তুলবে। পরবর্তীতে যখন তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাবে তখনও সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণকালের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন থাকবে এবং বৃহত্তর সমাজের সংহতি বৃদ্ধি ও ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। চতুর্থত, সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে দেশের জনগণের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন কারণে আগামীর বাংলাদেশের আরেকটি করণীয় হবে তরুণদের জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন। এই অনুচ্ছেদে আমরা এই করণীয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

৯.১ মুক্তিযুদ্ধ এবং সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা

একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের সূচনায় বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্র-জনতা পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে একটা পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনী প্রায় সারা দেশে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে এবং শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রলম্বিত পর্ব। এই পর্বে হাজার হাজার তরুণ যুদ্ধের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে। এই প্রশিক্ষণের পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য তারা দেশের ভেতরে প্রবেশ শুরু করে। তাদের অনেকে সীমান্তে অবস্থিত বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেও অন্তর্ভুক্ত হন এবং সনাতনী পদ্ধতির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এর পাশাপাশি দেশের ভেতরেও কিছু গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী ছিল বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত "কাদেরিয়া বাহিনী"। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার একটি বড় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বাহিনী এক পর্যায়ে প্রায় ১৭,০০০ সদস্য বিশিষ্ট বাহিনীতে পরিণত হয় বলে অনুমিত হয়। কাদেরিয়া বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বাহিনীর বিভিন্ন সফল অপারেশনের মধ্যে ছিল "জাহাজমারা যুদ্ধ," যেটার নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই যুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনী যমুনা নদী দিয়ে অগ্রসরমান

পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য এবং অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী জাহাজ আক্রমণ করে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ডিসেম্বরে টাঙ্গাইলে ভারতীয় বিমানবাহী ছত্রীসেনাদের অবতরণে সহায়তা করা যা পাকিস্তানি বাহিনীর দ্রুত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের পেছনে একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই আগে সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। কাদের সিদ্দিকী নিজে সামরিক বাহিনীতে ছিলেন এবং পরে বেসামরিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বাহিনীর একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য হাবিবুর রহমান মিঞা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে (ইবিআরসি) "অস্ত্র পরীক্ষকে"র (অয়েপনস ইন্সপেক্টর) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আরেকজন ছিলেন খন্দকার আবু তাহের, যিনি ১৯৪৯ সালে প্রথম ইবেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে সুবেদার মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে অস্ত্র পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে নিজের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আরও ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ল্যান্স নায়েক মহিউদ্দিন এবং সিপাহি আব্দুল মজিদ যাঁরা কাদেরিয়া বাহিনীর কমান্ডো প্লাটুন কমান্ডারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ থেকে দেখা যায়, সামরিকভাবে পূর্ব প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরাই কাদেরিয়া বাহিনী গঠনে উদ্যোগী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের উপস্থিতি ভিন্ন এ ধরনের একটি বাহিনী গড়ে ওঠা কঠিন হতো সন্দেহ নেই।

একই কথা বহুলাংশে প্রযোজ্য বৃহত্তর ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনীর জন্য। এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা মোহাম্মদ হেমায়েতউদ্দিনও ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার। স্বীয় সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবহার করে তিনি গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এলাকার নদী পরিবেষ্টিত এলাকার জন্য উপযোগী করে স্থানীয় যুবকদের রিক্রুট করে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। এটাও দুরূহ হতো না যদি না হেমায়েতের মতো সামরিকভাবে পূর্ব-প্রশিক্ষিত ব্যক্তি না থাকতেন। একইভাবে সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী দেশের

অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট, প্রশিক্ষণ এবং অপারেশন পরিচালন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট যে, সামরিকভাবে পূর্ব-প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটা আশ্চর্যের নয়, কারণ বেসামরিক আন্দোলন আর যুদ্ধ এক নয়। যুদ্ধ যে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র পরিচালনার দক্ষতা দাবি করে তাই নয়, যুদ্ধ একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলা, যৌথতা ও আচরণবিধির দাবি করে। এই উভয় দাবি পূরণের জন্য একটা প্রশিক্ষণ পর্বের প্রয়োজন হয়। যাদের এই প্রশিক্ষণ আছে তারা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; তাঁরা জানে কী করতে হবে এবং কীভাবে তা করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যদি সামরিক প্রশিক্ষণ আরও বিস্তৃত থাকতো তাহলে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আরও দ্রুত ও ব্যাপকভাবে গড়ে উঠত। সাধারণভাবে কোনো একটি দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণের মান সে কারণেই দেখা যায় পৃথিবীর বহু দেশ সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের নীতি অনুসরণ করে।

৯.২ বিশ্বে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার বিস্তৃতি এবং প্রকারভেদ

বাংলাদেশের জন্য নতুন এবং অপরিচিত হলেও বিশ্ব পরিধিতে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ একটি বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটা তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার মতো। সেখানে আমরা লক্ষ করেছি যে, আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য নতুন এবং অপরিচিত হলেও পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ এবং প্রায় সকল উন্নত দেশ এই নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার উপযোগিতা কী এবং কী সুনির্দিষ্ট উপায়ে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে পারে, তার আলোচনায় যাওয়ার আগে এ সংক্রান্ত বিশ্ব পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে লক্ষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছু তথ্য সারণি ৯.১-এ পরিবেশন করা হলো। এতে কোন কোন দেশে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে এবং তার মূল বৈশিষ্ট্য কী তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৯.১: সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি

ক্রমিক নং	দেশ	সারণি ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরন
১	আলজেরিয়া	১৯-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
২	এঙ্গোলা	২০-৪০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩	আর্জেন্টিনা	বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান
৪	আর্মেনিয়া	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫	অস্ট্রিয়া	১৮-৫০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৬-৯ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬	আজারবাইজান	১৮-২৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭	বেলারুশ	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-৩৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৮	বেলিজ	বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণের বিধান
৯	বেনিন	১৮-৩৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১৮ মাসের বাছাইকৃত সামরিক প্রশিক্ষণ
১০	ভূটান	২০-২৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য আবশ্যক সামরিক প্রশিক্ষণ; সামরিক বাহিনীতে পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি স্বেচ্ছামূলক
১১	বলিভিয়া	১৮-২২ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১২	ব্রাজিল	১৮-৪৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১০-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৫-১০ শতাংশের প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি
১৩	কাম্পুচিয়া	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১৪	কেপ ভার্দে	১৮-৩৫ বছর বয়সী পুরুষ এবং মহিলাদের ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১৫	চাদ	২০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৩৬ মাসের এবং ২১ বছর বয়সী মহিলাদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (মহিলারা বেসামরিক সেবাতেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে)
১৬	চিলি	২০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৩৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান, তবে বাধ্যতামূলক নয়

ক্রমিক নং	দেশ	সারণি ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরন
১৭	চীন	১৮-২২ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজনবোধে আরোপিত)
১৮	কলোম্বিয়া	১৮-২৪ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
১৯	কঙ্গো (গণপ্রজাতন্ত্রী)	১৮-২২ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
২০	কিউবা	১৭-২৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
২১	সাইপ্রাস	১৮-৫০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৪ মাস ন্যাশনাল গার্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান
২২	ডেনমার্ক	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৪-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে প্রয়োজনবোধে অন্তর্ভুক্তির বিধান
২৩	মিশর	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮-৩৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৯ বছরের জন্য রিজার্ভে থাকার বিধান
২৪	এল সালভাডোর	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১১-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (বাছাইকৃত)
২৫	বিষুবীয় গিনি	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (বাছাইকৃত)
২৬	ইরিত্রিয়া	১৮-৪০ বছর বয়সী পুরুষ ও নারীদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি
২৭	এস্টোনিয়া	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৮-১১ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
২৮	ইথিওপিয়া	প্রয়োজনবোধে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি
২৯	ফিনল্যান্ড	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৬-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৩০	জর্জিয়া	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩১	গ্রিস	১৯-৪৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৯-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশ	সারণি ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরন
৩২	গুয়াতেমালা	১৭-২১ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান (বাছাইকৃত)
৩৩	গিনি-বিসাউ	১৮-২৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৪	ইন্দোনেশিয়া	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৩৫	ইরান	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৬	ইসরায়েল	১৮ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪-৪৮ মাসের (পাইলটদের জন্য ৯ বছর) সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৭	আইভরি কোস্ট	১৮-২৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৩৮	জর্ডান	২৫-২৯ বছর বয়সী কর্মহীন পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৩৯	কাজাখস্তান	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪০	কুয়েত	১৮-৩৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪১	কিরঘিজস্তান	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৯-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪২	লাওস	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৩	লিথুনিয়া	১৯-২৬ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৯ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৪	মালি	১৮ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৫	মেক্সিকো	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (লটারি দ্বারা বাছাইকৃত), ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৪৬	মলদোভা	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৭	মঙ্গোলিয়া	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি

ক্রমিক নং	দেশ	সারণি ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরন
৪৮	মরোক্কো	১৯ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৪৯	মোজাম্বিক	১৮-৩৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫০	মিয়ানমার	বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিধান (২০১০ সাল থেকে)
৫১	নাইজার	১৮ বছর বয়সী অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫২	উত্তর কোরিয়া	১৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১০ বছর এবং মহিলাদের জন্য ৫ বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫৩	নরওয়ে	১৯-৩৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১২ মাস সামরিক প্রশিক্ষণ এবং ৪/৫টি পুনঃপ্রশিক্ষণ (প্রায় ৮০ শতাংশের অবমুক্তি)
৫৪	প্যারাগুয়ে	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫৫	পর্তুগাল	সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের বিধান
৫৬	কাতার	১৮-৩৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৪-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৫৭	রাশিয়া	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৫৮	সান মারিনো	১৬-৬০ বছর বয়সী পুরুষদের প্রয়োজনবোধে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি
৫৯	সাও তোমে প্রিনসিপে	১৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিধান
৬০	সেনেগাল	২০ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬১	সিঙ্গাপুর	১৮-২১ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ, এবং সৈনিকদের জন্য ৪০ বছর (অফিসারদের জন্য ৫০ বছর) বয়স পর্যন্ত রিজার্ভের থাকার বিধান
৬২	স্লোভাকিয়া	বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ)

ক্রমিক নং	দেশ	সারণি ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরন
৬৩	সোমালিয়া	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের এবং ১৮-৩০ বছর বয়সী মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ)
৬৪	দক্ষিণ কোরিয়া	১৮-২৮ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮-২২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬৫	স্পেন	১৯-২৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিধান (প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ)
৬৬	সুদান	১৮-৩৩ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬৭	সুইডেন	১৮ বছর বয়সী পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ৭.৫-১৫ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ; ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত রিজার্ভে অন্তর্ভুক্তি
৬৮	সুইটজারল্যান্ড	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪৫ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ
৬৯	সিরিয়া	১৮-৪২ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭০	তাইওয়ান	১৮-৩৬ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সর্বাধিক ৪ বার প্রতি বার ২০ দিনের জন্য পুনরায় আহ্বান (রিকল)
৭১	তাজিকিস্তান	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭২	তানজানিয়া	২৪ মাসের জন্য সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিধান
৭৩	থাইল্যান্ড	২১ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (লটারির মাধ্যমে বাছাইকৃত)
৭৪	তিমোর-লিস্টে	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১৮ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৭৫	তিউনিসিয়া	২০-৩৫ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৬	তুরস্ক	২০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ৬-১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৭	তুর্কমেনিস্তান	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪-৩০ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৭৮	ইউক্রেন	২০-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশ	সারণি ৯.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ধরন
৭৯	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৮-৩০ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১৬-২৪ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৮০	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি; ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা পুনর্বহালের সুযোগ;
৮১	উরুগুয়ে	বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি পুনর্বহালের সুযোগ
৮২	উজবেকিস্তান	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ
৮৩	ভেনেজুয়েলা	১৮-৫০ বছর বয়সী নাগরিকদের জন্য ১২ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের বিধান
৮৪	ভিয়েতনাম	১৮-২৭ বছর বয়সী পুরুষদের জন্য ২৪-৩৫ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ (মহিলাদের জন্য ঐচ্ছিক)

সূত্র: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-mandatory-military service

এই সারণি থেকে যেসব বিষয় বেরিয়ে আসে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ। প্রথমত, উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশেই এই ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। বস্তুত অনুপাত হিসেবে উন্নত দেশসমূহেই এই ব্যবস্থার প্রচলন বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেসব ওইসিডিভুক্তদেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে তার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রিস, ইসরায়েল, লিথুনিয়া, মেক্সিকো, নরওয়ে, পর্তুগাল, চেকোস্লোভাকিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র (বর্তমানে স্থগিত)। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সবকয়টি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ – ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ড – সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের নীতি অনুসরণ করছে। দ্বিতীয়ত, সারণি ৯.১ থেকে আরও দেখা যায়, সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপ দেশভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেসব প্রশ্নে এই ব্যবস্থার ভিন্নতা হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে:

(ক) প্রশিক্ষণের শুরুর এবং শেষের বয়স;

(খ) প্রশিক্ষণের সময়কাল;

(গ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরও পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা;

(ঘ) নারীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের প্রযোজ্যতা;

(ঙ) প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ;

(চ) প্রশিক্ষণের পর "রিজার্ভিস্ট" হিসেবে থাকার আবশ্যকতা;

(ছ) প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (*কনস্ক্রিপশান*) সম্পর্ক।

এসব প্রশ্নে কোন দেশ কী ধরনের উত্তর বেছে নিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সারণি ৯.১ এর ৩ নং কলামে দেওয়া আছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে বাংলাদেশের জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপ কী হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনার সময় এই সারণিতে প্রদত্ত তথ্যের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিবো।

৯.৩ বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা

অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জন্য সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা দুটোই বেশি। নিচে তার কিছু দিকের কথা উল্লেখ করা হলো।

৯.৩.১ *তরুণদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি*

সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের তরুণদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তাদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলাবোধ, কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধসহ জাতিগঠনের জন্য সহায়ক অন্যান্য গুণাবলি বিস্তৃত করবে। এক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবোধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকেই বলে থাকেন, জাতি হিসেবে আমাদের অন্যতম ঘাটতি হলো শৃংখলাবোধের অভাব। কেউ কেউ একটা ভূ-প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের নদনদী যেমন (বিশেষত বর্ষাকালে) শৃঙ্খলা মানতে চায় না, তেমনি এদেশের মানুষও শৃঙ্খলা মানে না। কিন্তু শিল্প-ভিত্তিক উৎপাদনে সাফল্যের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন হয় এবং যুদ্ধে জেতার জন্যও শৃঙ্খলাপূর্ণ যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সেজন্য শৃঙ্খলাবোধের উন্নতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে এবং সে লক্ষ্যে শিল্পায়ন সহায়ক হচ্ছে। তবে আরও অগ্রগতি প্রয়োজন। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা এক্ষেত্রে প্রভূত সহায়ক হবে। এই প্রশিক্ষণকালে তরুণদের মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধের জন্ম হবে তা আশা করা যায় পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকবে এবং তাদের মাধ্যমে গোটা সমাজেও তা বিস্তৃত হবে। সততা, কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, যৌথভাবে কাজ করার অভ্যাস ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য এ কথা প্রযোজ্য।

৯.৩.২ *সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি*

সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ফল হবে দেশের সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি। মুক্তিযুদ্ধ যেমন ধনী-দরিদ্র এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল তরুণকে একত্রিত করেছিল তেমনি সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা সমাজের সকল অংশের তরুণদের একই ছাউনিতে সমবেত করবে, ধন-সম্পদের ব্যবধান থেকে দূরে একটা সম-অবস্থানে থেকে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত করবে এবং জাতীয় লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মনোভাব গড়ে তুলবে। কায়িক ও মানসিক উভয় ধরনের শ্রমে অভ্যস্ত ও আগ্রহী তরুণেরা একই ছাউনিতে বসবাস করে প্রশিক্ষণে অংশ নিবে এবং এই প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে সমগ্র যুবসমাজের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে যখন তারা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাবে তখনও সমাজের সকল অংশের সাথে বন্ধন, বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার অনুভূতি এবং কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অব্যাহত থাকবে এবং তা বৃহত্তর সমাজের সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৯.৩.৩ *সামরিক বাহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্ক বৃদ্ধি*

সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে দেশের জনগণের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবে। এই অনুচ্ছেদের আলোচনার শুরুতেই আমরা লক্ষ করেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের ছাত্র-যুবকেরা বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে। তাদের অনেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে এসব রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্তও হয়েছে। যেসব গেরিলা বাহিনীতে তাঁরা যোগ দিয়েছে সেগুলিও বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যুদ্ধ করেছে। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের সনাতনী সামরিক বাহিনী তথা বিভিন্ন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্রিগেডের সাথে জনগণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহ দেশের জন্য অনেক ভালো কাজ করছে। দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়াও তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে সাফল্যের সাথে কাজ করার মাধ্যমে একদিকে দেশের সুনাম অর্জন করছেন, অন্যদিকে দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছেন। দেশের ভেতরে তাঁরা বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়ে দেশের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিভিন্ন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করছেন। তবে এটা ঠিক যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর সাথে জনগণের যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখন ততটা নেই। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন সামরিক বাহিনীর সাথে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। সামরিক বাহিনী যেমন নিজেকে আরও প্রখরভাবে জনগণের অংশ হিসেবে অনুভব করবে তেমনি জনগণও সামরিক বাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বোধ করবে।

৯.৩.৪ তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ভাগীদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ভাগীদার হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা তাদেরকে সে সুযোগ করে দিবে। এই শিক্ষা গ্রহণকালে তরুণরা বুঝতে পারবে মুক্তিযোদ্ধারা কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই প্রক্রিয়া ছিল অনেক বেশি কঠিন। তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে নিজেদের জীবনের পাশাপাশি দেশে ফেলে আসা পরিবারের সদস্যদের জীবনের অনিশ্চয়তা। সে তুলনায় আজকের দিনের তরুণদের সামরিক শিক্ষা হবে অনেক আরামদায়ক ও অনিশ্চয়তাবিহীন। কিন্তু তা সত্তেও সামরিক ছাউনিতে জীবনযাপন এবং সামরিক শিক্ষার প্রক্রিয়া তাদের প্রত্যেককে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কল্পনা করতে সহায়তা করবে এবং তা যেমন তাদের নিজেদের জন্য তেমনি জাতির জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ কোনোদিন হারিয়ে যাবে না বরং প্রজন্মান্তরে তা বহমান থাকবে।

৯.৩.৫ জাতি হিসেবে যোদ্ধা গুণের সংযোজন

বুদ্ধিমান হিসেবে বাঙালির খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। এর সাথে যোদ্ধা গুণ যোগ হলে বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যোদ্ধা জাতি হিসেবে বাঙালি জাতির যে আবির্ভাব ঘটেছিল সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা সেটাকে একটি স্থায়ী চরিত্র দিবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিরা প্রমাণ করেছে যে তাঁরা প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে জানে। সাধারণভাবে বাঙালি জাতিকে খুব একটা সামরিক গুণসম্পন্ন জাতি বলে ভাবা হতো না। এর কিছু ঐতিহাসিক কারণ ছিল। সুবিদিত, আর্য আগমনের পর এ অঞ্চলের আদি অনার্য জনগোষ্ঠীর সাথে

মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই উপমহাদেশে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা চার বর্ণে বিভক্ত ছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এরমধ্যে ক্ষত্রিয়রা ছিল যোদ্ধা। এই চার বর্ণে বিভক্ত সমাজের উৎপত্তি ঘটে মূলত পশ্চিম ও উত্তর ভারতবর্ষে। আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সমাজ যখন এবং যেভাবে বঙ্গীয় বদ্বীপে বিস্তৃত হয় তখন এখানকার সমাজে ক্ষত্রিয় বর্ণের তেমন কোনো উপস্থিতি ছিল না এমনকি নতুন করে উদ্ভবও ঘটেনি। ফলে যোদ্ধা বলে আলাদা কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠী বাংলার সমাজে ছিল না। পাল এবং সেন আমলেও বাংলার সমাজে যোদ্ধার অন্তর্ভুক্তি সীমাবদ্ধই থেকে যায়। পরবর্তীতে মুসলিম বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় তুর্কি, পারসিক, আফগানি প্রভৃতি সূত্রের যোদ্ধাদের কিছু বসতি গড়ে ওঠে এবং বাংলার বারো ভূঁইয়ার আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে ঈশা খানের হাতে মোগল সেনাপতি মান সিংহের পরাজয় বাংলার সমাজের মধ্যে সামরিক গুণাবলীর প্রসারের সাক্ষ্য দেয়। সুলতানা রাজিয়ার বীরত্ব গাথাও এর আরেক প্রমাণ। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাও এরূপ আরেক সাক্ষ্য। পরবর্তীতে অগ্নিযুগের বিপ্লবী কার্যক্রম এবং মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণের মধ্যেও বাংলার সমাজের মধ্যে সামরিক গুণের বিকাশের উদাহরণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে বাঙালি জাতিকে একটি অসামরিক জাতি বলেই ভাবা হতো। মুক্তিযুদ্ধই এই ধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়। মুক্তিযুদ্ধ দেখায় যে, বাঙালি সমাজের কোনো একটি বিশেষ স্তর বা অংশ নয়, গোটা সমাজই অস্ত্রধারনে সক্ষম। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট এই ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা উপকারী হবে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন কারণেই বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা বিশেষভাবে উপযোগী হবে। দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করায় তা প্রভূত সহায়ক হবে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর আমরা এখন বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট রূপ কী হতে পারে সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি।

৯.৪ বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সম্ভাব্য সুনির্দিষ্ট রূপ

বাংলাদেশ সামরিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট রূপের আলোচনার জন্য আমরা উপ-অনুচ্ছেদ ৯.৩-এ তালিকাভুক্ত প্রশ্নসমূহ ব্যবহার করতে পারি।

৯.৪.১ প্রশিক্ষণের শুরুর এবং শেষ বয়স

সারণি ৯.১ এর তৃতীয় স্তম্ভ দেখায় যে, প্রশিক্ষণের শুরুর এবং শেষের বয়সের বিষয়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন উদাহরণ দেখা যায়। তবে শুরুর বয়স বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১৮ বলে লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো দেশে তা ১৭ আবার কোনো কোনো দেশে তা ১৯ কিংবা ২০ বলেও দেখা যায়। বেশিরভাগ দেশের উদাহরণ অনুসরণে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের শুরুর বয়স ১৮ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সময় বেশিরভাগ তরুণ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে – তা উচ্চ শিক্ষা কিংবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ যাই হোক না কেন – যাওয়ার আগে সামরিক প্রশিক্ষণের পর্বটি সমাপ্ত করার উত্তম সময় হবে। প্রশিক্ষণের শেষের বয়সের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৈচিত্র্য আরও বেশি। শেষের বয়স দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হলো শুরুর বয়স আর অন্যটি হলো প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল। যেমন যদি শুরুর বয়স ১৮ হয় এবং প্রশিক্ষণ ১২ মাসের হয় তবে সকলের জন্য শেষের বয়স হবে ১৯। তবে অনেক দেশ এ বিষয়ে কড়াকড়ি নিয়ম আরোপ না করে একটা দীর্ঘতর সময়কাল নির্ধারণ করে দেয় যার মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে কিছুটা নমনীয়তা থাকে এবং তরুণেরা তাদের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ঠিক কখন সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশিক্ষণ শেষের বয়সসীমা ২২ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে পরিলক্ষিত হয়। তবে বেশিরভাগ দেশে এই সীমা ২২ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশেও তা ৩০ বছর করা যেতে পারে যাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে বয়সের তারতম্য কম হয় এবং প্রশিক্ষণের সুফল দীর্ঘায়িত হয়।

৯.৪.২ প্রশিক্ষণের মেয়াদ/সময়কাল

সামরিক প্রশিক্ষণের সময়কালের দৃষ্টিকোণ থেকেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হলো ৪ মাস (ডেনমার্ক) এবং সর্বোচ্চ হলো ১০ বছর (উত্তর কোরিয়া)। তবে বেশিরভাগ দেশে এটা ১২ মাস থেকে ২৪ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে এটাকে ৯ মাস করা যেতে পারে। প্রথমত, এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের সাথে সংগতিপূর্ণ। সে সময় আমাদের তরুণেরা ৯ মাস ঘরছাড়া ছিল। তেমনিভাবে এখনকার প্রজন্মের তরুণেরাও সামরিক প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে নয় মাসের জন্য সামরিক ছাউনির প্রতি রওয়ানা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, তরুণদের মধ্যে যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশে (ব্যাচেলর এবং মাস্টার ডিগ্রী) ইচ্ছুক তাদের জন্য এটা সুবিধাজনক হবে কারণ তারা ৯ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে ৩ মাস বিশ্রাম নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে।

৯.৪.৩ নারীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের প্রযোজ্যতা

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো সামরিক প্রশিক্ষণ নারীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে কিনা। সারণি ৯.১ তে দেখা যায়, অনেক দেশে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ নারীদের জন্যও প্রযোজ্য। বিশেষত আফ্রিকার বহুদেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিছু দেশ নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রযোজ্য করছে তবে তা নার্সিং ও সেবামূলক তৎপরতার জন্য সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিছু দেশে নারীদের জন্য এই প্রশিক্ষণ ঐচ্ছিক। সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনীতে নারীরা আশির দশক থেকেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এখন সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ইত্যাদি বিভিন্ন বাহিনীতে নারীরা সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করছেন। সে বিবেচনায় তাদের অনেকে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণে আগ্রহী হতে পারেন এবং এই কর্মসূচি থেকে তাদের বাদ রাখাকে নারীপুরুষের সমানাধিকারের লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করতে পারেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সূচনালগ্নে বাংলাদেশের জন্য সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ শুধু পুরুষদের দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। তবে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বেচ্ছাভিত্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা যেতে পারে এবং নারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ধরনে কিছুটা ভিন্নতা রাখা যেতে পারে। কিছুসময় ধরে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হওয়ার পর ভবিষ্যতে এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.৪.৪ প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ

সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা অনুসারী দেশসমূহের মধ্যে বেশিরভাগই এ ব্যাপারে শারীরিক যোগ্যতার অভাব ছাড়া অন্য কোনো ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখে না (সারণি ৯.১ দ্রষ্টব্য)। তবে কিছু দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। দ্রুত একটি দেশে অর্থপ্রদানের বিনিময়ে সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতির সুযোগের নজির দেখতে পাওয়া যায়। শারীরিক যোগ্যতার অভাব ছাড়া অন্য কোনো কারণে

অব্যাহতির সুযোগ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার মূল স্পৃহাকে বিনষ্ট করে। বিশেষত অর্থ দ্বারা এই শিক্ষা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিধান বিশেষভাবে গর্হিত। সেজন্য সামরিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বা সময়কাল কম রেখে সার্বজনীনতা বহাল রাখার চেষ্টাই শ্রেয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে এই সময়কাল অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদে (৯ মাসে) সীমাবদ্ধ রেখে স্বাস্থ্যগত ছাড়া অন্যান্য কারণে অব্যাহতি লাভের সুযোগ কম রাখাই শ্রেয় হবে।

৯.৪.৫ প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ

কিছু কিছু দেশ প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরবর্তী সময়ে এই প্রশিক্ষণ নবায়নের জন্য একাধিকবার "পুনরায় ডাকা" (রিকল)-এর বিধান রাখে (সারণি ৯.১ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশের জন্যও পুনরায় ডাকার বিধান থাকবে কিনা তা একটি আলোচনার বিষয়। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার কর্মসূচির বাস্তবায়ন এমনিতেই একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় হবে। সুতরাং তার সাথে পুনরায় ডাকার বিধান রাখা হলে এই চ্যালেঞ্জ অনতিক্রম্য হয়ে যেতে পারে। সেজন্য সূচনালগ্নে পুনরায় ডাকার বিধান না রাখাই শ্রেয় হবে। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণের সামর্থ্য বৃদ্ধি পেলে এবং জনসংখ্যার আকার হ্রাস পেলে এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.৪.৬ সার্বজনীন প্রশিক্ষণের পর "রিজার্ভিস্ট" হিসেবে থাকার আবশ্যকতা

কোনো কোনো দেশে সামরিক প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষিত তরুণদের একটা বয়স পর্যন্ত সেনাবাহিনীর "রিজার্ভিস্ট" তালিকায় রাখা হয়, যাতে প্রয়োজনবোধে এই তালিকা থেকে কল-আপ করে তাদেরকে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে এই বিধান সার্বজনীন না হয়ে ঐচ্ছিকও হতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনেক দেশে যারা রিজার্ভিস্ট হতে রাজী হয় তাদেরকে প্রণোদনা হিসেবে মাসিক একটা ভাতা এবং অন্যান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা (যেমন সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ) দেওয়া হয়। এসব প্রণোদনার কারণে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি রিজার্ভিস্ট হতে আগ্রহী হয়। বাংলাদেশে রিজার্ভিস্টের প্রয়োজন আছে কিনা তা দেশের স্থায়ী সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশের মোট প্রয়োজনের আলোকে ভেবে দেখতে হবে। সে অনুযায়ী রিজার্ভিস্ট হওয়া ঐচ্ছিক নাকি সার্বজনীন হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

৯.৪.৭ সার্বজনীন প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (কনস্ক্রিপশান) সম্পর্ক

অনেক দেশে যুদ্ধবিগ্রহের পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি তথা কনস্ক্রিপশান-এর আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল এবং তা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার সাথে কন্সক্রিপশানের সংঘাত নেই। যদি যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয় তাহলে প্রয়োজনে কন্সক্রিপশানের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তবে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা বরং এই ব্যবস্থাকে সুগম করবে কারণ যাদেরকে এই পদ্ধতিতে রিক্রুট করা হবে তারা ইতিপূর্বেই সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত হবে। ফলে তারা স্বল্প কিংবা নতুন প্রশিক্ষণ ছাড়াই কর্তব্য পালনের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে। কনস্ক্রিপশান হলো রিজার্ভিস্ট পদ্ধতির একটি বিকল্প। রিজার্ভিস্ট ব্যবস্থা চালু থাকলে কনস্ক্রিপশানের প্রয়োজনীয়তা কম হতে পারে। তবে রিজার্ভস্ট ও কন্সক্রিপশান উভয় পদ্ধতির জন্যই সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রয়োজনীয় ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

৯.৫ বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য ইস্যু

উপরে আমরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এগুলোকে প্রাথমিক প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাংলাদেশে এই ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ধারণের ভার মূলত সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের নিকট অর্পণ করতে হবে। এ বিষয়ে তাদেরই তথ্য এবং জ্ঞান বেশি। কাজেই তারা এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং জনগণের নিকট আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত করতে পারবেন। তবে এই আলোচনার সূত্রপাতের জন্য নিম্নরূপ আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হলো এই প্রশিক্ষণের লজিস্টিকস সংক্রান্ত, অর্থাৎ কোথায়, কীভাবে, কাদের দ্বারা এই প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হবে। দ্বিতীয় হলো অর্থায়ন সংক্রান্ত। তৃতীয় হলো বাংলাদেশের বর্তমান আনসার- ভিডিপি বাহিনীর সাথে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক সংক্রান্ত।

৯.৫.১ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার অর্থায়ন

অর্থায়ন ও লজিস্টিকের বিষয়ে প্রথমেই সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের অধীনে প্রতি বছর কত সংখ্যক তরুণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া দরকার। চিত্র ৯.১-এ ২০২০ সালের জন্য বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড তুলে ধরা হলো। এই পিরামিড দেখায় যে, ২০২০ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সীদের সংখ্যা ছিল ৭৫ লাখ। ধরা যাক, ১৫-১৯ বয়স গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের সংখ্যা সমান ছিল। সেক্ষেত্রে ১৮ বছর বয়সীদের সংখ্যা হবে ১৫ লাখ। ধরা যাক, নারী-পুরুষ অনুপাত সমান। সেক্ষেত্রে ২০২০ সালে ১৮ বছর বয়সী পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৭.৫ লাখ। তারমধ্যে স্বাস্থ্যগত কারণ, বিদেশ অবস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ধরা যাক ০.৫ লাখ এই কর্মসূচির অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সেক্ষেত্রে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৭ লাখ। যদি ৯ মাসের আহার, বাসস্থান, ইউনিফর্ম, অস্ত্রপাতির গোলাবারুদ ইত্যাদির জন্য জনপ্রতি ১ লাখ টাকা প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে মোট প্রয়োজন হবে ৭,০০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের এখন বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ প্রায় ৫ লাখ কোটি টাকা। সুতরাং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ৭,০০০ কোটি টাকা মোট বাজেটের ১.৪ শতাংশ। এটা দেখায় যে, সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অর্থায়ন বড় সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এজন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ অর্থ সামরিক খাতকে দেওয়া সম্ভব।

চিত্র ৯.১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড, ২০২০

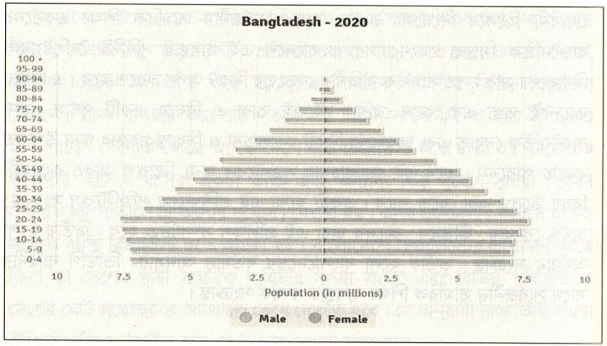

সূত্র: https://www.livepopulation.com/country/bangladesh.html

৯.৫.২ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার লজিস্টিকস

অর্থায়ন সম্ভব হলেও এত বিরাট সংখ্যক যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার মতো ভৌত সক্ষমতার সৃষ্টি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ হবে, অন্তত স্বল্পমেয়াদে। সাম্প্রতিক তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা ৩০টি।[৮৪] এগুলির আকৃতি এক নয়; কোনোটি বড় আবার কোনোটি ছোট। তবে গড়ে প্রতি ক্যান্টনমেন্টের উপর ২৩,০০০ যুবককে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হবে। প্রশ্ন হলো, এটা করার মতো ভৌত সামর্থ্য ক্যান্টনমেন্টসমূহের আছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য সামরিক বাহিনীই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং তারাই এর উত্তর দিতে সক্ষম। এই বিরাট সংখ্যক যুবকদের থাকা, খাওয়া এবং প্রশিক্ষণ লাভের ভৌত সক্ষমতা যদি না থাকে তবে তা গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, বাংলাদেশের ক্যান্টনমেন্টসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করে নির্মিত হয়েছে। ফলে এগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনে ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাইরেও সম্ভাবনা অনুযায়ী এ ধরনের ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে। বিজিবি, পুলিশসহ অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনী এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে কিনা তাও অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। জমি-স্বল্প বাংলাদেশে বিদ্যমান সুযোগ সমূহের সর্বাধিক ব্যবহারই শ্রেয় হবে যাতে জমির সাশ্রয় হয়। যদি সূচনাতে সামরিক শিক্ষায় সকল যোগ্য তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভৌত কাঠামো না থাকে এবং তা গড়ে তোলার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় তাহলে এই কর্মসূচি সূচনায় সীমিত আকারে প্রবর্তন করা যেতে পারে। যেমন যদি মূল্যায়ন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সূচনাতে সর্বমোট ১ লাখ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে ৭ লাখ উপযুক্ত তরুণের মধ্য থেকে ১ লাখকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গড়ে প্রতি ক্যান্টনমেন্টের উপর ৩,৩৩৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পড়বে। এ নির্বাচন লটারির মাধ্যমে করা যেতে পারে, যাতে ধনী-দরিদ্র

[৮৪] এগুলি হলো: (১) আলিকদম; (২) বান্দরবন; (৩) বগুড়া; (৪) চট্টগ্রাম; (৫) কুমিল্লা; (৬) ঢাকা; (৭) দীঘিনালা; (৮) মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ; (৯) হালিশহর; (১০) জাহানাবাদ, (১১) জাহাঙ্গীরাবাদ; (১২) জালালাবাদ; (১৩) যমুনা; (১৪) যশোর; (১৫) কাপ্তাই; (১৬) খাগড়াছড়ি; (১৭) খোলাহাতি (কালিহাতি?); (১৮) মিরপুর; (১৯) ময়মনসিংহ (২০) কাদিরাবাদ; (২১) রাজেন্দ্রপুর; (২২) রাজশাহী; (২৩) রামু; (২৪) রাঙ্গামাটি; (২৫) রংপুর; (২৬) সৈয়দপুর; (২৭) সাভার; (২৮) শহীদ সালাউদ্দিন; (২৯) শেখ হাসিনা; (৩০) শেখ রাসেল। সূত্র: https://en.wikipedia.org/wiki/Category: Cantonments_of_Bang

নির্বিশেষে সকলের এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। পরবর্তীতে ভৌত সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে এই নির্বাচিত তরুণদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি উপায় হলো সূচনায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ/সময়কাল প্রস্তাবিত ৯ মাসের পরিবর্তে ৩ মাসে সংক্ষিপ্ত করা যাতে এক বছরে ৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ করতে হয়, যার প্রতিটির সংখ্যা হবে ১,৭৫,০০০ জন, অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট প্রতি ৫,৮৩৩ জন। এতে অবশ্য শিক্ষা বছরের সাথে একটা অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হবে তবে সেটা কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে লটারির মাধ্যমে কমসংখ্যক তরুণকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করাই শ্রেয় হতে পারে। তবে দ্রুতই ভৌত সক্ষমতা বাড়িয়ে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে যাতে এ বিষয়ে কোনো বৈষম্য স্থায়ী চরিত্র গ্রহণ না করে।

৯.৫.৩ সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর ভূমিকা

স্বল্প সময়ের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের একটি ব্যবস্থা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে চালু আছে। সেটা হলো আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি, সংক্ষেপে ভিডিপি)। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর তাদেরকে একটি রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে রাখা হয় এবং প্রয়োজনবোধে তাদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়। এসব কাজ প্রায়শ স্বল্পকালীন হয়, যেমন নির্বাচনের সময় বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের পাহারা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করা। বর্তমানের আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণের সাথে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য হবে। তার মধ্যে মূল হলো "ঐচ্ছিক" বনাম "সার্বজনীনতা"। ঐচ্ছিকদের মধ্য থেকে সীমিত সংখ্যককে আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণত তুলনামূলকভাবে নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে যুবকেরাই এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। বিপরীতে, সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা হলো ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকলের জন্য। সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করা এই প্রশিক্ষণের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো প্রশিক্ষণের মেয়াদ বা সময়কাল বিষয়ে। আন্তর্জাতিক উদাহরণের অনুসরণে, আনসার-ভিডিপির বর্তমান প্রশিক্ষণ সময়কালের চেয়ে, সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের সময়কাল বেশি হতে পারে।

সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হলে পৃথক করে আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে না। তবে আনসার-ভিডিপি বাহিনী অব্যাহত থাকতে পারে এবং সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে আগ্রহীরা এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে এই বাহিনীর বিভিন্ন কর্তব্য পালনে নিয়োজিত হতে পারে। ফলে সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা এবং আনসার-ভিডিপি বাহিনী পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৯.৬ উপসংহার

সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের প্রবর্তন আগামীর বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ করণীয় হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য নতুন হলেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং অনুপাত হিসেবে উন্নত দেশসমূহের মধ্যে এই ব্যবস্থার প্রচলন আরও বেশি। বাংলাদেশের জন্য এই ব্যবস্থার বিশেষ উপযোগিতা আছে। তার মধ্যে রয়েছে: (ক) তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ভাগীদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ; (খ) তরুণদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি; (গ) জাতি হিসেবে বুদ্ধিমানের পাশাপাশি যোদ্ধা গুণের সংযোজন; (ঘ) সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি; (ঙ) সকল যুবদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি; এবং (ঙ) সামরিক বাহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্ক বৃদ্ধি। এসব প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রয়োজন হবে এই কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট রূপের প্রণয়ন। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে: (ক) সামরিক প্রশিক্ষণের শুরুর এবং শেষের বয়স; (খ) প্রশিক্ষণের মেয়াদ বা সময়কাল; (গ) নারীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের প্রযোজ্যতা; (ঘ) প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ; (ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ; (ছ) প্রশিক্ষণের পর রিজার্ভিস্ট হিসেবে থাকার আবশ্যকতা; এবং (ছ) সার্বজনীন প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (কনস্ক্রিপশান) সম্পর্ক। এসব প্রতিটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ আছে। তবে বাংলাদেশের নিজস্ব পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রবর্তনের আগে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও ভৌত সক্ষমতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নয় মাস স্থায়িত্বকালের সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাংলাদেশের মোট বাজেটের ১.৫ শতাংশের বেশি হবে না। সুতরাং এটা আয়ত্তের অধীন বলেই প্রতিভাত হয়। তবে ৭ লাখ উপযুক্ত যুবককে দেশের ৩০টি ক্যান্টনমেন্টে রেখে প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রতি ক্যান্টনমেন্টের উপর ২৩,৩৩৩ যুবকের ভার পড়বে। সকল ক্যান্টনমেন্ট এত সংখ্যক যুবকের ভার নিতে সক্ষম না হলে সূচনাতে এই সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। যেমন লটারির মাধ্যমে প্রতি ৭ জনের মধ্যে একজনকে বাছাই করা যেতে পারে। তাতে এই সংখ্যা ৩,৩৩৩-এ হ্রাস পাবে। অথবা প্রশিক্ষণকাল ৯ মাসের পরিবর্তে সূচনাতে ৩ মাস করা যেতে পারে এবং বছরে ৪টি ব্যাচের মাধ্যমে ৭ লাখ যুবকের সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গড়ে একেক ক্যান্টনমেন্টকে প্রতি ব্যাচে ৫,৮৩৩ জন যুবকের দায়িত্ব নিতে হবে। প্রয়োজনীয় ভৌত সক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে বেশি সংখ্যক যুবকের জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে পারবে। রাজনৈতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব এসব বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্পৃহাকে জাগরূক রাখবে; দেশের জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব দৃঢ় করবে; নিজেকে প্রয়োজনবোধে যোদ্ধা হিসেবে ভাবতে প্রস্তুত করবে; তাদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলাবোধের বিস্তৃতি ঘটাবে। ধনী-দরিদ্র, সমাজের সকল স্তর ও অংশ থেকে আগত যুবকদের একই ছাউনিতে থেকে, সমতার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পাবে। সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ হবে সমাজের "মহা-সমতাসাধনকারী কর্মসূচি" (*গ্রেট ইক্যুয়ালাইজার* বা *গ্রেট লেভেলার*)। সর্বোপরি, জনগণের সাথে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ এবং সামরিক বাহিনী একে অপরের কাছাকাছি এসেছিল। সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের ফলে সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যেমন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে তেমনি স্থায়ী চরিত্র গ্রহণ করবে।

১০। জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি

আগামী বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা এবং নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ। ক্ষুদ্র ভৌগোলিক আয়তন এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। তবে খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্ভর করে সম্পদ অনুসন্ধানের পরিধি ও মাত্রার উপর। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত, উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে আরও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে, এবং স্থলভাগ (*অন-শোর*) ও জলভাগ (*অফ শোর*) উভয়ের জন্যই তা প্রযোজ্য। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের সাম্প্রতিক মীমাংসার ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের "নিজস্ব অর্থনৈতিক এলাকার" (এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন) আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সম্পদের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি উর্বর মাটি এবং বিশাল জলপ্রবাহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানও একটি সম্পদ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গমস্থলে বঙ্গোপসাগরের চূড়ায় দীর্ঘ সমুদ্ররেখা সম্পন্ন ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এসব সম্পদের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবহার আগামী বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার সাথে বৈদেশিক নীতির বিষয়টি সম্পর্কিত। বিশ্বায়নের যুগে বৈদেশিক নীতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে যাওয়ার কারণে পরিস্থিতি আগের চেয়ে জটিল হয়েছে। বাংলাদেশকে একদিকে ভারত ও চীনের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত পশ্চিমা (পাশ্চাত্য) জোটের সাথে চীন-রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব (প্রাচ্য) জোটের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবহার করে আগামী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। এই অনুচ্ছেদে আমরা এই করণীয় নিয়ে আলোচনা করবো।

১০.১ বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদগত পরিস্থিতি

সাধারণভাবে জাতীয় সম্পদের মধ্যে দুটি ভাগ চিহ্নিত করা যায়। একটি হল মানব সম্পদ আর অন্যটি হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। একটি হলো খনিজ সম্পদ। প্রথমেই আমরা এ বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

পলিস্তর দ্বারা গঠিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের ভূতলে গ্যাস ও তেল পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। বস্তুত পাকিস্তান আমলেই বেশকিছু গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় এবং গ্যাস উত্তোলন ও তার ব্যবহার শুরু হয়। প্রথমাবস্থায় এই ব্যবহার শিল্পে সীমাবদ্ধ থাকে (যেমন, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা)। সেসময় গ্যাসের মোট মজুদ ২২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট বলে অনুমিত হতো। সিলেটের এসব গ্যাসক্ষেত্র শেল কোম্পানির মালিকানায় ছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার শেল কোম্পানির কাছ থেকে এসব গ্যাসক্ষেত্র কিনে নেয় এবং দেশের তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যবহার গণখাতে ন্যস্ত করে এবং সে উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা গঠন করে। পেট্রোবাংলার অধীনে অনুসন্ধান তৎপরতা জোরদার করা হয় এবং এর ফলে আরও অনেকগুলি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এ সময় গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য গ্যাস সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে উদ্দেশ্যে ঢাকাসহ কতিপয় শহরে পাইপভিত্তিক গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাসের অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সেসময়ই অনুভূত হয় এবং সে উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ১২টি ব্লকে ভাগ করা হয় এবং অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে *প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট* (*পিএসসি*) তৈরি করা হয়। বেশ কিছু বিদেশী কোম্পানি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং সে ধারাতে পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে কেয়ার্ন কোম্পানি কর্তৃক সাংগু গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত ও বিকশিত হয়। তবে বঙ্গবন্ধুর আমল পর্যন্ত স্থলভাগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ মূলত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পেট্রোবাংলার উপরই ন্যস্ত ছিল।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং তাঁর সরকার উৎখাতের পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং বৈদেশিক নীতির অভিমুখীনতার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তা দেশের খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত নীতিকেও প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রীয় খাতের ভূমিকা হ্রাস করে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুযায়ী স্থলভাগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনও বিদেশী কোম্পানির নিকট উন্মুক্ত করা হয়। সে ধারাতেই শেভরন কোম্পানি কর্তৃক বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত ও বিকশিত হয়।

দেশের তেল-গ্যাস ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানির অংশগ্রহণ জাতীয় সম্পদের সুরক্ষার সাথে বৈদেশিক নীতির সম্পর্ককে সামনে নিয়ে আসে। তার একটি প্রতিফলন দেখা যায় বিবিয়ানার গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত বিতর্কে। শেভরন কোম্পানি এই গ্যাস

ভারতে রপ্তানির প্রস্তাব করে এবং সে উদ্দেশ্যে পাইপলাইন নির্মাণের প্রস্তাবও করে। বলা বাহুল্য, এর মাধ্যমে শেভরন দ্রুতহারে গ্যাস উত্তোলন ও বিক্রয় করে সত্বর তার বিনিয়োগের প্রতিদান (*রিটার্ন*) তথা মুনাফা অর্জন করতে চেয়েছিল। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল শেভরনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তাঁরা লক্ষ করেন যে, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের নিজেরই বিবিয়ানা গ্যাসের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানি করা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে তেল, গ্যাস, বন্দর, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জাতীয় সম্পদ রক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ঘোষণা দেয় যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পঞ্চাশ বছরের গ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করেই কেবল রপ্তানির কথা ভাবা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিএনপি রপ্তানি নাকচ করার সমার্থক এরূপ কোনো ঘোষণা দেয় না। এসময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সাথেই সাক্ষাৎ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি গ্যাস রপ্তানি সংক্রান্ত শেভরনের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উভয় দলের নেতৃত্বকে চাপ দেন।[৮৫] বিবিয়ানা গ্যাস সংক্রান্ত উপর্যুক্ত ঘটনাবলির মধ্যে জাতীয় সম্পদের সুরক্ষার সাথে বৈদেশিক নীতির জড়িত হয়ে যাওয়ার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ঠিক একই ধরনের না হলেও জাতীয় সম্পদ সংক্রান্ত নীতির সাথে বৈদেশিক নীতির সম্পর্ক দেখা যায় জাপানি মারুবেণী কোম্পানির মালিকানাসম্পন্ন কাফকো কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানিকে (*কাফকো*) প্রদত্ত বিশেষ সুবিধার মধ্যেও। এই সুবিধার অধীনে কাফকো সস্তায় বাংলাদেশের গ্যাস পাচ্ছে, যা ব্যবহার করে সার উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ধারণা করা যেতে পারে যে, জাপানি কোম্পানিকে এ ধরনের বিশেষ সুবিধা প্রদান জাপান সরকারের সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়।

তেল ও গ্যাস বিষয়ে বিদেশী কোম্পানি এবং সেই সূত্রে বৈদেশিক নীতির সংশ্লিষ্টতা লক্ষ করা যায় বিভিন্ন দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ আদায়ের

[৮৫] আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, বিল ক্লিনটনের সাথে আলোচনায় আওয়ামী লীগ গ্যাস রপ্তানির বিরোধিতা করে, পক্ষান্তরে বিএনপি রপ্তানির প্রস্তাবের প্রতি সম্মতি প্রদান করে। আওয়ামী লীগের মতে, বিবিয়ানার গ্যাস রপ্তানিতে রাজি না হওয়ার কারণে মার্কিন সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলে ২০০১ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়।

প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও। মাগুরছড়া, টেংরাটিলা ইত্যাদি দুর্ঘটনার তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ কতটা সক্রিয় ও জোরালো হবে সেটাও বৈদেশিক নীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

১০.১.২ *খনিজ সম্পদ: কয়লা*

সুবিদিত, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে কিছু কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে বড় পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি এবং জামালগঞ্জের কথা উল্লেখ্য। জোরালো অনুসন্ধানের ফলে হয়তো আরও কয়লার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কয়লার ক্ষেত্রেও বিদেশী কোম্পানির অংশগ্রহণ এবং সেইসূত্রে বৈদেশিক নীতির সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন দেখা যায়। জামালগঞ্জে কয়লার গভীরতা বেশি। সে কারণে এই কয়লা উত্তোলনের জন্য এখন পর্যন্ত লাভজনক প্রযুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বড় পুকুরিয়াতে অবস্থিত কয়লা উত্তোলনের জন্য সেখানে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চীনা কোম্পানির সহযোগিতায় কূপাকার (*ক্লোজড পিট*) কয়লা খনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও তার পরিচালনা ও লাভজনকতা নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে। ফুলবাড়িতে অবস্থিত কয়লার স্তর অপেক্ষাকৃত অগভীর। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এশিয়া এনার্জি (*এইসি*) নামক এক বিদেশী কোম্পানি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (*ওপেন পিট*) ফুলবাড়ির কয়লা উত্তোলনে আগ্রহী হয় এবং নানা ধরনের লবিংয়ে ব্যাপৃত হয়। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের এই প্রয়াস আরও জোরদার হয়। এইসির প্রস্তাব অনুযায়ী সকল উৎপাদিত কয়লা রপ্তানি করা হবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ সরকারকে ৭ শতাংশ রয়্যালটি প্রদান করা হবে। ফুলবাড়ি একটি তিন-ফসলি এলাকা। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলিত হলে এই জনপদের বহু মানুষ উদ্বাস্তু হবে; পরিবেশ-প্রকৃতির বিপর্যয় ঘটবে; ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হবে; আশেপাশের এলাকার উপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ফলে আশ্চর্যের নয় যে, এইসির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তেল, গ্যাস, বন্দর, বিদ্যুৎ রক্ষা আন্দোলন এই সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় জনগণ এই কয়লা প্রকল্পের বিরুদ্ধে লড়াকু অবস্থা নেয়। তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ফুলবাড়ি প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ফুলবাড়িতে কয়লা খনি করতে দিবেন না। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যাতে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হয় এবং অনেকে আহত হয়। এই সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এইসি কোম্পানি ও এর সমর্থকেরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। বলা দরকার

যে, এইসি কোম্পানি লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে নথিবদ্ধ; ফলে বিদেশী শেয়ারহোল্ডারেরা নিজ নিজ সরকারের কাছে এইসি কোম্পানিকে সহায়তা করার দাবি জানায়। তার ফলে এসব দেশ ও সরকারের সাথে বাংলাদেশের জনগণের একটি স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফুলবাড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশের কয়লা দখল করার প্রয়াস থেকে এইসি এখনো পুরোপুরি নিবৃত্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। "গ্লোবাল কোল" নামে পুনর্গঠিত হয়ে এই কোম্পানি এখনও এই প্রয়াসে নিয়োজিত আছে এবং সে উদ্দেশ্যে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের সরকার দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিতে সচেষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে। সুতরাং কয়লার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, জাতীয় সম্পদের সুরক্ষার সাথে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে।

১০.১.৩ *নদনদী ও পানি সম্পদ*

বাংলাদেশের নদ-নদী ও তার প্রতি আঞ্চলিক হুমকি সম্পর্কে আমরা চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, ভূষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু ভাটির দেশ হওয়ার কারণে এই পানি, বিশেষত ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সম্পদের উপর বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ। নদনদী দ্বারা প্রবাহিত পানির প্রায় ৯৩ শতাংশ বাইরে থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হতো। কিন্তু উজানের দেশ, বিশেষত ভারত, স্বীয় ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ ব্যবহার করে এই পানি প্রবাহের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এবং পানি অপসারিত করছে। ফলে বাংলাদেশের নদনদীর প্রবাহ, বিশেষত শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে বহু নদনদী শুকিয়ে গিয়েছে এবং যেগুলি অবশিষ্ট আছে, সেগুলোও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন। সুতরাং, নদনদীর প্রবাহের বিষয় নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অন্যান্য দিকের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ভারত অনেক বড় দেশ এবং তা বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র স্থলসীমান্ত জুড়ে আছে। ভারত বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। এসবের পাশাপাশি অন্যান্য কারণে বাংলাদেশের সরকারসমূহ আন্তর্জাতিক নদনদীতে বাংলাদেশের ন্যায্য অংশের বিষয়ে ভারতের সাথে জোরালোভাবে দরকষাকষি করতে পারছে না বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারত বাংলাদেশের সম্মতির অপেক্ষা না করেই অভিন্ন নদ-নদীর উপর একের পর এক বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করে যাচ্ছে। আলাদা

আলাদা নদ-নদীর উপর হস্তক্ষেপের পর ভারত এখন "নদী সংযোগ প্রকল্পে"র মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশকারী সকল বড় নদ-নদীর পানি অপসারণে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতিকালে চীনও স্বীয় উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে তিব্বত প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের উজানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করছে এবং আরও বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। চীনের অনেকে ব্রহ্মপুত্রের পানি সে দেশের উত্তরের দিকে অপসারণেরও প্রস্তাব করেছে। ভারত চায় চীনের এসব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাংলাদেশ তার সাথে যোগ দিক। তবে, ভারতের এই চাওয়া স্ববিরোধী কারণ ভারত নিজেই উজান অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদনদীসমূহে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করেছে এবং করছে।

ভারত-চীন টানাপোড়েন দ্বারা পানি সম্পদ বিষয়ে বাংলাদেশের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো প্রস্তাবিত "তিস্তা নদী সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার প্রকল্প"। চতুর্থ অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি, ক্রমাগতভাবে তিস্তা নদীর পানি প্রত্যাহার করার ফলে বাংলাদেশে তিস্তা অববাহিকায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবেলার জন্য সরকার চীনা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এই প্রকল্প গ্রহণ করার কথা ভাবছে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে, কৃত্রিমভাবে এই নদীকে সরু করে এর প্রশস্ততা বর্তমানের এক-তৃতীয়াংশ করার প্রস্তাব স্থায়িত্বশীল নয়। সুতরাং, কারিগরি বিবেচনায় এই প্রকল্প যথেষ্টই প্রশ্নবিদ্ধ। তবে, অনেকের মতে, বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না কারণ ভারত এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে।[৮৬]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে পরিষ্কার যে, পানিসম্পদের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ শুধু যে ভারতের সাথে একটি বৈরিতার সম্মুখীন তাই নয়, ভারত-চীন সম্পর্কের টানাপোড়েন দ্বারাও আক্রান্ত।

[৮৬] তাদের মতে, এই প্রকল্প গৃহীত হলে তা বাস্তবায়নের জন্য তিস্তা অববাহিকায় হাজার হাজার চীনা প্রকৌশলী, ব্যবস্থাপক, শ্রমিকের আগমন ঘটবে এবং ভারত তা তার নিরাপত্তার জন্য স্বস্তিকর মনে করে না।

১০.১.৪ ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক অবস্থানও বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রথমত, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত। সে কারণে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আয়তনে ছোট হলেও বাংলাদেশের দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল রয়েছে এবং এই উপকূলের বিভিন্ন স্থানে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনা ব্যবহার করে বাংলাদেশ নিজস্ব সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্য ছাড়াও নেপাল, ভূটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে পারে। তদুপরি প্রস্তাবিত সিলেটের তামাবিল হয়ে কিংবা মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে চীনের কুনমিং শহরের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র বন্দর দক্ষিণ চীনের বহির্বাণিজ্যকেও সুগম করতে পারে। তৃতীয়ত, উপরে আমরা লক্ষ করেছি, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের "নিজস্ব অর্থনৈতিক জোন"-এর আকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এখনও যথাযথ ব্যবহারের অপেক্ষায়। তেল-গ্যাস ছাড়াও রয়েছে সামুদ্রিক মৎস্যসহ অন্যান্য সম্পদের সম্ভাবনা।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত সম্পদের ব্যবহারের উত্তম ব্যবহারের বিষয়টিও বৈদেশিক নীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় বাংলাদেশের আরেকটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের ক্ষেত্রে। সুবিদিত যে, প্রয়োজনীয় গভীরতার অভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে বড় জাহাজ (১০ মিটারের চেয়ে বেশি ড্রাফট সম্পন্ন) ভিড়তে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা আরও সীমাবদ্ধ। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই বন্দরের গভীরতা ১০ মিটার বজায় রাখতে সাংবাৎসরিকভাবে পলিবহুল পশুর নদীর খননকাজের প্রয়োজন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে এই খননজনিত বালু নিক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান পাওয়া কঠিন। পটুয়াখালীর পায়রাতে নতুন সমুদ্র বন্দর নির্মিত হলেও এই নদীও পলিবালিময় এবং সে কারণে এই বন্দরের নাব্যতা গভীর সমুদ্র বন্দরের উপযোগীরূপে বজায় রাখা সম্ভব হবে কিনা, সেটা প্রশ্নের বিষয়। সে কারণে চট্টগ্রাম উপকূলে -- যেখানে পলিপতনের সমস্যা কম -- একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে অনেকের মতে, সরকার প্রথমে চীনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায়

সোনাদিয়া দ্বীপে গভীর বন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিল, ভারতের বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশ এই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসে এবং জাপানের সহযোগিতায় নির্মীয়মান মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আমদানির লক্ষ্যে সেখানে যে বন্দর স্থাপন করা হচ্ছিল সেটাকেই জাপানের সহযোগিতায় গভীর সমুদ্র বন্দরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ চীন-ভারত দ্বন্দ্বের বেড়াজাল অতিক্রম করায় সক্ষম হলেও এই সিদ্ধান্তের কারিগরি ও অর্থনৈতিক উপযোগিতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। কারণ, প্রাপ্ত তথ্যমতে, মাতারবাড়ি বন্দরকে গভীর সমুদ্র বন্দর হিসেবে বজায় রাখার জন্যও খননের প্রয়োজন হবে। এসব সূত্রমতে, গভীর সমুদ্র বন্দরের স্থান হিসেবে সোনাদিয়া অধিকতর উপযোগী ছিল কারণ সে স্থানে এ ধরনের খননের প্রয়োজন হতো না। তদুপরি মাতারবাড়ি কেবল একটি টার্মিনাল, পুরোদস্তুর বন্দর নয়।

একইভাবে, বিভিন্ন সূত্রমতে, বাংলাদেশের তামাবিল বন্দর হয়ে আসামের মধ্য দিয়ে চীনের কুনমিংয়ের সাথে সংযোগস্থাপনকারী মহাসড়ক নির্মাণের প্রস্তাবও ভারতের বিরোধিতা কিংবা অসহযোগিতার ফলে অগ্রসর হতে পারছে না। অন্যদিকে মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে এই মহাসড়ক নির্মিত হওয়ার প্রস্তাবও একাধিক কারণে অগ্রসর হতে পারছে না। প্রথমত, এই পথ তুলনামূলকভাবে বেশি দীর্ঘ এবং সমস্যাসংকুল এলাকার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি– কারেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন, রাখাইন প্রদেশের অশান্ত পরিস্থিতি ইত্যাদি -- কারণেও এই মহাসড়ক নির্মাণে অগ্রসর হওয়া কঠিন। এসব ভূ-রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি এখন অনিশ্চিত।

১০১.৫ জনসম্পদ

বাংলাদেশের জনসম্পদ বিশাল, কিন্তু তার দক্ষ ব্যবহারের সাথেও বৈদেশিক নীতির ইস্যু জড়িত। সুবিদিত, নগর রাষ্ট্রসমূহ বাদ দিলে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বর্তমান প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, আগামী ২০৬১ সাল পর্যন্ত মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং প্রায় ২১ কোটিতে পৌঁছাবে। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে জনসংখ্যার এই বৃদ্ধিকে প্রশমিত করতে হবে; প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ

ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। তবে এই জনসম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য উপযোগী বৈদেশিক নীতিও প্রয়োজন। অত্যধিক ঘনত্ব এবং দেশের অভ্যন্তরে সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগের কারণে বাংলাদেশ থেকে বহির্গমন ও অভিবাসী হওয়ার চাপ বেশি। প্রায় এক কোটির মতো বাংলাদেশি এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে বলে অনুমিত হয়। তাদের প্রেরিত প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের মূল উৎস এবং তা এই দেশের উন্নয়নের প্রথম পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আগামীর বাংলাদেশের জন্যও রেমিট্যান্স আয় অব্যাহত রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে।

এক্ষেত্রেও বৈদেশিক নীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অস্থায়ীভাবে কর্মরত বাংলাদেশিদের একটি বড় অংশ সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের এবং মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এসব দেশে কতজন বাংলাদেশি কাজের জন্য যেতে পারবেন তা সেসব দেশের সরকার নির্ধারণ করে। অন্যান্য, বিশেষত পশ্চিমের দেশসমূহে অভিগমনের সংখ্যা সেসব দেশের সরকার দ্বারা ততটা পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। তা সত্ত্বেও এসব দেশে অভিবাসনের সুযোগও তাদের সরকারের নীতির উপর নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রের ওপি-ওয়ান এবং ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচি তার উদাহরণ। কাজেই এসব দেশে অধিক সংখ্যায় বাংলাদেশিদের অভিগমন সুগম করার ক্ষেত্রেও বৈদেশিক নীতি ভূমিকা পালন করে। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে কাজ করার বিষয়েও এ কথা বহুলাংশে প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে, বহির্বিশ্বে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসম্পদের ব্যবহারে সাফল্যও অনেকাংশে দেশের বৈদেশিক নীতির উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের জনসম্পদের ব্যবহারের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো জনশক্তি নিয়োজিত করে পণ্য উৎপাদন করে তা বিদেশে রপ্তানি। এতে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সম্ভাব্য আমদানিকারক দেশসমূহের নীতির উপর। উন্নত দেশসমূহে হ্রাসকৃত কিংবা বিনাশুল্কে রপ্তানির সুযোগ পাবে কিনা তা বহুলাংশে নির্ভর করে সেসব দেশের নীতির উপর এবং এসব দেশ তা বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। ফলে এই সূত্রেও দেশের সম্পদের ব্যবহারের সাথে বৈদেশিক নীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরা পড়ে।

১০.২ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ

উপরের উদাহরণসমূহ দেখায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের করণীয়টি বৈদেশিক নীতি থেকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এমন হতে হবে যাতে তা বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে পারে। প্রশ্ন হলো, কী হতে পারে সে বৈদেশিক নীতি? উপযুক্ত আলোচনা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির যেসব প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নির্দেশ করে তার কয়েকটি নিম্নরূপ।

১০.২.১ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান

লক্ষণীয়, বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নয়নে সফল হতে হলে বাংলাদেশের মতো একটি তুলনামূলকভাবে ছোট অর্থনীতির দেশের পক্ষে বিশ্ববাজারে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে লভ্য বাজার বড় ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিম ইউরোপ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্তভাবে তৈরি পোশাক ও অন্যান্য টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির সুযোগ প্রদান বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে তৈরি পোশাকশিল্পের বিকাশে সহায়তা করেছে। একইভাবে *জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস* (*জিএসপি*), *মোস্ট ফেভারড ন্যাশন* (*এমএফএন*) এবং *মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের* (*এমএফএ*) অধীনে বাংলাদেশকে প্রদত্ত কোটা ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও অন্যান্য টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। নিঃসন্দেহে, সময়ে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে ১৯৯৪ সালে এমএফএ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এই চুক্তিকে প্রতিস্থাপনকারী *এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইল অ্যান্ডক্লোদিং* (*এটিসি*)-এর মেয়াদ ২০০৫ সালে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ "স্বল্পোন্নত" দেশের পর্যায় থেকে "উন্নয়নশীল দেশ"-এর পর্যায়ে উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। এই উত্তরণের পর স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত দেশসমূহের কাছ থেকে যেসব বাণিজ্যিক সুবিধাদি পেত তার অবসান ঘটবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র খাত অনেক বেশি বিকশিত ও সংহত হয়েছে। তাজরিনসহ একাধিক ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর বিদেশী ক্রেতাদের চাপে অনেক উদ্যোক্তা নিজেদের কারখানার পরিবেশের উন্নয়নেও সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের প্রায় ২০০টি কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের "সবুজ সনদ" পেয়েছে এবং বস্ত্র খাত, পোশাক খাতের ওভেন

এবং নিট – এই তিন ক্যাটাগরিতে সবুজ প্রযুক্তির শীর্ষ তিন কারখানাই বাংলাদেশে অবস্থিত। বস্তুত বিশ্বের এ ধরনের ১৫টি কারখানার ১২টিই বাংলাদেশের। এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও আগামীর বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বাজারে — বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বাজারে— বাংলাদেশের পণ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করায় সচেষ্ট হতে হবে।

একই কথা বলা যায় শ্রম রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় সম্পর্কে। রেমিট্যান্স আয় যাতে অব্যাহত থাকে এবং আগামীতে আরও বৃদ্ধি পায় তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মসংস্থান প্রদানকারী দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। নিরপেক্ষতা ভিত্তিক বৈদেশিক নীতি এক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। লক্ষণীয়, কিছু কিছু উন্নত দেশও এখন বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকের পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিতে আগ্রহী হচ্ছে। তারমধ্যে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফলে আশা করা যায় যে, আগামী দিনেও উন্নত দেশসমূহ থেকে বাংলাদেশে প্রেরিত রেমিট্যান্সের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে।

১০.২.২ নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি—সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে একটি দ্বিমেরুসম্পন্ন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। আশির দশকের শেষে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন এবং নব্বই দশকের শুরুতে খোদ সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের পর ধারণা করা হয়েছিল যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সে আশা পূরণ হয় নি। সে জন্য বাংলাদেশকে এক সংঘাতপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য একমাত্র উপযোগী বৈদেশিক নীতি হলো বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত "নিরপেক্ষতা" তথা "সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়" নীতি গ্রহণ এবং অনুসরণ। কোনো দেশের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব অন্য এক বা একাধিক দেশকে যাতে বিরূপ ভাবাপন্ন না করতে পারে অথবা সেসব দেশের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের বিভিন্ন সুফল থেকে না বঞ্চিত করতে পারে সে বিষয়ে বাংলাদেশকে সচেষ্ট হতে হবে। এটা সহজ নয়, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহ বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে চায়। সেজন্য বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১০.২.৩ স্বচ্ছতা

এ পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাসম্ভব ভাল ফলাফল অর্জনের যে সম্পূরক নীতি সহায়ক হবে তা হলো স্বচ্ছতা। সকল সংশ্লিষ্ট দেশের কাছে পরিষ্কার হতে হবে যে, বাংলাদেশ নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করছে এবং এই নীতি অনুসরণে তার মূল লক্ষ্য হলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশের সুরক্ষা। এই বিষয়টি স্পষ্ট না হলে বিভিন্ন দেশের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। এর ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং তার দ্বারা বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সে জন্য বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভাবিত হতে পারে এমন সকল সিদ্ধান্ত এবং তার পেছনের যুক্তিসমূহ সকল তথ্য-উপাত্ত সমেত সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অভিগম্য করতে হবে। এরূপ খোলামেলাভাবে ও নীতিনিষ্ঠ উপায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে কোনো দেশের অকারণে ক্ষুব্ধ হওয়ার এবং বাংলাদেশের প্রতি বৈরী আচরণের কারণ কম হবে।

১০.২.৪ জনগণকে আস্থায় নেয়া

নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির সাফল্যের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো জনগণকে আস্থায় নেওয়া। দেশের জনগণের অধিকার আছে দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভাবিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকার কোন যুক্তিতে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানা। জনগণকে আস্থায় নেওয়ার একটি উপায় হলো এসব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দেশের সংসদে প্রয়োজনীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া। এছাড়া সরকার পত্রপত্রিকা, গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসবের বিস্তৃত আলোচনাকে উৎসাহিত করতে পারে। এরূপ গণ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তাতে মানুষের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হবে এবং তখন এসব সিদ্ধান্তের কারণে কোনো নেতিবাচক প্রতিফল হলেও তা সামাল দেওয়া সরকারের জন্য সহজ হবে। তা না করে যদি সরকার জনগণের অগোচরে বৈদেশিক সম্পর্কে প্রভাব সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে জনগণ সেসব সিদ্ধান্তের প্রতিফল সহজে গ্রহণ করবে না বরং তা সরকারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে। সেজন্য স্পর্শকাতর সিদ্ধান্তও জনগণের অগোচরে না নিয়ে তাদেরকে জানিয়ে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

১০.৩ উপসংহার

বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়। জাতীয় সম্পদের সুরক্ষার জন্য উপযোগী বৈদেশিক নীতি প্রয়োজন; আবার

বৈদেশিক নীতি জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও উত্তম ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হতে হবে দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সর্বোত্তম বহিঃস্থ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে ন্যায়-নীতি বিবর্জিত শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা সন্ধানী হতে হবে। দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে তার মানবিকতাবোধের উৎকৃষ্ট প্রমাণ রেখেছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি, মানব কল্যাণ ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহ সমুন্নত রেখেই বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিকে দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সহায়ক হতে হবে। ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দেখায় যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ, তথা "সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়" – এই নীতিই বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তবে এই নীতির সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা এবং দেশের জনগণকে আস্থায় নেয়া। স্পর্শকাতর ইস্যু সম্পর্কেও দেশের মানুষকে অবহিত করে এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া শ্রেয়। প্রথমত, এতে সিদ্ধান্ত ভালো হবে। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত ভুল হলেও তা সামাল দেওয়া সহজ হবে।

প্রবন্ধের সামগ্রিক উপসংহার

গত কয়েক দশকের প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রথম পর্ব অতিক্রম করছে। আগামীতে বাংলাদেশকে উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করতে হবে। এই প্রবন্ধে এই পর্বের জন্য দশটি করণীয়ের কথা আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে উপসংহার পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এখানে আমরা বরং সামগ্রিকভাবে এসব করণীয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

প্রথমত, উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বকে প্রথম পর্বের সরলরৈখিক প্রসারণ হিসেবে ভাবা ঠিক হবে না। অর্থাৎ, এটাকে "একই ধারার পুনরাবৃত্তি" (ইংরেজিতে যেটাকে *বিজনেস এজ ইউজুয়াল*) বলে ভাবাটা ভুল হবে। পুরানো ধারার অনেক কিছুর মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে এবং অনেক নতুন করণীয় গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য এটাকে হতে হবে একটি নতুন পর্ব।

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত দশটি করণীয় পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে - হয় পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে কিংবা অন্যটির উপর নির্ভর করে। এই আন্তঃসম্পর্কের সম্যক উপলব্ধি এসব করণীয় সফল সম্পাদনের জন্য

অপরিহার্য। একই কারণে এসব করণীয় তালিকার ক্রমানুবর্তীতা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিছুটা ভিন্নভাবেও যদি এই তালিকা প্রণীত হয় তাহলেও সামগ্রিকভাবে এর মর্ম ও চরিত্র বহুলাংশে একই থেকে যাবে। তবে তালিকার ক্রমানুবর্তীতা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বাস্তবায়নের ক্রমানুবর্তীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। যেমন, আগেই উল্লেখিত হয়েছে, গ্রাম পরিষদের মতো স্থানীয় সরকার কাঠামোর নতুন ধাপ সৃষ্টির আগে সুশাসন অর্জনে কিছু অগ্রগতি আবশ্যক হবে। একইভাবে, সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত করণীয়টি অতো আশু চরিত্রের নয়। অন্যান্য করণীয় সম্পাদনে অগ্রগতি অর্জনের পরই এই করণীয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা যেতে পারে। তদুপরি, এই করণীয় সম্পর্কে গণ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে কিছুটা বেশি সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। তালিকার ক্রমানুবর্তীতা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এসব করণীয়ের বাস্তবায়নে যথাযথ ক্রমানুবর্তীতা অনুসরণ গুরুত্বপূর্ণ হবে। যে করণীয়টি অপর কোন করণীয়ের পূর্বশর্ত তা আগে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। যেমন সুশাসনের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি অর্জন না করে গ্রাম পরিষদের মতো নতুন প্রতিষ্ঠানের সূচনা করতে যাওয়া সংগত হবে না, কারণ উন্নয়নের বর্তমান নিঃসরণ মডেল বজায় রেখে এরূপ নতুন স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হলে তা কেবল নিঃসরণের আরেকটি মুখ হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজেই করণীয়সমূহের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, একটি কথা উঠতে পারে আর তা হলে দশ করণীয়ের কথা বলা হলেও আসলে এই প্রবন্ধে দশের চেয়ে অনেক বেশি করণীয়ের কথা বলা হয়েছে। এটা ঠিক। কিন্তু, এই তালিকা প্রণয়নে করণীয়সমূহের বাহ্য অভিপ্রকাশের চেয়ে গভীর চরিত্রের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং সেই চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে যূথবদ্ধ করণীয়সমূহকে একটি শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো সামাজিক সংহতি বিষয়ক করণীয়। নিঃসন্দেহে, এখানে অনেকগুলি করণীয়ের কথা বলা হয়েছে– কিছু অনুভূমিক বিভক্তি সংক্রান্ত এবং কিছু উল্লাম্বিক বিভক্তি সংক্রান্ত। কিন্তু সবগুলিই সামাজিক বিভক্তির উদাহরণ এবং সে কারণেই এগুলোকে একত্র করা হয়েছে।

সবশেষে, এই প্রবন্ধে আলোচিত করণীয়সমূহ উপস্থিত করা হচ্ছে প্রস্তাব হিসেবে, যাতে দেশের উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বের করণীয় নিয়ে একটি গণ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। দেশের বুদ্ধিজীবীদেরই এই প্রক্রিয়ার সূচনা করতে হবে। তাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই করণীয় সংক্রান্ত প্রস্তাবনা আরও পরিমার্জিত ও বিকশিত রূপ পেতে পারবে এবং তা জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হবে এবং এর পক্ষে জনমত গড়ে উঠবে। তখন এই প্রস্তাবনার প্রতি দৃষ্টি দিতে রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতৃবৃন্দও প্রবুদ্ধ হবেন। অন্তত সেটাই আমার আশা।

নির্দেশিত রচনাবলি

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৪), বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গ, সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৭), বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা: বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট ও বিকল্প পথের প্রশ্ন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০১১ক), বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যত, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০১১খ), "বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব," প্রতিচিন্তা, প্রথম সংখ্যা।

ইসলাম, নজরুল (২০১২), আগামী দিনের বাংলাদেশ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০১৭), বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, ঈস্টার্ন একাডেমিক, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৩), বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন: বর্তমান ধারার সংকট এবং বিকল্পের প্রস্তাব, প্রাচ্য প্রজ্ঞা, ঢাকা।

মাহমুদ, ওয়াহিদউদ্দিন (২০২২)। উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: একটি রূপরেখা, বাতিঘর, ঢাকা।

বায়েস, আবদুল এবং মাহাবুব হোসেন (২০০৭), গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ অর্থনীতি: জীবন-জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা, রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, স্বরাজ, ঢাকা।

রায়, রাজা দেবাশীষ (২০০৪)। পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ও ভূমির অধিকার, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (ICI MOD), কাঠমন্ডু, নেপাল।

Ahsan, A. (2019). Bangladesh's economic geography: Some patterns and implications. *Journal of Bangladesh Studies, 21*(1), 1-17.

Ahsan, A. (2021). *Dhaka's overgrowth and its costs*. Presentation-Talk to BIDS Annual Conference, December.

Ahsan, A. (2022). What budget discussions omit – Can Bangladesh develop without decentralizing? *Policy Insights*, Policy Research Institute Quarterly, September.

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) (2023). *Statistical Yearbook of Bangladesh 2022*. Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

Bertocci, P. J. (1970). *Elusive villages: social structure and community organization in rural East Pakistan*. Michigan State University.

Bunn, D., & Cecilia P. W. (2023). Sources of government revenue in the OECD. Tax Foundation. https://taxfoundation.org/oecd-tax-revenue-by-country-2023.

Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast food industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, *84*(4), 772-793.

Card, D., & Krueger, A. B. (2000). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: reply. *American Economic Review*, *90*(5), 1397-1420.

Causa, O., & Hermansen, M. (2019). Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries. *Economic Department Working Paper No. 1453, July*, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Deléchat, C., & Medina, L. (2021). *The global informal workforce: Priorities for inclusive growth* International Monetary Fund, Washington D.C.

G. F. I. (2021). Trade-related illicit financial flows in 134 developing countries: 2009–2018. *Global Financial Integrity, 2021 Report*. See also https://thefinancialexpress.com.bd/trade/4965b-siphoned-off-from-bangladesh-in-six-years-gfi-1639797327

Gerschenkron, A. (1953). Economic backwardness in historical perspective In: Bert F. Hoselitz (ed.) *The progress in underdeveloped areas*, Chicago: Chicago University Press.

GOB (2021). *Nationally Determined Contributions (NDCs) 2021* Bangladesh (updated), August 26, Ministry of Environment, Forests, and Climate Change.

GoB (Government of Bangladesh), (2020). *8th Five-Year Plan (July 2020-June2025)*: *Promoting prosperity and fostering inclusiveness* General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka.

Henderson, V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. *Journal of Economic Growth*, *8*(1), 47-71.

HMT, OBR (Her Majesty's Treasury, Office for Budget Responsibility) https://obr.uk/about-the-obr/working-with-government/

HRW. (2020). https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/bangladesh1020_web.pdf

IBRD-IDA. (1968). Agriculture and water development program: Report of the November 1967 Mission, Vol. 1, The Main Report. Washington D.C. (May 21).

IECO (International Engineering Company), (1964a). *Master Plan.* Vol. I. Dhaka: East Pakistan Water and Power Development Board (EPWAPDA).

IECO (International Engineering Company), (1964b). *Master Plan.* Vol. II. Dhaka: East Pakistan Water and Power Development Board (EPWAPDA).

Islam, M. M. (2016). Demographic transition and the emerging windows of opportunities and challenges in Bangladesh. *Journal of Population Research*, *33*(3), 283-305.

Islam, N. (2016). *Governance for development: Political and administrative reforms in Bangladesh*. Palgrave-Macmillan, New York.

Islam, N. S. (2014). "Will inequality lead China to the middle-income Trap?" Frontier of Economics in China, 9(3): 398-437.

Islam, N. S. (2018). *Bangladesh delta plan: A review*, Dhaka, Eastern Academic.

Islam, N. S. (2020). *Rivers and sustainable development: Alternative approaches to rivers and their implications*. New York: Oxford University Press.

Islam, N. S. (2022a), Water development in Bangladesh: Past, present, & future, Eastern Academic, Dhaka.

Islam, N. S. (2022a). *Water development in Bangladesh: Past, present, & future*., Dhaka: Eastern Academic.

Islam, N. S. (2022b). *A review of Bangladesh delta plan 2100*. Dhaka: Eastern Academic.

Islam, N. S. (2022c), Looking at the Past to See the Future, BIDS public lecture, Bangladesh Institute for Development Studies, Dhaka, Bangladesh.

Islam, N. S. (2022c). *Looking at the past to see the future*. BIDS public lecture, Bangladesh Institute for Development Studies, Dhaka, Bangladesh.

Islam, N. S. (2023). *Our debt to the four professors*. প্রথমা প্রকাশন, Dhaka.

Islam, S. N. (2016), Governance for development: Political and administrative reforms in Bangladesh. New York: Palgrave-Macmillan.

Jahan, R. & Amundsen, I. (2010). The parliament of Bangladesh: Representation and accountability. *CPD-CMI Working Paper Series No. 2*, Centre for Policy Dialogue and Chr. Michelsen Institute.

Kapsos, S. (2008). The gender wage gap in Bangladesh. *ILO Asia-Pacific working paper series*.

Kassi, O., & Lehdonvirta, V. (2018). Online labour index: Measuring the online gig economy for policy and research. *Technological Forecasting and Social Change*, Elsevier, *137*(C), pp. 241-248.

Keep, M. (2023). Tax statistics: An overview. House of Commons Library. (https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8513/CBP-8513.pdf)

Khondker, B. H., Wadood, S. N., & Barua, S. (2010). A study on urbanization management and emerging regional disparity in Bangladesh: Policies and strategies for decentralized economic growth. *Study No. 18, Background Studies for the Sixth Five Year Plan (2011-2015)*. Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies.

Krug, J. A., van Blommestein, W. J., Thomas, R. A., Shorter C. F., Shaw, J. & Okey, W. C. (1957). *Water and power development in east Pakistan*. Report of a UN Technical Assistance Mission, New York, June.

Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, *22*, pp. 139-191.

Mahmood, S. A. (2005), Industrial development in Bangladesh: Regional differences. Mimeo

Mahmood, S. A. (2022). Economic zones: We must emphasize quality and not quantity. *The Business Standard*, January 9.

Mamun, M. A., & Griffiths, M. D. (2019). The assessment of internet addiction in Bangladesh: why are prevalence rates so different? *Asian Journal of Psychiatry*.

Ndebele, B. (2023). Combating child trafficking in Bangladesh through increasing access to information. *Girls' Globe*, April 21.

NIPORT (National Institute of Population Research and Training) and ICF (Inner City Fund), (2023). *Bangladesh demographic and health survey 2022: Key Indicators Report. Dhaka*, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA.

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University.

Rahman, F. (2022). Remittance outflow crosses $100m --- thru legal channel. *The Daily Star*, December 26.

Rahman, M., & Al-Hasan, M. (2019). Returns to schooling in Bangladesh revisited: an instrumental variable quantile regression approach. Centre for Policy Dialogue.

Sen, B., Ahmed, M., Yunus, M., & Ali, Z. (2014). *Regional inequality in Bangladesh in the 2000s: Re-visiting the East-West divide debate*. BIDS-REF Study Series No. 14-01, Dhaka, Bangladesh: Bangladesh Institute of Development Studies.

Sobhan, R. (2010). *Challenging the injustice of poverty: Agendas for inclusive development in South Asia*. Sage Publications.

Sobhan, R. (2021). *Untranquil recollections: Nation building in post-liberation Bangladesh*. SAGE Publishing India.

Sosale, S., Asaduzzaman, T., & Ramachandran, D. (2019). Girls' education in Bangladesh: A promising journey. *World Bank Blogs*.

SREDA (2018). National database on renewable energy. available at http://www.renewable energy.gov.bd/

TEC (Tokyo Electric Company) and BPDB (Bangladesh Power Development Board) (2010). *Power system master plan*. Tokyo and Dhaka.

TEC (Tokyo Electric Company) and BPDB (Bangladesh Power Development Board) (2016). *Revisiting power system master plan*. Tokyo and Dhaka.

UNFCCC (2015). *Paris agreement to the United Nations framework convention on climate change*, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104.

UNICEF. (2023). https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/malnutrition-mothers-soars-25-cent-crisis-hit-countries-putting-women-and-newborn.

United Nations. (2021). *Reconsidering rural development*, World Social Report 2021, Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/376.

Zohir, S. (2011). Regional differences in poverty levels and trends in Bangladesh: Are we asking the right questions. Economic Research Group, Dhaka. [Accessed June 20, 2012] http://www.ergonline.org/documents/sajjad%20regpov%2010july11.pdf.

বাংলাদেশের বাম-ইতিহাস চর্চায় একটি সমৃদ্ধ বই

তানভীর মোকাম্মেল

বাংলাদেশের লেখক-গবেষকদের লজ্জায় ফেললেন পশ্চিমবঙ্গের গৌতম রায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, এবং এ দেশটার সামজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেও, এদেশের বামপন্থিদের যে ব্যাপক একটা ভূমিকা ছিল, খুবই প্রয়োজন ছিল সে বিষয়ের উপর বিশদ ও নিরপেক্ষ একটা ইতিহাস রচনা। সেই দরকারী কাজটাই করলেন গৌতম রায় ওঁর প্রায় পৌনে তিনশ পৃষ্ঠার "পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার কথা" (১৯৪৭-১৯৬৭) বইটাতে।

মোট বারোটা অধ্যায়ে বিভক্ত বইটার বিভিন্ন পর্বের তালিকাটা দেখলেই বইটার পেছনে গবেষণার ব্যাপকতাটা বোঝা যাবে। অধ্যায়গুলো হচ্ছে "ভারত ও অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও বিস্তার", "বঙ্গবিভাজন ও কমিউনিস্ট পার্টি", "বিভাজনের পরে পূর্ববঙ্গ ও ঢাকা শহর", "পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির প্রতিষ্ঠা ও সংকট", "ভাষা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি", "ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা", "যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল ও কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা", "কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন", "ন্যাপ গঠন ও সামরিক শাসনের শুরু", "আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন: সামরিক শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক চিত্র", "সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক আঙিনায় রুশ-চীন বিরোধ", "পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভাজন" ও "মণি সিংহ গ্রেপ্তার"।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল দুবার। দুটো ভিন্ন জায়গায়। প্রথমবার তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে, ১৯২০ সালে। উদ্যোক্তা মূলত: এক বাঙালি যুবক-মানবেন্দ্রনাথ রায়। পাঁচ বছর পর ১৯২৫ সালে দ্বিতীয়বার কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় ভারতের কানপুর শহরে। তার আগেই অবশ্য বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছোটবড় নানা কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। যেমন ডাঙ্গের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে গড়ে উঠেছিল একটা গ্রুপ, আর বাংলায় গড়ে ওঠা গ্রুপটার নেতা ছিলেন কমরেড মুজফফর আহমদ।

প্রথম দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক সব কর্মকাণ্ড চললেও কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের পাঁচ-ছয়টা জেলায় কাজ করার উপযোগী কিছু কমরেড তৈরি হয়। এছাড়া আন্দামান কারাগারে ও দেউলি, হিজলির মতো জেলগুলোতে গড়ে উঠেছিল "কমিউনিস্ট কনসলিডেশন"। ১৯৩৭ সালে এ. কে. ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন। ওঁর আমলে রাজবন্দীরা বিভিন্ন জেল থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেন। নিয়মিত মার্কসবাদ চর্চার ফলে জেল থেকে মুক্ত হওয়া এসব কমরেডরা ছিলেন খুবই পরিণত। বিভিন্ন জেলায় এঁরাই হয়ে দাঁড়ান পার্টির প্রাণ। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী "অনুশীলন" ও "যুগান্তর" দলের অনেকেই তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সংগঠকে পরিণত হন। যেমন মণি সিংহ, খোকা রায়, জ্ঞান চক্রবর্তী, নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জী, জিতেন ঘোষ, সত্যেন সেন, বারীন দত্ত, শেখ রওশন আলী প্রমুখ।

চল্লিশ দশকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের তিনটে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল মণি সিংহের নেতৃত্বে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসং-দুর্গাপুর অঞ্চলে সাহসী টঙ্ক আন্দোলন গড়ে তোলা, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে শক্তিশালী তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলা ও ১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় অত্যন্ত সফলভাবে সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলনের আয়োজন করা।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকভাবে দেশভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে পূর্ববাংলার কমিউনিস্টরা এক মহাবিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা ও সদস্যরা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সিংহভাগ নেতা ও কর্মীই তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। এক সময় যে পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় বারো হাজার তা অচিরেই কমে নেমে আসে মাত্র চারশোতে।

গৌতম রায়ের বইটার এক বড় গুণ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস লেখার সুবাদে তিনি পূর্ববঙ্গের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকেও যেন কিছুটা তুলে ধরেছেন। জানাচ্ছেন ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। এর মধ্যে মুসলিম ২ কোটি ৯০ লক্ষ, আর হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৭ লক্ষ। দেশে তখন সম্পূর্ণ ভূমিহীন কৃষক ছিল ২৪%। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার জমিদারী অধিগ্রহণ আইন করলেও এতে দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের লাভ হয়নি তেমন। হিন্দু জমিদাররা প্রায় সবাই দেশত্যাগ করলে লাভ হলো বরং মুসলমান জোতদারদের। তারা সস্তায়, বা অনেক সময় বিনা ব্যয়েই, অনেক জমির মালিক হয়ে গেলো। ১৯৫০ সালে এদেশে একজন ক্ষেতমজুরের মজুরী ছিল ১ টাকা ৬২ পয়সা। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তা বৃদ্ধি পাবার চেয়ে বরং কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১ টাকা ৩২ পয়সায়। গ্রামাঞ্চলে ছিল তখন দারিদ্র্য ও ক্ষুধার প্রায় এক স্থায়ী অবস্থা। দারিদ্র্য এই পর্যায়ে বেড়ে যায় যে রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এসব জেলা থেকে এক ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র মুসলিম চাষী চিরকালের জন্যে আসামে দেশান্তরী হয়ে চলে যায়। বইটাতে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাও বেশ বিশদে এসেছে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় কেবল ঢাকা শহরেই ১,২০০ হিন্দু নিহত হয়। সাতচল্লিশের আগে ঢাকা শহরে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৬৯% ও দেশভাগের পরে, বিশেষ করে, ১৯৫০-য়ের দাঙ্গার পরে, তা কমে এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে সবচে ক্ষতি ঘটে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে। যেহেতু শিক্ষাপেশার সঙ্গে মূলত: হিন্দুরাই বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন ফলে হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের অভাবে গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু স্কুল বন্ধই হয়ে যায়। সার্বিকভাবে পূর্ববঙ্গের সমাজে সৃষ্টি হয় এক ভারসাম্যহীনতার এবং পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে তখন এই সামাজিক বাস্তবতা ও নিজেদের সীমিত শক্তি-কাঠামোর ভিত্তিতেই তার রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করতে হয়।

১৯৪৭-র দেশভাগের পর প্রথম এক বছর কমিউনিস্ট পার্টি অবিভাজিত ছিলো। ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই মার্চ কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ওই কংগ্রেসে পূর্ব বাংলা থেকে ১২৫ জন প্রতিনিধি ছিলেন। কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ডেকার্স লেনের অফিসের ছাদে বসে পাকিস্তানের জন্যে আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। নয় জন সদস্য নিয়ে গঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পূর্ববঙ্গ থেকে ছিলেন মণি সিংহ, নেপাল নাগ, খোকা রায়, মনসুর হাবিব ও কৃষ্ণবিনোদ রায়। পরের দিন ৬ই মার্চ পূর্ববঙ্গের নেতারা এক বৈঠকে বসে একটা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সম্পাদক হন খোকা রায় এবং অন্য সদস্যরা ছিলেন মণি সিংহ, নেপাল নাগ, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ফণী গুহ, আলতাব আলী, বারীণ দত্ত, রবি নিয়োগী প্রমুখ। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ অধিকাংশই মুসলিম হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েকজন মুসলিম নেতাকে এই প্রদেশে কাজ

করার জন্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী আবদুল্লাহ রসুল, মনসুর হাবিবুল্লাহ ও ব্যারিস্টার আবদুল লতিফ পূর্ববঙ্গে আসেন। ১৯৫১ সালে কলকাতায় প্রাদেশিক কমিটির আরেকটা সভা হয় এবং নতুন প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়। মণি সিংহ হন এ কমিটির সম্পাদক।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে-পরে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির একটা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ছিল টঙ্ক আন্দোলন। টঙ্ক আন্দোলনে সাহস ও সাংগঠনিকভাবে সুদক্ষ নেতৃত্ব গুণের পরিচয় দেবার কারণে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে কমরেড মণি সিংহের একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। টঙ্ক আন্দোলনের ফলে টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদ হলেও কমিউনিস্ট পার্টি রণদীভের সশস্ত্র লাইন নেবার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার টঙ্ক আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর, বিশেষ করে হাজংদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হাজং চিরতরে ঘর-বাড়ী-জমি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। মণি সিংহের নিজের ভাষাতে "এ আন্দোলনে এক দিকে ছিল জয়, আরেক দিকে পরাজয়"।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি-র এভাবে রণদীভের উগ্র লাইন গ্রহণ করার ফলে দেশের সাধারণ জনগণ থেকে কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলিম জনগণ তখন নতুন ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি গভীর আবেগ নিয়ে আকৃষ্ট। সেক্ষেত্রে রণদীভের লাইনের "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" শ্লোগান ও তৎপরতাকে তারা পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত হিসেবেই দেখে। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা ও কর্মী হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ার ফলে এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে মুসলিম লীগের ও পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের অপপ্রচার নাস্তিক, ভারতের দালাল, পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রভৃতি জনমনে অনেকটাই ভিত্তি পেয়ে যায়।

১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে হাঙ্গেরীর বুদাপোস্ট থেকে প্রকাশিত "কমিনফর্ম" পত্রিকার এক নিবন্ধে, রণদিভের এই লাইন যে ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক স্তরের, এ তত্ত্বকে সমালোচনা করা হয়। রণদিভের উগ্র লাইনের বিরুদ্ধে এদেশের কমরেডদের মনেও তখন নানা রকম অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। তাঁরা তখন রণদিভের হঠকারী লাইনকে খারিজ করে নতুন পার্টি লাইন গ্রহণ করেন। নতুন রণনীতি অনুযায়ী ঠিক করা হয় যে শ্রমিক-কৃষক ছাড়াও সকল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী শ্রেণিকে নিয়ে আন্দোলনে এগোতে হবে। এই রাজনৈতিক লাইন নেবার ফলে মূলত: মধ্যবিত্তের দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটাই নমনীয় হয় এবং কিছু কমরেডকে আওয়ামী লীগের ভেতরে থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই গড়ে ওঠে তৎকালীন আলোচিত কিন্তু ক্ষণস্থায়ী যুব সংগঠন "যুব লীগ"। যুব লীগের সম্মেলনটা হয়েছিল বেশ ব্যতিক্রমীভাবে। কথা ছিল সম্মেলনটা হবে ঢাকার অদূরে জিঞ্জিরায়। কিন্তু কেরাণীগঞ্জের দারোগা ১৪৪ ধারা জারী করলে বুড়ীগঙ্গা নদীর উপর চারটে নৌকা একত্রিত করে সারা রাত ধরে এ সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হয়। গৌতম রায় জানাচ্ছেন এ সংগঠনের প্রথম ইশতেহারটা একত্রে লেখেন কমরেড খোকা রায়, তাজউদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা।

পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় পাকিস্তানের প্রথম দিককার দিনগুলোতে এদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের অধিকাংশের দিন কেটেছে নানা গোপন "ডেন"-এ। কমলাপুরে "গোলামবাড়ী" নামে পরিচিত ও লক্ষ্মীবাজারের ডেনটা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সব কমিউনিস্ট নেতারা থাকতেন বা গোপনে আসা-যাওয়া

করতেন। এছাড়া ডেন ছিল নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষার পারে দশের গাঁওয়ে যেখানে কমরেড অনিল মুখার্জী ও কমরেড নেপাল নাগ থাকতেন।

পাকিস্তানের প্রথম জমানায় হিন্দু পরিচিতি নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কমিউনিস্ট রাজনীতি করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই পার্টির অনেক নেতাই মুসলিম "টেক নেম" গ্রহণ করে বাইরে কাজ করতেন। যেমন মণি সিংহের নাম ছিল "আজাদ ভাই", অনিল মুখার্জীর "আমিন ভাই", খোকা রায় "আজিজ ভাই", অজয় রায় "শরীফ ভাই", সুখেন্দু দস্তিদার "বশির ভাই", বারীণ দত্ত "সালাম ভাই", সত্যেন সেন "শাজাহান ভাই" ইত্যাদি। তবে শুধু নাম পরিবর্তনই নয়, নেতারা অনেকেই মুসলিম রীতিনীতিগুলোও সযত্নে আয়ত্ত করেন। অনেকেই কোরআন ও হাদিস ভালো করে শিখেছিলেন। কমরেড মণি সিংহ তো দীর্ঘ দিন ধরেই একজন মৌলভীর বেশে ঢাকা শহরে ঘোরাফেরা করতেন।

এসব সত্ত্বেও গ্রেপ্তার এড়ানো কঠিন হতো। পাকিস্তান আমলে দশ-পনেরো বছর জেল খেটেছেন অনেক কমিউনিস্ট নেতাই। মণি সিংহ জেল খেটেছিলেন এগারো বছর। এছাড়াও তিনি ২০ বছরের বেশি আত্মগোপনে ছিলেন। জেলের ভেতরেও কমিউনিস্টদের উপর নানা নির্যাতন চলতো। যার মধ্যে সবচে নৃশংস ঘটনাটা ছিলো ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে সাতজন কমিউনিস্টকে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করে। এদেশে এটাই ছিল প্রথম জেল হত্যা।

কমিউনিস্ট পার্টি তাদের জনবিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারে কেবল ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের সময়। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই কলকাতায় পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক ও ছাত্রদের মধ্যে কিছু আলোচনা ছিলো। তবে এ ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক দিন ছিলো ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, যেদিন করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের সভায় পূর্ববাংলা থেকে আইন পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আনেন। গৌতম রায় জানাচ্ছেন যে ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গের বাঙালি সরকারি কর্মচারীরা লক্ষ্য করেন যে পাকিস্তান সরকারের প্রকাশিত ডাকটিকিট, ট্রেনের টিকিট, পোস্ট কার্ড, মানি অর্ডার ফর্ম, এমন কী সদ্য মুদ্রিত টাকাতেও ইংরেজী ও উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বাংলা ভাষা সেখানে অনুপস্থিত। এর প্রতিবাদে ঢাকার পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাকে বসবাসকারি সরকারি কর্মচারীদের একাংশ নিজেদের ব্যারাকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে আকারে ছোট হলেও এটা ছিল ভাষা বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রথম সংগঠিত প্রতিবাদ।

১৯৫২-র ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনের একটা স্বতঃস্ফূর্ততা ছিলো। তবে কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় নিষিদ্ধ থাকলেও পার্টি নেতারা নেপথ্যে থেকে এ আন্দোলনে নানাভাবে অবদান রাখেন। শহীদুল্লাহ কায়সার, মোহাম্মদ তোয়াহা, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ তরুণ নেতারা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ওই সময়টাতে কমিউনিস্ট নেতারা মূলত: কমলাপুরের "গোলামবাড়ি" ডেনে থাকতেন। ওই ডেননিবাসী কমিউনিস্ট নেত্রী নিবেদিতা নাগ লিখেছেন; "আত্মগোপনে থাকা সত্ত্বেও মণি সিংহ, নেগাল নাগ, খোকা রায়, অনিল মুখার্জী, প্রমুখ নেতা দিনের বেলাতেও ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লাহ হল নামে ছাত্রাবাসগুলোতে গোপনে সভা করতে যেতেন। ছাত্রদের মধ্যে এসব কমিউনিস্ট নেতাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো।" নিবেদিতা নাগ আরো জানাচ্ছেন যে; "সেই সময় ভাষা আন্দোলনের লিফলেট লিখতেন কমরেড

অনিল মুখার্জী ও কমরেড খোকা রায়। আমি ও জুঁইফুল রায় রাতদিন নির্বিশেষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিফলেটগুলোর স্টেনসিল কাটতাম"।

কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম রায় এদেশের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। যেমন দেশভাগের পরে পূর্ব-বাংলায় সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের অনুপস্থিতিতে এই দুই নেতার অনুগামীরা এক জোট হয়ে ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে লীগের শাখা অফিসটা তাদের দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। এ সময় মওলানা ভাসানী ছিলেন আসামের ধুবরি জেলে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভাসানী ঢাকায় আসেন এবং স্বামীবাগে কাজী বশীরের বাসা রোজ গার্ডেনে ওঠেন। ওই বাসাতেই ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন দুই-তিনশো জনের এক কর্মীসভা বসে। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন জেলে। ওঁর "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"-তে উনি লিখছেন; "আমাকে যোগাযোগ করা হলে আমি জানিয়ে দিলাম আর মুসলিম লীগের পেছনে ঘুরে লাভ নেই। বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।" দুই দিন ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রবীণ নেতাদের সম্মতি নিয়ে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। সভাপতি হন মওলানা ভাসানী, সম্পাদক হন শামসুল হক আর শেখ মুজিবকে করা হয় যুগ্ম-সম্পাদক।

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার বরাবরই বেশ অভাব ছিল যেটা এ অঞ্চলে প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আজো এক বড় সমস্যা। কিন্তু এসময় পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের মনে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব কিছুটা হলেও সৃষ্টি হচ্ছিল। যেমন ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পাকিস্তানের কোনো রকম সামরিক জোটে থাকার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হয়। গৌতম রায় জানাচ্ছেন এ প্রস্তাবটা তোলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর যেহেতু পার্টির সিংহভাগ সদস্য-সদস্যাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের, ফলে হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগ ও মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতির ফলে পার্টির হিন্দুপ্রধান গণসংগঠনগুলো ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। গৌতম রায় নিবেদিতা নাগকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন; "জেলা কমিটিগুলো থেকে প্রাদেশিক কমিটিতে পাঠানো রিপোর্টগুলো থাকতো নৈরাশ্যে ভরা। এ অবস্থায় পার্টির নেতৃত্বের অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় দুটি। এক মুসলিম জনগণের মধ্যে ধৈর্য ধরে কাজ করে তাদের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ বাড়ানো এবং নতুন নতুন মুসলিম ক্যাডার সংগ্রহ করে পার্টির সংগঠনগুলোকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা। দুই, মুসলিম শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র প্রভৃতির ভেতর দৈনন্দিন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে শ্রেণি সংগঠন ও শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে সচেষ্ট হওয়া।"

ভাষা আন্দোলনের এক পরোক্ষ ফল ছিলো এক ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নামে "মুসলিম" শব্দটা থাকার কারণে তা অমুসলিম ও প্রগতিশীল ছাত্রদের যোগদানের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এসব বিবেচনায় একটা অসাম্প্রদায়িক ও সামাজ্যবাদবিরোধী ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৫২ সালে ২৬শে এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরিতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ছাত্রদের সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়। এদিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও মতাদর্শগত বিবর্তন ঘটছিল। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত দলটার সভায় "মুসলিম" শব্দটা বাদ দিয়ে দলটার নাম কেবল "আওয়ামী লীগ"

করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী এই তিন নেতাই এই পরিবর্তনের সপক্ষে ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খান পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের মুক্তির আদেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। ওঁর সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ মন্ত্রীরা। গৌতম রায় লিখছেন; "বামপন্থিদের উপর ধারাবাহিক দমন-পীড়নের যুগে এটি ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা"। তবে দুঃখজনক যে যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশি দিন আর টেঁকেনি।

১৯৫৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা ছিলেন কমরেড মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত ও অনিল মুখার্জী। পার্টির মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বাড়াতে বেশ কয়েকজন মুসলিম কমরেডকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, চৌধুরী হারুন-অর-রশীদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, আমজাদ হোসেন ও মোহাম্মদ তোয়াহা।

১৯৫৭ মালে "ন্যাপ"-এর প্রতিষ্ঠা ছিল পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গৌতম রায় মনে করেন যে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে "ন্যাপ" প্রতিষ্ঠার পেছনে আরো অনেক কারণের মধ্যে কুচক্রী ইস্কান্দার মীর্জার মদদ ছিল অন্যতম। আর এ ব্যাপারে ইয়ার মোহাম্মদ খানের ভূমিকার কথা উনি উল্লেখ করেছেন। মওলানা ভাসানী ঢাকায় এলে এই ইয়ার মোহাম্মদের বাড়িতেই উঠতেন। আর ইয়ার মোহাম্মদ খান ছিল জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার ঘনিষ্ঠজন। ফলে অভিযোগটা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

১৯৬০-এর দশকে এদেশের বামপন্থিদের জীবনে একটা বড় ঘটনা ছিল ১৯৬১ সালে শেখ মুজিবের সঙ্গে মণি সিংহের বৈঠক ও আইয়ুববিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে মণি সিংহ লিখছেন "মাণিক মিয়া এক রাতে এলেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে যে আলাপ-আলোচনা হলো, তার মোদ্দা কথা ছিলো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একযোগে আন্দোলন করতে না পারলে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়।" মাণিক মিয়ার প্রস্তাবমতো তাঁর ও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের প্রথম বৈঠক হয় ১৯৬১ সালের নভেম্বরে মগবাজারের এক বাড়িতে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মণি সিংহ ও খোকা রায় এই বৈঠকে যোগ দেন। কয়েক দফা বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করা হবে এবং তা করা হবে ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে। শুরু হয় ১৯৬২-র ছাত্র-আন্দোলন যা ১৯৬৯ সালে এসে এক চূড়ান্ত গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্রদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সেতুবন্ধনের কাজটা করতেন কমরেড ফরহাদ।

১৯৬৩ সালে শীতকালে ভারতের কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদে হযরত মোহাম্মদের (স.) কেশ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারি আইয়ুব খান বেতারে এক উস্কানিমূলক ভাষণ দেন। এর ফলে ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশালসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে এক ভয়াবহ হিন্দুবিদ্বেষী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এ দাঙ্গার বিরুদ্ধে যে "পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও" প্রতিবাদ-

আন্দোলন গড়ে ওঠে, সে আন্দোলনে সারা দেশে ছড়ানো কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা রাখেন।

১৯৬৪ সালেই আইয়ুব সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। বিরোধী দলসমূহ থেকে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করার ধারণাটা প্রথম সামনে আনা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই। নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্যে ১৯৬৪ সালের ২১শে জুলাই বিরোধীদলসমূহের এক বৈঠক বসে এবং গঠিত হয় "কমবাইন্ড অপোজিশন পার্টি" বা "কপ"।

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নবগঠিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান।

এ সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহচর বেরিয়াকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তে স্তালিনের আমলের নানা গুপ্ত হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিনকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে বক্তৃতা করেন। এরপর থেকে স্তালিনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সঙ্গে রুশ পার্টির বিভেদ সৃষ্টি হতে থাকে। সবচেয়ে বড় বিভেদ সৃষ্টি হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। মাও-সে-তুং মনে করতেন স্তালিন "সত্তর ভাগ সঠিক ও তিরিশ ভাগ ভুল"। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো, এই দুই বৃহত্তম পার্টি, রুশ ও চীনের পার্টির বিভক্তি অনুযায়ী, বিভক্ত হতে থাকে। ১৯৬০ সালে মস্কোকে ৮১টি দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সম্মেলনের সময় মতপার্থক্যগুলো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। জোড়াতালি দিয়ে শেষমেষ একটা সমঝোতা হলেও রুশ ও চীন পার্টির মধ্যেকার বিরোধটা ক্রমেই সামনে চলে আসতে থাকে।

অচিরেই এ ভাঙনের প্রভাব পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতেও এসে পড়ে। ১৯৬২ সালের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার ও যশোরের আবদুল হকসহ বেশ কিছু সদস্য চীনা পার্টির মতাদর্শী হয়ে ওঠেন এবং নিজেদেরকে "পিকিংপন্থি" বলে ঘোষণা করেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে তখন ঐক্যবদ্ধ রাখার জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তাই এ ব্যাপারে ১৯৬৩ সালের মার্চে "আমাদের অভিমত" নামে একটা দলিল আলোচনার জন্যে পার্টির ভেতরে প্রচার করে। এই রিপোর্টের পাল্টা দলিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা। তাঁদের দুজনের ছদ্মনাম অনুসারে এ দলিলটা "খালেদ-বশিরের দলিল" নামে পরিচিত ছিলো।

এদিকে সারা পূর্ব বাংলায় তখন আইয়ুববিরোধী এক জনমত ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে এবং আইয়ুবের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। যেহেতু চীনের সোভিয়েতবিরোধিতার কারণে তখন আমেরিকার সঙ্গে চীনের সখ্যতা গড়ে উঠছে, ফলে মার্কিনবন্ধু আইয়ুব খানও তখন চীনাপন্থিদের প্রিয় হয়ে উঠেছে। এদেশের চীনাপন্থিরা তাই আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছিল অনিচ্ছুক। এমনও বলা হয়েছে "ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব"। সার্বিক এই পরিস্থিতিটা আলোচনার জন্যে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা মোহাম্মদপুরের এক গোপন ডেনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালের ২০ ডিসেম্বর প্লেনামের পর মূলত:

চীন-রুশ প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে যায়। এই ভাঙনের ফলে শতকরা এক-চতুর্থাংশ পার্টি সদস্য চীনা পার্টির মতবাদ গ্রহণ করে পার্টি থেকে বেরিয়ে যায়।
এই ভাঙন প্রবীণ ও ত্যাগী কমিউনিস্ট নেতাদের জন্যে নিঃস্বন্দেহে ছিল খুবই বেদনাদায়ক। যেমন চীনাপন্থি শরদিন্দু দস্তিদার লিখেছেন; "তখন প্লেনামের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মণিদা কান্নাভেজা সুরে আমায় বললেন, পার্টি আজ দুটো হয়ে গেল, এর ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়।.. শেষ মুহূর্তে আমার হাত ধরে আরো বললেন, হয়তো আর আপনার সাথে এবং আপনার বন্ধু সুখেন্দু দস্তিদারের সাথে দেখা হবে না। কিন্তু আপনাদের কথা আমি ভুলব না।"
চীন-সোভিয়েত প্রশ্নে প্রথম বিভক্তিটা দেখা দিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে যা ষাটের দশকে ছিল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এক সুবিশাল সংগঠন। ছাত্র ইউনিয়নের মস্কোপন্থি ছাত্ররা ছিলেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু পিকিংপন্থি ছাত্রদের একাংশ ৬-দফাকে "সিআইএ-র দলিল" আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করতে থাকে।
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রুশ-চীন বিরোধের একটা তাত্ত্বিক দিকও ছিলো। তা ছিলো, বিপ্লবের স্তর নিয়ে। মোটা দাগে তা ছিল, চীনাপন্থিরা বলতে চাইতেন এখন বিপ্লবটা হবে "জনগণতান্ত্রিক"। ফলে শ্রমিক-কৃষকদের নেতৃত্বেই হতে হবে সব কিছু। আর মস্কোপন্থিরা বলতেন বিপ্লবের স্তর এখন "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। আন্দোলনের এ স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক ছাড়াও মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা রইবে। সেই বিবেচনায় তারা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য জাতীয় শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন।
এ প্রসঙ্গে সাবেক ন্যাপ নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্যের উদ্বৃতি দিয়ে গৌতম রায় জানাচ্ছেন; "পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এ সময় শুধু দেশের দুজন নেতা মওলানা ভাসানী ও মুজিবুর রহমানের ওপরেই ভরসা করতেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী সামরিক সরকারের অর্থে সরকারি দলের নেতা হয়ে চীন সফরে যাওয়ার ফলে তাঁর ভাবমূর্তি জনসাধারণকে ভয়ানকভাবে ক্ষুব্ধ করে। অতএব তাদের ভরসাস্থল হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ৬-দফাই হয়ে ওঠে জনসাধারণের কাছে প্রধানতম রাজনৈতিক কর্মসূচী।"
বাস্তবে এই ৬-দফাই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের আন্দোলনের বীজমন্ত্র। এ প্রসঙ্গে ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমেদ লিখেছেন; "৬-দফা পেশের সময় মুজিবুর আমাকে ও রুহুল কুদ্দুসকে ডেকে বলেন, আসলে এটা ৬-দফা নয়, এক দফাই। আমি ঘুরিয়ে বললাম শুধু।"
১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার আসাদ গেটের কাছে চলমান এক রিক্সা থেকে কমরেড মণি সিংহ গ্রেপ্তার হয়ে যান। এবং এদেশের বামপন্থিদের ইতিহাস নিয়ে গৌতম রায়ের বইটা ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে সমাপ্ত হয়।
১৯৪৭ থেকে গোটা পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টির অর্জন বা ব্যর্থতার একটা মূল্যায়ন করার সময় এটা মনে রাখা সঙ্গত হবে যে কোনও মুসলমানপ্রধান দেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার বা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজটা মোটেই সহজ নয়। তাছাড়া গোটা পাকিস্তান আমলটাতে, কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে অনেকেরই, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটার তীব্রতা নিয়ে উপলব্ধির অভাব ছিলো। যাঁরা হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এসেছেন তাঁরা বিষয়টা যতটা অনুভব করতেন, মুসলমান পরিবার থেকে আসা কমরেডরা এ ব্যাপারে ততটা সংবেদনশীল ছিলেন না। তবে এ কেবল সংবেদনশীলতার প্রশ্ন নয়। এর একটা

বৈষয়িক দিকও ছিলো। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিলো শক্তিশালী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবে অবদমিত। যেমন দেশভাগের সময় ঢাকা শহরের মোট সম্পত্তির ৮৫ শতাংশ ছিলো হিন্দুদের মালিকানায়। দেশভাগের পর হিন্দুরা দেশত্যাগ শুরু করলে চাকরি, সম্পত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম মধ্যবিত্তের সামনে ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশের পথ খুলে যায়। গ্রামাঞ্চলেও হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জমি সস্তায় কিনে, এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় বিনামূল্যে পেয়ে, অনেক মুসলিম পরিবারই সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। এ সময় কমিউনিস্টদের সর্বত্যাগী ও ব্যক্তিগত উচ্চ আশাহীন জীবন মুসলমানদের যে খুব ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করতে পারবে না সেটা হয়তো স্বাভাবিকই ছিল। ফলে পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টি আকারে-আয়তনে ততটা বাড়তে পারেনি। তবে কমিউনিস্ট পার্টির অর্জন হিসেবে যেটা সব সময়ে বলা যাবে যে এত প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও এদেশের জাতীয় জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কমিউনিস্টরা হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং দুর্বল সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলো।
পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনে ইতিহাসের দুটো সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। তাই গৌতম রায়ের বইটা ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত হলে ভালো হতো, যে বাংলাদেশের জন্মের পেছনে কমিউনিস্টদেরও অনেক অবদান ছিলো। কিন্তু ১৯৬৭ সালে মণি সিংহের গ্রেপ্তারের ঘটনায় বইটা শেষ হওয়াটা পাঠককে হয়তো কিছুটা হতাশই করবে। এ যেন ম্যারাথনের দৌড়টা পুরোটা প্রায় সমাপ্ত করে শেষ ল্যাপের আগেই হঠাৎ দৌড়টা থামিয়ে দেওয়া হলো!
তবে গৌতম রায়ের বইয়ের গুণ অনেক। এমন সমৃদ্ধ ও বিশদ গবেষণা, ইতিহাসের এত গভীরে যাওয়া এবং এত নৈর্ব্যক্তিকভাবে সে ইতিহাসের মণি-মুক্তোগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরা, এ সত্যিই এক বড় মাপের কাজ। এত পরিশ্রমী ও মননশীল গবেষণার কাজ বাংলার সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চায় তেমনটা দেখা যায় না। আর বইটার আরেক বড় গুণ, বইটার সহজ সরল ভাষা। অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় গৌতম রায় ওঁর বইটা লিখেছেন। এমন সাবলীল ভাষায় কোনো বই লেখা তখনই সম্ভব হয় যখন বিষয়বস্তুটার উপর লেখকের থাকে পূর্ণাঙ্গ ও সবিশেষ দখল। গৌতম রায়ের সে দখলটা ভালোই ছিল বোঝা যায়। যারাই বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতি ও পূর্ববঙ্গের ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী "প্রথমা" প্রকাশনা প্রকাশিত এ বইটা সবার জন্যেই এক অবশ্যপাঠ্য বই হয়ে রইল।

=o=



Dhaka WASA Turn Around Program

10 Years of Success Story

WASA

Moving towards Smart Water Managment System

Prime Bank

HASANAH
ISLAMIC BANKING

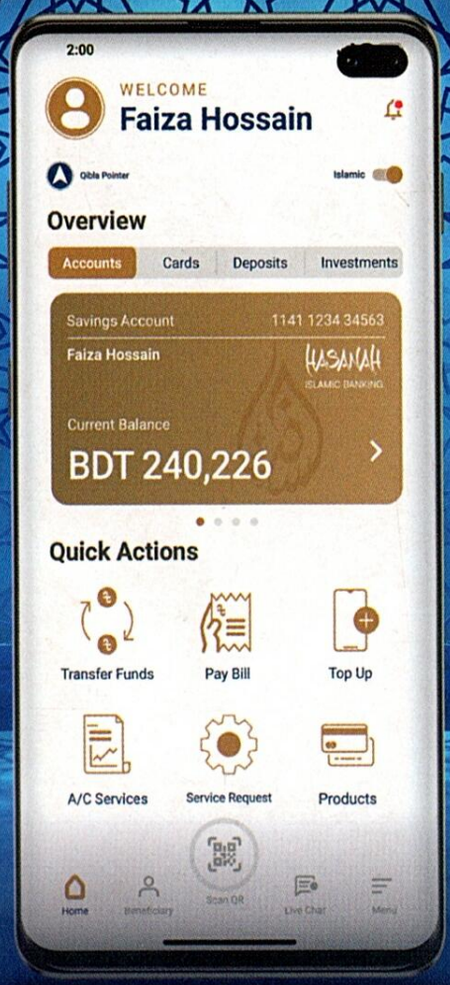

Freedom
to do banking from
anywhere, anytime

All Islamic Banking
Services in One App

Instant Account Opening I Fund Transfer
Bills Pay I Mobile Top-Up I QR Payment
Term Deposit I Investment, Account &
Card Management I 24X7 Support

MyPrime

GET IT ON
Google Play

Scan to Download